নবনূর

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

কলিকাতা,

১৪৩ নং কড়েয়া রোড, নবনূর কার্য্যালয় হইতে
মোহাম্মদ আসাদ আলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—)১৩১০(—

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা. প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

সূচীপত্র।

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অঙ্গুলের পথে (ভ্রমণ)	শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত রায়	৪১
"অতীত" (পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	৭৮
অনুরোধ (পদ্য)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩২১
অন্তলার দুর্গাধিকার (গাথা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৫৩
আওরঙ্গজেব কি সত্যই দোষী ?	শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ	৪৬১
আবাহন (পদ্য)	মুন্সী কায়কোবাদ	৩১
আমাদের শিক্ষা	মৌলভী ইমদাদুল হক্ বি, এ,	৪৩, ৯৩
আমার কি ভয় ? (পদ্য)	শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল,	৭৭
আমরা কি ? (পদ্য)	মৌলভী কে, এ, সিদ্দিকী	২৬৯
আমি যেন কার (পদ্য)	এম, মোহ্সেন আলী	৩২২
আরবীয় দর্শনালোচনা	মিঃ আবদুল্লা আল্-মামুন সোহ্রাওয়ার্দী এম, এ, এম, আর, এ, এস,	১৬০, ২০১, ৩১৫, ৩৯৬, ৪৫৩
আলি পাশা	মুন্সী মোজাম্মেল হক্	২৮, ২৬২, ৪৩৩, ৪৫৯
আশীর্ব্বাদ (পদ্য)	„ হবিব উল্লা	১২৭
আশ্রিতা (পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	১১৭
আহ্বান (পদ্য)	শ্রীঅটলবিহারী দাস	১৫৮
আয় আয় (পদ্য)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	৪৬৭
আয়েষার পরিণাম (গল্প)	সম্পাদক	২৫
ঈদ (পদ্য)	„	৩১৩
উত্থান-পতন	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ	১৬, ৭৬
উদ্বোধন (পদ্য)	মৌলভী ইমদাদুল হক্ বি, এ,	৩৯০
উপেক্ষিতা (পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	৩০৯
একখানি পত্র	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	২৩৪
একটি পত্র (পদ্য)	মৌলভী ওসমান আলী বি, এল,	৭৯
একটি বালিকার প্রতি (পদ্য)	সম্পাদক	৩৯

বিষয়		লেখক	
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ		শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	১৪২, ১৭৯
কবি আলাওলের প্রতি	(পদ্য)	মৌলবী মোহাম্মদ মহতসুম্ বিল্লা চৌধুরী	৪৬৫
কলঙ্ক ও মৃত্যু	(পদ্য)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৩৭
কল্পনার প্রতি	(পদ্য)	সম্পাদক	২৬৮
কল্পনা	(পদ্য)	মুন্সী কায়কোবাদ	৪৭৯
কার দোষ	(পদ্য)	মৌলবী কে, এ, সিদ্দিকী	১৯৫
কাল ও প্রেম	(পদ্য)	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়	৪৩৬
কি দিব তোমায়	(পদ্য)	মৌলবী আজিজর রহমান	ঐ
কেন্দ্রে	(পদ্য)	শ্রীকাব্যানন্দ	১৪৯
খন্দদিগের নরবলি-নিবারণ		শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	৩৪২
খলিফার ন্যায়পরায়ণতা		মুন্সী মোহাম্মদ মেয়রাজ উদ্দীন আহম্মদ	২০
খেলা	(পদ্য)	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি, এল,	১৫৭
খোকা	(পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	১৯৭
গতি	(পদ্য)	„ „	২৬৮
গান		স্বর্গীয় বিহারীলাল দেব নাথ	২৫
গোড়াতেই কথা		শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ	৩৯৬
গোরস্থান	(পদ্য)	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি, এল	৪৭১
গোলাপ ফুল	(পদ্য)	বিবী আজিজন্নেসা	৩৫
গ্রন্থ-সমালোচনা		মৌলবী আবদুল করিম, মোহাম্মদ আসাদ আলী ও সম্পাদক	৮০, ২০০, ৩৯২, ৪৩৯,
ঘুড়ি		মৌলবী ওসমান আলী বি, এল	১৫০
চাহনা	(পদ্য)	মুন্সী মোজাম্মেল হক	৭৮
চিরযুগ বন্দিতা	(পদ্য)	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্তী	৪৩৬
ছিলাম বিলাতী আমরা ভারতে	(পদ্য)	মৌলবী এওশের আলী খান ইউসফজয়ী	১০৫
জোছনায়	(পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	১৫৭
তুলসী বাই	(পদ্য)	মৌলবী ইমদাদুল হক বি, এ,	৩৯৫
ত্রিকূটেশ্বর		শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৬৮
"দাতুনে মিস্ হুই"		শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২৬, ১৮০

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
দীক্ষা	(পদ্য)	[illegible]	[illegible]
দুর্দিনের [illegible]		[illegible]	[illegible],৩৫৬
দূরহিত [illegible]	(পদ্য)	[illegible]	[illegible]
দেবতা আমার	(পদ্য)	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩০৬
দৌলত উজীর ও আলাওল সম্বন্ধে		মৌলবী [illegible]	২১৩
ধর্ম এবং শিক্ষা		মৌলবী [illegible] বি, এ,	৪০৭
ধর্মযুদ্ধ, গাজী ও জেহাদ			২৯৯
নবনূর	(পদ্য)	মুন্সী কায়কোবাদ	১২১
নবীন জীবন	(পদ্য)	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	৩০২
নিজিতা	(পদ্য)	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	২৬৮
নিবেদন	(পদ্য)	মুন্সী মোজাম্মেল আলী খান	১৫৮
নিবেদন		সম্পাদক	৪৭৭
নিবাহ বাঙ্গালী		মিসেস্ আর, সাখাওয়াত হোসেন	৩৭৭
পত্র		শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল	৪১৭
পরিব্রাজক বন্ধুর গীত (পদ্য)		মুন্সী কায়কোবাদ	১৮৮
পাপিয়া	(পদ্য)	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	২২৬
পূজনীয়া খদিজা দেবী (পদ্য)		সম্পাদক	৪৮
প্রতিবাদে অনুরোধ		শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার	৬৭
প্রাচীন মুসলমানী গীতমালা		মৌলবী আবদুল করিম	১০২
প্রার্থনা	(পদ্য)	মুন্সী কায়কোবাদ	৪১
প্রাদেশিক মুসলমান-শিক্ষা-সমিতি		মৌলবী মির্জা আবুল ফজল	১৫৭
প্রেম ও মৃত্যু	(পদ্য)	মৌলবী ইমদাদুল হক বি, এ,	১৫৬
প্রেম-ডোর	(পদ্য)	শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল,	২৩৪
প্রেমের কোকিল	(পদ্য)	মুন্সী কায়কোবাদ	৮১
প্রেমের চিত্র	(পদ্য)	মৌলবী ইমদাদুল হক বি, এ,	১১৬
ফুল		শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল,	৪
বঙ্গভাষায় মুসলমানী-সাহিত্য		মৌলবী আবদুল করিম	১১৩
বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান		মৌলবী আফতাব উদ্দীন আহ্মদ	৩২৯

বিষয়		লেখক	
বণিক ও শুকপক্ষী	(গাথা)	মুন্সী মোহাম্মদ এবরার আনসারী	[illegible]
বন্ধুর প্রীতি	(পদ্য)	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	[illegible]
বসন্ত	(পদ্য)	মৌলভী এমদাদুল হক্ বি, এ,	৩১৫
ব্যর্থ জীবন	(পদ্য)	সম্পাদক	৭৮
বাসনা	(পদ্য)	"	১১৬
✓নারিকেল	(পদ্য)	মিসেস্ আর, সাখাওয়াত হোসেন	৪২৪
বিচারক বিচারাধীনে			২৯৪
বিজন-মাধুরী	(পদ্য)	শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল,	১৯৬
বিধবা	(গল্প)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৯০, ২৩৮, ৩০৪
বিমলা	(গল্প)	সম্পাদক	২৫৮
"প্রবাসী" ও হিন্দুসমাজ		মৌলভী এমদাদুল হক্ বি, এ,	৩৭৬
বিরহ	(পদ্য)	শ্রীশরৎচন্দ্র সরকার	১৯৭
ভক্তি উপহার	(পদ্য)	সম্পাদক	১৪১
ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতা	(পদ্য)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১১৭
মধ্যএশিয়ার জ্ঞানভাণ্ডার		মৌলভী এমদাদুল হক্ বি, এ,	৪৭৩
মনের বেদন মনই জানে	(পদ্য)	মৌলভী ওসমান আলী বি, এল,	৩৬
মনপ্রাণ সকল	(পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা দেবী	৪৩৮
মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান		সম্পাদক	৩৪৮
মাসিক সাহিত্য		ঐ	৩৭,১২০,১৯৮,২৭০,৩১০,৩৫৩,৪৩৬,৪৮৩
মিলন	(পদ্য)	শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪১
মুসলমানের প্রতি হিন্দু-লেখকের অত্যাচার			১৬৭
মুসলমানের শিক্ষা		শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	২৭৮
মুসলমানসমাজে ইতিহাস-চর্চ্চা		সম্পাদক	৮২
মোগলশাসনের দুটি কথা		শ্রীপঞ্চানন ঘোষ	২০৬
মৃত্যু	(পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৫৭
যাচনা	(পদ্য)	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়	ঐ
রণজিৎ সিংহের মুসলমান-মন্ত্রী		সম্পাদক	১৩৭
রাজর্ষি লাউন		শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪২৫
রুচি বিকৃতি		মৌলভী এমদাদুল হক্ বি, এ,	২৬৭

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
লুসাই হিল		মুন্‌শী আহমদ আলী দেওয়ান	৪৩১
শকুন্তলা	(পদ্য)	শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়	৪২৯
শরতে কামনা	(পদ্য)	সম্পাদক	৩০৮
শশধর	(পদ্য)	মিসেস্ আর, সাখাওয়াত হোসেন	৪৭৮
শিরজী বা সাজাদী রোসিনারা		মৌলভী ইম্‌দাদুল হক্ বি, এ,	৬৯
শিক্ষিত মুসলমানের ফটো		মৌলভী মোহাম্মদ আজিজ মেহের	১০১
শূন্য-গৃহে	(পদ্য)	মুন্‌শী শেখ ফজলল করিম	৭৯
শোক-স্মৃতি	(পদ্য)	সম্পাদক	১০৪
সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী		মৌলভী আবদুল করিম	৩২০, ৪৪৭
সন্ধ্যায়	(গল্প)	সম্পাদক	৬২
সম্রাট আওরঙ্গজেব		মৌলভী এস, এম, আবদুল আহাদ	১৮৮,
সম্মিলন	(পদ্য)	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সরকার	৩৮৬
সংসার	(পদ্য)	শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল	১৫৬
স্বর্ণরেণু		মৌলভী আবদুল করিম	১০৬, ১৪৬
স্বাধীন বাসর	(পদ্য)	মৌলভী আফতাব উদ্দীন আহ্‌মদ	৩০৯
সাহিত্য-শক্তি ও জাতি-সংগঠন		মুন্‌শী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন	৫৬
সিরাজদ্দৌলা	(পদ্য)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৬৮
শুধুমাগো—পুজিতে তোমায় (পদ্য)			৩৯০
সূচনা		সম্পাদক	১
হজরত মহাম্মদ গ্রন্থ		মুন্‌শী আজিজল হক্	৪৮০
হাসি কান্না	(পদ্য)	মৌলভী আফতাব উদ্দীন আহ্‌মদ	১৫৭
হিন্দুনারীর মুসলমানত্বগ্রহণ		মৌলভী ইম্‌দাদুল হক্ বি, এ,	৯
হিন্দুলেখক ও মুসলমান সমাজ		মৌলভী আফতাব উদ্দীন আহ্‌মদ	২২৬
হীরামণ	(পদ্য)	মুন্‌শী কায়কোবাদ	৩০৭

নিবেদন।

১ম সংখ্যা "নবনূর" আমাদের অনেক পরিচিত অপরিচিত সমাজ হিতৈষী মহোদয়গণের নিকট প্রেরিত হইল। আশা করি তাঁহারা নবনূরের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা প্রেরণ করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহিত করিবেন। যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংখ্যা পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। কোন গ্রাহক অনুমতি করিলে আমরা ২য় সংখ্যা পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিয়া মূল্য আদায় করিতে পারি।

নবনূরকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করাই আমাদের অভিপ্রায়, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এ বৎসর আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। পত্রিকার উন্নতি গ্রাহকগণের অনুকম্পার উপরই সম্যক্ নির্ভর করে, যদি সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা যথারীতি সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হই, তবে আগামী বৎসর হইতে নবনূরকে উন্নত করিতে যত্নপর হইব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, মৌলভী সৈয়দ শামসুল হুদা এম-এ, বি-এল উকীল সাহেব, "ইস্‌লাম-প্রচারক" সম্পাদক মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, "মিহির ও সুধাকর" সম্পাদক মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম সাহেব, মৌলভী ইম্‌দাদুল হক্ বি-এ সাহেব প্রভৃতি সমাজ হিতৈষী মহাত্মাগণ আমাকে নবনূর প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। সুহৃদ্বর মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব ও নবনূরের সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন।

অনুগ্রহপ্রার্থী—

মোহাম্মদ আসাদ আলী।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক নবনূরে নিয়মিত রূপে লেখনী পরিচালনা করিবেন।

মৌলভী সৈয়দ শামসুল হুদা এম-এ, বি-এল।
" মির্জ্জা আবুল ফজল।
" রেজা আলী।
শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ।
" শেখ আবদুর রহিম।
" কায়কোবাদ।
" মোজাম্মেল হক্‌।
" মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন।
মৌলভী ইমদাদুল হক্‌ বি, এ,
" আবদুল করিম।
" মতিয়র রহমান।
" মোহাম্মদ আজিজ মেহের।
" ডাক্তার আবদুল বারি।
শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল,
" " দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।
" " অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" " নগেন্দ্রচন্দ্র রায়।
" " নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ।
মৌলভী ডাক্তার আব্দুল রহমান।
" নওশের আলী খান ইউসফজী।
" এলাহ্‌ নেওয়াজ খাঁ বি, এ,
" মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান।
আজিজন্নেসা খাতুন।
মুন্‌শী আবদুল লতীফ।
" শেখ ফজলল করিম।
" দেওয়ান নসির উদ্দীন আহ্‌মদ।
" এবরার আনছারি।

নবনূর।

সূচনা।

যাঁহার নূরের বিন্দুমাত্র আভা গ্রহণ করিয়া শশী-তপন উদ্ভাসিত, ফুল চারুহাসি ভরা, শিশুর সরল মুখ লাবণ্যের খনি, কিশলয়-পত্র, নয়নাভিরাম হরিৎবর্ণভূষিত; মণি-মরকতে, চুনী-পান্নায়, হীরক-কোহিনূরে যাঁহার জ্যোতির বিকাশ, সেই চির জ্যোতির্ম্ময়, চির প্রেমময়, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একমাত্র অধীশ্বরকে প্রণাম। তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেই লয়। অসীম তাঁহার কৃপা, অনন্ত তাঁহার স্নেহ। সেই কৃপা ও স্নেহের উপর একমাত্র নির্ভর করিয়াই আজ আমরা নবনূর হস্তে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। তিনিই আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা সাফল্যে পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন। তাঁহারই স্নেহালোকে নবনূরের প্রতি পৃষ্ঠা আলোকিত হইবে। আমরা উত্থান ও পতন উভয়ই তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।

যে সমাজে 'আখ্‌বারে এস্‌লামীয়া', 'ইস্‌লাম', 'মাসিক মিহির', 'হাফেজ', 'কোহিনূর' এবং 'লহরী' জন্মের কিছুকাল পরেই অকাল মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সেই সমাজে কেন আবার এই প্রয়াস? 'ইস্‌লাম-প্রচারক' প্রবীন সম্পাদকের অধীনে থাকিয়াও যে সমাজে উন্নতির আসন লাভ করিতে পারিতেছে না, সেই ঘোর নিদ্রাতুর সমাজের বক্ষে আবার এই ক্ষীণ আলোর ক্ষণিক বিকাশের কি প্রয়োজন? অনেকেই হয়ত আমাদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, ইহার উত্তরে আমরা কেবল মাত্র একটী কথা বলিতে পারি,—মাতৃভাষার সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্যই আমরা বাহিরের পূর্ণালোকে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাদের অন্য সাধ নাই অন্য লক্ষ্যও নাই। মায়ের ছেলে মায়ের

যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করে, অন্যের প্রশংসার ধার ধারে না, আমরা সেইরূপ বাঞ্ছিত ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারিলেই আমাদের সকল শ্রমে যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছি বলিয়া মনে করিব।

এই বহু মাসিক প্লাবিত দেশে আর একখানা মাসিকের জন্ম দিয়া কি লাভ এবং তাহাতে কোন সুফলের আশা আছে কি না ইহাও একটু অনুধাবনের বিষয়। আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যে জাতি একদিন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে অতুল যশোলাভ করিয়াছিল, সেই জাতির এই জঘন্য পরিণাম দর্শন করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণ না যন্ত্রণায় অভিভূত হয়? পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার, একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য। সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হয়; এবং যদি কখনও মুসলমানজাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহা সাহিত্য-চর্চা-লব্ধ শক্তি দ্বারাই হইবে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একখানা ভাল মাসিকের অভাব দর্শন করিয়াই আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। ভাল কি মন্দ করিয়াছি বুঝিবার অবসর পাই নাই। নবনূর যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্য চর্চার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে পারে তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন।

আজ আমরা বঙ্গভাষার প্রত্যেক মুসলমান লেখককে সাদরে আমাদের এই পুণ্যব্রতে সাহায্যার্থ আহ্বান করিতেছি। বঙ্গভাষাকে একটা নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিয়া 'মুসলমান বাঙ্গলা সাহিত্যের' শক্তি সঞ্চার করা প্রত্যেক বঙ্গীয় মুসলমানেরই অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহাতে বঙ্গভাষারও অঙ্গপুষ্টি হইবে এবং আরবী পারসী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য হইতে কত অমূল্য রত্ন ভাষান্তরিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের বক্ষে মণিমালার ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাও আশা করি যে, যে সমুদয় পূজনীয় হিন্দুলেখক মুসলমানজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল, এবং একত্র বাস নিবন্ধন তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারা ... যথোচিত সাহায্য করিয়া মুসলমানপ্রীতির পরিচয় প্রদানে

করিবেন। ভারতবর্ষের অদৃষ্টফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখদুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত ; বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজীত এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্তক্ষেত্র। মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষায় নূতন লেখক ; নূতনকে চিরকালই প্রাচীনের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সাহায্যগ্রহণে যে এক মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, তাহাই এই দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতিকে একীভূত করিবার একমাত্র উপায় ; অন্ততঃ এতদ্দারা তাহাদের মধ্যে সখ্যভাব বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের এই অনুষ্ঠানের সূচনাতেই যে সমুদয় হিন্দুলেখক আমাদিগকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, নবনূরের প্রতি তাঁহাদের এই অনুগ্রহ চিরদিনই অটুট থাকিবে বলিয়া ভরসা করি।

মুসলমান লেখকগণকে আর কি বলিব ? নবনূর ত তাঁহাদেরই সম্পত্তি। এই জাতীয় সম্পত্তি-রক্ষার ভার তাঁহাদের হস্তেই আমরা অর্পণ করিলাম। তাঁহারাই ইহাকে নিজেদের অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিচর্য্যার বলে উন্নত করিবেন।

আজ আমরা আমাদের অন্তঃপুরস্থ প্রত্যেক মহিলাকে 'নবনূরের' উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য সাদরে সাহিত্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। পারিবারিক জীবনে তাঁহারা আমাদিগকে মাতার যত্নে, ভগিনীর স্নেহে, স্ত্রীর স্নিগ্ধপ্রেমে সঞ্জীবিত করেন, আমাদের সাহিত্যিক জীবনেও কি তাঁহারা আমাদের চির-সহায় হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবেন না ?

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আর একবার আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট আমাদের আরব্ধকার্য্য সুসম্পাদনের জন্য যথোচিত শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। মঙ্গলময়, তোমারই মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হউক।

ফুল।

:•:—

ফুলের গান গাহিতে গাহিতে প্রাচীন কবি গাহিয়াছেন,—

"ফুল, তুমি শিখাও আমারে ;
তুষিতে অমনি করে পারি যেন সবারে
বালকের খেলিবার,
প্রেমিকের কণ্ঠহার,
সাধকের অর্চ্চনার,
সুধা দিয়ে ভ্রমরে
অমনি করিয়া আমি মোহিব এ সংসারে।
ফুল, তুমি শিখাও আমারে।"*

আধুনিক কবিও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

প্রণয়ের পরিচয় কুসুমের দাম,
তব লীলা খেলা নিয়ে মত্ত বিশ্বধাম,
কি সুলগ্নে কিবা শুভ তপস্যার ফলে
ভবে আগমন দেখি, করেছিলে তুমি,
এক বেশে যুবা বৃদ্ধ বালক সকলে
ভুলাইলে :—সে কঠোর তপ বল শুনি,
খেলায় আদরে তোমা বালক সকল,
হ'য়ে প্রেম-উপহার মাতাও যুবার,
বৃদ্ধের দেব-পূজায় তুমিই সম্বল,
কে এমন ভাগ্যবতী বল এ ধরায় ?" ইত্যাদি।

প্রাচীন কবি জগতে ফুল কি কি কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে সব কথা নিঃশেষ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,——

"ফুল, তুমি শিখাও আমারে,
ওই পরিণাম তব শক্তির কি আচারে

* প্রচার—তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা—১৮৪ পৃঃ

রূপগন্ধ শুকাইলে,
পরিমল ফুরাইলে,
সেবিতে অশক্ত হলে ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ধরারে,
অমনি আনন্দোঝ'রে পড়িব এ সংসারে
ফুল, তুমি শিখাও আমারে।"*

কিন্তু এ কথা কয়টী কি ঠিক?—ফুল কি যথার্থই রূপ গন্ধ শুকাইলে পরিমল ফুরাইলে, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ধরার সেবায় অশক্ত হইল বলিয়া ঝরিয়া পড়ে? অথবা ইহার তখনও কর্ত্তব্য কার্য্য ফুরাইয়া যায় না,—আর ও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঝরিয়া পড়ে? ভাবুক ভাবের বশে যাহাই লিখিয়া থাকুন, তাহা খাটি সত্য কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়।

ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য পরিমল নহে,—সৌন্দর্য্য নহে,—সৌকুমার্য্যও নহে। ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য অস্থায়ী জগতে স্থায়িত্ব আনয়ন,—নশ্বর জগতে অবিনশ্বরত্ব প্রদান;—সঙ্গে সঙ্গে অপর যে সকল গুণরাশির সমাবেশ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা ও কৌশলের একটু সামান্য পরিচয় মাত্র।

ফুল,—ফলের জন্য; ফল কি জন্য?—ফল, আত্ম-বিনাশে আত্ম-স্বরূপ স্বরূপের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য; সঙ্গে সঙ্গে গৌণভাবে অপর কার্য্য সাধন হয় হউক, তাহাতে তাহার গৌরব বই অগৌরবের কথা নাই;—কিন্তু আসল কথাটী এই বটে।

এ নশ্বর জগতে যে মানব কিছুমাত্র "স্মৃতি-চিহ্ন" রাখিয়া যাইতে পারে না, তাঁহার এ জগতের নিকট সাময়িক। অন্তিম বিদায় লওয়ার সময়

---

* প্রচার—তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

সাময়িক,—যেমন,

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
-ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা; ২য় অধ্যায়,২২ শ্লোক।

সুতরাং আমরা যাহাকে সচরাচর অন্তিম বিদায় বলি, গীতার মতে তাহা অন্তিম বিদায় নহে।

যে কি বিষম মনোকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা একজন অসাধারণ দার্শনিক কবি দুইটী মাত্র ছত্রে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—

"For who, to dumb forgetfulness a prey.
This pleasing anxious being e'er resigned,
Left the warm precincts of the cheerful day,
Nor cast one longing, lingering look behind ?"

Thomas Grey.

বাস্তবিক মানব এই সাময়িক অন্তিম বিদায় টুকু—এই কেবল দেহ পরিবর্ত্তন টুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইবার সময়, তাঁহার জন্য কাঁদিতে কেহ থাকিল কিনা,—তাঁহার নামটী তদীয় বর্ত্তমান দেহের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইবে, অথবা দুদিনের জন্য কেহ তাহার "স্মৃতি" মনে স্থান দিবে, এই ভাবনায় বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

মানবের সম্বন্ধে উল্লিখিত কথাটী সত্য, সকল মানবের পক্ষেই এক-রূপ;—অধিক কি যিনি যোগী, সন্ন্যাসী, সংসারে নিস্পৃহ, তিনিও আত্মার উন্নতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে অমরত্ব-সাধন প্রয়াসী, তিনি ও কায়া পরিবর্ত্তনের সময় সজল-নয়নে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে ;—আশানুরূপ ফলবতী না হইয়া থাকিলে তিনি ও বোধ হয় এ আক্ষেপটির হাত ছাড়া হইতে পারেন না।

মানুষের সম্বন্ধে যাহা সত্য, প্রাণী মাত্রের সম্বন্ধেই তাহা খাটিতে পারে,—কিন্তু বৃক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাহা খাটিবে কি না ?

বলা বাহুল্য যে বৃক্ষেরও প্রাণ আছে ; প্রাণীসংজ্ঞার মধ্যে বৃক্ষ অন্তর্ভুক্ত না হউক, বৃক্ষ সজীব পদার্থ ;—ইহার জীবন আছে,—জীবন্ত-ভাবের অবস্থিতি ও বৃদ্ধি, এমন কি জীবনের অন্তাবস্থা, প্রাণীর ন্যায় সকলই ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। এই বৃক্ষ ক্রমাভিব্যক্তিবাদের ফলে যে, ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, তাহা অনেক প্রাচীন পণ্ডিত-গণের অভিমত। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রেও যমলার্জ্জুন বৃক্ষের গন্ধর্ব্ব-রূপ প্রাপ্তি ঘটনাটীর আড়ালে, এইরূপ ভাবেরই আভাস পাওয়া যায় না কি ? *

* মনুর মুক্তিদেশ পরিণতি প্রাপ্ত অবস্থায় মানব-দেহ প্রাপ্তি ও কি তদ্রূপ নহে ?

ক্রমাভিব্যক্তিবাদে বৃক্ষ কালক্রমে মানবে পরিণত হউক বা না হউক, কোন কোন বিষয়ে বৃক্ষ যে মানবের অনুকরণ করে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। চিরস্থায়িত্বের জন্য মানবের যে যত্ন,—বৃক্ষেরও সে যত্ন।

তবে মানব উৎকৃষ্টতর জীব, তাহার চিরস্থায়িত্বের বা অবিনশ্বরত্বের চেষ্টারও উৎকৃষ্টতর প্রণালী আছে;—কোন কোন মানব কেবল আত্মজের দ্বারা নিজের স্থায়িত্বের অর্থাৎ অবিনশ্বরত্বের আশা করিয়া থাকেন, কোন কোন দেবভাবসম্পন্ন মানব তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের পথে চলেন;—তাঁহারা জগতে যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করতঃ স্বকীয় জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া সমগ্র মানব জগতের মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া যান এবং যাহার প্রভাবে কর্ম্ম-জগতের যন্ত্র সকল অভিনব বেগে অভিনব পথে পরিচালিত হয়, তাহাতেই তাঁহারা চিরকাল অমর রহেন।

বৃক্ষ এ উচ্চতর আদর্শ কোথায় পাইবে? প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানবের পথই তাহার অবলম্বন, সুতরাং অবিনশ্বরত্বের জন্য মানবের যে যত্ন, বৃক্ষেরও সে প্রকার যত্ন আছে বলা যাইতে পারে। বৃক্ষের সে যত্নের ফলই ফুল,—ফল।

এখন দেখুন ফুলের কি মহৎ একটী উদ্দেশ্য আছে।

মানবদেহে যেমন ধমনী ও তদ্রূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বর্ত্তমান আছে, বৃক্ষের কাণ্ড শাখা প্রশাখা, এমন কি পত্রাদিতেও তেমনি শিরা আছে বলা যাইতে পারে। ফুস্ ফুস্ হইতে প্রতি ধমনীতে প্রতি শিরায় রক্তসঞ্চালিত হইয়া যেমন মানব-দেহের পুষ্টিসাধন করে, বৃক্ষেরও সেরূপ প্রতি শাখা প্রশাখার, প্রতি পত্রের পথে রস সঞ্চারিত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষের প্রধান অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আত্মানুরূপ পুনর্নির্ম্মাণ। এই উদ্দেশ্যেই বৃক্ষ ফল প্রসব করে,—ফল হইতে পুনরায় সেই বৃক্ষের বংশধর বা ভাবী উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই ফল প্রস্তুত করণ ব্যাপারটী নিতান্ত সামান্য নহে। ফলের সৃষ্টির জন্য নিতান্ত বিশুদ্ধ রসের প্রয়োজন; বৃক্ষের সমস্ত দেহ হইতে বিশুদ্ধ রস একত্র সংগ্রহ করিয়া, কি উপায়ে কোথায় রক্ষা করিয়া সুন্দর ফল নির্ম্মাণের অনুকূল সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে, ইহাই বৃক্ষ শ্রেণীর প্রধান চিন্তা। এই

জন্য—এই অভাব পূরণ জন্য—ফুলের সৃষ্টি। এইরূপে বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রস আকর্ষণ পূর্ব্বক শোষণ করতঃ তদ্দ্বারা স্বকীয় পুষ্টিসাধনে অনবরত যত্ন করিয়া ফুল ফলোৎপাদনান্তর, অশ্বতরীর ন্যায়, নিজ সন্তানের জন্মোৎসব সময়ে আপনি ঝরিয়া পড়ে। অতএব বুঝা গেল যে ফুলটী এই শোষণীয়ম ; কিন্তু কেবল শোষণীয়ই নহে, এইটী যে কি অভিনব অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই ফুল বৃক্ষের শরীরের রস হইতে সারভাগ পৃথক করিয়া নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তদ্দ্বারা এরূপ পুষ্ট করিয়া তোলে যে তাহা হইতেই বৃক্ষের অবিনশ্বরত্ব রক্ষার পালিবার বীজ নির্গত হইতে পারে।

বৃক্ষ এবং লতার সারভাগে ফুলের অবয়ব গঠিত হয়, সুতরাং বৃক্ষ ও লতার অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা সৌকুমার্য্যে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ফুলটী শ্রেষ্ঠ। আবার প্রত্যেক পদার্থেরই কোন না কোনরূপ গন্ধ আছে ; বৃক্ষ লতার প্রতি শাখায়, প্রতি পত্রে, প্রতি অবয়বেই গন্ধ বর্ত্তমান ; কিন্তু সকলাংশের সার পুষ্পে, তাহা পরিমল নামে অভিহিত,—যেহেতু ফুলের গন্ধটীও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ফুলের মধ্যে আর একটী দেখিবার জিনিষ আছে,—তাহা অনন্তের ছায়া। ফুলে ভগবানের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। যে জাতির মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাতেই ভগবানের বিভূতি অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান,—অর্থাৎ এক কথায় তাহাকে ভগবানের প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলা যায়। বৃক্ষের মধ্যে বটবৃক্ষে যদি ভগবানের প্রতিরূপ ধরিতে আপত্তি না থাকে, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়ে যদি ভগবানের বিভূতির সমধিক বিকাশ ধরিয়া লইতে কাহারও মনে দ্বিধা না হয়, * তবে বৃক্ষ লতার শ্রেষ্ঠ অবয়ব ফুলে ভগবানের প্রতিবিম্ব দেখাই উচিত। শুধু এ জন্যই নহে,—ফুলে ভগবানের অনন্তকাল-স্থায়ী শক্তির আমরা পরিচয় পাই। এই একটী ফুলেই ঐ বৃক্ষটী অনন্ত-কাল স্থায়ী করিবার বীজ নিহিত রহিয়াছে ভাবিলে, ফুলে ভগবানের এই অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া ফুলকে ভগবানেরই প্রতিরূপ বা ছায়া বলিতে কাহার না সাধ হইবে ? এখন পাঠক, আরম্ভের কথার সহিত মিলাইয়া দেখুন ফুলের প্রয়োজন (উদ্দেশ্য) কি গুরুতর,—ফুল কেবল

* 'অশ্বথ. সর্ব্ব বৃক্ষাণাং' ইত্যাদি। গীতা ; ১০ম অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিতরণ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে না ;— পরন্তু ইহার এই লোকললামভূত সৌন্দর্য্যের মধ্যে, এই মনোহর স্নিগ্ধ সুগন্ধের পরে, এই অবর্ণনীয় সৌকুমার্য্য ব্যতীত, ইহাতে কিরূপ একটী গুরুতর, মহৎ এবং গৌরব-জনক উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে।

আহা, যিনি এহেন সৌন্দর্য্যের আধার জিনিষে, এহেন সুন্দর মহদুদ্দেশ্যের সমাবেশ করিয়া, এহেন কোমলতা ও সৌরভ-পরিপূর্ণ অদ্ভুত জিনিষটির রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কি অসীম সৃষ্টি কুশলতারই না পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। আর যে আর্য্য ঋষিগণ এহেন ফুলকে সেই দেবতার চরণে দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মহিমা বুঝিয়াছিলেন, আমরা কি বুঝিব !

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল,

হিন্দু নারীর মুসলমানঘৃণা।

যুক্তি হীন, প্রমাণ বিহীন, ঐতিহাসিক সম্পর্ক শূন্য মজ্জাগত-মুসলমান-ঘৃণামূলক কথা যেমন বঙ্গসাহিত্যে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, এমন আর কোথায়ও নহে। খ্যাতনামা বাঙ্গালী লেখকবৃন্দ মুসলমান-কলঙ্করাশির ভীম দুন্দুভি প্রাণপণ উল্লাসে নিনাদিত করিয়া, বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের চিত্ত কিরূপ গভীর আনন্দ-রসপ্লাবনে ভাসাইয়া দিয়াছেন, প্রবন্ধান্তরে * তাহার আভাষ প্রদানের চেষ্টা করা গিয়াছে। এই আনন্দ এবং সাহিত্যজগতে নামার্জ্জন করিবার এহেন সরল পন্থাবলম্বনের দুর্দ্দমনীয় লোভ সাধারণ লেখকগণে সংক্রামিত ত হইবেই, এবং হইয়াছেও বটে ; এতদ্ভিন্ন বিদুষী নারীলেখিকাও যে তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই, তাহার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ অদ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে "সাবিত্রী" প্রবন্ধাবলী পাঠ করিতে করিতে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা, "বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা"

* ভারতী বৈশাখ, ১৩১০। "হিন্দু মুসলমান ও বঙ্গ সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আমাদের দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল। ধারণা ছিল যে, সরল নাম পাঠকের চিত্ত স্থির রাখিতে পারে, সম্পাদিকা এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট রচনা স্থান দিবেন; সে দিবস ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সম্পাদিকা লিখিয়াছেন, "যে সকল জাতির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব, এবং অবরোধ প্রথার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, সেই সমস্ত সমাজে স্ত্রীগণ সর্বাধিক হীনচরিত্রা হইয়া, মুসলমান রমণীগণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।" এক কথায় সমগ্র মুসলমান জাতীয় রমণীগণকে হীনচরিত্রা বলিয়া লেখিকা যে কতদূর অসমসাহসিকতা এবং সুরুচিবিগর্হিত মেয়েলি গালাগালিপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; এবং তজ্জন্য যে হিন্দুসমাজ কর্তৃক তিনি ভর্ৎসিতা না হইয়া বরং প্রশংসিতা ও পুরস্কৃতা হইয়াছেন, ইহাতে হিন্দু সমাজেরই একান্ত সঙ্কীর্ণ চিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে।

স্ত্রীশিক্ষার অভাব আমাদের ভারতীয় মুসলমান সমাজে আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে কোন মুসলমান সমাজকে তাহার অভাবে হাহাকার করিতে হয় না। হিন্দুর ন্যায় মুসলমান ত শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই নহে, যে ভারতবাসী মুষ্টিমেয় মুসলমানের যাহা নাই, মুসলমান জাতিটারই তাহা নাই বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। অধুনা অধঃপতিত ভারতবর্ষের সাধারণ মুসলমান নারীগণ পুস্তকগত শিক্ষা না পাইলেও তাঁহারা সগৌরবে আপনাপন সম্মান, ধর্ম্ম ও অধিকার রক্ষা করিয়া নিষ্কলঙ্কচিত্তে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে উপযুক্ত মত শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইস্লামের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলিতে গেলে শুধু রাস্তায় বাহির হইয়া পাউডার বিলেপিত মুখশ্রী এবং আঁটাসাঁটা অঙ্গরাখা দ্বারা কঠিনরূপে আবদ্ধ দেহযষ্টির ভঙ্গিমা দেখাইয়া বেড়ানই যে স্বাধীনতা, কোন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা মনেও করিবেন না। মুসলমান স্ত্রীলোক রাস্তায় বাহির না হইলেও সমাজে তাঁহারা কত স্বাধীন, এবং সমাজ তাঁহাদিগকে কতগুলি স্বাধীন অধিকার প্রদান করিয়াছে, ইস্লাম শাস্ত্রে সম্যক্ প্রবেশ না করিতে পারিলে তাহা কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। মুসলমান স্ত্রীলোক অবরোধে

[illegible] করিয়াও হিন্দুনারীর ন্যায় ধনাধিকার হীনা দাসীশ্রেণী ভুক্তা (ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয়ো এবাধনাঃ স্মৃতাঃ ইতি মনু) ক্রীড়ার পুত্তলি মাত্র নহে। বাস্তবিক স্ত্রীস্বাধীনতা যে কি জিনিষ, তাহা সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকারে বঞ্চিতা হিন্দু রমণীর বুঝিতে অনেক বিলম্ব আছে।

পক্ষান্তরে যাহার অভাবে রচয়িত্রী মুসলমান রমণীগণকে হীনচরিত্রা বলিয়া তাঁহার রচনাশক্তির একটা কোতনায় অপচয় করিয়া বসিয়াছেন, তাহারি প্রভুলতায় যতগুলি স্ত্রীকবি, স্ত্রীদার্শনিক, স্ত্রীঐতিহাসিক, স্ত্রীবৈজ্ঞানিক, স্ত্রীবক্তা, স্ত্রীচিকিৎসক স্ত্রীশাসননীতিবিদ্ প্রভৃতি মুসলমানজাতির ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, এবং এখনো হইতেছে তাহার শতাংশের একাংশও প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া বাহির করিতে হইলে "নারী সম্মান গৌরবকারী" হিন্দুগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইবেন, সন্দেহ নাই। ইউরোপের মধ্যযুগ যে মুসলমানের নিকট নারীমর্য্যাদা শিক্ষা করিয়াছিল, এবং তাহাদের শিভাল্‌রির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই মুসলমানজাতি "স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত অনাদর ও অবিশ্বাস করিয়া থাকে," এ কথা রচয়িত্রী অবসরকল্পনাবলে আবিষ্কার করিয়া একদেশদর্শী সাহিত্যজগতে নামাঙ্কন করিয়া ধন্যা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইস্লাম-তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা এ কথা শুনিলে কেহ বা হাসিবেন, কাহারো বা নিরাকর্ষণ হইবে।

"চীনদেশের মুসলমানদিগের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের আত্মা নাই, তাহাদের প্রতি আর কি সম্মান করিবে?" রচয়িত্রী জগতের সমস্ত মুসলমানের কথা চাপিয়া রাখিয়া চীনের কথা কেন উপস্থিত করিলেন ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। সুদূর চীনের সংবাদ কেহ খোঁজ লইতে পারিবে না, তাই বুঝি? অথবা বুঝি তিনি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে লোকচক্ষু বহির্ভূত কোন অসভ্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সভ্য-ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহাকেই মুসলমানজগতের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছেন! চণ্ডাল সমাজকেও ত তাহা হইলে হিন্দুর আদর্শসমাজ বলিয়া অনায়াসে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে! যুক্তি-শাস্ত্রের উপর এ প্রকার ভয়ঙ্কর ডাকাতির কথা ইতিপূর্ব্বে কখনো শুনা যায় নাই!" স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, এবং নারীজাতিকে চিরদাসীত্বে পরিণত যদি কোন জাতি করিয়া থাকে, ত সে হিন্দু। [illegible] হিন্দুর পরম পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র

মনুসংহিতায় নারীজাতি কিরূপ হীন অপদার্থ কলুষাধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়টী পাঠ করিলে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥" ২য় অধ্যায়, ২১৩॥

ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব। এ কারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনো প্রমত্ত বা অসাবধান হন না।

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥" ৫ম অ, ১৪৭ ॥

বালিকাই হউক, যুবতীই হউক, আর বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীলোকের সংসারের কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্যও স্বতন্ত্রভাবে করা বিধেয় নহে। [হিন্দুর স্ত্রী-স্বাধীনতা তাহা হইলে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?]

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয়ো এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যৎ তে সমাধিগচ্ছন্তি, যস্য যে, তস্য তদ্ধনম্ ॥ ৮ম, ৪১৬ ॥

ভার্য্যা, পুত্র, দাস, ইহারা ৩ জন অধন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহারা যে ধন উপার্জ্জন করিবে, ইহারা যাহার, সে ধন তাহার।

"নৈতাং রূপং পরীক্ষন্তে, নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥" ৯ম, ১৪ ॥

ইহারা সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই, পুরুষ পাইলেই তাহারা সম্ভোগ করিয়া থাকে।

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে ॥" ৯ম, ১৫ ॥

পুরুষ দর্শন মাত্রে তৎসম্ভোগাভিলাষশীলতা হেতু, স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য এবং স্নেহশূন্যতা বশতঃ, পতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও স্ত্রীজাতি ভর্ত্তৃদিগকে ব্যভিচার করিয়া থাকে। [কি ঘৃণা !]

"এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি নিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি ॥" ৯ম, ১৬ ॥

বিধাতা কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতির সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ, ইহা অবগত হইয়া, তাহার রক্ষা বিধানে যত্নবান হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য।

"শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ ॥" ৯ম, ১৭ ॥

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি হইতেই শয়নাসনভূষণলালসা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার সমুদ্ভূত হয়।

"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রীয়োহনৃতম্ ইতি স্থিতিঃ॥" ৯ম, ১৮ ॥

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না। স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই। কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই। ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ।

অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় পরায়ণতার গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু পর পর এতগুলি নারীঘৃণাব্যাঞ্জক উক্তির সমর্থন, পৃথিবীর যাবতীয় মিথ্যাতার্কিক একত্র হইলেও সম্ভবপর হইবে না।

ইস্‌লাম জগতে যতখানি নারীসম্মানের অবতারণা করিয়াছে, কোন ধর্ম্মশাস্ত্র ততখানি করে নাই। অধুনা যাঁহারা সভ্যতা-জ্যোতিপ্রভাবে নারীমর্য্যাদা প্রকাশে তৎপর হইয়াছেন, তাঁহারা যে কার্য্যতঃ ইস্‌লামেরই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথার কোন প্রতিবাদ হইতেই পারে না।

ঐ প্রবন্ধের স্থানান্তরে লেখা হইয়াছে,—"যে সহোদর সহোদরা এক জননীর পবিত্র অঙ্কে বসিয়া স্তন্যপান করিয়াছে, সেই ভ্রাতাভগিনীরও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একত্র সহবাস ও আলাপাদি করা নিষিদ্ধ, এরূপ হীন প্রথাকে শত শত ধিক্!"

মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়, ২১৫ শ্লোক—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

মাতা, ভগ্নি, কন্যা, প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই, কেননা ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান যে, তাহারা জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে—এই রুচিবিদ্রোহী শাস্ত্রকথাকে রচয়িত্রী কতগুলি ধিক্কার দিতে পারেন, জানিতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। ভ্রাতাভগিনীর একত্র সহবাস ও আলাপাদি মুসলমান-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে;

অপর স্ত্রীপরিজনের প্রতি, এমন কি আপন স্ত্রীর প্রতিও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনার্থ কথাবার্ত্তা কহিবার সময়ে যতটুকু দূরত্ব রক্ষা করা আবশ্যক, তাহা না করিলে লোকে "বেয়াদব" বলিয়া থাকে। পাছে ইন্দ্রিয় সকল উপদ্রব করে, এই রুচি বিগর্হিত ভয় প্রদর্শন করিয়া মুসলমান-শাস্ত্র মাতা, ভগিনী, দুহিতাদি হইতে সর্ব্বদা পৃথক্ থাকিতে আদেশ প্রদান করে নাই। নারী পুরুষের সমক্ষে সুসংযত-বস্ত্রবেশা এবং ব্রীড়াশীলা, ও পুরুষ নারীর প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শন পরায়ণ হইবেন, ইহাই মুসলমানের শাস্ত্রীয় Etiquette. ("আদব," যাহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নাই!)। মাতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী সকলের বেলাতেই ঐ ব্যবস্থা। একমাত্র হস্ত শাটী সম্বল শালিনী হিন্দু রমণীর ন্যায় মুসলমান রমণীগণ আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে এমন কি সকল সময়ে স্বামীর সমক্ষেও অদ্ধপরিদৃশ্যমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উপস্থিত হইতে পারেন না। ভগিনীর লজ্জাশীলতা ও ভ্রাতার সম্মান-প্রদর্শন তৎপরতা কি কখনো উভয়ের স্নেহ ভালবাসার অন্তরায় হইতে পারে? বরং নির্লজ্জতা ও সম্মানহীনতার প্রাদুর্ভাব না থাকায় সে স্নেহ সম্বন্ধ আরো উজ্জ্বলতর, আরো পবিত্রতর হইয়া উঠে। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা কতদূর হইতে পারে, ভগিনীর প্রিয়নাম-চিহ্নধারী ঐতিহাসিক সোমলেম বীরসন্তানগণই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। যিনি মুসলমানের এ হেন পবিত্র প্রথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অবলীলাক্রমে ধিক্কার দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারি ধিক্কারে শত সহস্র ধিক্, যে না জানিয়া শুনিয়াও তিনি আপন জ্ঞান প্রকাশে তৎপরা!

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ও মাতুল এই সকল ঘনিষ্ঠতম পুরুষ পরিজনের জন্য আমাদের অন্তঃপুরদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়-বর্গের সম্মুখে স্ত্রীলোকগণকে আপাদ মস্তক অবগুণ্ঠনাবৃত [বোরখা পরিধান] করিয়া থাকিতে হয়। এই সুন্দর প্রথার উপর কটাক্ষপাত করিয়া রচয়িত্রী লিখিয়াছেন, "অথচ যে সকল স্থলে ব্যভিচার-স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত আছে!" কি সুন্দর সমালোচনার বিচার! সাহিত্যে আবার এহেন নীচজনোচিত বীভৎস ঘৃণিত অমূলক গালিগালাজ স্থান পায়, ইহা আমাদের জানা ছিল না! বিশেষতঃ বিদুষী নারীর লেখনী হইতে এরূপ কুরুচিপূর্ণ তীব্র গালি বাহির হইল, সাহিত্য

জগৎ আবার তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন,—ধিক্ বঙ্গসাহিত্যে, আর ধিক্ এই সকল সাহিত্যের পাণ্ডাগণকে!

এই কথার প্রতিবাদচ্ছলে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, হিন্দু সমাজের বিধবা কুলের অবস্থা, এবং প্রতিদিন গোপন ভ্রূণহত্যা ও বারবিলাসিনী সংখ্যার প্রবল বৃদ্ধি দর্শন করিয়াও যে তাঁহারা মুসলমানের প্রতি এরূপ ঘৃণিত কলঙ্ক নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের কথা আর কি হইতে পারে! মুসলমানকে গালি দিবার সময়ে হিন্দুগণের স্মরণ করা উচিত যে, যাঁহারা স্বয়ং খড়ের ঘরে বাস করেন, অন্যের সুরম্য অট্টালিকা দর্শনে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য প্রবল হস্তকণ্ডূয়ন আরম্ভ হইলেও তাহা তাঁহাদিগের সবলে সম্বরণ করা উচিত। সাধু জনেরা এইরূপ সুপরামর্শই দিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ মুসলমানগণকে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সহস্র মৌখিক সদ্ভাব প্রদর্শন-চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা হাটে, মাঠে, ঘাটে, আফিসে, রাজদ্বারে, বিদ্যালয়ে, সাহিত্যে (কিসে নয়?) সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তাহার জলন্ত প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া থাকি। তাঁহারা কিছুমাত্র না জানিয়া শুনিয়া ইস্‌লাম-শাস্ত্র ইতিহাস প্রভৃতির দীর্ঘ দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বাহবা লইয়া থাকেন। (হতভাগ্য মুসলমান সমাজের মধ্যে ও প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই!) মুসলমান শাস্ত্রের তত্ত্ব কে কবে জানিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন? যাহাদিগের ছায়া মাড়াইলে জাতি যায়, তাহাদের ভিতরে কি আছে তাহা তাঁহারা কোন মতেই জানিতে পারেন না। অথচ একটা কিছু না লিখিলেও নয়; সুতরাং যে কোন একটা মনগড়া কথা লইয়া, তাহার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতার অভাবে তাহাকে অষ্টপৃষ্ঠে গালি দিয়া আপনা আপনি রঙ্গ করিতে, এবং সাহিত্যজগতে প্রচার করিতে তাঁহারা ভালবাসেন।

হিন্দুর এই সকল অন্যায় অপবাদ প্রয়োগের চেষ্টাই হিন্দু-মুসলমান-গণের মধ্যে ঘোর বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং করিতেছে। স্পর্শে জাতিচ্যুতিভয়ভীত সঙ্কীর্ণচিত্ত হিন্দুই এ বিরোধের জন্য সম্যক্ দায়ী। অথচ তাঁহারাই আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাইবার জন্য চীৎকার করিয়া করিয়া কাংগ্রেসের অশ্বডিম্বটার মাথাটী মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছেন!

সঙ্গে সঙ্গে অমূলক যুক্তিহীন প্রবন্ধ-বাণবর্ষণ করিয়া মুসলমানের অন্তঃস্থল অর্জ্জরিত করিয়া দিতেও ত্রুটি করিতেছেন না।* তাই যখন আমরা কোন প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে গালি খাই, তখন আমাদিগকে পুস্তক দূরে ফেলিয়া দিতে হয়, এবং গভীর ঘৃণার সহিত মুখ বিকৃত করিয়া বলিতে হয়, ছিঃ!

উত্থান-পতন।

('মুসদ্দসে হালীর' বঙ্গানুবাদ)

অবতরণিকা।

'মুসদ্দসে হালী' উর্দ্দু ভাষায় একখানি বিশিষ্ট কাব্য। মুসলমানজাতির উন্নতি এবং পতনের কথাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বিষয়টী অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কবি স্বীয় প্রতিভাবলে ইহা এমনি হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন যে তিনি এই এক কাব্যেই উর্দ্দু সাহিত্যে অমর হইয়াছেন। যে কাব্যে কবি অমর হন, ভাষান্তরে তাহার লালিত্য রক্ষা করা অসাধারণ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ বহু মূলভাষা হইতে গঠিত মধুময় উর্দ্দু ভাষায় যে উচ্চকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সম্যক গৌরব রক্ষা করা অসম্ভব। অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলভী সাহেবের আদেশেই আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। পৃথিবীর একটী প্রধান জাতির অভ্যুন্নতি ও অভাবনীয় পতনরূপ মহাক্ষেত্রে স্বভাব কবি কর-পালিত কবিত্ব-তরু হইতে যে অপূর্ব্ব ফল প্রসূত হইয়াছে তাহা পাছে এই অধঃপতিত দুর্দ্দশাগ্রস্থ মুসলমান সমাজের মোহ-বিকার ঘুচিবে ভাবিয়াই মাননীয় মৌলভী সাহেব আমাকে এই পুণ্যোদ্দমে প্রবৃত্ত করিয়াছেন।

---

* ভারতী, চৈত্র, ১৩০৯। "শক্তিসাধন ও তাহার পরিণাম" ১১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। হিন্দুর এ বিকৃত ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বই কমিতেছে না। মিলনের আশা কোথায়?

এই কাব্যের মুগ্ধকারিনী শক্তি এতই অধিক যে ইহা প্রকাশিত হইলে পর বহুকাল ধরিয়া কবি-সমাজ এই বিষয়ে অবিরত লেখনী চালনা করিয়াছিলেন এবং এতৎ সম্বন্ধে অনেক কাব্য ও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই হালীর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাণীপুত্র শ্রীমধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, এবং গৌড়জন এখনও তাহাতে পরমানন্দে মধুপান করিতেছেন, ঠিক সেইরূপ হালীও নূতন ছন্দে নূতন গান শুনাইয়া উর্দ্দু সাহিত্য চিরোজ্জল করিয়াছেন। হালীর এই করুণ সঙ্গীত মুসলমান সমাজের মহা উপকার সাধন করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইহাই যুক্তপ্রদেশের মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান উন্নতির প্রধানতম কারণ।

হালী বর্ত্তমান যুগের মুসলমান-কবি-কুল-মণি। তাঁহার জীবনের ইতিহাস গ্রথিত হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমান সমাজের আদর্শভূমি দিল্লীকেন্দ্রের অন্তর্গত 'পানিপথ' হালীর জন্মভূমি। বিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই তিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেন। প্রথমাবধিই তাঁহার কবিতা সকলের মনাকর্ষণ করিত। তাঁহার প্রথম রচিত কবিতাগুলি কেবল পার্থিব প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাময়। কিন্তু প্রতিভাবান কবি হালী ক্রমে নায়ক নায়িকার প্রেম-চিত্র অঙ্কনেও সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত হইলেন। গীত রচনায় আকবর বাদশাহের শোরী মিঞা ও বাঙ্গালার নিধুবাবু যে স্থান পাইয়াছেন, পদ্য লিখিয়া হালী সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। আলিগড়ের প্রাতঃস্মরণীয় স্যর সৈয়দ আহ্মদ হালীর সমসাময়িক। কবি জগুপ্রণয়ীর ন্যায় বিশ বৎসর কাল প্রেমরাজ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যখন জাতীয় ভাষায় প্রণয় প্রসঙ্গের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্যর সৈয়দ আহ্মদ তাঁহাকে অকিঞ্চিৎকর বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাজের হিতার্থে জাতীয় উন্নতি ও পতন বিষয়ে কাব্য রচনা করিতে পরামর্শ দেন। মহাপুরুষের উপদেশ ব্যর্থ হয় নাই। হালী প্রণয়ের কুসুমাস্তীর্ণপথ পরিত্যাগ করিয়া বাণীর মন্দিরে প্রথম যে অঞ্জলি প্রদান করেন, তাহাই তাঁহার এই বিখ্যাত কাব্য। ইহা এমন উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং মুসলমান জন সাধারণের হৃদয়ের উপর এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, কেবল এই এক কাব্যের সহায়েই স্যর

সৈয়দ আহমদের চিরপোষিত আশাতরু মুঞ্জরিত হয়। ইহা তাঁহার জীবন-ব্যাপি সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রধান অবলম্বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'মদ্দ ও জজ্রে ইসলাম' অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম্মের জোয়ার-ভাটা। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা 'মুসদ্দসে হালী' নামেই অভিহিত হয়। 'মুসদ্দস' এক প্রকার ছন্দ বিশেষ, 'হালী' কাব্যকারের কল্পিত নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম সৈয়দ আল্তাফ হোসেন। 'হালী' শব্দের অর্থ আধুনিক।

আমার শেষ কথা। 'হালীর' কাব্য অনুবাদ করিয়া হালীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব না, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। যাঁহার ইচ্ছাপূরণে আমি এই অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই অধ্যয়নশীল মৌলভী সৈয়দ আবদুল হক্ সাহেব এ বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিতেছেন বহু পূর্ব্বে একবার উক্ত মৌলভী সাহেবের সাহিত্য শিষ্য সৈয়দ আবদুল গফ্ফার সাহেবের প্রতি এই অনুবাদের ভারার্পণ হইয়াছিল এবং তিনি ঐ কার্য্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু নিরতিশয় সংসার পীড়নে তিনি অদ্যাপিও আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারায় আমার প্রতিই এই গুরুভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি যত দূর লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, আমার অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা হালীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রক্ষিত হইত। আমার ইচ্ছা ছিল তিনি যত দূর লিখিয়াছেন, তাহা প্রথম ভাগে প্রকাশিত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে আমি অবশিষ্টাংশ লিখিব। কিন্তু নানা কারণে তাহা হইল না।

মৌলভী সাহেব মূল কাব্যের অনুরূপ ছন্দে অনুবাদ করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমার নিকট তাহা কষ্টকর বোধ হওয়ায় আমি নিজের পথেই চলিয়াছি। অবশ্য মুসদ্দস ছন্দের অনুকরণে অনুবাদ করিতে পারিলে বঙ্গভাষার কিছু স্থায়ী লাভ হইত। অনুবাদ কার্য্যে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সংবাদ দিলে কৃতার্থ হইব। বঙ্গীয় মুসলমান-জন-সাধারণের উপলব্ধির জন্য অনুবাদে মূল কাব্যের কোন কোন অংশ কিছু বিস্তৃত করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন আমরা যথোচিত সাবধানতার সহিত মূলের অনুসরণ করিয়াছি।

শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ।

গ্রন্থারম্ভ ।

আছিল গ্রীসদেশেতে * নামে ভিষক প্রধান,
ভানুসম ছিল তাঁর যশঃ জ্যোতিষ্মান ।
ধন্বন্তরী সমতুল, জ্ঞানের আধার,
আরোগ্য হইত রোগী নামেতে যাঁহার ;
স্বগুণে অমর যিনি নশ্বর ধরায়,
স্বদেশ হইল ধন্য যাঁহার শিক্ষায়,
মহাবীর সেকেন্দর শাহের সভায়
শোভিত যে নিরন্তর জ্ঞান-সূর্য প্রায়,
সে জনে সুধিল কেহ কৌতূহল বশে,
বল হে ভিষকবর আছে কি এ বিশ্বে
অনারোগ্য জীবভোগ্য হেন কোন ব্যাধি,
বসুন্ধরা মাঝে যার নাহিক ঔষধি ।
কিবা তার নাম শুনি, কেমন স্বভাব,
কি জ্বালা জ্বালায় জীবে সে রোগ প্রভাব ।
উত্তরিলা মহাজন প্রশান্ত বদনে,
জ্ঞানাগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেন খসিল নয়নে,—
"লীলাময় জগন্নাথ দয়ার আধার,
বর্ণনা অতীত সদা মহিমা যাঁহার,
মহাপ্রেমে সৃজেছেন এই বসুন্ধরা,
মহান্ কৌশল তাঁর, সৃষ্টি মনোহরা ।
হেন ব্যাধি দয়াসিন্ধু কভু সৃজে নাই,
যাহার ঔষধ শাস্ত্রে খুঁজিয়া না পাই ।
কিন্তু এক রোগ বড় দেখি যে ভীষণ
ভিষক পরাস্ত মানে সে রোগ সদন ।
রোগ হ'লে রোগী তাহে রহে উদাসীন,
মনোব্যাধি নাম তার শুন হে প্রবীণ ।
সে রোগ অদৃশ্যে বাড়ে ক্রমেই ভীষণ ;
চিকিৎসক কাছে রোগী করেনা গমন ।
বলিলে কখনও তারে চিকিৎসার তরে,
বিষবৎ লাগে তাহা তাহার অন্তরে !
ইহাই বিশেষ এই রোগের প্রতাপ,
বৈদ্য বলে হিত বোল, সে ভাবে প্রলাপ ।
খাদ্য নিষ্ঠা কিছুমাত্র না করে পালন,
ঔষধের নাম মুখে না আনে কখন,
এইরূপে রোগ দেহে দিন দিন বাড়ে
অনলে পবন যেন কানন-মাঝারে ।
এই এক রোগে শুধু আপনার দোষে
মরে প্রাণে নীরবেতে রোগী অবশেষে !"

* গ্রীক দার্শনিক হিপোক্রিটিস ।

পৃথিবীতে হেন ভাব কোন জাতির আছে
ভাসে যেন পোতে যারা সাগরের মাঝে
নিদ্রাগত সকলেই রয়েছে অবশ,
সবেগে ছুটিছে তরী হয়ে বায়ুবশ ।
প্রচণ্ড-পবন-বলে ঘূর্ণিত তরঙ্গে
পড়িতে জাতীয় তরী ছুটিতেছে রঙ্গে ।
অগাধ অসীম সিন্ধু কূল বহুদূরে,
এখনি ডুবিবে তরী অকূল পাথারে !
নিদ্রিত আরোহী সবে অনাথের প্রায়
হায়, হায়, ওই বুঝি চিরতরে যায় !

সংসার সমুদ্রে তথা ইস্লামের তরী
বহুদূরে গেছে চলে কূল পরিহরি
দুর্ভাগ্যের ঘনঘটা মাথার উপরে
ছাইয়া রয়েছে যেন গ্রাসিয়া অম্বরে ।
দারিদ্র্য ও দুরবস্থা করিছে প্রকাশ,
পাপ-ঝড় গর্জনেতে পূরিছে আকাশ !
তরঙ্গ সবেগে তরী ফেলিছে আছাড়ি,—
কোথা হায় কর্ণধার, কোথা হায় দাঁড়ী ।
হইল আকাশ-বাণী এহেন সময়ে,—
"ওরে হতভাগাগণ কেন আছ শুয়ে ?
কি ভাবে বা কাল ছিলি, আজ কিবা হ'লি
এখনি জাগিতে ছিলি, এখনি ঘুমালি ?"

চলে গেল কত দিন কত বর্ষ হায়,
এখনো তো সেই জাতি নিশ্চিন্তে ঘুমায় !
মজ্জাগত আ'লস্যতো আছে সেইরূপ,
হীনদশা প্রতি ভয় হয়নি বিরূপ ।
ধূলাতে পতিত, কিন্তু পূর্ণ অহঙ্কারে
উঠলিছে পক্ষী মত আলো চারিধারে !
নিশি শেষ অবসান, হলো সূর্যোদয়,
মোহনিদ্রা তাহাদের ভঙ্গ নাহি হয় ।
নাহি বিন্দু স্পৃহা হায় সম্মান রাখিতে,
এমন অদ্ভুত কোথা না পাই দেখিতে !
প্রকৃত উন্নতি পথে ভুলেও চলেনা,
পর দশা দেখি নাহি জাগে উদ্দীপনা ।
চিরদুঃখে সদা সুখী কোন চিন্তা নাই,
পশু ভিন্ন ইহাদের তুলা নাহি পাই ।
মানচ্যুতি ঘৃণা তারা জানেনা কেমন,
সম্মান লাভের ইচ্ছা করে না কখন ;
নরকেরও ভয় নাই, স্বর্গে নাহি সাধ,
নিদ্রাবুদ্ধি সনে যেন ঘটেছে বিবাদ !

জ্ঞান কিম্বা ধর্ম্ম হতে কোন কর্ম্ম তারা
লয় না, সংসার মাঝে সত্য পথহারা।
মহান্ ইস্‌লামধর্ম্ম খ্যাত সর্ব্বস্থানে
দুর্নাম ঘটিল তার ইহাদের গুণে।
কোথা গেল সেই ধর্ম্ম যাহার প্রভাবে
মহাশক্র লব্ধ হ'ল চিরমিত্র ভাবে।
যে জীবন্ত ফলপ্রদ ধর্ম্মের বচনে,
পশুপ্রায় মূর্খ নর উল্লাসিত মনে,
দেশ-বলে ভেদ করি ঘুচি মূর্খতার
সুশিক্ষায় শিখাইল মানব-আচার!
হিংস্রক জন্তুরে যেন মন্ত্রৌষধি প্রায়
শিখাইল কষ্ট পেতে পরের ব্যথায়।
ক্ষুধিত ভিক্ষুক দল প্রভাবে যাহার
মহাশ্রেষ্ঠা রাজা হৈল ধরণী মাঝার।
ইতরতা পরিপূর্ণ ছিল যেই দেশ
জগতে তাহার মান বাড়াল অশেষ।
মান-দণ্ড তাহাদের হৈল মহাভার,
অগ্রগণ্য সেই জাতি হইল ধরার।

আরব নামেতে ভাই মরুময় দেশ
বিদিত যাহার খ্যাতি ভুবনে বিশেষ;
সাগরের উপদ্বীপ, জলধি বেষ্টিত,
সংসার হইতে যাহা পৃথক স্থাপিত।
কা'রো সে অধীন কভু করেনি জগতে,
নিজেও অধীন কভু হয়নি কিছুতে।

সভ্যতার ছায়া মাত্র ছিল না তথায়,
মানব-নামেতে গণ্য হইবে যাহায়।
অভাগেরে তুষ্টি দিতে জলবায়ু তার,
একটিও তুষ্টিকর ছিল না আহার।
শস্য [illegible] ছিল না তথায়,
ভাল নামে যাহা কিছু জাত বসুধায়।
এমন কিছুই তথা ছিলনা তখন
মনের আনন্দ যাতে হয় বিকীরণ।
নাহি ছিল জল কিম্বা শ্যাম দূর্ব্বাদল
বিকাশিত হয় যাতে মনের কমল।
দৃষ্টিতে নির্ভর মাত্র, কষ্টের অশেষ,
যদি শুনে লয় সেই অতি শুষ্ক দেশ।
পাষাণের মাটি তথা আগুন পবন
ঝাপটেতে "লু" চলে, ঝরিতে জীবন।
পাহাড় পর্ব্বত আর [illegible] মাঠ,
মরীচিকা মরুভূমি সে দেশের ঠাট।
তরুলতা আছে যত [illegible],
সে দেশের শোভা কভু করেনা বর্দ্ধন।
কণ্টকের বৃক্ষ বিনা পাবেনা তথায়
মনের আনন্দলাভ হইবে যাহায়।
তাহাও দুইটা মাত্র বাব্‌লা খেজুর
সর্ব্বস্থানে উৎপন্ন করেছে প্রচুর।
শস্য হীন সেই দেশ, কষ্ট সমুদয়,
আরব দেশের ভাই এই পরিচয়।

ক্রমশঃ।

খলিফার ন্যায় পরায়ণতা।

—:০:—

ওমর বিন্-আবদুল আজিজ, বনি ওমিয়া বংশীয় দেমেস্কের অষ্টম খলিফা। ওমিয়া বংশীয় খলিফাদিগের নাম শুনিলেই, মনে এক প্রকার বিজাতিয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। হজরত মোয়াভিয়ার পুত্র দুরাচার এজিদ, তৎপরবর্ত্তী মারোয়ান ও আবদুল মালেক প্রভৃতি ওমিয়া বংশীয় সম্রাটদিগের অত্যাচারণে, কঠোর ব্যবহারে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য কলাপে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিতেও প্রাণে আঘাত লাগে—মর্ম্মবেদনায় অধীর হইতে হয়। কারবালার সেই হৃদয় বিদারক শোক-কাহিনী কাহার না হৃদয়ে জাগরূক আছে। এই তিনটী নৃপতি-কুল কলঙ্কের কার্য্যকলাপে ওমিয়া

বংশের প্রতি সাধারণতঃ লোকের ঘৃণা ও অভক্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ বংশের অন্যান্য খলিফাগণ, ইস্‌লামের যথার্থ গৌরব বর্দ্ধক ছিলেন; তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব ও মুসলমানদিগের জাতীয় সম্মান অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া গিয়াছেন। আবার ইঁহাদের আধিপত্য কালে খলিফীয় অধিকার যতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, অন্য কোনও বংশীয় খলিফা বা সম্রাটগণের রাজ্য তদ্রূপ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। পশ্চিমে ফ্রান্সের সীমা অর্থাৎ হিস্পানিয়া (স্পেন) রাজ্য ও আটলান্টিক মহাসাগরের তটদেশ হইতে পূর্ব্বে তীব্বৎ, তাতার ও ভারতবর্ষের সীমা (সিন্ধু, গুজরাট) প্রদেশ পর্য্যন্ত ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, সকল সম্প্রদায় হইতেই লক্ষ লক্ষ লোক ইস্‌লাম গ্রহণ ও খলিফাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ওমিয়া বংশীয় ৮ম খলিফা ওমর বিন্‌-আবদুল আজিজ একজন প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষ ছিলেন। ন্যায় বিচারে, সদনুষ্ঠানে ও সদাচারে ইনি একজন আদর্শ ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। খলিফার প্রিয়তমা মহিষির নাম ফাতেমা ছিল। খলিফা তাঁহাকে আদর করিয়া আবদুল্লার জননী বলিয়া ডাকিতেন। এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সধর্ম্মা মহিলা, একান্ত স্বামী-পরায়ণা ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখ-দুঃখ ভাগিনী ছিলেন। বিপদে সম্পদে সকল অবস্থায়ই তিনি স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলেন।

আজ পবিত্র রমজান মাস শেষ হইয়াছে—শওয়াল মাসের প্রথম তারিখ—ইদুল ফেৎরের দিন। ইদের আনন্দে মুসলমানগণ বিভোর হইয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক, মহানগরী দেমেস্কের রাজপথে বিচরণ করিতেছে। সকলেই 'ইদগাহে' যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দেমেস্ক তখন ধরণীর নগরীকুল রাণী। সমগ্র পৃথিবীর গৌরবরাশি লইয়া যেন এই মহানগরী তখন ধরাতলে বিরাজ করিতেছিল। পৃথিবীর কোন রাজধানীই তখন দেমেস্কের ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিলনা। দেমেস্ক তখন আমীর ওমরাওদিগের বাসভবন, ধনী ব্যবসায়ীদিগের লীলা-নিকেতন, বিদ্বানদিগের আশ্রয় স্থল। পৃথিবীর অর্দ্ধাংশেরও অধিকাংশ জনপদ বাসিগণ তখন দেমেস্কের খলিফীয় শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ঈদৃশ গৌর-

খলিফার সময়ে মহারাজধানী দেমেস্কে পবিত্র ঈদোৎসব কিরূপ সমারোহে সম্পাদিত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

খলিফা রাজ-প্রাসাদস্থ এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন। হঠাৎ সেই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—রাজ-মহিষি ফাতেমা দেবী স্বীয় তরুণ বয়স্ক পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। খলিফা মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক, মহিষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'অয়ি আবদুল্লার জননি! কুশল ত? এই বালকদিগকে লইয়া এরূপ ভোর সময় কেন এখানে আসিলে?' মহিষি বলিলেন, 'হে আমিরুল মুমেনিন! এই বালকগণ আমাকে সারা রাত্রি ঘুমাইতে দেয় নাই। কাল সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ইহারা খেলিতে খেলিতে উজীরে আজমের (প্রধান মন্ত্রীর) গৃহে গিয়াছিল। উজীরে আজমের পুত্রদিগের জন্য ঈদের যে কাপড় তৈয়ার হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ইহারা মহা আবদার আরম্ভ করে, এবং আমাকে বলে যে, তুমি পিতৃদেবকে যাইয়া বল, তিনি আমাদিগকেও ঐ রূপ কাপড় তৈয়ার করাইয়া দেন। নিরুপায় হইয়া আমি তাহাদের পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতে ভবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।' এতচ্ছ্রবণে খলিফা বলিলেন, 'অয়ি আবদুল্লার জননি! বালকদিগের কি পরিবার কাপড় নাই? কাপড় না থাকিলে তাহারা কি পরিয়া রহিয়াছে? তোমার প্রস্তাব এই যে, উজীরে আজমের পুত্রদিগের ন্যায় কাপড় উহাদিগকেও তৈয়ার করিয়া দি; কিন্তু ইহা অসম্ভব ব্যাপার। বায়তুল মাল (সাধারণ ধনাগার) হইতে দৈনিক দুই দেরেম মাত্র আমার খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি উহাই দিতে পারি, তদপেক্ষা অধিক দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। কেননা, বয়তুল মালে যাহা কিছু আছে, উহা সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি। আমি উহা হইতে নিজের ন্যায্য প্রাপ্যাংশ অপেক্ষা অধিক কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি?' খলিফার বক্তব্য শেষ হইলে রাজ-মহিষি বলিলেন, 'আমিরুল মুমেনিন! বালকদিগের পরিবার কাপড় অবশ্যই আছে; উহারা নূতন কাপড় তৈয়ার করাইতে চাহিলেও, এ সময় মধ্যে তাহা কিছুতেই হইতে পারেনা; কারণ ঈদের নমাজের সময় অতি নিকট-বর্ত্তী। তবে অবশ্যই ঈদগাহে খরচপত্র করিবার জন্য উহাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু দেওয়া আবশ্যক। আর আমি ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি যে,

বয়তুল মাল হইতে নিজ ব্যয় ভূষণের জন্য আপনি দৈনিক দুই দেরেমই পাইয়া থাকেন। উহা হইতে বেশী আপনি লইতে পারেন না। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি যেরূপেই পারি, কষ্টে সৃষ্টে উহা দ্বারা সংসার চালাইব। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, অদ্যকার দুই দেরেম ও আগামী কল্যের দুই দেরেম, এই চারি দেরেম বালকদিগের নিমিত্ত বয়তুল মাল হইতে বাহির করিয়া দিন। ইহা অপেক্ষা বেশী দিবার জন্য আমি অনুরোধ করিব না।' খলিফা বলিলেন, 'অয়ি আবদুল্লার জননি! আমি অদ্যকার দুই দেরেম কি প্রকারে বয়তুল মাল হইতে বাহির করিব? কারণ, অদ্যকার দিন এখনও শেষ হয় নাই। আগামী কল্যের কথা এই যে, উহা ত এখন পর্য্যন্ত আরম্ভই হয় নাই। সুতরাং এ সময় এক কপর্দ্দকও লওয়া যাইতে পারে না।' এতচ্ছ্রবণে রাজমহিষি বলিলেন, 'হে আমিরুল মুমেনিন! আপনি রাজাধিরাজ হইয়া এই ক্ষমতাটুকুও কি রাখেন না যে, নিজের প্রাপ্য দুই দিনের অগ্রিম বেতন বয়তুল মাল হইতে গ্রহণ করেন?' খলিফা মহিষির এই উক্তি শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন; এবং ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে কহিলেন, 'অয়ি আবদুল্লার জননি! আমি অবশ্যই আমিরুল মুমেনিন (বিশ্বাসীদিগের নেতা), কিন্তু আমিরুল আলেমিন (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নেতা) নহি। আমাকে বয়তুল মাল হইতে যে মাসহারা প্রদত্ত হয়, উহা এই জন্য যে, আমি মুসলমানদিগের তত্ত্বাবধান করিব। যে দিন এখন ও শেষ হয় নাই, কিম্বা যে দিন এখন আরম্ভ হয় নাই, ঐ ঐ দিনের তত্ত্বাবধান কার্য্য আমার দ্বারা এখনও সম্পন্ন হয় নাই, এ ক্ষেত্রে আমি কি প্রকারে অগ্রিম মাসহারা গ্রহণ করিতে পারি? তুমি যে ৪ দেরেম পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছ, উহা আমি ঐ অবস্থায় বাহির করিতে পারি—যে অবস্থায় আমি এই দুই দিন জীবিত থাকিব, এবং মুসলমানদিগের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্যা কার্য্য করিতে সক্ষম হইব বলিয়া তুমি প্রতিভূ হইতে পার। অয়ি আবদুল্লার জননি! তুমি কি সত্য সত্যই এবিষয়ের প্রতিভূ হইতে পারিবে?' রাজমহিষি খলিফার ঈদৃশ সুযুক্তি পূর্ণ উক্তি শ্রবণে আর কোন উত্তর না করিয়া, বালকদিগকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক, একবার চিন্তা করুন; যে পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজের রাজ্য-সীমা স্পেন হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাঁহার একটী মাত্র বাক্যের

উপর লক্ষ লক্ষ লোকের অদৃষ্টের শুভাশুভ নির্ণীত হইত; যাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য পৃথিবীর তদানীন্তন পরাক্রান্ত নরপতিগণের সকলেই একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; যাঁহার পরাক্রান্ত সৈনিকমণ্ডলীর হুহুঙ্কারে সমগ্র পৃথিবী বিকম্পিত হইত, তাঁহার পক্ষে চারি দেরেমের জন্য স্বীয় প্রিয়তমা সহধর্মিণীর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করা ও প্রাণোপম সন্তানগণের আবদার রক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করা কি এক বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? ধরণীপতি খলিফা ওমর বিন্-আবদুল আজিজ, পবিত্র ইস্লাম ধর্মের মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষা করিতেন, তিনি কিরূপ ন্যায় পরায়ণ ও সদাশয় নরপতি ছিলেন, উপস্থিত ঘটনা কি তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ নহে? চারি দেরেম ত কোন ছার; যিনি ইচ্ছা করিলেই চারি কোটি বা চল্লিশ কোটি দেরেম সাধারণ ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতে পারিতেন, কেহ এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিতে পারিতনা; কাহারও কোন প্রতিবাদ করিবার সাধ্য ছিলনা। যাঁহার একমাত্র আদেশে কত শত নরপতির রাজ মুকুট ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইত; তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ইস্লামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি ভাবে দীন হীন ফকীরের ন্যায় সামান্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন;— কিরূপ সুবিচারের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। ইস্লামধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এরূপ সাধু পুরুষের অভাব ছিলনা। আজ মহাকবি হালির অলন্ত উক্তির প্রতিধ্বনী করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে;

"মুসলমানানে দর গোর, মুসলমানী দর কেতাব"

অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমানগণ কবরে চলিয়া গিয়াছেন; এবং প্রকৃত মুসলমানী গ্রন্থ মধ্যেই নিবদ্ধ আছে।

গান ।

ধন্য ধন্য হে মোহাম্মদ * পৃথিবীতে জন্মেছিলে ;
তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ নামে সবাকারে উদ্ধারিলে ।
পৌত্তলিকতার মূল উৎপাটন করিতে হইল তোমার জনম,
তব বিশ্বাস বলেতে পৃথিবী হইতে জড় পূজা গেল চলে ॥
প্রত্যাদেশ লাভ তুমি করিলে হে যে সময়
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নাম প্রচার করিতে ধরায় ;
তখন সবাই বিপক্ষ ছিল না স্বপক্ষ তবু নাহি ভয় করিলে ॥
তোমার বিশ্বাস বলে সকল বিরোধীগণ
নরজপূজা আদি ছাড়ি ব্রহ্ম পরায়ণ হন ;
তারা তব সহবাসে থাকি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গেল চলে ॥
মহাপাপী উদ্ধারিতে তুমি এসেছিলে তুমি ধরায় ;
আশীর্ব্বাদ কর দাসে দেখে অতি নিরুপায় ।
মজে তোমার ভাবেতে থাকি সকলেতে ব্রহ্মকল্পতরু মূলে ॥

৺বিহারীলাল দেব নাথ ।

আয়েষার পরিণাম ।

(ক্ষুদ্র গল্প)

১

মিষ্টার আবুল কাসেম একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার । সকলের নিষেধ সত্বেও তিনি পাটনার নিকটবর্ত্তী রতন ঘাটের জমিদার ফরহাদ উদ্দীনের কনিষ্ঠ পুত্র আনওয়ারল হকের সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যা আয়েষার বিবাহ দিয়াছিলেন । আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা সকলেই বলিয়া-

* নামের পর মুসলমান মাত্রেকেই দরূদ শরিফ পড়া চাই ।

ছিলেন, 'তুমি বাঙ্গালী, বিশেষতঃ নব্যতন্ত্রের লোক, তোমার ঘরে কন্যা সম্প্রদান করা মানায় না। তোমারই মত অবস্থাপন্ন একটী সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবকের সহিত বিবাহ দিলে বরং তোমার মেয়ের জীবন বেশী সুখে কাটিবে।' কিন্তু তাঁহার ঘাড়ে কোন্ অপদেবতা যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, বলা যায় না। তিনি নিজ সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কাহারও পরামর্শই তাঁহার মনঃপূত হইয়াছিল না।

বিবাহের সময়ে আয়েষার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ছিল। তাহার নাতিক্ষুদ্র গৌরকান্তিময় সুডৌল দেহখানি যৌবনের পদার্পণে লাবণ্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মিষ্টার কাসেম প্রাচীন মতের পোষক ছিলেন না, তাই কন্যাকে সতোপযুক্ত বাঙ্গলা এবং কিছু আরবী ও কিছু ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। আয়েষার কনক চম্পকাঙ্গুলি গুলি শিল্পকার্য্যেও কিছু কিছু দক্ষ হইয়াছিল। তা, হইলে কি হয়? যে বিদুষী লক্ষ্মী স্ত্রী নব্যতন্ত্রের যে কোন সুশিক্ষিত মুসলমান যুবককে চিরসুখী করিতে পারিত, আনওয়ার তাহাকে পছন্দ করিত না। আনওয়ার উর্দ্দু ভাষী, আয়েষা চিরজীবন বাঙ্গালায় কথা বলিয়াছে। সে হয়ত তাহার মনের কথা স্বামীকে খুলিয়া বলিতে পারিত না—তাহার উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞতা তাহার নবীন যৌবনের প্রেমকে মূক করিয়া রাখিত।

বিবাহের পর প্রথম কয়েক মাস একরূপে কাটিয়া গেল। নববধূ স্বামীর নিকট যে আদরের প্রত্যাশা করিয়াও বঞ্চিতা হইত, শাশুড়ীর স্নেহে তাহার কতকটা ঢাকা পড়িত। রমণীই রমণীর মনের অভাব ও অভিযোগ বুঝিতে পারে। শাশুড়ী সবই দেখিতেন, কিন্তু পুত্র তাঁহার অবাধ্য, তাই তিনি সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না।

২

আনওয়ারল হক্ অন্য বিষয়ে যাহাই থাকুক, লেখা পড়ায় বক্তিয়ের গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের প্রায় সমকক্ষই ছিল। বাহিরের বেশ দেখিয়া কেহ তাহাকে নিশ্চয়ই অশিক্ষিত বলিয়া ঠাহর করিতে পারিত না। কিন্তু একবার তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেই, সামান্য একটু বায়ুর সঞ্চালনে ভস্মাচ্ছাদিত মণির বিকাশের ন্যায়, তাহার সমস্ত জ্ঞানের সম্পদ ঠিক্‌রিয়া পড়িত! তাহার গুণ অসংখ্য ছিল। এমন ব্যক্তি খুব কমই থাকে যে ব্যক্তিকে

তার উদরে কিছু দানাপানি না পড়িত। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত পালিত অশিক্ষিত যুবক সচরাচর যে সব ক্রিয়ায় জীবন মন সমর্পণ করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে, তার সবই তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতিদিনই সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সে কলুষিতাদের সংসর্গে থাকিত। তাহার জীবনে পাপ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত।

প্রথম প্রথম আয়েষা এ সব নীরবে সহ্য করিত। প্রায়ই সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া নয়নজলে উপাধানসিক্ত করিত এবং নিজের এই ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতে নিঃশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করিত। শেষে একদিন সে আর পারিল না। তাহাদের বঙ্গদেশের পল্লিজীবনে সে যে সুখের চিত্র দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার নয়ন সমক্ষে তখনও তাহা উজ্জ্বল ছিল। তাহার সখীদের অনেকেরই ত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কই তাহাদের কেহই ত তাহার মত হতভাগিনী নহে! তাই, একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর যখন তাহার স্বামী তাহার বড় সৌভাগ্য বশতঃ তাহারই শয্যায় লুটোপুটি খাইতেছিল, সে তখন তাহার রুদ্ধ হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দুতে তাহাকে তাহার বেদনা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যে হাব-ভাব-লীলা-চাঞ্চল্য অন্যত্র সুলভ, আয়েষাতে তাহার কিছুই ছিল না। তাই তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সরলা আয়েষা সারল্যের বিনিময়ে একটু প্রিয় সম্ভাষণও লাভ করিল না! সে চাহিল সুখের ঘর বাঁধিতে, কিন্তু সুখাট্টালিকার পত্তন হইবার পূর্ব্বেই তাহার সব আশা শূন্যে মিলাইল।

আনওয়ারল হক দিন দিন আরও পাপের পঙ্কে ডুবিতে লাগিল শেষে ভদ্র ঘরে যাহা অসম্ভব সে তাহাই করিল। সে গৃহে একটী বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া গৃহের শোভা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিল! অন্যের কথা যাহাই হউক, অন্ততঃ তাহার এবং তাহার সহচরগণের এইরূপই ধারণা ছিল।

শিক্ষিত মুসলমান সমাজের এই এক দিকের চিত্র।

৩

হতভাগিনী আয়েষা নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাক্ হইতে লাগিল। বিধাতা যেন তার দুঃখের উপশম উদ্দেশ্যেই তাহাকে

একটী কন্যা দিয়াছিলেন। সেই কন্যাটীকে বুকে রাখিয়া সে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে চেষ্টা করিত। তাহার স্বামী যদি গৃহের বাহিরে রামলীলার অভিনয় করিত তবু বরং ছিল ভাল, তার একটু শান্তির একটু সান্ত্বনার পথ থাকিত! কিন্তু তাহারই চোখের সামনে নিত্য নিত্য যেসব দৃশ্যের অবতারণা হয়, তাহা রক্ত মাংসের শরীরে সে কেমনে সহ্য করিবে? তাই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, খুব আবশ্যক না পড়িলে সে আর নিজের শুইবার ও বসিবার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যাইবে না। দিন ত একরূপে কাটান চাই—বাঙ্গালা উপন্যাস তাহার সে অভাব পূরণ করিবে।

প্রথম সে "মৃণালিনী" পড়িল। মৃণালিনী আগেও একবার সে পড়িয়াছিল, কিন্তু তখন তাহা এত ভাল লাগে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে থাকিয়া সে মৃণালিনী পাঠে যাহা না বুঝিয়াছিল, না পাইয়াছিল, এখন তাহা পাইল বুঝিল। মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া সে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার জীবন যদি মৃণালিনীর মত হইত, তাহার স্বামী যদি হেমচন্দ্রের অনুরূপ হইত!

মৃণালিনীর পর সে "লায়লী ও মজনু" পড়িল, লায়লী ও মজনুর অমর-দুর্লভ প্রেম তাহার বাঞ্ছনীয় হইলেও সে তাহা সাধারণ মানব জীবনে এক-রূপ অসম্ভব জ্ঞান করিল। "শিরি ও ফরহাদ" ও সে পড়িল। ফরহাদ-প্রেমের বলে কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছিল! কিন্তু হায়, ফরহাদের জীবনের সেই শেষ দৃশ্য কি করুণ, কি প্রাণমধুর! পাপ মন্ত্রী, একটী সরল বহিঃপ্রকৃতির মত সরল এবং উদার প্রণয়ীকে কি ভাবে মৃত্যুর অধীন করিল! ফরহাদের প্রেমে কি অসীম তন্ময়তা, কি অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ ছিল! এসব ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোক দুটী জলে ভরিয়া যাইত।

আমেনা উপন্যাসের পর উপন্যাসে নিজের জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজিতে লাগিল। যে বই খানিই সে হাতে লয় তাহাতেই সে প্রেমিক প্রেমিকার অনবদ্য প্রেম প্রতিফলিত দেখে! স্বর্ণলতা পড়িল,—গোপাল ও স্বর্ণের প্রেম কি স্বাভাবিক, কি মধুর! সে স্বর্ণের বিবাহিত জীবনের সুখের সন্ধান পাইয়া নিজকে শত ধিক্কার দিল। কেন তাহার জীবন স্বর্ণের মত হইল না?—তাহার হৃদয়ে কি প্রেম নাই, তাহার বাক্যে কি স্বর্ণের মত

মধুবৃষ্টি কোথা ? সে এমন কথা ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইয়া কাঁদিত—ক্রন্দনই কেবল তখন তাহার হৃদয়ের ভার লঘু করিবার ক্ষমতা রাখিত।

৪

দিন যায় রাত্রি আসে, ধরণী আঁধারে আপনাকে ডুবাইয়া দেয়। জগতের বারো আনা পাপ এই আঁধারেই অনুষ্ঠিত হয়। আনওয়ারও আঁধারের কোলেই বেশী করিয়া আপনাকে পাপের স্রোতে ঢালিয়া দিত। হতভাগিনী আয়েষা দূর হইতে তাহা শুনিত আর পাগলিনীর মত একবার উঠিত, একবার বসিত, কখনও বা পুস্তকে মন দিতে চেষ্টা করিত।

আয়েষা 'বিষবৃক্ষের' নাম শুনিয়াছিল, তাহাও পড়িল। তাহাতেও ত সূর্য্যমুখীরই বিষময়কাহিনী বর্ণিত। কুন্দ নামে একখানা ছোট্ট মেঘ কিছুকালের জন্য সূর্য্যমুখীর জীবনাকাশ অন্ধকার করিয়াছিল, তাহার 'আপনার' নগেন্দ্রকে 'পর' করিয়াছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ ? প্রবল বাতাসে যেরূপ পতিত মেঘ উড়াইয়া নিয়া গেলে সূর্য্যের আলো আরও বেশী উজ্জ্বল হয়, সূর্য্যমুখীর জীবনেও ত তাহাই ঘটিয়াছিল। আয়েষা সূর্য্যমুখীর শেষ সুখের কল্পনায় একরাত্রি কাটাইয়া দিল।

তারপর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কাহিনীও আয়েষা পড়িল। রোহিণী যদি বারুণীতে সে দিন তাহাকে দর্শন দিত তবে হয়ত কৃষ্ণকান্তের [illegible] থাকিত না। আয়েষা তাহার উপরে বড়ই চটিল। তাহার সমস্ত সহানুভূতি ভ্রমরের সহিত জড়াইয়া দিয়া সে যেন কিছু শান্তি পাইল। সে ভাবিল, ভ্রমর [illegible] ত একটা হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ ছিল! সেই ভ্রমরকে কিনা পাপীয়সী রোহিণী সারা জীবন স্বামী-ধনে বঞ্চিত রাখিল! ভ্রমরের প্রেমে যে গভীরতা ছিল, গোবিন্দলালের তাহা ছিলনা, তাই ত সে এত সহজে পোড়া কপালী রোহিণীর রূপ-তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে পারিয়াছিল! দুঃখিনী ভ্রমরের আর তাহাতে কি প্রয়োজন —ভ্রমরের এই এক সুখ ছিল, পতিত স্বামীর পাপের চিত্র তাহাকে দেখিতে হয় নাই! সে ত সে চিত্র নিজেই দেখে আর মলো!

এই সব কল্পনা তাহার মনের উপর এমনই ক্রিয়া করিল যে সে একবার স্বামীর সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া করিবার জন্য ব্যস্ত হইল!

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা, পেয়ারী দাদি তাহারই মেয়েটীকে বুকে করিয়া তখন মেঝেতে শুইয়া পড়িয়াছিল। আয়েষা তাহাকে জাগাইয়া, আন্‌ওয়ারকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। আন্‌ওয়ার তখন তাহার প্রমোদ-গৃহে সুখের সাগরে ভাসমান।

পেয়ারী দু একবার যাইতে পারিবেনা বলিল, কিন্তু আয়েষা যখন তাহাকে বড়ই জেদ করিতে লাগিল, তখন সে আর কি করে, বাধ্য হইয়াই গেল।

পেয়ারী আয়েষার পিতৃগৃহের বাঁদী, অনেক সময় তাহার সুখ দুঃখের সাথী।

৫

পেয়ারীর অনুনয় বিনয়ে বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বে ও আন্‌ওয়ার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল। যখন সে হতভাগিনী আয়েষার গৃহে পদার্পণ করিল তখন রজনী দ্বিপ্রহর। সেই নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র ঝিল্লী-মুখরিত নিশীথে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ মাত্রও শুনা যাইতে ছিলনা।

বহুদিনের পর স্বামী আজ আসিতেছে, তাই আয়েষা একটু অভিমান করিয়া শয্যায় পাশ কাটিয়া শুইল। রমণী জীবনে এই অভিমান সাধারণ! ইহা সম্ভবতঃ তাহাদের আকুল প্রেমের একটী অধ্যায় বিশেষ! কিন্তু নিষ্ঠুর কঠোর আন্‌ওয়ার তাহা বুঝিল না। সেই হতভাগ্য অপরিণামদর্শী যুবক, —যে যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই পাপের পঙ্কে গড়াগড়ি যাইতেছিল, সে প্রকৃত প্রেমের প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না!

শয্যাপার্শ্বে আসিয়াই আনওয়ার রুক্ষস্বরে বলিল, "এত রাত্রে কেন আমাকে ডাকিয়াছ? আমাতে তোমার কি প্রয়োজন?"

হায়, মূর্খ! প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিবার শক্তি যদি তোমার থাকিত, তবে আর এই কুসুমকোমলা প্রেমময়ী রমণীজীবন উপেক্ষার হ্রদে নিঃক্ষেপ করিতে পারিতে না! গৃহের স্নিগ্ধপ্রেম অনুভব করিবার শক্তিই যে তোমার তিরোহিত হইয়াছে!

আয়েষা স্বামীকে কত কথা বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বর শুনিয়াই সব গোলমাল হইয়া গেল, অভিমান দূরে পলাইল! কম্পিত, ভয়বিজড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "এত দিন পরে যদি আসিয়াছ, আমার মাথা

যাও, এখানে কতক্ষণ একটু বসিয়া থাক। আমি কি তোমার কেহ নই? এই সোনার প্রতিমা মেয়েটার দিকেও ত একবার চাহিতে আছে।"

আনওয়ার একবার মেয়েটার দিকে চাহিল। ইচ্ছা হইল কোলে টানিয়া লয়। কিন্তু পরক্ষণেই কি এক প্রবল ঝড়ের তাড়নায় তার সব বাসনা উড়িয়া গেল! সে বলিল, "এই সব কথা বলিতেই আমাকে ডাকিয়াছ? আরও কিছু বলিবার আছে? আমার সময় বয়ে যাচ্ছে, আমি বৃথা এখানে বসে থাক্‌তে পারব না!"

এইবার যে আবেগ এতদিন আপনার হৃদয়কারায় সমস্ত বাধা অর্গলিত করিয়া রাখিয়াছিল, সে মুখ খুলিল। রুদ্ধজলপ্রবাহ একবার ছুটিবার পথ পাইলে যেমন আবেগে উচ্ছ্বাসে কলগর্জনে বহিয়া যায়, তাহারও আজ সেই দশা! সে যদি মুখই খুলিয়াছে, তবে রাখিয়া ঢাকিয়া বলায় তার কি প্রয়োজন? আজ ত সে জানিতেই চায়, স্বামী তাহারই কি অন্যের।

আয়েষা। অনেক দিন থেকে তোমায় একটা কথা বল্‌ব ভাব্‌ছি। যদি আমাকে এইরূপ অস্পৃশ্যার মত রাখাই তোমার মনের বাসনা ছিল, তবে কেন তুমি তোমার এই শূন্য গৃহের এক কোণে আমায় স্থান দিয়েছিলে? এই ঐশ্বর্য্য, এই বিলাস, এসব দিয়া আমি কি করিব? এরা আমায় যেন চারিদিক থেকে সাপের মত দংশে বেড়াচ্ছে! রমণী কি কেবলই বসন-ভূষণের কাঙ্গালিনী? তাকে কি আর কিছুর অভাব সহিতে হয় না? যার একটু কণা পেলে রমণী-জীবন ধন্য হয়ে যায়, সেইটীই যদি ভাগ্যে না ঘটিল, তবে আর এ ছাই জীবন থাক্‌লেই বা কি, গেলেই বা কি! পায়ের ধুলো যত শীঘ্র ঝেড়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল!

আনওয়ার। দেখ, আমি অত প্যান-প্যানানী ঘ্যান-ঘ্যানানী শুন্‌তে পারিনে, ভাগ্যি তিনি একটা ভদ্রলোকের মেয়ে এসেছেন কি না!

আয়েষা। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে নই সত্য, কিন্তু আমি হৃদয়হীনের মেয়েও নই। আমাদের পাড়াগাঁয়ে, স্বামী একান্ত হতাদর করলেও তার সঙ্গে সারাদিনে স্ত্রীর অন্ততঃ দুই একবার দেখা হয়। আর রজনীর অন্ধকারে তোমাদের মত গা ঢাকা দিয়ে বেড়ান তাদের কোষ্ঠিতে লিখে না।

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই আনওয়ার বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। আয়েষা ছুটিয়া উঠিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। আমি অবোধ নারী, কি বলিতে কি বলিয়াছি, আর একটু বসিয়া যাও, আমি তোমাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই।"

হায়, আয়েষা! আনওয়ার তাহাকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই পাথর কঠিন মেঝেতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

পেয়ারী তখন আর এক কোঠায় বসিয়া তন্দ্রার মাঝে একটা বিকট স্বপ্ন দেখিতেছিল। আয়েষার পতন শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেই সে জাগিয়া উঠিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল। পেয়ারীর ক্রন্দনের রোলে যে যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি সে দিকে আসিল। আয়েষার শাশুড়ীও আসিলেন। তিনি সংজ্ঞাবিহীনা বধূকে টানিয়া কোলে উঠাইয়া লইলেন। দাসীরা অজ্ঞানগত আয়েষার চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর সেই আড়ষ্ট, হিমদেহে যেন একটু জীবনী সঞ্চার হইল। সে একটু চাহিল, কিন্তু কথা বলিবার শক্তি তাহার তিরোহিত হইয়াছিল। তাহার মস্তকের মধ্যে বিষম চোট লাগিয়াছিল, হৃদয়েও কম নহে!

৬

প্রত্যেক সম্পত্তিশালী ঘরেরই এক একজন গৃহচিকিৎসক থাকেন। এ বাড়ীর ও একজন ছিলেন। সামান্য অসুখ বিসুখে তিনিই চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার নাম সুরেশচন্দ্র রায়।

এই শঙ্কটের সময়ে প্রথমেই সুরেশবাবুর ডাক পড়িল। তিনি এ বাড়ীর বড় পেয়ারের ডাক্তার। যুবাদের আমোদের আড্ডায়, বর্ষীয়ানদের গল্প-গুজবের বৈঠকে, সব স্থানেই তাঁহার অবারিত গতি ছিল, তিনি আসিয়া বিশেষ করিয়া আয়েষাকে পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার মুখের ভাবে বুঝা গেল বিষয়টা কিছু সাংঘাতিক।

আয়েষার শ্বশুরও তখন সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তারকে, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ডাক্তার বাবু, কেমন বুঝ্‌লেন?' ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'না, তা এমন কিছু নয়, বাহিরে গিয়া বলিতেছি।'

উভয়ে বাহিরে গেলেন। ডাক্তার বাবু চারিদিক দেখিয়া বলিলেন, 'দেখুন, অবস্থা বড় ভাল নয়। মাথায় এমন চোট লাগিয়াছে যে দু এক দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয়। কাজটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। এখন কি করা যায়?'

ফরহাদ উদ্দীন। আপনিই আমাদের এখন সর্ব্বপ্রধান সহায়। কি করিতে হইবে আপনিই বলুন। এ বিপদ হইতে ত্রাণ পাইলে একদিন ইহার প্রতিদান নিশ্চয়ই পাইবেন।

যে কোন রকমেই হউক, আয়েষার সম্বন্ধে অন্য একটা বিষয় রটনা করা হইল। সর্ব্বস্থানে যে ঘটনার ফলে যাহা হয়, এ স্থানেও তাহাই হইল। তাহার জীবন প্রদীপ নিবিয়া গেল! মৃত্যুর সময়ে সে তাহার স্নেহময় জনক জননীর মুখটী পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না!

৭

প্রাতঃকাল ব্যারিষ্টার নিজ ব্যবসায়ের কাজে বড় ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যেও কেন জানি তাঁহার উদ্বেগ বোধ হইতেছিল। তিনি এক একবার কাজ ছাড়িয়া পায়চারি করিতেছিলেন, আবার বসিতেছিলেন। কিছুই ভাল লাগিতে ছিলনা। এমন সময়ে টেলিগ্রাফের পিয়ন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ব্যারিষ্টারের শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি কভারটা খুলিয়া সংবাদ পড়িতেই 'ওগো মাগো!' বলিয়া অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া গেলেন। সকলে ছুটিয়া আসিল, ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। বাড়ী শুদ্ধ সকলের ক্রন্দনের রোলে আরও অনেকে সেখানে জড় হইল। আমরা ব্যারিষ্টারেরও আয়েষার জননীর শোকের বর্ণনা করিতে অক্ষম! সে দৃশ্য এতই করুণ, এতই মর্ম্মভেদী যে তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।

শোকের বাহ্যিক বেগ একটু প্রশমিত হইলে স্থির হইল, ব্যারিষ্টার তখনই রতন ঘাটে রওয়ানা হইবেন, আয়েষার মা তাহার পরের ট্রেনে যাইবেন।

তাহাই হইল। বাপ-মার অতি স্নেহেরধন আয়েষার পরিণাম স্মরণ করিয়া সকলেই ব্যারিষ্টারকে কত মন্দ বলিলেন। তিনি শোকাকুল চিত্তে একদিন বলিয়াছিলেন, "আয়েষা আমাকে বেশ শিক্ষা দিয়া গেল। তাহার

মৃত্যুকবলিত মুখখানা যেন আমাকে বলিয়া গেল, 'বাবা নানু রহিল, উহাকে আমার মত হতভাগিনী করিওনা' ”

আয়েষার মেয়েটীকে তাহার মাই লালন পালন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উপযুক্ত বরের হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রথম ভ্রান্তির সংশোধন করিয়াছিলেন। সেই বিবাহে হতভাগ্য আনওয়ারও আসিয়াছিল। কিন্তু আয়েষার মৃত্যুর পর হইতে তাহার বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। লোকের সঙ্গে সে আর মিশিত না,—নির্জ্জনতাকেই নিজের শ্রেয় সাথী করিয়া লইয়াছিল। সম্ভবতঃ অনুতাপের অনলে তাহার অন্তরের সব পাপ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল—সে তখন পবিত্রতার রাজ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

কবিতা-গুচ্ছ।

—:০:—

আবাহন।

এ'স গো কল্পনে এ'স, সাহিত্যের কুঞ্জবনে
করিগে ভ্রমণ।
অভাগা বঙ্গের কবি, আবার তোমায় আজি
করে আবাহন।
যথা জন-মনোলোভা, পুষ্পিত সে কুঞ্জবন
কত শোভা ধরে।
ভূতলে নন্দন যেন, মুখরিত অনুক্ষণ
কোকিলের স্বরে।
কানন ধ্বনিত করি, গাইছে কি সুধা স্বরে
বন-কপোতিনী।
ঝর ঝর ঝর রবে, ঝরিতেছে কি মধুরে
চারু নির্ঝরিণী।
ফুটিছে মন্দার-কলি, সৌরভে মোহিত ধরা
কত মনোহর।
চারি ধারে ঝাউ তরু, মাঝখানে কি সুন্দর
কাব্য-সরোবর।
কুমুদ কহ্লার কত, ফুটে আছে নীল জলে
মুকুতার মত।
সুধাংশুর সুধা-রশ্মি, নাচে সেই জল'পরি
মনোলোভা কত।
বসন্ত শরত সদা বিরাজিছে সেই বনে
ফুটে ফুল রাশি।
হাসিছে রজনীগন্ধা, আনন্দে মাখিয়া মুখে
চন্দ্রমার হাসি।
এ'স গো কল্পনে এ'স, অই মঞ্জু কুঞ্জবনে,
তুলি বন-ফুল।
দীনা হীনা বঙ্গভাষা, এ'স আজি কানে তার
পরাইব দুল।
তুলিয়া মন্দার-কলি, রচিব নূতন ছাঁদে
সাজাব কবরী,
সুরভি কবিতা-ফুলে গাঁথিয়া নূতন মালা
পরা'ব লহরী।
মালতী মল্লিকা যুঁই, জড়িয়া গোলাপ সনে
গ'ড়ে দিব মালা।
চামেলী চম্পক দিয়া, আদরে রচিয়া দিব
হাতের দু'বালা।
এ'স গো কল্পনে এ'স, কুসুমিত কুঞ্জবনে
করিগে ভ্রমণ।
অভাগা বঙ্গের কবি, আবার তোমায় আজি
করে আবাহন।

কায়কোবাদ।

বন্ধুর প্রতি।

সদা গাবে শোক গীতি,
আঁধারে একেলা তুমি।
পশ্চাতে পড়েছে ভূমি,
তাই হবে মোহ মদ আশা শান্তি-প্রীতি।
শিয়রে একেলা কেন
বিজন বনের কোণে।
নীরবে গাহিছ গান, জাগে প্রকৃতি।
গম্ভীর আঁধার রাতি।

যে সময় ধরা ঘুমে
কোটী কোটী আঁখিজল
ঝরিতেছে অবিরল
ফুটিছে অমৃতধারা করি কল্ কল্,
অনেক দেবতা যারা
হেরিছে আপনা হারা,
দিব্যজ্যোতিঃ ফুটে আছে তোমার আননে,
ধারা বয় দুনয়নে।

সত্যধর্ম্ম ভালবাসা,
সাধনায় দিবাযাম
শিখিয়াছ আত্মদান,
বিশ্বাসী প্রেমিক তুমি, উদার মহান্।
উদাসীন স্বার্থশূন্য
মমতায় অতি পূর্ণ,
বিশ্বের মঙ্গল তরে তোমার পরাণ,
প্রেমরশ্মি বহান।

থেমে যাক শোক গান,
প্রেমে বাঁধরে অন্তর
ওগো নূতন সুন্দর।
আকাশে উঠিছে বাণী, সুধামাখা তান।
তুমি ও আনন্দবাণী
ভক্তিপূর্ণ মন্দাকিনী,
পিপাসা হরুক পুনঃ আলো মাখি গায়,
নবীন তান গীতায়।

*

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গোলাপ ফুল।

গোলাপ! কবিবালা তুমি ফুল দলে,
রঙ্গিনী যৌবনময়ী কণ্টক ঢাকিতে,
কি অদ্ভুত শক্তি তব মানস মোহিতে,
তোমারি উপমা শুধু তুমি ধরাতলে।

ভবে উপমা তুমি! কবি উচ্ছল
কত শোভা চারিদিক বাসে আমোদিত,
সহস্র কণ্টক তথা থাক পরিবৃত,
তোমারি সৌরভভরে পরাণ পাগল।

হরিত পত্রের মাঝে রক্তিম বরণে
শোভ যবে সমীরণে স্বচারুদর্শনা!
তখন এ সংসারের ভীষণ যন্ত্রণা
ভুলি, শান্তি পাই তোমা নিরখি নয়নে।

পুষ্পকুলেশ্বরি! তুমি ভবে অতুলন,
কমল কোমল বলি আদরে সবায়,
কিন্তু তার সনে মধু গন্ধ নাসিকায়
না পারি ধরিতে হায়, আমি অভাজন।

চিত্ত বিমোহিনী অয়ি মধুরহাসিনী,
গাঁথি আজি পুষ্পপুঞ্জে তোমায় আদরে,
রাখিলাম গলায় সদা রাখি প্রেম ভরে,
তব সহবাসে বহি দিবস যামিনী।

অপূর্ব রতন যদি পারস্যের তুমি,
যথা, কবি কলকণ্ঠে ভরি দিক মুখরিত,
আর, নীরেশের পদাঘাতে যামিনী কাঁপিত,
সেই দেশে ফুলরাণী! জন্ম তব ভূমি।

মোগল গৌরব-রবি বাবর ভূপতি,
আনি তোমা, ওগো চির সুখের আকর,
স্থাপিলা হৃদয়ে এই ভারত ভিতর,
কেননা জানিত আগে তোমার আরতী।

গোলাপের পরাণ জগ এবার বহন,
কণ্টক আসন তাই নিরখি তোমার,
কি নিগূঢ় ভাবে ভরা এ বিশ্বসংসার,
হেথায় নিখুঁত কিছু না হেরি কখন।

গিয়াছে সে কোহেনুর, যাক্ সে বিলাতে;
ভারতের উপকারী কি ছিল সে মণি ?
কি স্বর্ণ প্রস্তরে ? তুমি মানসমোহিনী,
বিরাজ কুসুম-রাণী সাদরে ভারতে,

আজিজন্নেসা খাতুন।

একটী বালিকার প্রতি।

একবার যায় স্নেহ নিও তুমি কেড়ে,
সে তোমারে জিজ্ঞাসে, কি যায় চলে দূরে
নেহারিতে তাই তুমি থাক দাঁড়াইয়া
স্নেহের প্রতিমা আমি ! মুগ্ধপ্রাণ নিয়া
করিবারে চাও পরে অতি আপনার,—
কি স্নেহ উছলে অই হৃদে অনিবার।
এ সংসারে সেই ভাল, যাহার পরশে
পুণ্য লভে জন, আর যাহার দরশে
টুটে জীবনের পাপ, ঘুচে অবসাদ,
জাগি উঠে ক্ষীণপ্রাণে পরম আহ্লাদ !
হও তুমি সেই মত,—বড় মন লয়ে
শত পাপ তাপ ঢাকি নিও স্নেহ ছায়ে।
দূর হতে শুনি তব করুণা-কাহিনী,
লইব গো আপনারে শত ধন্য মানি।

মনের বেদন মনই জানে।

আকাশের কোলে পূর্ণিমার চাঁদ
ঢালিছে রজত জোছনা রাশি
হাসিছে জগত আমি কেন শুধু
নয়নের নীরে নিয়ত ভাসি ?
গাইছে কোকিল সুধা মাখা স্বরে
ভুবন ভরিয়া পুলকে ওই
শুনি সে মধুর কোকিল কূজন
কি হেতু অন্তরে ব্যাকুল হই ?
যখন শ্যামল নব মেঘদল
ছায়রে গগন নবীন সাজে
তখন আমার প্রাণের ভিতর
কি জানি বিষম কি যেন বাজে।
তার মাঝে ওই থাকিয়া থাকিয়া
জগত উজলি বিজলি হাসে
হেরি সে বিজলি কেন মন প্রাণ
বিষাদ সলিলে সদাই ভাসে ?
কপোত কপোতী মনোসুখে সবে
করে প্রেমালাপ সোহাগভরে
সে সুখ নেহারি দুঃখভারে চিত
ব্যথিত না হয় কিসের তরে ?
কেন এত ভাব উঠে মনোমাঝে
কারণ বুঝিতে না পারি হায়।
যখন যাহারে পাই পাই সামনেতে
মিনতি করিয়া সুধাই তায়।
পাগল বলিয়া কেহ উপহাসে
কেহ ব্যঙ্গ মোরে করে না কত
আমার কথায় নাহি দেয় কান
নিজ স্বার্থে হায় এমনি রত
সংসারী জনের হেন আচরণে
অন্তরে বেদনা পাইনু অতি
হৃদয় বিহীন নরনারীগণ
নিজ নিজ স্বার্থে সবারি মতি।
দুঃখে ক্ষোভে, রোষে আপন মনেরে
সুধাইনু শেষে মিনতি করি
সদয় হইয়া দিল সে উত্তর
পরম সুন্দর এরূপে মরি :—
"ছিল কেহ তব প্রিয়তমা অতি
পূর্ণ শশীসম আনন যার
চাঁদে হেরি তার চারুমুখ ছবি
হৃদিপটে জেগে উঠে তোমার।
"ছড়াত মাধুরী হাসিয়া বিমল
বিধুমুখী পাশে আসিত যবে
আপনারে তার উদাস পরাণে
আঁখি নীরে তেঁই ভাসিছ এবে।

"কোকিল নিন্দিত সুধা বিজড়িত
ছিল সে আমার কণ্ঠের স্বর
শুনি সেই হেতু পিকবধূ আজি
ব্যাকুলিত হয় তব অন্তর
"নিরখি গগনে শ্যাম মেঘদল
তাহার সজল নয়নদ্বয়
স্মরণেতে পড়ে, হৃদি তন্ত্রী তেঁই
আবেগে বিষম কম্পিত হয়।
"বিজলীর খেলা করি বিলোকন
মনে পড়ে তার মোহন হাসি

তবে সে সমীরে না হেরি নয়নে
বিষাদ সলিলে বেড়াও ভাসি।
"কপোত যুগের হেরি প্রেমালাপ
মনে পড়ে তোমা দোঁহার কথা
শত সুধালাপ সোহাগ, আদর
চিতে পাও তেঁই দারুণ ব্যথা।"
মনের নিকট শুনি সদুত্তর
পাইনু আরাম তাপিত প্রাণে
বুঝিলাম আজি অতি সত্য কথা
"মনের বেদন মনই জানে।"

ও, আলি, বি. এল.।

মাসিক সাহিত্য।

—:o:—

ভারতী চৈত্র, ১৩০৯। প্রথমেই ফরাসী কবি কপে হইতে অনূদিত জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর 'মানী প্রজা' জ্যোতি বাবুর অনুবাদ পড়িয়া অনেক সময়ে তাহা মূল বলিয়া ভ্রম জন্মে। 'শক্তিসাধনা ও তাহার পরিণাম' শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভাদুড়ী লিখিত একটী প্রবন্ধ। তিনি বলেন, 'ভীষণ ও মধুর ভাবের মিলন, কোমল ও প্রচণ্ড ভাবের সমাবেশ, এবং একাধারে বিপরীত ভাবের সম্মিলনই শক্তির 'প্রকৃত ভাব।' শক্তিকে তিনি দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; তাহাদের একটির নাম দিয়াছেন দক্ষিণাংশ, অপরটীর নাম রাখিয়াছেন বামাংশ। তাঁহার মতে 'বামাংশের অবলম্বনের পরিণাম প্রচণ্ড ভাবের পূর্ণ বিকাশ, এবং তজ্জন্য স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অত্যাচার পরায়ণতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব। কেবল দক্ষিণাংশের অবলম্বনের ফলে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, ঐহিকে অনাস্থা প্রভৃতি পরমার্থ সাধক ও সংসার বিরোধী গুণের প্রাবল্য। কেবল মিলিত ভাবেই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।' অতঃপর লেখক বলিতেছেন, 'ইহুদীনেতা মুসা প্রভৃতির নিকট আদ্যাশক্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহার সমগ্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেই আদ্যাশক্তির ভীষণাংশ, কঠোরাংশ মাত্র তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট ইহুদীধর্ম্মের এই খুঁত টুকু বুঝিতে পারিয়া, আধ্যাত্মিকের দার্শনিকতা প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিলেন, ভীত ত্রস্ত জনগণের নিকট ভগবানের দয়াপ্রেম স্নেহমমতার বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। মূর্খ ইহুদীগণ প্রেমধর্ম্মের বিকাশ লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিল পারিল না, মিলিত স্রোত মহাবেগে চারিদিকে ধাবিত হইল। আধ্যাত্মিকের এই ভীষণ ও মধুর ভাব মিলিত হইয়া তমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিল।' এইরূপে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কথা একটু মধুর মোলায়েম ভাষায় বর্ণনা করিয়া, লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি মুসলমান ধর্ম্মের শ্লেষপূর্ণ সমালোচনায় অপব্যয় করিয়াছেন। ইস্লামধর্ম্ম যে মহাত্মা ইব্রাহিম (আ) (Abraham) প্রচারিত ধর্ম্মেরই আদর্শ শাখা, ইহা মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) বহুবার বলিয়াছেন, 'ইস্লাম' তো নূতন ধর্ম্ম নয়, জগতের সত্য সনাতন ধর্ম্মের নামই 'ইস্লাম'। এই সামান্য শব্দটীর অর্থও তাহার অধিকার-সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা অবগত থাকিলে লেখক কখনই তাঁহার প্রবন্ধের এই অংশে 'দুই চারি পোঁচ অধিক রং লাগাইয়া' মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় দিতেন না। ইহা তো প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান নয়, ইহা মুসলমানের দেহে ইচ্ছাকৃত অস্ত্রাঘাত। আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াও যাহা জানিতাম না, এবং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নিচয়েও যাহার উল্লেখ নাই এমন সব নূতন কথা ভূতনাথ বাবু আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। 'ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা যে ইস্লাম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, এই কঠোর সত্য তিনি কৈলাসের কোন্ তুষার ধবল শিখরে বসিয়া আবিষ্কার করিলেন, তাহা জানিতে পারিলে নিখিল মুসলমান সমাজের বিশেষ উপকার হইত। ইস্লাম ধর্ম্ম 'শক্তি স্বরূপিনী রমণীগণকে বিলাসের উপাদান মাত্রে পরিণত' করিয়াছিল?—লেখক যদি কোরাণ শরিফের বাঙ্গালা অনুবাদ খানাও একবার পড়িতেন! ইস্লাম রমণীজাতিকে যে সব অধিকার প্রদান করিয়াছে, অন্য কোনও ধর্ম্ম তাহা করিয়াছে কি? আমাদের পরিতাপের বিষয় এই যে, লেখক কিছু না জানিয়াও সব জানিবার ভাণ করিয়াছেন। নারীজাতি সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'যদি তোমরা (পুরুষগণ) তাহাদিগকে (রমণীদিগকে) অবজ্ঞা কর, তবে হয়ত এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে যে যাহাতে খোদাতালা প্রচুর কল্যাণ করিয়া থাকেন'। 'নারীজাতিকে সম্মান করিও'; 'যাহারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দান করে, তৎপর চারিজন সাক্ষী আনয়ন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা অশীতি কশাঘাত করিও, এবং কখন (কোন বিষয়ে) তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, ইহারাই তাহারা যে দুষ্কৃতশীল'; 'পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর স্বত্ব, স্ত্রীগণেরও তদ্রূপ।' কোরাণের আদেশ অনুসারে কোনও মুসলমানই এক সময়ে চারির অধিক স্ত্রী রাখিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারি স্ত্রীর উপরে কি একাধিক স্ত্রীর উপরে সমান ব্যবহার করিতে না পারিবে তাহার পক্ষে একের অধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ। এই সমুদয় আমাদের

পরন্তু কি লেখক বলিবেন, 'মুসলমানগণ রমণীগণকে বিলাসের উপাদান মাত্রে পরিণত করিয়াছিল? লেখক বলেন, 'কাফের নাশকে এবং কাফেরের প্রতি অত্যাচারকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত করিতে হইয়াছিল।' ইহা এক অতি অলীক কথা। ইস্লামের সর্ব্বশেষ প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) সদিনায় অনেক স্থানে কালে শরিফেই বলপ্রয়োগে ধর্ম্মপ্রচারের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বোপরি কোরাণের ৩ সুরার ১৯ আয়েতে আছে, 'যাহারা গ্রন্থপ্রাপ্ত ও যাহারা অশিক্ষিত তাহাদিগকে বল, তোমরা কি খোদাতালার উপর আত্মসমর্পণ করিতেছ? যদ্যপি তাহারা মুসলমান হয় তবে তাহারা নিশ্চয় পথপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যদ্যপি বিমুখ হয়, তবে ধর্ম্মসমাচার প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছু নহে; এবং খোদাতালা দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী।' 'প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রচার কার্য্য বই নহে, তোমরা যাহা প্রকাশ্যে কর ও যাহা গুপ্ত রাখ খোদাতালা তাহা জ্ঞাত হন। (কোরাণ সুরা ৫, আয়েত ৯৯)।' 'ধর্ম্মের জন্য বলপ্রয়োগ নাই; নিশ্চয় পথ ভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে (সুরা২,আয়েত ৫৩)।' বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টান লিখিত গ্রন্থ হইতে ইস্লাম ধর্ম্মের অন্যায় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া লেখক কি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন? 'ইস্লাম' কখনও সমৃদ্ধিশালী দেশ নগর ছারখার করে নাই। ইস্লামের 'চন্দ্রকলাঙ্কিত পতাকা' দেশের পর দেশকে সত্যধর্ম্মের স্নিগ্ধ কিরণে সঞ্জীবিত করিয়াছিল মাত্র। মুসলমান যে বহু সমৃদ্ধিশালী নগরের স্থাপয়িতা লেখক কি এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন? শিল্পে ও বাণিজ্যে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে, মুসলমান কি একদিন জগতে কল্যাণপূর্ণের অবতারণা করে নাই? নিদ্রিত ইউরোপকে কে জাগাইয়াছিল? ইস্লাম নয় কি? একদিন জগতের তিমিরপ্রায় জ্ঞানালোক কোন্ জাতি প্রদীপ্ত করিয়াছিল? এমন মোটা সত্য কথাও যে ভূতনাথ বাবুর ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ লেখকের কেন অবিদিত, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। তিনি বলিয়াছেন, 'এক্ষণে বিষহীন ভীষণ শার্দ্দূলের ন্যায় মুসলমান পড়িয়া আছে, উঠিবার শক্তি নাই, উঠিবার আশাও নাই।' তাঁহার এই বর্ণনা টুকুর প্রতি সহৃদয় হিন্দুভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বদেশী, প্রতিবাসী, পতিত জনের প্রতি এরূপ ভাষা ব্যবহার করা কি সঙ্গত? ইহাই কি হিন্দু মুসলমানের শুভ সম্মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়? কিন্তু লেখকের প্রবন্ধের মূল বিষয় কি ইহাই নহে যে, 'কঠোরতা ও মধুরতার মিলনেই ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হয়, এবং সেই ধর্ম্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার নিজ উক্তি অনুসারেই আমরা বলিতে বাধ্য "ইস্লামই" জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম'। কারণ মুসলমান ধর্ম্মে উচ্ছৃঙ্খল আরবজাতীয় মনোগ্রাহী কঠোর মধুর ভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছিল।' 'কঠোর মধুর' বলিলে কি বুঝা যায় লেখক তাহা বলিবেন কি? জগতের বিখ্যাত জাতি নিচয়ের প্রত্যেকেই দ্বৈত শক্তির উপাসক। মুসলমানগণ যে এক সময়ে উন্নতির শীর্ষদেশে উঠিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে কি

এই উপাসনার সফলতা বিদ্যমান নয়? আজ তাঁহারা সেই পবিত্র মানবধর্ম চ্যুত হইয়াছেন বলিয়াই ত 'বেটে ভূতে' পড়িয়া আছেন, আশা করা যায় এই শিক্ষিত সমাজ ও আবার জাগিবে এবং তাহার জাগ্রত হইবার দিনও সমাগত প্রায়। আমরা ভূতনাথ বাবুর সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সর্ব্বশেষে কেবল মাত্র এই একটী কথা বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি,—

'ভাল হ'তে মন্দটুকু নিয়ে ঘৃণা দেব এ তব ক্রন্দন!'

'স্কুলের বাবু' অনেক প্রাচীন স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য বিবরণী। চিত্রাকর্ষক। 'সৌন্দর্য্যের বাসা' একটী সুন্দর কবিতা। কবি রমণীকে পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'তুই স্বর্গের সৌন্দর্য্যশিশুরে কোথায় লুকায়ে রেখেছিস?' তারপর তিনি রমণীর অন্ধকার ঘেরা কুণ্ডলিত কৃষ্ণকেশ পাশের কুঞ্চিত অলকে, শ্যাম স্বচ্ছ সরসীর মত সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আঁখি দুটীর অনন্ত অতলে, এবং আরক্ত অধরের যে হাসি না ফুটিয়া অমনি মিলায় তাহারই নিভৃতকোণে, দুরন্ত চঞ্চল সৌন্দর্য্যশিশুর বাসভূমির সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই, বরং তাহাকে রমণীর সর্ব্বাঙ্গেই আশ্রিত দেখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বলে, 'সুগঠন দেহের গঠনে তার বাস,' দার্শনিক বলে, 'তাহা নয়, নিশ্চয় সে মানবের মনে।' কবি বলেন, "আমি খেয়ালের ঝোঁকে কথা কই, আমি অতশত বুঝি না। আমার বিশ্বাস—সৌন্দর্য্য, সে প্রেমিকের চোখে।" আমরাও বলি তাই ঠিক। 'পুলিশ কমিশন' কমিশনের আলোচনা নহে, পুলিস বিভাগের কয়েকটী দোষের বিবরণ। লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে একবর্ণও মিথ্যা নাই। 'সুন্দরী' অশ্রান্ত বাবুর উপন্যাস, এখনও চলিতেছে। 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বর্ত্তমান সময়ে যে সব ঘটনা ভারতবাসীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে তাহারই তথ্যে পূর্ণ। সর্ব্বশেষ 'বাবু সুচিৎ সিংহ' একজন প্রসিদ্ধ পাহলোয়ানের জীবনী। সুচিতের অকালমৃত্যু দুঃখেরই কারণ বটে। লেখকের মত আমরাও আশা করি, 'তাঁহার বিধবা বয়স্ক শিশু পুত্র দীননাথ কোন দিন পিতার নামের গৌরব রক্ষা করিবে।'

প্রার্থনা।

১

বিভো, দেহ হৃদে বল।
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি,
আমি নিঃসম্বল।
তোমার দুয়ারে, আজি রিক্ত করে,
দাঁড়ায়েছি প্রভো, মাগিতে তোমারে
শুধু তপ্ত আঁখি-জল,
দেহ হৃদে বল।

২

বিভো দেহ হৃদে বল।
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে,
ভুলিনি তোমারে এক পল।
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর সাধের সম্বল।
দেহ হৃদে বল।

৩

বিভো, দেহ হৃদে বল।
এ নিখিল বিশ্বে, তোমারি মহিমা,
গাইছে সতত, তপন-চন্দ্রমা
গ্রহ উপগ্রহ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল।
তোমারি করুণা শিশিরের বিন্দু,
তোমার জ্যোতিতে পূর্ণিমার ইন্দু,
এত সমুজ্জ্বল।
দেহ হৃদে বল।

৪

বিভো, দেহ হৃদে বল।
কত জাতি পাখী নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণ গানে,
আনন্দে বিহ্বল।
ভুলিলে তোমারে প্রাণে অবসাদ,
তরু-লতা-শিরে তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফল।
দেহ হৃদে বল।

৫

বিভো, দেহ হৃদে বল।
তব প্রীতি বিনে, প্রাণ হীন ধরা,
তুমি সৌন্দর্য্যের জীবন্ত ফোয়ারা,
শান্তি-শতদল।
তোমারি প্রণয়ে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে
নির্ঝরিণী করে "কল কল"।
দেহ হৃদে বল।

৬

বিভো, দেহ হৃদে বল।
তুমি প্রেমময়, করুণা-নিলয়,
তব দ্বারে কেহ, নিরাশ ত নয়,

পতিতপাবন তুমি।
আমি মূর্খ নর কি চিনিব তোমা,
হৃদয়ে আঁধার অশান্তির অমা,
তুমি প্রাণে জ্যোতি সমুজ্জ্বল!
দেহ হৃদে বল!

৭

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তুমি নিরাকার, অথচ সাকার,
তুমি সর্ব্বব্যাপী, শক্তি-মূলাধার,
অনাদি অনন্ত তুমি!
তব স্নেহ-ক্রোড়ে লইলে আশ্রয়
না থাকে জীবনে মরণের ভয়
তুমি নাথ, ভকত বৎসল!
দেহ হৃদে বল!

৮

বিভো, দেহ হৃদে বল!
গোধূলির ভালে তুমি স্বর্ণ ছটা,
প্রভাতে বালার্ক সিন্দুরের ফোঁটা,
বর্ষায় বৃষ্টির জল!
বিশ্বরূপী তুমি, বিশ্ব তব রূপ
কর্ম্ম তব রাজ্য তুমি তার ভূপ,
সকলি তোমার ছল!
দেহ হৃদে বল!

৯

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিশ্বাস বসন্তের বায়ু
তব স্নেহ-কণা জগতের আয়ু
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে বিপদের ক্রোড়ে
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিবে শোকানল!
দেহ হৃদে বল!

১০

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি তোমারি অসীম জীবন,
তব প্রেমামৃত চন্দ্রমা-কিরণ,
তোমারি সৃজিত ভূমণ্ডল!
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তোমারি রহস্য
তোমারি কৌশল!
দেহ হৃদে বল!

১১

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমার রহস্য কি বুঝিবে নর
ভাবিলে সে কথা শিহরে অন্তর,
জ্ঞানের অতীত তুমি!
কারো বা কল্পনা, কারো অগ্নি জ্বালা
কারো বা প্রেমের অশ্রু-ঝরণা,
পাপ-পুণ্য-ফল!
দেহ হৃদে বল!

১২

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তব আশীর্ব্বাদ যা'চে শির'পরে,
তব পূত নাম স্মরিয়া অন্তরে
পশিব জীবন-রণে!
ছ'টি ভীম দস্যু দলি পদ ভরে,
পারি যেন নাথ সাধিতে সংসারে,
জীবের মঙ্গল!
দেহ হৃদে বল!

কায়কোবাদ।

আমাদের শিক্ষা ।*

— ৪০৪ –

আমাদের দেশে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার লইয়া আজকাল একটা আন্দোলন চলিতেছে। যেখানে সেখানে সভা সমিতির অধিবেশন দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের যেরূপ পতিত অবস্থা, তাহাতে স্রোতের গতি যখন একবার ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত হতভাগ্য কৃষকগণের চক্ষে নবাঙ্কুরিত শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ন্যায় যে তাহা আমাদিগের প্রাণে শুভ ভবিষ্যতের আশা সঞ্চারক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই নবাঙ্কুরিত ক্ষেত্র হইতে ষোল আনা ফসল আদায় করিতে হইলে, যত্নে ও পরিশ্রমে যেমন তাহাকে প্লাবন বা অনাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি এই নবীন উৎসাহের স্রোত (উৎসাহস্রোত) যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সতত প্রবাহিত রাখা আবশ্যক, অন্যথা আমাদের ভবিষ্যতের ক্ষীণ আশাটুকু আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প সংখ্যক লোক এই নূতন উৎসাহস্রোতে যোগদান করিয়াছেন; ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত, কেহ বা শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান সমাজের সংস্পর্শে থাকায়ই শিক্ষার মর্য্যাদা সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। অবশিষ্টের হৃদয়ে এখনো শিক্ষার আলোক প্রবেশের পথ পায় নাই, তাঁহারা সহজে এ স্রোতের নিকটে ঘেঁসিতে চাহেন না।

ক্রমাগত বহুকাল ধরিয়া শিক্ষার অভাব চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া আজ শত চেষ্টা সত্বেও আমরা সমাজে শিক্ষার বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেছি না। কেন না, শিক্ষার মর্য্যাদা অতি অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমদশাপন্ন হিন্দুগণ আমাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া সগর্ব্বে

* বিগত ১৯০২ সালের ২৩শে মে তারিখে দৌলতপুর (খুলনা) স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণের যত্নে ও উৎসাহে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত মুন্সি মেহের উল্লা সাহেব "শিক্ষা মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী উক্ত সভায় পঠিত হইয়াছিল।

উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়া নিয়ন্ত্রিত এবং পতিত সমাজের প্রতি অবজ্ঞাভরে নেত্রপাত পূর্ব্বক ঘন ঘন নাসাকুঞ্চিত করিতেছে। শত সহস্র চেষ্টা সত্বেও আমরা তাহাদের সমকক্ষতা করিতে পারিতেছি না। পদে পদে অবজ্ঞাক্রমে হিন্দুগণ আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেছে, আর পৌরুষহীন আমরা, তাহা নতশিরে গ্রহণ করিতেছি ও আপন বিষে আপনি জ্বলিয়া মরিতেছি!

হিন্দুগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই শিক্ষাকার্য্যে অগ্রসর হইয়া স্বীয় সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের উন্নত সমাজ ক্রমশঃ অধিকতর বেগে উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এক্ষণে সে বেগ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া আমাদের সাধ্য নহে। কারণ তাঁহারা বহু পুরুষ হইতেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে আধুনিক উন্নতি লাভে যত্নবান হইয়াছেন; পরন্তু আমরা বহুপুরুষ হইতেই শিক্ষাকে ঘৃণা করিয়া উন্নতির উত্তুঙ্গ গিরিশিখরচ্যুত হইয়া পূতিগন্ধময়, গভীর অন্ধকারপূর্ণ অজ্ঞানতাকূপে নিমজ্জিত হইতেছিলাম এবং সর্ব্বনাশকারী "হাম-বড়া"ভাবে স্ফীত ও হিন্দুগণের পরিত্যক্ত কুলমর্য্যাদার ঘৃণিত নারকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার চক্ষে আপনি গৌরবান্বিত হইতেছিলাম! তাই যে আলোকে মুসলমানগণ এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সে আলোক আজ পরহস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা চিরপরিত্রাণ হীন অধঃপতনের ঘোর আবর্ত্তে এক পার্শ্বে পতিত ও বিলুপ্ত হইবার জন্য উচ্ছৃঙ্খল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছি! হায়, কি ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও লজ্জার কথা।

শিক্ষার অভাবে অলক্ষিতে আমাদিগের সমাজে যে কতগুলি ভয়াবহ দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মূর্খতার প্রভাব এখন বীভৎস যে, আমরা আবার সেই দোষগুলিকেই ধর্ম্মের খোলস পরাইয়া আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করিতেছি। আজ আমরা ঈশ্বরের আদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিবার জন্য একবিন্দুও ঔৎসুক্য প্রদর্শন করি না,—অথচ বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর দেখাইয়া আপনাকে ধার্ম্মিক নামে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহি। হৃদয়-জ্ঞান-হীন সুন্নত পালনকারী মুর্শিদগণই আজ আমাদের সমাজের পথ প্রদর্শক। ধর্ম্মের মূল সত্য উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা হারাইয়া, শুধু কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য ভিত্তির উপর ততোঽধিক অন্তঃসারশূন্য ধর্ম্মের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কি আজ আমরা সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি না? সেই সত্যধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষ

মোহাম্মদের (দঃ) নিকট ধর্ম নষ্টকারী বলিয়া ঘৃণিত ও তাঁহার পবিত্র "ওম্মত"-দলচ্যুত হইতেছি না? সর্ব্বোপরি জগদীশ্বরের কঠোর শাস্তি আপনার শিরে পতিত হইবার জন্য সাগ্রহে আহ্বান করিয়া আনিতেছি না?

শিক্ষার অভাবে ধর্ম্ম-জ্ঞান, কর্ম্ম-জ্ঞান— সর্ব্ব জ্ঞানহারা হইয়া আজ আমরা বহুবাড়ম্বরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান আমাদের সমাজে পদে পদে দেখিতে পাইতেছি। আমরা অদৃষ্টের উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকি, মনে করি, যদি কপালে থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদিগের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক বিদ্যা, অর্থ, ধন, মান, সমস্তই আমাদের কচ্ছাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া যাইবেন! তাই আজ আমাদের সমাজে আলস্যের দাস, দারিদ্র নিষ্পেষিত, মুষ্টিভিক্ষাপ্রার্থী তরুণ বয়স্ক "ফকিরবংশসম্ভূত" যুবকের অভাব নাই। অনুসন্ধান করিলে এরূপ জঘন্যদশাগ্রস্ত অনেক ভদ্র-সন্তানও দৃষ্টিগোচর হইবে। অন্ধ অদৃষ্ট তাহাদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

ইস্‌লামের মূলতত্বগুলির সরল অর্থ আজকাল শিক্ষার অভাবে আর কাহারো বোধগম্য হয় না। তাই "ফতওয়া" ও "মস্‌লা তলবের"এত ছড়াছড়ি। মূল ধর্ম্ম এই সকল মসলার ও দপ্তর-বাহী ছাত্র পরিবেষ্টিত বিপথ-পরিচালক মস্‌লা প্রদানকারী মুন্সিগণের গোলকধাঁধার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর!

যে শিক্ষার অভাবে আমরা কতকগুলি জঘন্য বৃত্তির দাস হইয়া ক্রমশঃ নরকের কীটত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছি, তাহার সম্যক্ বিস্তার করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতে কেন আমরা এখনো যত্নবান হইতেছি না? ধর্ম্ম ভ্রমে অধর্ম্মাচরণ করিয়াও পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়কে এককালে বঞ্চিত করিয়া স্বর্গের মেওয়া আমরাই খাইতে পাইব বলিয়া কেন আমরা এখনো বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছি? যে শিক্ষার স্রোতে আজ পৃথিবী প্লাবিত, তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সভ্যতার সমীরহিল্লোলে নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে কেন আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না?

তাহার কারণ, যদিও এতদিনে আমাদিগের চক্ষু ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে, যদিও এতদিন পরে আমাদের ঘোর মোহনিদ্রা একটু একটু করিয়া অপসৃত হইতেছে, যদিও আমরা গাত্রোত্থান করিয়া উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিবার জন্য মনে মনে উত্তেজিত হইতেছি, তথাপি, এ দীর্ঘকাল যে সুখশয্যায় আমরা

ত ছিলাম, কতকগুলি দুশ্ছেদ্য পাশ আমাদিগকে সেই সময়ের সহিত বই
া রাখিয়াছে। আমাদিগের মোহনিদ্রার অবসানে পৃথিবী যখন বিজ্ঞান-
ত ভাসিতে ভাসিতে লক্ষ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া যাইতেছিল, তখনই
া অজ্ঞানতা বশতঃ কতকগুলি ফাঁস বিনা বাক্য ব্যয়ে গলায় জড়াইয়া
ছি। এ গুলি ছেদন করাই এখন আমাদের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান
য।

ীলোকেরাই আমাদের কঠিনতম পাশ। স্ত্রীসমাজের কুশিক্ষার বিষাক্ত
বে আমাদের সমাজ জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণই মানবকুলের
; তাঁহারাই আবার সমাজের উন্নতি বা অবনতির প্রসূতি। স্ত্রীগণ
ক্ষত থাকিলে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ-বিকল হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সমাজ দ্বারা
কর্ম্মই সুসাধিত হয় না।

দহতত্ত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আমাদের রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক, অস্থি,
সমস্তই মাতৃদেহ হইতেই গঠিত হয়। পিতৃদেহ হইতে ঐরূপ গঠিত
র শক্তিটুকু মাত্র প্রদত্ত হয়। বটবৃক্ষের সহিত তাহার ক্ষুদ্র বীজের তুলনা
া দেখিলে, গণিত শাস্ত্রের হিসাবে যে বীজটাকে অনায়াসেই লোপ
া দেওয়া যাইতে পারে। বিশাল বটবৃক্ষের সমগ্র দেহ যেমন মৃত্তিকার
গঠিত হয়, আমাদেরও সমগ্র দেহ তেমনি মাতৃদেহেরই অংশ মাত্র।
র জঠরে অবস্থান কালেই ভ্রূণের মানসিক বৃত্তিনিচয় অঙ্কুরিত হইতে
, এই কারণে গর্ভিণীকে সদা সর্ব্বদা শোক, ক্লেশ, অথবা উত্তেজনা হইতে
নে নিবৃত্ত রাখা হইয়া থাকে। মাতার শরীর অথবা মনের অস্বাভাবিক
বৈলক্ষণ্য ঘটিলে শিশুও সেই অস্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং
মানসিক বৃত্তিগুলি পুত্রকন্যাতে প্রবর্ত্তিত হয়। শরীর ও মনোবিজ্ঞান
াচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, গর্ভাবস্থায় মাতা যদি জ্ঞানালোকে
উদ্ভাসিত করিতে যত্নবতী হন, তাহা হইলে পুত্র কন্যাগণও শিশুকাল
জ্ঞানার্জ্জনে যত্নবান হইবে। কিন্তু মাতা যদি মূর্খতা ও কুসংস্কারের
াইয়া আপনার ক্ষুদ্র অজ্ঞানান্ধকার গণ্ডীর ভিতর বিচরণ করিতে থাকেন,
হইলে তাঁহার সন্তানের পক্ষে সে গণ্ডী কাটিয়া উঠা দুষ্কর হইয়া পড়িবে।
ও কুসংস্কারাচ্ছন্নচিত্ত মাতার সন্তান প্রায়ই স্বভাব মূর্খ হইয়া থাকে।
দর দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, যেমন মা, তেমনি ছেলে। ইহা
ই উল্লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হয়।

জননী সন্তানের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুশিক্ষা অথবা কুশিক্ষার বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা স্ফূর্ত্তি না পাইলে পিতা তাহাকে শিক্ষাদান ও শাসন করিতে পারেন না। পুনশ্চ শিশুগণ প্রথম ৫।৬ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর যত বিষয় শিক্ষা করে, তদপেক্ষা অধিক বয়স্কেরা ২০।৩০ বৎসরেও ততটা শিক্ষালাভ করিতে পারেন না। সেই মূল্যবান ৫টী কি ৬টী বৎসর শিশুরা মাতার নিকট ও অন্যান্য স্ত্রী পরিজনের নিকট থাকিয়াই যাহা কিছু শিখিবার, শেখে। পিতা অথবা অন্য পুরুষ পরিজনের সহিত ততদিন তাহাদের সংস্রব এক প্রকার থাকেই না বলা যাইতে পারে। অতএব স্ত্রীলোকগণের মতিগতি ও শিক্ষা সংস্কার যেরূপ থাকে, বালকগণের সরল চিত্তে তাহা দৃঢ়রূপে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন স্ত্রীলোকগণই আমাদের শিক্ষার প্রধান পরিচালক কিনা।

ইংলণ্ডের কোন খ্যাতনামা পণ্ডিত এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর বালকগণ ১৯০০ বৎসরের শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সে কথা আমাদের পক্ষে খাটে না। কারণ আমাদের বালকগণ, তাহাদের মাতৃসমাজের কুসংস্কার, অবনতি ও অজ্ঞানতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য দেশের পক্ষে যে বাণী অতি সত্য, এবং অংশতঃ আমাদের প্রতিবাসী হিন্দুদের উপরেও যাহা প্রয়োগ করিতে আপত্তি নাই, তাহার মূল কারণ সুশিক্ষিত মাতৃজাতি। বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ কোন সম্পদ লইয়া আমাদের গৌরব করিবার কিছুই নাই।

দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্ঞান ও শিক্ষাকে ঘৃণা করিয়া অন্ধকারে বাস করিতে করিতে আমরা বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি। পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতিস্রোত যতই বেগে অগ্রবাহী হইয়াছে, আমাদের মূর্খতাস্রোত আমাদিগকে ঠিক তদনুরূপ বেগে অসভ্যতা ও অবনতির দিকে পিছাইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহারা ১৯০০ বৎসরের জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং তদুপরে সেই জ্ঞান-রাশি জীবনে আরও উন্নত করিতে থাকে, জ্ঞান-লেশহীন আমরা কি করিয়া তাহাদের সমকক্ষ হইব, ভাবিলে দিশাহারা হইতে হয়। আমরা শিশুকালে স্ত্রীসমাজ হইতে যতদিন কুসংস্কার ও কুশিক্ষা লাভ করিতে থাকি, তাহারা ততদিন তাহাদের মাতৃজাতি হইতে জ্ঞান, সভ্যতা, উচ্চ সুশিক্ষা ও সুসংস্কার লাভ করিয়া আমাদের অপেক্ষা লক্ষ যোজন দূরে অগ্রসর হইয়া পড়ে। তাহার পর জীবনে সেই সকল কুসংস্কার ও কুশিক্ষার বীজ দূর করিয়া ভাল মন্দ বিচারের

ক্ষমতা লাভ করিতে করিতেই আমাদের আয়ুঃ শেষ হইয়া যায়, এবং [illegible] সময়ের মধ্যে তাহারা উন্নতির এত উচ্চশিখরে আরূঢ় হয় যে তাহারা একেবারেই আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে। একবার পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়া আবার অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের সহস্র চেষ্টা বিফল হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ।

বোধ হয় আর স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে না যে এই সকল কারণ হইতেই আমাদের সমাজে নানারূপ ভীষণ কুপ্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়া উন্নতির পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদিন আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই। আমাদের সময়ে যাহা হইবার তাহা ত এক প্রকার হইয়াই গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের সন্তানগণ যাহাতে সুসংস্কৃত ও সুশিক্ষিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নহে? এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ভিন্ন তাহার আর কি উপায় আছে?

ক্রমশঃ ।

পূজনীয়া খদিজা দেবী ।

ঘন ঘোর অন্ধকারে আরব-গগন
যবে সমাচ্ছন্ন দেবী, আরব সন্তান
কুআচার, ব্যভিচারে ঘোর নিমগন,
সে সময়ে যে বীরেন্দ্র, মানব প্রধান,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি করি বিতরণ
নাশিল তিমির রাশি, সকলের আগে
চিনিলে তাঁহারে তুমি ; করিয়া যতন
শত ভালবাসা দিয়া, শত অনুরাগে
বরিলে সে বরবপুঃ ; একাগ্র অন্তরে
স্থাপিলে বিশ্বাস দেবী, ইস্লাম উপরে।
কত যুগ মিলাইল কালের প্রবাহে,
তবু দেবী তব কথা মোস্লেমের গেহে
ভক্তিভরে নবোৎসাহে হয় উচ্চারিত
প্রতিদিন, শত শত ভক্ত রসনায়
তোমার কাহিনী গায়, করি বিমোহিত
প্রতি মোস্লেমের প্রাণ ; প্রত্যেক হিয়ায়
যাচে নর, কন্যা-জায়া হউক তাহার
তব মত পতিপ্রাণা, সতীত্ব-আধার,
তব মত ধর্ম্মে তারা, হ'ক স্থিরা মতি,
তব মত প্রতি কার্য্যে ধর্ম্মে থাক রতি,
তোমারি মতন তারা পতি বুকে থাকি
প্রকৃত কর্ম্মের পথে নিক তারে ডাকি।
তুমি মাগো স্বর্গে থাকি কর আশীর্ব্বাদ,
নারী হ'তে ঘুচে যাক চির অবসাদ
তোমার সন্তানদের ; পুনঃ জাগি উঠি
এ বিশ্বের প্রতি কেন্দ্র হ'তে তারা লুটি
লউক জ্ঞানের জ্যোতি। আর একবার
ইস্লামের জয়রবে কানন-কান্তার-
জল-স্থল-মহাশূন্য হউক ধ্বনিত,
তার নব অভ্যুত্থান হ'ক প্রচারিত।

অঙ্গুলের পথে।

জীবনসংগ্রামের প্রবল তাড়নে একদিন আমাকে বঙ্গদেশের স্নিগ্ধ, শান্ত, শ্যামল প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া উপল বন্ধুর অঙ্গুলের দিকে ছুটিতে হইয়াছিল। সে আজ দুই বৎসরের কথা। কিন্তু সেই ঘটনার স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রকৃত সংসারে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। সংশয়ে শঙ্কায় মুহ্যমান নবীন যুবক আমি, কত সুখদুঃখের কল্পনা করিতে করিতে সেই দিন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তখন স্নেহের চিরতপ্ত নীড়খানি আমার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছিল। হায়, আমার মত কত হতভাগ্য না জানি এমনি করিয়া সকল স্নেহের বাঁধন টুটিয়া কুগ্রহের মত নিরন্তর সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে মার সেই আকুল ক্রন্দন আমাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। আর আমার প্রাণের ভাইটী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া যখন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে ছিল, তখন আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই। আমার অতি কঠিন হৃদয়ও সেইদিন দ্রব হইয়া গিয়াছিল। জীবনে সেই প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার জন্য কাঁদিবার, আমার অভাব অনুভব করিবারও লোক আছে।

মার একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও আমি চোখের জল মুছিতে মুছিতে উড়িষ্যার শেষ প্রান্তস্থিত অঙ্গুলে যাত্রা করিলাম। সেদিন ১৩০৮ সনের বৈশাখের ১৯এ তারিখ। রজনীর অন্ধকারে দেহ আবৃত করিয়া শীঘ্রই বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম। কাহারও চোখের জল, স্নেহের দৃঢ় বন্ধন, আমার সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না। মনের মধ্যে যে একটা যাব-কি যাব-না ভাবের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, গোপন হৃদয়পুরে তাহা আরও গোপন করিয়া আমাকে যাইতেই হইল। ইহাই সংসারের নিয়ম। সকলকেই একবার যাইতে হয়, কেহ কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ম—বাবু আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আড়-কাটিরা নূতন কুলিকে নানা মনোমুগ্ধকর কথায় ভুলাইয়া যেমন কোন প্রকারে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াই চলিয়া আসে, ম—বাবুও সেইরূপ আমাকে অনেক প্রবোধ দিলেন এবং শেষে গোয়ালন্দ মেলে উঠাইয়া দিয়া ঢাকা ফিরিয়া গেলেন। আমার সেই সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা

প্রাপ্ত অপরাধির শেষ জন্মভূমি দর্শনের ন্যায় আমি একবার আমার স্বদেশের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তখন চোখের জল আমার দৃষ্টিরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষতঃ আমার স্নেহের ভাই বোন-দের সাহচর্য্যাভাব তখন আমার হৃদয়ে এমনি একটা বিষাদের তান জাগাইয়া তুলিয়াছিল যে পোড়া অশ্রু আর বারণ মানিতেছিল না।

আমার সুখ দুঃখের কথা ভাবিবার কেহ সেখানে ছিলনা, কেহ তাহা ভাবিলও না। আমি নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া জাহাজের এক কোণে বসিয়া রহিলাম। যথা সময়ে সারেঙ্গ ঘণ্টা বাজাইল, ভোঁ-ভোঁ করিয়া সিটি বাজিয়া উঠিল এবং ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে জাহাজ চলিতে লাগিল। মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় যেমন ঘটা করিয়া কান্না জুড়িয়া দেয় এবং কিছু দূর যাইয়াই তাহাদের সপ্তমে চড়া সুর নীরব হইয়া আসে, আমাকেও তখন সেই পথ অবলম্বন করিতে হইল।

বহুক্ষণ জাহাজ চলিলে পর আমি একটু শান্ত হইলাম। তবুও লোক-সঙ্গ ভাল লাগিল না। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া একমনে তীরস্থিত নব প্রকৃতির দিকে চাহিয়া রহিলাম। রৌদ্রকরোজ্জ্বল গ্রামগুলি তখন বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল এবং কোমল শ্যামল তৃণপূর্ণ মাঠগুলি একটু একটু করিয়া নাটকের দৃশ্যের অভিনয়ের মত আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িতেছিল। প্রাতঃকাল; ক্ষেত্র হইতে কৃষকদের প্রমোদনন্দন জনিত সরল গানগুলি মৃদু পবনে ভাসিয়া ভাসিয়া অতি অস্পষ্ট ভাবে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, তাহা কত না মধুর! কোথাও বা দেখিলাম কোন সরলা গ্রাম্য বধূ নদীর ঘাটে জল নিতে আসিয়া ষ্টিমারের দিকে চাহিয়া আছে, কেহ বা ঢেউ দিয়া দিয়া কলসী পূর্ণ করিতেছে। অন্যত্র কয়েক জন তরুণী বুকজলে শরীর ডুবাইয়া দিয়া হাসির তরঙ্গে আর মধুর কথায় ঘাটখানি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, তাহারা তখন স্বামী-প্রেমের রসপূর্ণ সমা-লোচনায় বড়ই ব্যস্ত। তাহাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই মহাসভায় কোন বর্ষীয়সী বা গুরুজনের শুভাগমন হয় নাই।

কতস্থানে ষ্টিমার থামিল, কত কেহ উঠিল, কত কেহ নামিল। আমাদের ষ্টিমার এখন পদ্মা বাহিয়া চলিয়াছে। যে পদ্মার গ্রাসে বিক্রমপুরের কত সমৃদ্ধি-শালী গ্রামের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লুকাইয়াছে, যে পদ্মা বিশ্বাসঘাতক রাজা রাজবল্লভের অতুলকীর্ত্তি একবিংশতি রত্ন ধ্বংশ করিয়া কীর্ত্তিনাশা নাম গ্রহণ

পূর্ব্বক বড় গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া ছুটিয়াছে, সেই পদ্মায় এখন আমরা ভাসমান। বৈশাখের প্রথম হইতেই পদ্মার মূর্ত্তি ফিরিয়া যায়। নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিল কর্দ্দম-পূর্ণ হইয়া পড়ে, স্রোতের বেগ বর্দ্ধিত হয় এবং স্থানে স্থানে ভীষণ আবর্ত্ত সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। পদ্মার কাজ কেবল ভাঙ্গা, কেবল গড়া। এক দিক দিয়া সে ভাঙ্গিতেছে, আর এক দিক দিয়া গড়িতেছে। পূর্ব্বে পদ্মাকে গঙ্গার শাখা বলা হইত, কিন্তু এখন অনেকেই সেই মতে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন গঙ্গা নিজে কি তাহার কোনও শাখা কূল-ধ্বংশ কারিণী নহে। ব্রহ্মপুত্রের গুণ গুলিই পদ্মাতে সম্পূর্ণ প্রতিভাত। মোট কথা পদ্মা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোত।

যাক্ এ সব কথা। পদ্মা যেমন বাহিয়া যাইতেছে তেমনি বহিয়া যাউক, তাহার কূলেকূলে তেমনি শ্যামচ্ছবি বিরাজিত থাকুক ;—আবার যখন স্বদেশের দিকে ফিরিব তখন যেন সকলই এইরূপ দেখিতে পাই। আজ যাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়াছি, প্রত্যাবর্ত্তনের পর আবার যেন তাঁহাদের স্নেহের ছায়ায় বসিয়া আজিকার এই ব্যথিত জীবনের শেষ স্মৃতিটুকুও ভুলিয়া যাই, কেবল আনন্দের সুনির্ম্মল ছবিখানাই যেন সারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের জাহাজ গোয়ালন্দ পঁহুছিল। আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম, কিন্তু গোয়ালন্দ গিয়াই টিকেট খানা মধ্যম শ্রেণীর করিয়া লইলাম। অতি প্রত্যুষে আমাদের নিয়া ট্রেন কলিকাতা উপস্থিত হইল। আমি সেই দিনের জন্য এক আত্মীয়ের বাসায় অতিথি হইলাম।

পরদিন প্রাতে হাবড়ার ষ্টেসনে যাইয়া কটকের টিকেট কিনিয়া 'বি, এন্, আর'এর আশ্রয় লইলাম। গাড়ী আমাদিগকে লইয়া বেগে ছুটিল। দুই দিকের বন-উপবন, প্রান্তর-পথ যেন ট্রেনের হুঙ্কার-ধ্বনিতে ভয়ত্রস্ত হইয়া দূরে, অতি দূরে আত্মগোপন করিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে ছয়টী ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া আমরা উলুবেড়িয়া আসিয়া পঁহুছিলাম। এইখানে যথেষ্ট ডাব নারিকেল পাওয়া যায়। বৈশাখের স্নিগ্ধ কোমল নেয়াপাতি ডাব খাইবার প্রলোভন আমি এড়াইতে পারিলাম না। অতএব তাহার কিছু সৎকার হইল। আর একটী ষ্টেসন পরেই ট্রেন কোলাঘাট স্পর্শ করিল। পূর্ব্বে উড়িষ্যাযাত্রীদিগকে এই স্থানে ষ্টিমারে নদী পার হইয়া পুনঃ ট্রেনে উঠিতে হইত। দার্জ্জিলিং যাত্রীদিগকে যেরূপ দামুকদিয়া ঘাট হইতে ষ্টিমারে উঠিয়া সাঁড়ায় অবতরণ করিয়া দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কৃপাভিখারী হইতে হয়, এখানেও

ঠিক তদ্রূপই হইত। চাঁদবালী হইতে যে ষ্টিমার বরাবর যাত্রী নিয়া কটক যাইত তাহারও গন্তব্য পথে কোলাঘাট একটী ষ্টেসন ছিল। কোলাঘাটে অনেক লোকজনের ভিড় দেখা গেল। একটার পর একটী ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া আমাদের ট্রেনখানি খড়্গপুর আসিয়া পঁহুছিল। খড়্গপুর বি, এন্, আর, এর একটী প্রকাণ্ড ষ্টেসন। এখানে ওয়ার্কশপ আছে। মেদিনীপুরের যাত্রীদিগকে এই স্থানে নামিয়া অন্য একখানা ট্রেনে উঠিতে হয়। ষ্টেসন গৃহটীর দুই দিকে দুই প্লাটফরম। Madras mailএ চলিয়াছি, আমার অবতরণরূপ কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের অভিনয়ের কোন দরকার ছিল না, তাই বসিয়া বসিয়া যাত্রীদের আনাগোনা আর রেলওয়ে মহা প্রভুদের লম্ফ ঝম্ফ লক্ষ করিতেছিলাম।

আবার গাড়ী ছাড়িল। আমরা বেলপুর, নারায়ণগড়, কন্টাইরোড, দাঁতন, জেলাসোর পার হইয়া ময়ূরভঞ্জে আসিলাম। ট্রেন হইতে ময়ূরভঞ্জের রাজবাটী বেশ দেখা যাইতেছিল। ইহার পরের ষ্টেসনই বালেশ্বর। বালেশ্বর খুব সুন্দর সহর। এইখানে যে সব মাটির পুতুল পাওয়া যায় তাহা প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণ প্রস্তর বলিয়াই ভ্রম হয়। পুতুলগুলি দেখিতে মন্দ নয়। আরও কয়েক ষ্টেসন পরে জাজপুর রোড। তথা হইতে দুই মাইল দূরে আমরা বৈতরণী পার হইলাম। বৈতরণীর বুকে রেলওয়ে কোম্পানির কল্যাণে এখন বেশ একটী সেতু শোভা পাইতেছে! বৈতরণী পার হইবার কালে আমাদের সেই চির পরিচিত প্রবাদটী মনে পড়িয়াছিল! উড়িষ্যা বুঝি কোনও এক স্মরণাতীত কালে আমাদের দেশের পক্ষে আন্দামান স্বরূপ ছিল, তাই এই প্রবাদের সৃষ্টি। জাজপুরে সাদাপাথরের খুব ভাল পুতুল পাওয়া যায়। ব্যাস-সরোবর, জেনাপুর, ধন-মণ্ডল অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী কপিলাশ পাহাড়ের কোলে স্থাপিত ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিল। কপিলাশ একটি ছোটখাট পাহাড়। আর এক ষ্টেসন পরেই কটক। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমরা সন্ধ্যার অাঁধারেই মহানদীর প্রকাণ্ড সেতু পার হইয়া কটক পঁহুছিলাম। শুনিয়াছি মহানদীব্রিজ, সোন ব্রিজের পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত। আমি কটকে তথা-কার জমিদার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী সব ডেপুটী কালেক্টর মহাশয়ের গেষ্ট হইলাম। তিনি আমাকে পরম সাদরে গ্রহণ করিলেন। একদিন তথায়বিশ্রাম করিয়া তৎপর দিন প্রাতে অঙ্গুল রওয়ানা হইলাম।

মহানদী সহরের প্রায় এক মাইল দূরে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত। পদ্মা ও মেঘনার মতন ইহা আকারে বড় না হইলেও ইহার স্রোত খুব প্রখর। জলের রঙ্গ ঈষৎ লাল, কিন্তু পরিষ্কার। নদীর পাড়ে মাটি দেখিবার সুবিধা নাই, তথায় কেবলই বালু, যেন বালুরই রাজ্য। মহানদীর তীরভূমি কঙ্করে পরিপূর্ণ পাদুকা ব্যতীত পা ফেলিতে বড় কষ্টবোধ হয়। নদীর মাঝখানে চড়া, বর্ষাকালে তাহা ডুবিয়া যায়। স্থানে স্থানে এক একখানা কাল পাথর নদীতে এমনি ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন এক একটী হাতী গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শরীরের অর্দ্ধাংশ জলে ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীতে কুম্ভীর যথেষ্ট। আমি পার হওয়ার সময়ই তিন চারিটা দেখিতে পাইয়াছিলাম। বেলা আটটার সময় নদীর অপর পারে যাইয়া উঠিলাম তখন আমার মনে হইল, আমি বুঝি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সিংহলে উপনীত হইলাম। সেই সময়ে ভাবিবার অনেক বিষয় জুটিয়াছিল, ভাবিলামও অনেক ; কিন্তু সকল ভাবনাকে পরাজয় করিয়া ক্ষুধার জয়লাভ হইল। অতএব আমি উদর দেবতার সেবায় কিছুক্ষণ ব্যয় না করিয়া আর পারিলাম না। সমুদয় অঙ্গুলযাত্রীর মত কটক হইতে আসিবার সময় আমাকেও তিন দিনের খাবার ও পানীয় সঙ্গে করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

আমার জলযোগের পর গাড়োয়ানকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। কতক দূর অগ্রসর হইয়াই ডানদিকে মোড় ফিরিবার সময় দেখিলাম দূরে আকাশ যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে। গাড়োয়ানকে বলিলাম, সব ঠিক করিয়া রাখ বৃষ্টি হইবে! সে বলিল 'কোন কহিছু'? এতক্ষণ তাহার সঙ্গে আমার বড় একটা কথা হয় নাই, তাহার এই প্রথম কথা শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। পুনরায় বৃষ্টি হইবার কথা বলিলে, সে উত্তর করিল 'মেঘ কৌঠি' ? মেঘে আর বৃষ্টিতে কি প্রভেদ তাহা নিরক্ষর উড়িয়া গাড়োয়ান জানিত কি না তখন আমি সে মহা আবিষ্কারের সুবিধা পাই নাই, কিন্তু এখন ভাবিতেছি, 'উড়ে অন্তর' মধ্যেও বিশেষজ্ঞ আছে। যে 'বাঙ্গাল' মানুষ ছিলনা, সেও মানুষ হইয়াছে,'উড়ে অন্তু'ও এখন অনেক উন্নতি করিয়াছে! আমার গাড়োয়ান প্রভু আমাকে বুঝাইলেন ওটা মেঘ নয়, পাহাড়—'ন হজুর সেটি মেঘ ন অছি, গোটা পাহাড় দেখা যাউছি।' আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দূর হবে' ? সে বলিল, 'কেত্তা বাট ?—বিশ ক্রোশ

ঘাট হব'। এইরূপে আমরা দুজনে অনেক আলাপ করিলাম, তাহার উড়িয়া কথা গুলি আমার বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল।

আমরা বাক্যের সাগরে ডুব দিয়া সকল ভুলিয়া গেলেও আমাদের গাড়ী চলিতেই ছিল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে একখানা বড় ঘর দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—ডাক বাঙ্গলা। কটক হইতে অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রতি আট মাইল অন্তরই এইরূপ ডাক বাঙ্গলা বিদ্যমান। আমরা ডাক বাঙ্গলাটী অতিক্রম করিয়া দশ বারো মিনিট গিয়াছি পর সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের দুই দিকে নিবিড় অরণ্য, মাঝে মাঝে দূরে উভয় পার্শ্বে পাহাড়। বড় বড় গাছ গুলি সেখানে সূর্য্য দেবকে কিছু জব্দ করিয়া রাখিয়াছে এবং বেলা দশ এগারটার সময়ই সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে। সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর। কিন্তু আমার গাড়োয়ান প্রভুর কথা শুনিয়া সকল আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। তিনি বলিলেন, সেখানে নাকি দিনেই বাঘ, ভালুক, হাতি প্রভৃতি সময় সময় রাস্তার ধারে দেখা যায়, অনেক সময় অনেককে আক্রমণও করে। কতকদিন পূর্ব্বে তাহারই নাকি একটা গরু বাঘের ডাক শুনিয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে গাড়ীখানা উল্টাইয়া যাওয়ায় আরোহী কিছু আঘাত পাইয়াছিল, এ সব কথায় একটু ভয় বোধ হইল, ভয় নামক অসুরটাকে তাড়াইবার জন্য গান ধরিলাম, কিন্তু সব বেসুরো হইয়া গেল। আমি নীরবে শয্যালীন হইলাম।

গাড়োয়ান জিভ দ্বারা টা-অট্টা-হট্-হট্-শব্দ করিয়া গরুর লেজ মোচড়াইতে মোচড়াইতে আট মাইল পথ অতিক্রমোনান্তর আর একটী পান্থ নিবাসে আসিয়া পড়িল। এ স্থানের নাম খড়ন। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রজনী দশ ঘটিকার সময় ঢেকানল পঁহুছিলাম। তথায় রাতটী কাটাইয়া প্রত্যুষে আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। ঢেকানলের রাজা সূর্য্যপ্রতাপ মহেন্দ্র বাহাদুরের বাড়ী দেখিতে বড়ই সুন্দর। বাড়ীখানা ভূমি হইতে প্রায় ২৫ ফিট উচ্চে একটী পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত; পাকা কোঠা, দূর হইতে দেখিতে ঠিক যেন ছবির মত বোধ হয়।

বেলা বারোটার সময় আমরা আর একটী ডাক বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একজন লোক গাড়োয়ানকে আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমরা 'গড়' যাইতেছি শুনিয়া সে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন জানিল যে আমি অঙ্গুল জেলের নবনিয়োজিত নায়েব দারোগা, তখন সে আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। অঙ্গুল প্রবাসী একজন ভদ্রলোক

উক্ত চিঠিতে আমাকে পত্রবাহক হইতে রাস্তার বিবরণ জানিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। লোকটী কনেষ্টবল, অঙ্গুল হইতে কয়েদী লইয়া কটক চলিয়াছে। এই স্থানে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত অবস্থান পূর্ব্বক আহার ও বিশ্রাম করিয়া আবার গো-যানের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলাম। সুমধুর ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে চলিল। স্থানটীর নাম বড় গড়িয়া। পূর্ব্বে আমরা একস্থানে "গড়ের" উল্লেখ করিয়াছি। 'গড়', অঙ্গুলেরই এ দেশ প্রচলিত নাম।

সন্ধ্যার কিছু পর আর এক বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। পূর্ব্বে পথে লোকজনের বড় সাক্ষাৎ পাই নাই। এখন হইতে দু একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইতেছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গলায় আমাদের স্থান হইল না, একটী ভদ্রলোক সপরিবারে পূর্ব্বেই তাহা দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন। পাশ্বনিবাস বাত্তিত সেই নির্জ্জন স্থানে কেবল মাত্র একখানা দোকান ঘর ছিল, আমরা গাড়ীসহ তথায়ই রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিলাম। আমাদের জঠরানল জ্বলিয়াছিল; পাক ত হইলই না, বাধ্য হইয়াই চিপিটকের সেবা করিতে হইল। কর্ম্মময় যুগে আমার জন্ম, নতুবা সেই গাবের বীচির মত বড় বড় এক একটা চিঁড়ের বর্ণনায় আজ পাঠকদিগের সবিশেষ প্রীত করিতে সক্ষম হইতাম।

গাড়ীতে শুইয়া আছি, রাত্র তখন প্রায় একটা, এমন সময়ে জনকোলাহল শুনিতে পাইলাম, একটু কাণ পাতিয়া শুনিলাম, লোকগুলি বাঘের বিষয়ে আলাপ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চৌকিদারও ছিল, তাহাকে ডাকিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে গাত্র শিহরিয়া উঠিল। একটা বাঘ নাকি আমাদের গাড়ীর কাছেই কিছু পূর্ব্বে ডাকিয়াছে। চৌকিদারকে আমার গাড়ীর নিকট থাকিতে বলিলাম, সে আমার গাড়োয়ানকে ডাক দিয়া উঠাইল এবং দুই তিনজনে টানিয়া আমার গাড়ীখানা আরও দুইখানা গাড়ীর মধ্যে রাখিল। এই দুইখানা গাড়ী আমি ঘুমাইলে পর সেখানে আসিয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া চৌকিদারকে কিছু বখসিস্ ও দোকানীকে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া রওয়ানা হইলাম। এই স্থানের নাম বাঙ্গুরসিঙ্গা।

দুপুর বেলায় আমরা ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়া মুটুকায় পঁহুছিলাম। ব্রাহ্মণীর জল অতি অল্প, গাড়ীতে বসিয়াই নদী পার হইলাম। আহার ও বিশ্রামের জন্য সেখানে তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আবার যাত্রা করিলাম। দুই দিনের পরিশ্রমে গরু গুলি খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আকাশে মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাই বোন ঝড় ও বৃষ্টির মাতামাতিতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই গমনে নিরস্ত হইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের প্রকোপ কমিল সত্য, কিন্তু অন্ধকার দূর হইল না। সেই অন্ধকারেই আমরা আবার ছুটিলাম। আমাদের সঙ্গে পূর্ব্ব রাত্রির দুখানা গাড়ীও ছিল। তখন আমরা অঙ্গুলের খুব কাছে আসিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্টের ফের থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। আমরা পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছি। সড়কে নূতন মাটী ফেলাতে মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তা পড়িয়াছে, সেই রাস্তাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে। আমরা দূরে দু একটী আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলাম, ঘণ্টার শব্দ ও শুনিলাম,—তখন ৯ টা বাজিল। কেহ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাবার সম্মুখে দিয়া যদি ভোজনকারীর হস্তবদ্ধ করিয়া রাখে তবে তাহার হৃদয়ে যে ভাব হয়, অঙ্গুলকে সম্মুখে রাখিয়াও তাহাতে প্রবেশ লাভে অসমর্থ হইয়া আমাদের সেই দশা হইল। মাঠের মধ্য দিয়া অন্ধকারে গাড়ী চালান বড়ই কষ্টকর, কারণ তথায় বড় বড় পাথর আমাদেরই পথ আগুলিবার জন্য পড়িয়া রহিয়াছিল। অতএব অগত্যা সেখানেই রাত্রি কাটাইতে হইল।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সঙ্গীয় লোকজন রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিল। আমরা ৬ টার সময় অঙ্গুলে পঁহুছিলাম। তথায় আমার স্বদেশীয় পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকটী আমাকে অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই রূপে আমি আমার অঙ্গুলযাত্রা শেষ করিলাম। ভবিষ্যতে, পাঠক পাঠিকাদিগেকে 'অঙ্গুলের স্মৃতি' উপহার দিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আজ বিদায় ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রায়।

সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন।

পৃথিবীর যাবতীয় উন্নতিশীল প্রাচীন এবং আধুনিক সভ্য জাতির ইতিহাস খুলিয়া দেখ, তাহাদিগকে জাগ্রত, জীবন্ত এবং মহিমা-মণ্ডিত করিবার মূলেই সাহিত্য শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান। সাহিত্যের মূল্য জগতের সমুদয় রাজকোষের ধনরত্ন অপেক্ষাও অধিক। সাহিত্যের শক্তির তুলনায় বীর মণ্ডলীর একত্রীভূত বলও অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে কদর্য্য সাহিত্যের

কুৎসিত ভাব, কু-কল্পনা এবং কু চিন্তার কলুষরাশি জগতের সমুদয় পাপ প্রলোভনাপেক্ষাও ভয়াবহ! ইতিহাসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যের মহাঋষিগণ ভাবতরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া সাহিত্য-সমুদ্রে যখন যে চিন্তা এবং ভাবের স্রোতঃ ঢালিয়া দিয়াছেন, তখনই সমস্ত জাতি সেই ভাবে বিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক জাতির অভ্যুদয়কালের সহিত অধঃপতনকালের সাহিত্যের এই জন্যই গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জগতের যাবতীয় উন্নত জাতির অভ্যুত্থানকালের সাহিত্যের মূলে সর্ব্বদাই বীর, করুণ এবং শান্তরস প্রধান মহাকাব্য (Epic) সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উন্নতির মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত রস-প্রবাহপুরিত সাহিত্যের পুষ্টিই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পতনের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই কুৎসিত কদর্য্যভাবপূর্ণ উপন্যাস, কাব্য ও আখ্যায়িকার ভারে বীরভোগ্যা ভাষা প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় জীবনের সংগঠন, উদ্দীপন, পরিচালন এবং অধঃপতন, সাহিত্যের উপরেই যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের সাহিত্যের দিকে দৃক্‌পাত করিলে, বাস্তবিকই সমাজহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণকে অনুতাপের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে হয়! আমরা যেরূপ অধঃপতিত, অনন্তদুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি—আমাদের হৃদয়ের বল, মনের তেজঃ যেরূপ ক্ষীণ; চরিত্র যেরূপ অবনত, আদর্শ যেরূপ সামান্য—তাহাতে আমাদের সাহিত্য কিরূপ জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালী ও উচ্চআকাঙ্ক্ষাযুক্ত এবং উদ্দীপনাময় হওয়া আবশ্যক; তাহা জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজসেবকগণের একান্ত চিন্তার বিষয়। সত্য বটে, বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রত্যহ শত শত পত্র পত্রিকা এবং পুস্তক পুস্তিকা বাহির হইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহার মধ্যে কয়খানিতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনী খুঁজিয়া পাওয়া যায়? —গবেষণা ও স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়? সাপ্তাহিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই গাঁজাখুরী গল্প এবং নায়ক নায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়প্রসঙ্গের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ! নূতন লেখক যাঁহারা দেখা দিতেছেন, তাঁহারাও উপন্যাস বিন্যাসে এবং গল্প ফাঁদিতেই ব্যতিব্যস্ত! দেশের সমস্ত পাঠকই যেন উপন্যাস এবং প্রণয়কাহিনী পড়িবার জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন! জাল জুয়াচুরী, ডাকাতী অপহরণ ও বহিষ্করণের গন্ধে মাসিক পত্রিকাগুলি ভারাক্রান্ত। তেমন জাঁকজমকশালী সাম-

ডাকের মাসিক গুলিতেও পড়িবার উপযোগী সমাজনীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতি বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ নিতান্ত অল্প পরিমাণেই পরিদৃষ্ট হয়! আর কাব্য বা কবিতার কথা কি লিখিব? চাঁদের হাসি, ফুলের রাশি, বিরহ অনল, মিলনের জল, পুকুরপাড়ের অভিসার, ফুলবাগানের প্রেমের হার, প্রথম চুম্বন, প্রথম আলিঙ্গন, আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, প্রিয়-লাভ-বিফলতার হা হুতাশ, ইহা ছাড়া কবিতার বিষয় আর কিছুই পাইবার নাই। আদিরস ব্যতীত আজকাল পাঠকদিগেরও যেন অন্য রসবোধ হয় না। তারপর ভীতিশূন্য কবিতার ত অন্তই নাই। উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, অর্থ নাই, কেবল রসাল জাঁকাল শব্দের ঘটা মাত্র। এই শ্রেণীর কবিতার স্রোতে বঙ্গসাহিত্য এক্ষণে বিপ্লাবিত।

আজকাল দেশের একটা প্রবাদ বাক্য হইয়াছে "কবিতা,কোমল বনিতা।" অনেকের ধারণা কবিতা কেবল 'চুম্বন' 'আলিঙ্গন' 'মিলন' ও 'বিরহ' বর্ণনা করিবার জন্য। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান কবিবন্ধুর সহিত আমার এ বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল। আমি বলিলাম "এক্ষণে বঙ্গীয় মুসলমানগণের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, আর আমাদের যেরূপ নিদারুণ অধঃপতন হইয়াছে; তাহাতে আপনি যেরূপ রসের প্রবাহে কল্পনার তরী ভাসাইয়াছেন, তাহা সমাজের পক্ষে ক্ষুদ্র হইলেও নিতান্ত কলঙ্ক ও ক্ষতির কারণ।" তিনি বলিলেন, "হাঁ, তাহা আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ, করুণ ক্রন্দনপূর্ণ জাতীয় কবিতা আমাদের তত পছন্দ নয়। বিশেষতঃ আপনি জাতীয় কবি, আমরা স্বাধীন কবি। কবিতার বর্ণনার বিষয়ই বনিতা। কবিতা ও বনিতা পরস্পর সদৃশ জিনিস।" আমি বলিলাম "সে কি? আপনি স্বাধীন কবি বলিয়াই যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখিবেন? স্বাধীন কবি বরং নিজের শ্রেষ্ঠ শক্তি সমাজের হিতার্থে অর্পণ করিবেন। তিনি প্রণয়-কবিতা লিখিতে পারেন, কিন্তু জাতীয় উত্থান মূলক কবিতা লেখাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি কবি দ্বারা জাতি সংগঠন এবং পরিচালনার সহায়তাই না হইল, তবে তাহাকে 'কবি' না বলিয়া 'কপি' উপাধি দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। আপনি বলিলেন "কবিতা এবং বনিতা।" আমি বলিতেছি "কবিতা পবিত্রতা এবং বীরতা। জগতের প্রধান প্রধান কবিগণ বাল্মিকী, ব্যাস, মিল্টন, হোমার, দান্তে, ফেরদৌসী, নিজামী, সাদী, জালালুদ্দিন, রুমী, ভার্জ্জিন; ইঁহাদের কাব্য সমূহ কোন্ রসপ্রধান? কবিতায় যেমন ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকুজন এবং বিরহের আলাপ হইতে পারে, তেমনি কি উহাতে দুন্দুভিধ্বনি, মেঘমন্দ্র, সিংহগর্জ্জন এবং পবিত্রতা, নীতি ও স্বর্গীয়

প্রেমালাপ হইতে পারে না?" বন্ধুবর আমার বাক্যে আর কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না।

বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোন অধঃপতিত জাতি, কোন কালে নাটক নভেল পড়িয়া, বেশ্যাসঙ্গীত প্রেমসঙ্গীত গাহিয়া, যাত্রা থিয়েটারের অভিনয় করিয়া, আমোদ প্রমোদ ও রঙ্গ-বিলাস-সাগরে ডুবিয়া, উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইতিহাস হইতে তাহার নিদর্শন দেখাইয়া দিতে পারেন কি? পরন্তু উপরোক্ত কারণ পরম্পরায় জগতের যাবতীয় সমুন্নত প্রাচীন জাতি সমূহ যে, অধঃপতিত এবং অনেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ইতিহাস কি জলদক্ষরে তাহাই প্রকাশ করিতেছে না? যখন ব্যাস বাল্মিকীর বীর করুণ ও শান্তরস-প্রধান কবিত্ব-প্রবাহের পরে ভবভূতি শ্রীহর্ষ মাঘ কালিদাস ভারবী প্রভৃতি কবিগণের আদিরসের উন্মাদ ভাবতরঙ্গে জাতীয় জীবন-তরী লক্ষহারা দিক্‌-হারা হইয়া অকূলে ভাসিয়া গিয়াছিল; তখনই কি আর্য্যজাতির প্রকৃত অধঃ-পতনের আরম্ভ হয় নাই? মুসলমানজগতে ফেরদৌসী, নিজামী, আনোয়ারী, সাদী, হাফেজ, রুমী প্রভৃতি কবিগণের শত পাবকশিখার ন্যায় জ্বালাময়ী বীর-রসের কবিতা এবং পবিত্র ঐশীপ্রেম ও নৈতিক-কুসুম-সুরভি-কবিতা-প্রবাহের পরে জামী, খসরু, ফৈজী, বাহারাম প্রভৃতি কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যখন উন্মত্ত প্রেমের প্রমত্ত অভিনয়দ্বারা ধীরে ধীরে সমস্ত জাতিকে সংযমহীন এবং চঞ্চলহৃদয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন হইতেই কি মুসলমানগণের ধর্ম্মগগনের সৌভাগ্যসূর্য্য ঢলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে নাই?

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আজ হয়ত আমার লেখনী পরিচালনায় এবং বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনায় আপনারা অনেকেই আমার প্রতি বিরূপ হইবেন; কিন্তু তাহা হইবার পূর্ব্বে একবার বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার খুঁজিয়া দেখুন যে, উহা প্রায় ভস্মস্তূপে পরিপূর্ণ কিনা? যে দুই একখানি রত্ন, রশ্মি বিস্তার করিতেছে, তাহাও প্রায় ভস্মস্তূপের নীচে পড়িয়া অদৃশ্যপ্রায় হইয়া গিয়াছে! বঙ্গসাহিত্যে ন্যায়, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও জীবনী নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। শিল্প, কৃষি, রসায়ন ও বাণিজ্যবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করা বিড়-ম্বনা মাত্র। শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লবাবু এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, রাসায়-নিক এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ইউরোপ ও আমেরিকা কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে পরি-কীর্ত্তিত হইলেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার কণামাত্রও প্রকাশ হইল না; হায়! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিদেশীয় মহাপুরুষদিগের

জীবন চরিত দূরে থাক্‌---স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগেরও বা কয়খানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে? ফলতঃ বঙ্গভাষায় আগাগোড়া কেবল কামিনী-কোমল উপন্যাসে পুষ্টিলাভ করিতেছে। ইতিহাসের কথা আর কি বলিব? উপকরণ সংগৃহীত থাকা সত্বেও এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় একখানি সম্পূর্ণ বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। হতভাগ্য দেশের এমনি দুর্দ্দশা যে, যদিও বা মাতৃভূমির দুই একটী সুসন্তান ইতিহাস, জীবনী ও গবেষণামূলক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমিকে শক্তিশালিনী ও গৌরবভাগিনী করিতে সদা তৎপর, তথাপি সহানুভূতির অভাবে তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের গ্রন্থ বৎসরে শতখণ্ডও বিক্রীত হয় কিনা সন্দেহ। উপহার দিলেও সহসা কেহ পাঠ করিতে চাহেনা!! আর পাঠ করিতে চাহিবেই বা কেন? উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কেবল নায়িকার মূর্ত্তিদর্শন করা ও মোহজাত বিষাক্তপ্রেমের রসে ভাসমান হওয়াই যাহাদের অভ্যাস, এবং পৈশাচিক প্রেমের বন্যায় যাহারা হাবু ডুবু খাইতেছে, তাহাদের বিজ্ঞান, ন্যায়, নীতি, প্রাণী ও উদ্ভিদতত্বের আলোচনা করিবার শক্তি আছে কি? বনিতার ন্যায় কোমল কবিতা ও গল্পের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তাহারা এমনই বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, তখন আর গভীর বিষয়ের আলোচনার অবসর থাকে না। বঙ্গদেশের অধিকাংশ লেখকই ভুঁইফোড় প্রকৃতির। বিদ্যাবুদ্ধি, স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা এবং প্রতিভা কিছু থাক্‌ বা না থাক্‌---কলম ধরিতে পারিলেই লেখক। পুস্তক ছাপিতে পারিলেই গ্রন্থকার। আমাদের দেশের লোক সকল বিষয়েই অলস---বাবু। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কে অত পরিশ্রম করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন পূর্ব্বক দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ লেখে? কে অত যত্ন করিয়া, গবেষণা করিয়া সহস্র সহস্র ঘটনার আদ্যোপান্ত আলোচনা এবং বিচার করিয়া ইতিহাস ও জীবনী লেখে? কে এমন গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, হেমন্তের শিশির ও শীতের কঠোরতা সহ্য করিয়া পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, কৃষিক্ষেত্র ও গহ্বর আদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অক্লান্ত অশ্রান্তভাবে প্রচুর আলোচনা দ্বারা প্রাণীতত্ব ও উদ্ভিদতত্ব প্রকটন করে? সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপন্যাস লেখা। গাঁজায় দম দিয়া একটী গল্পের স্রোতঃ বহাইয়া দাও। নায়ক নায়িকার রসালাপ, অভিসার ও পলায়ন লইয়া খুব জমকাল বর্ণনা কর এবং সুকুমার সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বদেশীয় ভিন্ন জাতীর প্রতি প্রচুর পরিমাণে গালীবর্ষণ কর,---বিষের স্রোত প্রবাহিত

কর দেশোদ্ধার হইবে। হিন্দু নায়কের জন্য অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমান বাদ্‌সাহজাদীগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির কর—হতভাগা মুসলমানদিগকে তীব্র বিদ্রূপ বাণে মর্ম্মাহত কর, তৎপর নায়ক বা নায়িকাকে সাগরবক্ষে ডুবাইয়া দাও অথবা উদাসী বা উদাসিনীর বেশে সাজাইয়া দাও, খুব মজাদার একখানা উপন্যাস হইয়া গেল। ছাপাইয়া দাও—যথেষ্ট টাকা হইবে এবং সমালোচনার দুন্দুভিনাদে চারিদিক চঞ্চল হইয়া উঠিবে। কেহ বলিবে দ্বিতীয় বঙ্কিম, কেহ বলিবে দ্বিতীয় স্কটের অভ্যুদয় হইয়াছে! আর চাই কি, তোমার জন্ম ও জীবন সফল হইয়া গেল। দেশ অধঃপাতে যাক্—হিন্দু মুসলমানে হিংসানলে প্রজ্জলিত হউক, তাহাতে তোমার কি? তুমি ত রায় বাহাদুর বঙ্কিম। তোমার আর চিন্তা কি? ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জন্ম ও জীবন। পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই হয় ত ইহা পাঠ করিয়া আমার মুণ্ডপাতের কামনা করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উপন্যাস ও কদর্য্য কবিতা ব্যতীত এ জগতে আর কি কিছু লিখিবার পড়িবার নাই?

অনেকে বলিতে পারেন, উপন্যাস পাঠে উপকার আছে। আমি বলি দুই চারিজনের জন্য সে উপকার—সর্ব্বসাধারণের জন্য কদাপি নহে। আরও বিবেচনার বিষয়, উপন্যাস পাঠে যে উপকার, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, জীবনী, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনায় কি তদপেক্ষা বহুল উপকারের আশা নাই? যদি থাকে, তবে শুধু উপন্যাসই লিখিতে এবং পড়িতে হইবে, তাহার কারণ কি? উপন্যাস পাঠে দুই দশজনের উপকার হইলেও হইতে পারে—কিন্তু আর শত সহস্র ব্যক্তির ঘোরতর অপকার ব্যতীত কদাপি উপকারের আশা করা যায় কি? কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে কাহারও উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইয়াছে? আর বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার এক্ষণে যেরূপ উপন্যাসে পূর্ণ হইতেছে তাহা কি নিতান্তই জঘন্য এবং কদর্য্য নহে?

ক্রমশঃ।

সন্ধ্যায়।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

নবীন বসন্ত। গাছে গাছে নূতন পত্রাবলি, নব কিশলয়। ফুলের সুবাসে বসুন্ধরার কঠোর কঠিন বুকেও একটু সুখের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, নির্ম্মল স্নিগ্ধ সান্ধ্যবায়ু রহিয়া রহিয়া বহিতেছে। দূরে, অতিদূরে গ্রামের ধূসর ছায়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়াছে। নিকটেই আমগাছে বসিয়া একটা কোকিল বড় মধুর ডাকিতেছে।

এমনি সময়ে আমরা কয়েকটী বন্ধুতে বসিয়া কথার উৎস খুলিয়া দিয়াছিলাম। সকলেরই নবীন বয়স—উৎসাহে উদ্যমে, প্রেম-ভালবাসায় হৃদয় পূর্ণ। কেহ বা পরিণিত, কেহ বা সংসারধর্ম্মকে এখনও ততটা খেয়ালের মধ্যে আনিতে পারে নাই। পরিণিত যাহারা, তাহারা সকলেই নিজ নিজ বিবাহিত জীবনের সুখময় কাহিনীর পরিচয় প্রদানে ব্যতিব্যস্ত। আমি কিছু বেশী করিয়া নিজের বাহাদুরী নিতেছিলাম।

কেবল নগেন একটু দূরে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। আমরা তখন নিজ নিজ গৃহিণীর সুনীল নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষের বর্ণনায় ও ব্যাখ্যায় এতই তন্ময় যে সে বেচারার দিকে আর চাহিবারও অবসর ঘটে নাই। সে তখন তাহার নিজের মন লইয়া কি জানি কোন্ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল।

সকল বিষয়েরই একটা জোয়ার ভাটা আছে। সকলেরই বাক্যের ভাণ্ডার কিছু খালি হইয়া আসিল। নগেন তখনও সেই ভাবেই রহিয়াছে। সহজেই সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল।

সুরেন কিছু খোলা। সে বলিল, কি ভাই নগেন, এমন করে বসে বসে এক-মনে কি ভাবছ? তুমি বুঝি এতক্ষণ দার্শনিক ভাবেই বিভোর ছিলে! কি তোমার এমন মনের কষ্ট যে এতগুলি বন্ধুর উদ্দাম আমোদের স্রোতও মুহূর্ত্তের জন্য তোমার প্রাণে একটা ক্ষণিক আনন্দের বিকাশ করতেও অক্ষম হল।"

নগেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই মরুময় জীবনের সহস্র কষ্ট নিয়াই তোমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম। আশা ছিল, বুঝিবা তাহা তোমা-

দের স্নেহের স্পর্শে লাঘব হবে। যেমন আমার অদৃষ্ট! আজ যেন তা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। তাই এ প্রাণের জ্বালা আর নিবিল না—নিবিবে না। 'কালের ভেষজে' হৃদয়ের গভীর ক্ষত আর শুকাইল না!"

তাহার কাহিনী শুনিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র হইলাম। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। নীড়-উদ্দেশে পাখীগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়া চলিয়াছিল। চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশের এককোণে দাঁড়াইয়া একটু আলো বিতরণ করিতেছিল। সমস্ত বিশ্বে যেন কি আলস্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"সে প্রায় আজ ছয় বছরের কথা। তখন সবে মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি। সংসার তখন চিনিতাম না—চিনিবার অবসরও ছিলনা। ভাবিতাম বুঝি এ জীবন কেবল প্রেম ও ভালবাসারই জন্য। কলেজের শিক্ষা আমার প্রাণে সে ভাব আরও বেশী করিয়া জাগাইয়া দিয়াছিল। কাব্য ও কবিতায় তখন সমস্ত মনটাকে নিবিষ্ট করিয়াও যেন কিসের অভাব অনুভব করিতাম। ঘটনার স্রোতে পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম তাহা 'প্রেম'। আজ তোমাদিগকে আমার সেই প্রেমের কাহিনীই বলিব।

তখন আশ্বিন মাস। নূতন ডিগ্রিপ্রাপ্ত যুবক আমি—আমার মনে কত উৎসাহ। এলাহাবাদ হইতে জ্যেঠা মহাশয় বাবাকে পত্র লিখিলেন—"নগেনকে এখানে পাঠাইয়া দিও। দেশভ্রমণ না করিলে অভিজ্ঞতা জন্মে না।" তাহাই হইল। আমি এলাহাবাদ রওয়ানা হইলাম। যেদিন সেখানে পঁহুছিলাম, সে দিন আমার জ্যেঠতাত ভাইবোনগুলির কি আনন্দ! দাদা এসেছেন বলে তারা আজ সকলেই ছুটাছুটিতে ব্যস্ত। তাদের শত খুটিনাটি জিনিস দেখিতেই আমার প্রথম দিন কেটে গেল। পরদিন এলাহাবাদের কয়েকটা দ্রষ্টব্যস্থান দেখিলাম। এলাহাবাদ কি মনোরম স্থান। হিমালয়দুহিতা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে কত যে কবিত্ব উছলিয়া উঠিয়াছিল, তা আর আজ তোমাদিগকে কি বলিব। কয়েক দিন খুব আমোদেই কেটে গেল। প্রথম প্রথম নূতন লোক ব'লে বাঙ্গালী বাবুরা আমাকে দেখিতে আসিতেন। আমিও সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। এইরূপে তথাকার একটী বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আমার খুব মেশামেশি হইল।

প্রবাসী বাঙ্গালী তাহার স্বদেশীয়ের প্রতি যে মমতা দেখায়, দেশে আসিয়া যদি সে তাই করিতে পারিত, তবে বুঝি এই বাঙ্গালীজাতি আর বহুদিন

অধম থাকিত না। প্রবাসী বাঙ্গালীর সে একতা দেখিলে কাহার না প্রাণ মুগ্ধ হয়—আশায় কে না উৎফুল্ল হয়?

রমণী বাবু এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। তাঁহার পুত্র হেম তখন বি, এ, পড়িতেছিল। তাহারই সঙ্গে আমার বিশেষ ভাব হইল। হেমের ছোট একটী বোন আর একটী ভাই ছিল। সরযূ তখন সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা, আর নরেশ তখনও শিশু।

প্রথম প্রথম সরযূ আমাকে দেখিলে ছুটিয়া পলাইত। কখনও বা কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিত। ক্রমে ক্রমে আমি যখন সেই পরিবারে খুব পরিচিত হইয়া পড়িলাম, তখন আর সে ভাব রহিল না। সরযূ তখন বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা পড়িতেছিল। সে মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে তাহার পড়ার দু এক স্থান বুঝাইয়া দিতে বলিত। তাহাকে পড়াইয়া আমি যে কত সুখী হইতাম সে সুখের কল্পনাও এখন করিতে পারি না। জানই ত কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলে চিন্তার স্রোত যেন দ্বিগুণ প্রবাহিত হয়—আকাশ পাতাল কত কিছু কল্পনার মৃদুকরতাড়নায় অন্তরের পুরোভাগে শরীরি হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে। আমি ভাবিতাম, হায়, এই সরলা বালিকা কি আমার হইবে? এই অনাগত যৌবন-মাধুরীই যাহাকে এত কমনীয় করিয়াছে, সে যে যৌবনের পদস্পর্শে কোন্ এক কোমল মহিমাময়ী দেবীমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে, সারাদিন কেবল তাহাই ভাবিতাম আর আকুল হইতাম।

এইরূপে শূন্যহৃদয় কি জানি কেমনে সরযূর বালিকামূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

৩

দুঃর্ভিক্ষপীড়িতের ক্ষুধার ন্যায় প্রেমের ক্ষুধায় তখন আমার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সকাল-সন্ধ্যায় একবার সরযূকে না দেখিলে আর আমি বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিতাম না। কি জানি কোন্ আকুল আহ্বানে আমার লুব্ধ, তৃষিত হৃদয় পুলকে নাচিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে সরযূর সঙ্গে কথা হইত। সে বালিকা, সে প্রেমের কি জানে? তবু সে আমার কাছে থাকিতে ভালবাসিত। আমি তাহাতেই আমার জীবন সার্থক মনে করিতাম। সে আমাকে কত কিছু জিজ্ঞাসা করিত। বঙ্গদেশ,—তাও কি এদেশেরই মত। সে দেশেও কি সহরে সহরে এমনি জনকোলাহল। সে দেশের বাহ্য সৌন্দর্য্য কি এ দেশেরই ন্যায়। আমি তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতাম। তার মা বলেছেন বঙ্গদেশের বিবাহে নাকি এ দেশের চেয়ে

বেশী উৎসব হয়। সত্যি নাকি তাই ? বঙ্গদেশের মেয়েরা কি এ দেশের মেয়েদেরই মত কাপড় পরে ? এইরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্নে সে আমার হৃদয়ের মাঝে একটা উদ্বেগ বাসনার স্রোত জাগাইয়া দিত।

নূতন বসন্তের প্রভাতের মত মৃদু পদসঞ্চারে প্রেম সেই বালিকার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে তাহা প্রেম কি অন্য কিছু বুঝিবার অবসর পায় নাই।

এমন সময়ে বাড়ী হইতে বাবা পত্র লিখিলেন মা কিছু পীড়িত। একদিকে প্রেমের টান, অন্যদিকে কর্ত্তব্যের আকর্ষণ। প্রেম তখন নেপথ্যে ছিল, তাই কর্ত্তব্যেরই জয় হইল। আমি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। বলিতে হইবে কি আসিবার কালে সরযুর ছল ছল নয়ন দুটী আমাকে আত্মহারা করিয়াছিল।

৪

আবার জনকোলাহলপূর্ণ প্রাসাদনগরী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পশ্চিম হইতে আসিতেছি বলিয়া অনেকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদিগকে সব বলিলাম, কিন্তু পশ্চিমপ্রবাসিনী একটী বাঙ্গালীমেয়ের হাতে যে আমার প্রাণটী সঁপিয়া দিয়া আসিয়াছি, সে কথা আর বলিলাম না।

মা তত পীড়িত হইয়াছিলেন না। পরমেশ্বরের কৃপায় একটু যত্ন ও সুচিকিৎসায়ই তিনি সারিয়া উঠিলেন। অল্পে অল্পে তিনি স্বীয় স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। স্নেহময়ী জননীর করস্পর্শে আমাদের গৃহের সকলেরই যেন আবার শ্রী ফিরিল। এইরূপে আরও তিন চারিটী মাস কাটিয়া গেল।

হেম রীতিমত আমাকে চিঠি লিখিত। মাঝে মাঝে সে সব চিঠির প্রান্তভাগে সরযুর দু একটী কথাও থাকিত। আমি সেই চিঠিগুলি বুকে করিয়া দিবস যামিনী কত সুখস্বপ্ন দেখিতাম।

একদিন শীতল বাতাস কিছু বেশী জোরে বহিতেছিল, সেদিন আর বাহিরে যাওয়া হয় নাই। ঘরে বসিয়া বসিয়া সরযুর সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির কথা ভাবিতেছিলাম আর রহিয়া রহিয়া তাহার সেই বিদায়ের দিনের সজল নয়ন দুটী মনে পড়িতেছিল। মানুষ যখন প্রণয়ের পাগল হয়, তখন সংসার তাহাকে শত বাহুবেষ্টন করিয়াও বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। আমি সেই নিরালা গৃহে বসিয়া প্রেমের স্বপ্নে সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইতেছিলাম। এমন সময়ে পোষ্টম্যান আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানা হেমের হস্তাক্ষর যুক্ত কিন্তু বাবার নামে লিখিত। চিঠিতে কি লেখা আছে তাহা

জানিবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হইল। কি করিব, খুলিতেও পারিনা। অবশেষে বাবার নিকট পাঠাইয়া দিলাম এবং বামা দাসীকে বলিয়া দিলাম সে যেন পত্রের সংবাদটা আমাকে জানায়।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই বামা হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। "কি গো দাদা বাবু! পশ্চিম থেকে নাকি তুমি কোন্ সুন্দরীর মন চুরি করে নিয়ে এসেছ, তাই এক গ্রেপ্তারি পরওয়ানা হাজির! তোমরা কত না জান!" আমি একটু ভান করিয়া বলিলাম, "তুই বলিস কি? এ বয়সে আবার কারো জন্য পাগ্‌লী সাজ্‌লি নাকি?" সে বলিল, "তা টুকটুকে বউটী এলে সব টের পাবে। আর জিজ্ঞেস্ করব সে কেমন করে দাদা বাবুর মনটা দখল করে বসেছিল। ওগো, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়! রমণী বাবু তাঁর মেয়ে সরযুর সহিত তোমার বের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। মা ত শুনেই খুসিতে আটখানা! বাবাও কতকটা রাজি হয়েছেন। মা নাকি সে মেয়েকে একবার দেখেছেন। এত বড় একটা সুসংবাদ তোমায় দিলুম, এখন কি বখসিস্ দিবে দাও।" আমি বলিলাম, "বখসিস্ আর আমি কি দিব? তুই সে দিনের অপেক্ষায় আশার ঘর বাঁধিয়া রাখ্। তোর ও ছোট্ট আঁচলখানিতে সে দিনকার বখসিস্ ধরবেও না।" সে এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল—যেন আসে পাশের বাড়ীতে এই সুসংবাদটী পঁহুছাইবার জন্য তাহার চঞ্চল চরণ দুটী তখন অতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল।

আরও দু একজন আত্মীয়ের সঙ্গে বুঝিয়া বাবা রমণী বাবুকে সম্মতিসূচক পত্র লিখিলেন এবং যাহাতে এই ফাল্গুনেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহাও লিখিয়া পাঠাইলেন।

৫

দীর্ঘ বিরহের পর মিলন অতি সুখের। কিন্তু সেই সুখের দিনে আনন্দে হৃদয় এমনি আত্মহারা হয় যে দুইটী কথা বলিবারও তখন অবসর থাকে না। প্রিয়জনকে বুকে রাখিতেই যেন সমস্ত বাক্যের স্রোতে কোন অজানা শক্তির প্রভাবে রুদ্ধ হইয়া যায়। দর্শনের পূর্ব্বে কল্পনার সাহায্যে মনে কত ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে কিন্তু যখন প্রণয়ীযুগল একত্র হয় তখন সে সব কোথায় ভাসিয়া যায়! প্রেমের নিকটে কল্পনা যেন হারি মানে!

ফাল্গুনের মাঝা মাঝি আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। কাব্যগত নায়ক নায়িকার মত যদিও আমরা মিলনের সুখস্পর্শে একান্ত বিভোর হইয়াছিলাম

না, তথাপিও একথা বলিতে পারি যে উভয়েই উভয়কে আপনার করিয়া হৃদয়ে অপরিমেয় সুখানুভব করিয়াছিলাম। সরযূর বালিকাহৃদয়ে প্রথম প্রেমের উন্মেষে যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল, আজ সেই ছবির মানুষটীকে আপনার বলিতে পারিয়া সে যে মনে মনে কত কি সুখের ঘর বাঁধিয়াছিল আজ আবার কি তোমাদিগকে তা বলিয়া দিতে হইবে?

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। সে আপন মনে আপন পথে ছুটিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে আমাদের বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরযূ এরি মধ্যে তিন চারিবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে। পিত্রালয়ে যাইতে তাহারা যেন হাতে স্বর্গ পায়! এই এক বৎসরে সে আমাকে তাহার অতি আপনার করিয়া লইয়াছে। আমরা পুরুষ মানুষ, মেয়েদের হাতে পড়িলে অনেক সময়ই ভেড়া সাজিয়া থাকি। সরযূ আমাকে ভেড়া বানাইয়াছিল না, কিন্তু পোষা টিয়া পাখীর চেয়েও আমি তাহার নিকট বেশী পোষ মানিয়াছিলাম— সিকল কাটিবার মোটেই আশঙ্কা ছিল না।

পশ্চিমের গ্রীষ্মের কথা অনেকের মুখে তোমরা শুনিয়াছ। বাতাস গুলি যেন অনল মাখিয়া বহিতে থাকে। ধূলিচ্ছন্ন, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে সেখানে পথ চলা আর কণ্ঠরোধ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করা একই কথা। গৃহেও তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে! আর সে সময় যাদের জর হয় তারা যেন মৃত্যুরও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে।

জ্যৈষ্ঠের মাঝা মাঝি শ্বশুর মহাশয় টেলিগ্রাম করিলেন, "শীঘ্র চলে এস। কালবিলম্ব ক'র না, ভাবি বিপদ!" বিপদ কি তা বুঝিতে পারিলাম না। কত কি অমঙ্গলের কল্পনা করিলাম। তবে কি সরযূর কোন অশুভ হয়েছে? সত্যিই যদি তাই হয়, তবে আমি কেমন করে প্রাণ ধরব?

বাবার নিকট হইতে বিদায় লইয়া এলাহাবাদে রওয়ানা হইলাম। সেখানে পঁহুছিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সরযূর বড় ভয়ানক জর! আজ দশদিন থেকে জর মোটেই ত্যাগ হচ্ছে না। সেই কমনীয় কনক-কান্তি কালীমাময় হইয়াছে, সেই সবল-সুঠাম দেহখানি বৃক্ষচ্যুত লতার মত শয্যায় এলাইয়া পড়িয়াছে! সে আমাকে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিল, তারপর মুখখানি আর এক দিকে সরাইল। দেখিলাম দুই বিন্দু অশ্রু তার গণ্ড বহিয়া উপাধানে পড়িল।

সেই দিন বৈকালে সকলে বাহিরে গেলে, একটু নিরিবিলি পাইয়া সে আমার দিকে সরিয়া আসিল। আমি তাহার পার্শ্বেই বসিয়াছিলাম। তারপর আমার হাত ধরিল, যেন তাহার কিছু বলিবার আছে। আমি বলিলাম, "কি সরযূ অসুখ কি বেশী বোধ হয়?" সে বলিল, "আর অসুখ! আমার শরীরের সমস্ত বল যেন কে হ'রে নিয়েছে। তোমরা যা বল, আমি আর বাঁচিব না। বড় জোর আর দুএক দিনই যদি বাঁচি! তোমাকে দেখিব বলেই আমার প্রাণ এখনো বেরোয় নাই। তুমি বালকের মত কাঁদিও না। আমি কেবল সুখের রাজ্যে পা দিয়াই চলিয়া যাইতেছি, দুঃখ আমার বেশী, না তোমার? তুমি আমার কথা কয়টা শোন। যে দিন তোমাকে প্রথম দেখি, সেই দিন হইতেই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম। অনেকের ভাগ্যে যাহা ঘটেনা, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। আমার ভালবাসা নিরর্থক হয় নাই। আমি তোমাকে পাইয়াছি। বুঝি মনের একাগ্রতা থাকিলে কখনও কাহার ভালবাসা ব্যর্থ হয় না। কিন্তু ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে পৃথিবীর সুখ বেশী লিখেন নাই, তাই আজ তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়াছি, তোমার এই নবীন বয়স, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তুমি এসব মাটি করিও না। আবার বিবাহ করিও, আবার সুখের ঘর বাঁধিও। দুদিনে সব ভুলিয়া যাইবে, তবে আমার শিরে তোমার পদধূলি দিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, জীবনের পরপারে মরণের রাজ্যে আবার যেন তোমার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে যেন তোমাকে দাসী ভাবে সেবা করিয়া এ জীবনের সব সাধ মিটাইতে পারি।" সরযূ আর বলিতে পারিল না, উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। আমি নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম। গৃহেও তখন লোক প্রবেশ করিয়াছিল।

সরযূ ঠিকই বলিয়াছিল। পরদিন শেষ বেলায় তাহার কমলনয়ন দুটী চিরজীবনের জন্য মুদিয়া আসিল। সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর আমি?—

দিনের পর দিন যাইতেছে, কিন্তু কই সরযূর কথা ঠিক হইল কই? তাহাকে ভুলিতে পারিলাম কই? কি পাপে যে আমি তাহাকে হারাইলাম, তা'ত আজও বুঝিতে পারি নাই। সেই শ্মশানের স্মৃতি যে আমাকে পাগল করিয়াছে! হায় অতীত!"

নগেনের কথা যখন শেষ হইল তখন চন্দ্র অস্ত গিয়াছিল। নৈশ অন্ধকার সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আকাশের কোলে তারাগুলি মিটি মিটি

করিয়া জ্বলিতেছিল—পৃথিবীতে গাছে গাছে, ঝোপের পাশে খদ্যোতকুল তাহার ক্ষীণ অনুকরণ করিতেছিল। দিনের কোলাহল তখন শান্তির মাঝে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সহানুভূতির চিহ্ন স্বরূপ সকলেই উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু কাহারই মুখে কথা ফুটিল না। হায়, বিপত্নিক জীবন কি সান্ত্বনাই

শিবজী বা সাজাদী রোশিনা

(সমালো

আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া ছকত
হিন্দুগণ আমাদিগের হিন্দুবি
তাঁহারা প্রতিপদে কিরূপ
আপন প্রতিবেশীর হৃদয়ে
বিচারবিহীন অতিরঞ্জি
গল্প সমূহ ইতিহাস
কুশল সাহিত্যজগ
সম্বন্ধে আবার জা
সাহিত্যজগতে অ
একতাসূত্রে আবদ্ধ
পশ্চাদস্থ মুসলমান
করেন, তাঁহাদিগের
তাহা একবার ভাবি
খুঁজিয়া পান না

এ কথার
সমালো[illegible]
"[illegible]
পি, এ,

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তদীয় পূর্বগামীগণ কতকগুলি ইতিহাস নামধেয় গালগল্প-লিখিত সম্রাটকুমারীগণের চরিত্রকলঙ্কপূর্ণ শ্রাদ্ধভোজ যোড়শোপচারে সুসম্পন্ন করিয়া যাওয়ায় তাঁহার শ্রম নিষ্ফল হইয়া গেল, তেমন মুখরোচক শিকার মিলিল না। নিরুপায় গ্রন্থকার তখন সম্রাট-ভগিনী রওশন আরাকে অন্ধকারে আলোক স্বরূপ হাতে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন, যথাসম্ভব ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাকেই সম্রাট-কন্যা করিয়া লইলেন; মনের সাধ মিটাইয়া ধন্য হইলেন। আমরা তাঁহাকে congratulate করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

পাঠকবর্গ বুঝিয়া দেখুন, ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্বন্ধের উপরে দিনে ডাকাতী করিয়া গ্রন্থকার কিরূপ অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

নাটকখানিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব আদর্শ পিশাচের চিত্রে চিত্রিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্ত গ্রন্থখানি নকল করিতে হয়। "দন্ত যদি মনোভাব অবগত হয়, একে একে উৎপাটিত করিব তাহায়"—এই জঘন্য রুচি বিগর্হিত পৈশাচিক উক্তি সম্রাটের মুখ হইতে নির্গত করা হইয়াছে (৪৮ পৃঃ)। কিন্তু থাক্, আওরঙ্গজেবের চরিত্রচিত্রণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

"আমখাস" দরবার (১০৭পৃঃ) এই nonsense বাক্যটীর মর্ম্ম আমাদিগের বোধগম্য হইল না। "আম" অর্থাৎ public, "খাস" অর্থাৎ private, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে কি প্রকার অভিনব দরবারের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার একটী চিত্র প্রদান করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবেন কি?

"পীর পেগম্বর সদা রক্ষুন তাঁহায়" (১৩১ পৃঃ), বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী শাপবশে রওশন আরা রূপে আওরঙ্গজেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াই (১৭১ পৃঃ) কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। যে রওশন আরা কবিবিকৃতমস্তিষ্কা জেবের-ভগিনী নহেন, কবির মস্তিষ্কবাসিনী আওরঙ্গজেব-কন্যা শাপভ্রষ্ট অপ্সরী—এদিকে তিনি পৌত্তলিকদিগের ন্যায় নশ্বর মানবদেহী পীর পেগম্বরে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে যাইবেন কেন?

মুসলমানগণের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বোধ কতদূর তাহা পাঠকবর্গ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নাই। অথচ ইনি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নাটক লিখিবার

স্পর্দ্ধা রাখেন! সেই নাটক আবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া দর্শকবৃন্দের নগদ ॥০ আনা ব্যয় সার্থক করিয়া ধন্যবাদার্হ হয়! আমাদিগেরই সমসুখ-দুঃখভাগী হিন্দুগণ আজ ঘরের পয়সা খরচ করিয়া সানন্দে প্রতিবেশীঘৃণাবিদ্বেষ ক্রয় করিতেছেন, এবং ঘরে ফিরিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি-জাগরণোত্তপ্ত-মস্তিষ্কে অর্দ্ধনিদ্রাবস্থায় থিয়েটারের অভিনেত্রী বারবনিতা কুলের হাবভাবলীলাতরঙ্গাভিঘাতাবেশস্বপ্ন-সুখের ক্ষণিক বিরাম কালে এক একবার হিন্দু-মুসলমানমিলনসম্ভাবালোকোদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ United Indiaর শব্দবহুল অন্তঃসারশূন্য নানাবিধ কল্পনা করিয়া লইতেছেন।

মুসলমানগাত্রবিনির্গত রসুনের ও গরম মসলার তীব্রগন্ধে বেচারা সদা-সুখের ব্রাহ্মণত্ব অন্তর্হিত হইয়াছিল, তজ্জন্য আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হইলাম। (১৩৯, ১৪০ পৃঃ)। কিন্তু সেই রসুন ও গরম মসলার তীব্ররসাস্বাদে উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হইয়া সদাসুখের পশ্চাদ্বর্ত্তীগণ যে মুসলমানের উপর শ্লেষ নিক্ষেপ করিতে এতখানি সুখবোধ করেন, তজ্জন্য আমরা আরো একটু বেশী দুঃখিত। সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, নাটককার আধুনিক কোন বিখ্যাত কবির কাব্যগ্রন্থের উপর দুই একটা ঠোক মারিয়া কিছু কিছু কবিত্ব আহরণ করিয়াছেন, যথা—"রাজশ্রী দুয়ারে বসি কাঁদে সকাতরে" [হাহাকার রবে], (৪১ পৃঃ),"হায় নারি কি কঠিন হৃদয় তোমার" (১৫২ পৃঃ), ইত্যাদি।

স্বর্ণধাতুপথপ্রবাহিত সমুজ্জ্বল তড়িতালোকের ন্যায় গুরুউপদেশবাণী মস্তিষ্কমধ্যে বৈদ্যুতিক কার্য্য সাধন করিবার কথা শিবজীর মুখে শ্রবণ করিয়া (১৯ পৃঃ) জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এ শিবজী কি সেই ইতিহাসপ্রথিত নিরক্ষর শিবজী, না প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে "বি এস্, সি" উপাধিভূষিত এক নূতন শিবজী, আধুনিক অসাধ্যসাধনকুশল কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবলে ভারতেতিহাসের সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] "পার্ব্বত্য মূষিকের" স্থান অধিকার করিয়াছেন? ইতিহাসের মধ্যে ক্ষেপ করা এত সহজ, "হায়, তাহা কে আগে জানিত!"

কথা, নাগরা নারীর

এক্ষণে "সাজাদী রোশিনারার" প্রেমের কথা। ঢাকার দুর্গ মধ্যস্থ প্রবেশলাভ করিয়া শিবজী সাহজাদীর মন-প্রাণ হরণ করিলেন। তা[illegible] অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমান-সম্রাট-তনয়া যে এত লঘ্বী, ইহা আমাদের জা[illegible] না। যাহা হউক, নাটককারের এ মহদাবিষ্কার যে আমাদিগে[illegible]ছেন,

উত্থান-পতন।

(মুসদ্দসে হালীর অনুবাদ।)

২

মিশরের আলো তথা হয়নি স্ফুরিত,
গ্রীসের জ্ঞানের জ্যোতি ছিল লুক্কায়িত।
বিষ্ণুর পবিত্র নাম না লইত মুখে,
বিশ্বাস করিত সবে তিনটী খোদাতে।
সর্ব্বস্থানে মূর্ত্তিপূজা ছিল প্রচলিত
অনায়াসে পাদ্রিফাঁদে সকলে পড়িত।
মায়াবী দেখাত যাহা আশ্চর্য্যদর্শন,
সত্যাবলি অনেকে তা' করিত গ্রহণ।
ঈশ্বরের যেই গৃহ সকলের আগে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরব ভূভাগে,
ইব্রাহিম খলিলুল্লা যত্ন করিয়া
নিজ হাতে যেই গৃহ ছিলেন রচিয়া,
অনাদি অনন্তকাল হতে দয়াময়
ইচ্ছিলেন প্রবাহিতে যে পবিত্র গৃহ হতে
জ্ঞানের একটী উৎস চির শান্তিময়।
তথা, প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত নাহি ছিল কেহ,
মূর্ত্তিপূজকের তীর্থ ছিল সেই গেহ।
ঘরে ঘরে ভিন্ন ভিন্ন মূরতি পূজিত,
"হবল, নায়েলা," নাম কত কি রাখিত।
এইরূপে প্রতি গৃহে নূতন ঈশ্বর
নূতন ভ্রান্তির রথে নূতন পাপের পথে
চালাইত জ্ঞানহীন মূর্খে নিরন্তর।
অন্ধকার মেঘে সূর্য্য ছিল আচ্ছাদিত,
'ফারাণ' গিরির চূড়া ছিল লুক্কায়িত। *

মানবের ব্যবহার ছিলনা তথায়,
পশুভাব পশুগণে শোভে হয় তায়;
দস্যুতা কি প্রবঞ্চনা কিম্বা কুআচার
সর্ব্বজনে পূর্ণ মাত্রা ছিল অধিকার;
মারামারি লুটপাট প্রচণ্ড আহবে—
হিংস্রক তস্কর তুল্য দক্ষ ছিল সবে।
সামাজিক কোন রূপ বিধি কি বিধানে
বদ্ধ নাহি ছিল সবে অশিক্ষার স্থানে।

বিবাদেতে ছিল তারা পৃথিবী বিখ্যাত,
অশান্তির স্রোত তথা বহিত নিয়ত;
অকারণে সদা মার কথায় কথায়,
প্রবল বিবাদ-বহ্নি জ্বলিত সদায়;
কিছুতেই নিভ কিনা কেহ না ভাবিত,
বুঝাইলে কোন মতে কেহ না বুঝিত।
বিবাহিতে ছলনায়, আনন্দ-উৎসবে
শত শত পরিবার যোগ দিত তাতে;
সুখের স্ফুলিঙ্গ মাঝে উঠিয়া সহজে
দেশব্যাপী হুতাশন জ্বালাত সতেজে।

কিবা যুদ্ধ বাধাইল 'তগলব'গণ
বকরের সনে যাহা অতীব ভীষণ;
পঞ্চাশ বৎসর কাল যাহার কারণ
বহুশত পরিবারে হ'ল মহারণ।
দেশময় যেই বহ্নি বিস্তারিয়া তেজে
সহস্র সহস্র প্রাণ গ্রাসিল সহজে।
"হবরে ওয়াদেন" নামে আর এক রণ,
যাহার বর্ণনা গাথা শুনিতে ভীষণ;
বেগবতী রক্তস্রোত যাহার কারণে
বহিল অনেক কাল দেশে সর্ব্বস্থানে। †

---

* 'ফারাণ' মক্কা শরিফের পর্ব্বত বিশেষ। মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) জন্মাদি বর্ণনা করিয়া বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে এই 'ফারাণ' পর্ব্বত হইতে বিশ্বব্যাপি ধর্ম্মজ্যোতি প্রবাহিত হইবে। কবি বলিতেছেন, এই ফারাণের চূড়া অন্ধকারে আবৃত ছিল, অর্থাৎ তখন মোহাম্মদ সম্ভূত জ্যোতি প্রকাশিত হয় নাই। অঃ।

† বকর ও তগ্‌লব পরিবারের যুদ্ধ আরব-দেশে বিখ্যাত। একটী উষ্ট্র কোন স্ত্রীলোকের শস্য নষ্ট করিয়াছিল। রমণী উষ্ট্রস্বামীর প্রতি কটূক্তি করায় বলো অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী মহাসমরের

তক্ত বলি গণ্য হ'ল সুনাম অর্জিয়া
কায়মন বিকাইল ধর্ম্মের লাগিয়া।
ব্যর্থ হ'ল বিভু-ভক্তি ব্যর্থ হ'ল খ্যাতি
বিশ্ব-পরিচিত হ'ল মহামূর্খ জাতি।

এহেন দৌভাগ্য-শশী অভ্যুদয়কালে
মহানাত্মা মোহাম্মদ স্বজাতী সকলে
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন সফার * পর্ব্বতে
সকলে উঠায়ে নিয়ে উঠিলা শৃঙ্গেতে
কহিলেন সর্ব্বজনে সুগম্ভীর স্বরে,
জলদ গরজে যথা শারদ অম্বরে ;
"শুনহে আত্মীয়বৃন্দ স্নেহপাত্রগণ,
নিবিষ্ট মনেতে শুন আমার বচন ;
এতদিন তোমা সবে দেখিতেছ মোরে,
এই যে রয়েছি আমি সবার গোচরে ;
আমারে তোমরা সবে জানহ কেমন,—
সত্য-বাদী সাধু কিম্বা মিথ্যুক কুজন ?"
উত্তরিল সবে তবে প্রফুল্ল আননে
"অদ্যাবধি মিথ্যা কভু তোমার বদনে
কোন জনে শুনে নাই, কিম্বা কু-আচার
তিলেক তরেও কভু দেখিনা তোমার।"
এ হেন উত্তরে তিনি কহিলেন তবে,
"আমারে এরূপ যদি ভাব তোমা সবে ;
সত্যই প্রত্যয় যদি আমার কথায়,
বলি যদি পৃষ্ঠদেশে গিরির গুহায়,
রয়েছে শত্রুর দল্য সশস্ত্র সজ্জিত
উৎসাহে উন্মত্ত সবে বর্ম্ম আচ্ছাদিত।
তবে কি আমার কথা করিবে বিশ্বাস,
অকপটে কহ সবে মদীয় সকাশ।"
এতেক শুনিয়া সবে কহিল তখন,
"শুনহে প্রবীণ জ্ঞানী নিরীহ সুজন ;
অদ্যাবধি তব মুখে কভু মিথ্যা ভাষ
শুনি নাই তবে কেন হ'বে অবিশ্বাস।
অবশ্য মানিব সত্য তোমার বচনে
সদা তুমি সত্যভাষী জানি মোরা মনে।"
তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলিলেন তিনি,—
বাজিল শ্রবণে যেন মেঘমন্দ্র ধ্বনি,
"শুন সবে হিতবাক্য জ্ঞান-তত্ত্ব-সার,—
সুনিশ্চয় অন্ত হ'বে জীবন অসার ;
যে দিন আসিবে পরে শমনের [illegible]
সে দিনে উত্তীর্ণ হ'তে যত্ন কর আজি।"
শ্রীমুখে শুনিয়া হেন জীবন্ত বচন
সর্ব্বজন অঙ্গে হ'ল লোমহর্ষণ ;
স্তম্ভিত হইল মনে সবে আচম্বিতে—
অচিরে—অভূতপূর্ব্ব মহান্ আলোকে।
ঈশ প্রিয় হ'তে সবে কৈল আকিঞ্চন
নূতন মাধ্যাকে তারা বিকাইল মন।
মূর্খতা-কাননে যেন ধর্ম্মের অনল
বিস্তারিল নিজ শক্তি হইয়া প্রবল ;
প্রবাহিল এই ভাব সমগ্র আরবে,
বর্ব্বরতা ভস্ম হ'ল যাহার প্রভাবে,
সকলে সবল হ'ল বিভুর নিকটে
গিরি, মঠ, মাঠ কিম্বা জন বাসস্থান
মুখরিত হ'ল গাহি একেশ্বর-গান ;
কোরাণোক্তি শুনি সবে শুদ্ধ কৈল মন—
সন্ন্যাসী হইল পাপী পুণ্যের কারণ।
মোহাচ্ছন্ন জনে হ'ল বৈরাগ্য সঞ্চার
পালিল কুকর্ম্মী যত পবিত্র আচার ;
পাপ-নিদ্রা অভিভূত ছিল যত জন
সকলে জাগিল শুনি ধর্ম্মের বচন ;
যে তত্ত্ব আছিল গুপ্ত বহুকাল হ'তে
সর্ব্বত্র ব্যাপিত হ'ল নবীর কৃপাতে।
প্রভু হ'তে দূরে যারা লুকাইয়ে ছিল—
একবারে তাহাদিগে সম্মুখে দাঁড়াল।
অজ্ঞ ছিল সবে যারা স্বামীর আচারে,
তাহাদিগে উদ্ধারিল শেষ পয়গম্বরে।

অনন্তর মহানবী ধর্ম্ম প্রচারিতে
স্থজিলেন মহাবল আরব ভূমেতে ;

* সফা ও মরওয়া এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমীতে মক্কাযাত্রী হাজীগণকে সাতবার অনাবৃত দেহে ছুটা ছুটী করিতে হয়। কারণ পুরাকালে হজরত এসমাইলের (আঃ) মাতা হাজেরা বিবী শিশু সন্তানসহ নির্ব্বাসনে পতিতা হইলে এইস্থানে পুত্রকে রাখিয়া বারি অন্বেষণার্থ পিপাসায় ছায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে ছিলেন। শেষে হতাশ হৃদয়ে পুত্রকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন, শিশুর পদতল হইতে স্নিগ্ধ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে। এই উৎসই 'জমজম' নামে খ্যাত। এবং সেই শিশু হজরত এসমাইল নামে পয়গম্বর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যগণ প্রভুআজ্ঞা বহনার্থ রৌদ্রে গমনাগমন কালীন কিরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে এই স্থলে মক্কাযাত্রী ধনীগণ তাহার আস্বাদ পাইয়া থাকেন।

নিজের অক্ষমতা ভাবি কেহ পিছু নয়।
কিন্তু অনন্তের কাছে কারো কি ক্ষমতা থাকে,
তা ভাবিয়া কেহই ত বিরত না হয়।
জ্ঞানী গুণী বলি যারা বিখ্যাত এ ভবে, তারা
অনন্ত দেবের কাছে কোথা পড়ি রয়।
তবে আর এ জগতে আমার কি ভয়?

আমার কি ভয়?
তাঁর কার্য্য সাধিবারে সকল সবে রয়।
উঠে বলি দিবাকর, বিরত কি সুধাকর,
ফুটে বলে কমলিনী কুমুদিনী ক্ষান্ত রয়।
অতএব ভিন্ন ভিন্ন থাকিয়া করিতে পূর্ণ
সৃষ্টির অনন্ত কার্য্য বিচিত্রতাময়,
কেন ভয় করি মনে যদি দেহ বিসর্জ্জনে
অনুমাত্র ইচ্ছা তাঁর কিছু পূর্ণ হয়,
তবে আর এ জগতে আমার কি ভয়?

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

—o—

ব্যর্থ প্রণয়।

ধূলি ধূসরিত দেহে মলিন শয্যার মাঝে
ছিনু আমি সংসারের এককোণে পড়ি,
দুর্ব্বল হিয়া দেখি, যাচিতনা কেহ কাছে
ছিনু আপনাতে তুষ্ট, ভাবনা পাশরি।
কোনকালে সে আসিয়া দাঁড়াইল মোর হায়,
নিবিড় আঁধার পূর্ণ হৃদয়ের দ্বারে।
ভুলিলাম আপনারে— জানিনাকো কি তৃষায়
ছুটিলাম ঝাঁপ দিতে প্রেমসিন্ধুনীরে।
মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত শুধু, তারি অতি পরশনে
বুঝিলাম কিযে আমি, কোথা মোর স্থান;
কেন ছুটে এনু হায়, কার বৃথা অন্বেষণে?—
সে ত গো পাষাণ হতে আরও পাষাণ!
দুটী দিনে ভেঙ্গে গেল সাধের স্বপন,
ব্যর্থ প্রণয়ের ব্যথা বুঝিনু তখন।

—o—

"অতীত"।

অনন্ত জীবন-পথে শুভ সম্মিলন
হয়েছিল তার সাথে; স্বর্গময় ছায়া,
পুষ্পরেণু, প্রেমগীতি, স্বপ্ন আলিঙ্গন—
সব ছিল,—ভস্ম আজি, বুঝি সব মায়া।
পলক ফেলিতে হায়, ভেদি মর্ম্মস্থল
বাজিল শোকের তন্ত্রী, আকুল পরাণে;—
শিশু কাঁদে ঘুমঘোরে হইনু চঞ্চল
ফিরিলাম পুনঃ নিয়ে অবশ পরাণ।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

—

চাহিনা।

চাহিনা সুন্দরী! চাহিনা তোমার
মুনি-মনোহরা রূপের রাশি,
চাহিনা তোমার ভুবন-ভুলান,
অমিয়-মাখান চাঁদের হাসি।

বলনা ললনে আমার সকাশে!
অতুল তোমার বদন শোভা,
হয় হো'ক, তাহে সুখ দুঃখ কিবা।
নহে মম তাহা মানসলোভা।

প্রবাল সদৃশ অধর যুগল
টল টল করে রসের ভরে,
কি চারু চাহনি নলিন-নয়নে,
দেখিলে পরাণ উদাস করে।

চিকণ চিকুরে রচিলে কবরী,
আহা কি সুচারু মাধুরী ফুটে,
রূপ মাতোয়ারা ব্যাকুল পরাণ,
আপনি আসিয়ে পড়ে গো লুটে।

উন্নত উরস কামের সরস,
ডগমগ কত ভাবের ভরে।
চিত্ত মজাইয়া দিক্ উজলিয়া
ফুটেছে কমল তাহাতে পরে।

চাহিনা ও সব! চাহিনা শুনিতে
বাখান তাহার; এ মর ভবে,
দুদিনে সকলি যাবে ফুরাইয়া,
নিমেষীর প্রভা স্থায়ী সে কবে?

থাকুক তোমার কণ্ঠের ঝঙ্কারে,
বীণার ললিত মোহন তান,
ঢালুক শ্রবণে অমিয়ের ধারা,
মজেনাক তাহে আমার প্রাণ।

থাকে যদি তবে [সরল অন্তর,
সুগুণ ভূষিত সরল চিত্ত;
তাই দেহ মোরে ও সব বদলে,
তাই ল'য়ে সখি! হইব প্রীত।

সেই জনি মাঝে　　মম হিয়া রাখি,
　　কহিব শতেক মরম ব্যথা।
তোমাদের কাণে　　গুন্ গুন স্বরে
　　কহে গো কাতর ভ্রমর যথা।
অয়ি অয়ি মম　　শান্তি প্রদায়িনী!
　　এ'স কেন মন পাষাণ হ'য়ে,
স্মরণের সুখ　　ভুলিব তাহায়,
　　মরতের জ্বালা যাতনা স'য়ে।

মোজাম্মেল হক্।

একটী পত্র।

ওহে সখা বহুদিন গিয়াছ বিদেশ
সকলি ত আছে মনে স্বজন স্বদেশ?
যাত্রা তব যাত্রা অতি আসিতে কুশল
নয়নের মণি তার ভুলিছে কেবল।
আর তব সহোদর স্নেহের রতন
লিখন না পেয়ে তব সদা দুঃখী মন।
সরলা প্রেয়সী তব সাধ্বী বরাননী
হতাশে পত্রের আশে সদা রহে ধনী।
রহে যথা পিপাসিতা চাতকিনী হায়।
মেঘ পানে স্বরগের সলিল আশায়
দিন দিন আসি তব আশীষ বচন
জীবিত রয়েছ কি না জিজ্ঞাসে সঘন
পুরাও সবার আশা পত্র লিখি সখা,
রহিল ইহাতে মম নাম ধাম লিখা।

শূন্য-গৃহে।

আঁধার ঘরে বিজনতা মাঝে
　　শু'য়ে থাকি আমি একেলা,
এদিকে শূন্য ওদিকে শূন্য
　　শূন্যের-মাঝে নিরালা।
　শুধু নিশের গম্ভীর ছায়া,
　তুলিছে হৃদয়ে হারাণ মায়া,—
দিন-রাত জাগি আমারি সঙ্গ
　　চ'লে যায় সেই একেলা,
　　শূন্যের মাঝে নিরালা।
তোমার জীবনে তোমার কাহিনী
　　অপূর্ব্ব পুলকে জাগে,
তার মাঝে যদি বিষাদের স্মৃতি,
　　আঁখিজল ব'য়ে আসে
　এক তুমি জীবনের প্রফুল্ল সুখ,
　দুখে যৌবনে সয় আমার দুঃখ,
জগতের প্রেমে ডুবে পড়ি আমি
　প্রাণ ফুটে এক বিষাদে,
　জানি না যে কোন্ আবাসে!
চোখের জল পারি না দেখিতে,
　　ভালবাসা পারি দেখিতে
প্রাণের বেদনা পারি না সহিতে,
　　মিলন পারি সহিতে!
　নাই শোক-তাপ জ্বালা-বেদনা,
　আছে প্রেম-হর্ষ আনন্দ-পূর্ণ,
সে তীর্থ আমার সমাধির স্থান
　সে আমার প্রিয়-ভূমি,
　মিলিব তুমি আর আমি!
নিতি নিতি আসে দিবস-রজনী
　　নিতি ক'রে যায় খেলা,
ফুরায়ে আসিছে জীবনের দিন
　　পড়িয়া আসিছে বেলা!
　সংসার দুয়ারে বসিয়ে একা,
　যাচিতেছি তার করুণার দেখা
এমনি কঠিন পাষাণ সেহ
　দেয় না আমারে দয়া,
　কিবা পাগলের পারা?
কারো দিন প'ড়ে থাকে না জগতে
　　কেউ নাহি সদা হাসে,
আমার এ দিন কখন ভুলিয়া
　　যাবে সেই দিন পাশে!
　এই আশে আমি নিবারি তৃষা
　পোহাইয়া সেই বাদলের নিশা,
আশাপথ পানে চেয়ে আছি তাই
　নিরাশা জানি না আমি,
　—মিলিব তুমি আর আমি।
তুমি চ'লে যাও বহু দূর দূর
　　দিও না গো ব্যথা মোরে,
　তুমি দ'লে যাও পীড়িত হৃদয়
　　শত খানি মনে ধরে।
　আমি জানি আমি তোমারি মাঝে,
　এসে ফিরে যাই সকালে সাঁঝে,
তাতে তুমি কভু ক'ও না কথা
　　ভোল না অমন সুখে,
　　এই যা' আমার দুঃখ!

শেখ ফজলল করিম।

গ্রন্থ সমালোচনা ।

উত্থান ।—শ্রীকাব্যানন্দ প্রণীত মূল্য ।৴৹ আনা। মুর্শিদাবাদ "সুধা" কার্য্যালয়ে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। লেখক সাহিত্য সমাজে পরিচিত ব্যক্তি এবং তাঁহার লিখিবার ক্ষমতাও বেশ আছে। ভাষা ভাল, রুচি ভাল, উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় আর আশা ?—আকাশ-কুসুম কি না আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ত তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। পুস্তক খানির কাগজ, ছাপা ও চিত্র দেখিলে স্বভাবতঃ হৃদয় আকর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক নিশ্বাসে পাঠ শেষ করিয়া মনে হয়, বুঝি লেখকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। যে সমাজে প্রেমের গীত, প্রেমের রচনা, প্রেমচিত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত; যে সমাজ পেটেন্ট আলোক বুটের মত গুরুপাক প্রবন্ধটীকেও উদরস্থ করিয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে; সে সমাজে এই বীর রসাত্মক অনর্থক চীৎকার ধ্বনি সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করিবে কি না তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে আমরা একথা বলিতে পারি, যিনি বারটী পয়সা ব্যয় করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিবেন তাঁহার সে পয়সা অনর্থক যাইবে না। লেখক মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য আমরা উত্থানের "উপক্রম" হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দাঁড়াও অমন করি' যেওনা, যেওনা ওরে
চরণে দলি'
সুপ্ত পন্নগ সে যে হয় ত উঠিতে পারে
মরণ ঠেলি'!
বিষদন্ত ভগ্ন বলি' সদা তা'রে কর তুচ্ছ,
বৃথা কর আস্ফালন উচ্চে তুলি' ক্ষীণপুচ্ছ'
পীড় তা'রে বধ তা'রে, নাশ তার আশাগুচ্ছ
মরমে দলি',
কিন্তু সুপ্ত সর্প সে যে হয় ত উঠিতে পারে
মরণ ঠেলি'!"

*　　*　　*　　*

"ক'রো না তাহারে ঘৃণা, ভেবো না সে অচেতন,
তোমার অধিক তা'র আছে শক্তি অতুলন,
যে বিশ্ব তোমার বল, সে যে তা'রো নিকেতন ;—
যামিনী যাপে,
সে শুধু প্রভাত-আশে, উঠিবে প্রভাতে পুনঃ
অমিত দাপে।"

ভাই হিন্দু! তুমি যে সত্বরই অমিত দাপে উত্থানলাভ করিয়া স্বীয় চ্যুত সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা সুনিশ্চয়! কিন্তু যে জাতির উদ্বোধন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমগ্র জগত আজ মানব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে; সেই জাতির কি ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা একবার দেখ।

পুষ্পাহার।—দেওয়ান নসির উদ্দীন আহমদ বিরচিত। মূল্য ।৹ আনা। "মহাত্মা দেওয়ান হাফেজ ও শেখ সাদি প্রভৃতি মহাকবিগণের রচিত কাব্যোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্পচয়ন করতঃ এই পুষ্পহার গ্রথিত হইয়াছে।" পুষ্প গুলি বেশ মনোহর ও সৌগন্ধবাহী। ইহার মধ্যে কয়েকটী পুষ্প মহাকবি শেখ সাদির কাব্যোদ্যানের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। লেখক কবিতা রচনায় নূতন ব্রতী চর্চ্চা রাখিলে আশা করি তিনি একার্য্যে সফলতা লাভ করিবেন।

প্রেমের কোকিল ।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রেমের কোকিল তুমি সাহিত্য-কাননে ।
তোমার ললিত তান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ
আনন্দের উৎস ফুটে ভাবুকের মনে ।
তোমার কবিতাগুলি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি তুলি,
কুলু কুলু তানে সদা বহে অবিরাম !
বেগ নাই, ঝঞ্ঝা নাই, হুঙ্কার গর্জ্জন নাই
কোকিলের কণ্ঠে যেন সুললিত তান !
দীপক গাইতে ছিলে, ভৈরবী গাইলে ভু'লে
পারিলে না ফুটাইতে বিজলী-অনল !
গাঁথিলে ফুলের মালা, সাজা'লে প্রেমের ডালা,
তোমার কবিতা পূত মন্দাকিনী-জল ।
দীন হীন বঙ্গবাসী, দিবে প্রীতি-পুষ্প রাশি,
তোমার চরণ তলে স্মরি তব নাম !
অভাগিনী বঙ্গভাষা, ফুরা'ল তাহার আশা
নীরব নিস্তব্ধ আজি কবি-কুঞ্জ ধাম !
প্রেমের কোকিল তুমি, মাতা'লে এ বঙ্গভূমি,
ফুটা'লে প্রেমিক প্রাণে প্রেমের নির্ঝর !
যাও কবি ! স্বর্গবাসে শ্রীমধুসূদন পাশে
কবিত্ব-কাননে তুমি হইলে অমর !

কায়কোবাদ ।

মুসলমানসমাজে ইতিহাসচর্চ্চা।

অতীতের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে একটী জাতি মাত্র ইতিহাস-চর্চ্চায় সিদ্ধহস্ত ছিল বলিয়া নিঃসংশয় ধারণা জন্মে। সে জাতি মুসলমান,—বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত সে জাতি। মুসলমান যেখানে পদার্পণ করিয়াছে, সে স্থানেরই ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক ভারত-বর্ষে তাহারা ইতিহাসের হিসাবে যাহা করিয়াছে তাহার তুলনা এই বিশাল জগতের অন্য কোথাও প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। তাহারা নিজেদের গৌরবের কথার সহিত অগৌরবের কথা লিপিবদ্ধ করিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। সত্যের প্রতি এই একান্ত নির্ভরশীলতাই এক সময়ে তাহাদিগকে ঐতিহাসিক সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের দিন আজ আর নাই। আজ মুসলমানের অদৃষ্ট-গগন বহুস্তরবিন্যস্ত কুহেলীআচ্ছন্ন। তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র সমতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের দর্শনলাভ ত আকাশ কুসুম হইতেও দুর্ল্লভ, দুএকটা ক্ষীণ তারকার জ্যোতিও সকল সময়ে পরিদৃষ্ট হয়না এবং এখানে সেখানে জোনাকীপুঞ্জের আলো নৈশকুঞ্জের ঘনান্ধকার দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের ব্যর্থ আলোকে অন্ধকার যেন আরও বেশী করিয়া ঘনীভূত হয়।

এই তমঃপ্রধান যুগে মুসলমানকে আবার ইতিহাসের সিদ্ধিপথে টানিয়া আনিবার সময় পড়িয়াছে। এখন চারিদিক হইতে এত সব বিরুদ্ধমতের ইতি-হাস বাহির হইতেছে যে, সে সমুদয় পাঠ করিয়া লোকের মনে মুসলমানজাতির প্রতি বিরাট ঘৃণার ভাব সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। মুসলমানযুগের ভারতের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া অনেকে যথেষ্ট বাহাদুরী নিতেছেন, কিন্তু সেই সমুদয় ইতিহাসে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে বলিয়া আমরা দ্বিধাশূন্য ভাবে স্বীকার করিতে পারিনা। মুসলমানের বহুযত্নরক্ষিত মালমসলার দ্বারাই ইতিহাস রচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু মুসলমানকে ঠিক তাহাতে পটে রঞ্জিত ক্রীড়া পুত্তলের ন্যায়ই চিত্রিত করিবার প্রয়াস হইতেছে। ইতিহাসের এই গতি রুদ্ধ করিবার শক্তি একমাত্র মুসলমানেরই আছে, এবং মুসলমানেরই তাহা করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মুসলমানসমাজ হইতে তজ্জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও

পূর্ব্বলক্ষণও নয়নগোচর হইতেছে না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ব-
সমাজের প্রতি এতই উদাসীন যে, যে প্রসিদ্ধ জাতির তাঁহারা অংশ, সেই জাতির
মাথে বহু অপবাদ লিপিবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ভ্রমে একবার
তাহার তত্ত্ব লন না। তাঁহারা রাজবৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়া মাত্রই জ্ঞানানুশীলনকে
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া স্বীয় আবাসভবন হইতে সুদূরে বিদায় করিয়া দেন। এইরূপ
অধোগতির আদর্শ অন্য কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে নানা বিষয়ের সময়োপ-
যোগী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা কেবল কুসুমপেলব সাহিত্যের
দিকেই মনোনিবেশ করেন নাই, প্রেমগীতিই কেবল তাঁহাদের লক্ষ্য নয়, তৎ-
সঙ্গে তাঁহারা বিজ্ঞানের কঠোর সত্য, দর্শনের সূক্ষ্মতম মীমাংসা, বহু পরিশ্রমসাধ্য
ঐতিহাসিক আলোচনা এবং পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারেও সমভাবে মনঃসংযোগ
করিয়াছেন। হিন্দুজাতির উত্থানের ইহাই পূর্ব্ব সূচনা। কিন্তু চিরহতভাগ্য
মুসলমানসমাজে তদ্রূপ কোন পরিশ্রমজনক কার্য্য করিবার ইচ্ছা কাহারও
আছে কিনা সে সংবাদ এখনও কেহ প্রাপ্ত হন নাই, হইবার কোন নিকটবর্ত্তী
আশঙ্কাও দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুএকটা পাশের স্তম্ভ উত্থিত
করিয়াই মুসলমান যুবকগণ অন্ততঃ ইহকালের জন্য জ্ঞানানুশীলনে বিরত
থাকেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা আমাদের শরীরে তখন আর কঠোর পরিশ্রম
সহ্য হয় না। আরও কিছুদিন সমাজ এইরূপ অবস্থায় থাকিলে তখন তাহার
অবসাদ নিরাকৃত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইবে, তাই এই আগম সময়ে
শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ইতিহাসের দিকে পতিত হওয়ার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে
বিনীত সহকারে অনুরোধ করিতেছি। হিন্দুও মানুষ, আমরাও মানুষ, তাঁহারা
যদি জাতীয়তার হিসাবে সমাজের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া
থাকেন, আমরা কেন তাহা পারিব না? কেবল একটু স্বার্থত্যাগ চাই, একটু
আত্মবিসর্জ্জন চাই, তবেই সকল দিক রক্ষা পাইবে।

বঙ্কিম, রমেশ প্রভৃতি প্রতিভাবান হিন্দু লেখকগণ যদি স্বীকৃত রাজকার্য্য
বিনা আপত্তিতে সম্পন্ন করিয়া কাব্যেতিহাস আলোচনায় সময় ক্ষেপ করিতে
পারিয়া থাকেন, তবে আমাদের শিক্ষিত সমাজ কেন তাহা পারিবেন না? এই
বঙ্গদেশে এমন কি কোন মুসলমান আছেন যিনি এই সমুদয় খ্যাতনামা হিন্দু-
দের চেয়ে অধিক পরিশ্রম সহকারে স্বীয় অর্থকরী কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন?
যদি তাহাই না হয়, তবে কেন তাঁহারা তাঁহাদের অবসর সময় অযথা রূপে হত্যা

করিতেছেন?—অবসর অর্থে নিষ্ক্রীয় অবস্থায় সময় কাটান বুঝায় না, এক কার্য্য হইতে অন্য কার্য্যে মনঃসংযোগের নামই অবসর। 'Absence of occupation is not rest' বাক্যটীর প্রতি আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হওয়া উচিত।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণের সকলেই যে মুসলমানের বিকৃতচিত্র সাহিত্য-সমাজে প্রচার করিতে তৎপর এমন কথা আমরা বলি না। অক্ষয় বাবু, নিখিল বাবু আর বিহারীবাবুকে আংশিক রূপে বাদ দিলে এরূপ একজন হিন্দু ঐতিহাসিকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যিনি মুসলমানকে প্রকৃত ভাইয়ের মত দেখিয়া তাহাদের যশঃ অপযশের আলোচনা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও ধৃষ্টতা এত অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠে এই বুঝা যায়, মুসলমানের মত অপকৃষ্টজাতি আর জগতে নাই। দুঃখের বিষয়, ইঁহারা ইতিহাসের মাল মসলা যথেষ্ট তৈলমর্দ্দনে মুসলমানের গৃহ হইতেই সংগ্রহ করিয়া মনের সাধে মুসলমানকেই আবার গালী দিয়াছেন! কৃতঘ্নতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না!

এই সমুদয় বিশ্বনিন্দুকদের হাত হইতে মুসলমান সমাজকে ও প্রকৃত ইতিহাসকে উদ্ধার করিতে হইবে। শিক্ষিত মুসলমান সেই কার্য্যের ভার লইবেন। ইতিহাস বিশেষের বঙ্গানুবাদে বিশেষ ফল ফলিবার আশা নাই, তাই বহু ইতিহাসের গভীর আলোচনা দ্বারা প্রকৃত বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম, বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনার একান্ত অভাব পড়িয়াছে। বাঙ্গলার মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস এখনও সুলিখিত হয় নাই। সংক্ষিপ্ত স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের বিবরণ এমন অল্পকথায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে তদ্বারা কাহারও প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল' নাম দিয়া একখানা বৃহৎ ইতিহাস লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা মুসলমান শাসনের একাংশের পরিচয়েই সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। নবাবী আমলের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন বাবু যথাযথ ভাবে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের রাজকার্য্যের বর্ণনা প্রদান করিতে সক্ষম হন নাই। যে সমুদয় দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই মুসলমানের হাতে পড়িলে অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। অবশ্য আমরা এমন বলিতেছিনা যে তিনি সর্ব্বত্র ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই;—

অনেক স্থানে তিনি মুসলমানকে তাহার প্রাপ্য প্রশংসা প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক দেখাইতে চান, মুসলমানরাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুরই করতলগত ছিল, হিন্দুই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা, মুসলমান কেবল নাম মাত্র রাজা। মুসলমানের গৌরবকীর্ত্তি হইতে এইরূপে বহু রত্ন চুরি করিবার চেষ্টায় আজ কাল অনেককেই ব্যস্ত দেখা যায়! ইহা ন্যায়ের চক্ষে সমীচিন বলিয়া বিবেচিত হইবে কিনা তাহাই গভীর চিন্তার বিষয়। এখন ইতিহাসের স্রোত যে খাত দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহা মুসলমানজাতির পক্ষে অনুকূল নহে। স্রোত বাঞ্ছিত পথ দিয়া প্রবাহিত করিতে হইলে শিক্ষিত মুসলমানসমাজের শক্তিশালী পুরুষদিগকে উৎসাহের সহিত ইতিহাসের প্রকৃত আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। জোর করিয়া নিজ জাতির গৌরব বৃদ্ধি করা ঐতিহাসিকের কাজ নহে, সত্যাবিষ্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যিনিই ইতিহাসের নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকেই এই একটী কথায় প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালার মুসলমান শাসনের ইতিহাস এখন নানা লোকের হাতে নানা প্রকারে প্রকটিত হইতেছে। ইতিহাসের এই বিভাগ অরাজকতায় পূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অরাজকতা বিনাশের জন্য একজন শান্তি স্থাপকের একান্ত প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বিভিন্ন জাতীয় লোক হইলে চলিবেনা, মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সে কার্য্য সুসম্পাদিত হইবার আশা নাই। মুসলমানের কথা, মুসলমানের হাতে যেরূপ ভাবে আলোচিত হইবে, অন্যে তাহা অসম্ভব। হিন্দুগণ নিজেদের মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানজাতিকে আরও বেশী করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের হিংসাবৃত্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। [illegible] হিসাবে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা খুব কমই আশা করিতে পারি। যে জাতি এতদ্দেশে 'ভদ্রলোক' বলিলে কেবল নিজের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত সম্মান লুটিয়া লইতে চায়, সে জাতির দ্বারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের ন্যায়ানুমোদিত আলোচনা হইবে বলিয়া আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ঐতিহাসিক আলোচনায় মুসলমান রাজত্বের বাঙ্গালার খাঁটী ইতিহাসই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হইবেনা, একটীর পর একটী করিয়া আমাদিগকে ইতিহাসের অন্যান্য বিভাগের সংস্কারে হস্তার্পণ করিতে হইবে। এই কার্য্য

আ[illegible] এভাবে করিতে হইবে যেন আমাদের ভবিষ্যৎবংশধরগণ আমাদের পরিশ্রমের সুফল ভোগ করিতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে যেমন তাহারা আমাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী হইবে তেমনই তাহারা আমাদের ঐতিহাসিক গবেষণার ফলভোগ করিবে। আমরা শ্রম সহকারে শিক্ষার নানা দ্বার তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া না দিয়া গেলে, আমাদের জাতির ভবিষ্যত উন্নতির পথ নিশ্চয়ই রুদ্ধ থাকিবে।

এখন কথা এই, যাঁহারা ইতিহাসের আলোচনায় হস্তার্পণ করিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র শিক্ষিত মুসলমানসমাজের সাহায্য করিতে হইবে। যে সমুদয় দুষ্প্রাপ্য বহি, ফরমান, অনুশাসন ইত্যাদি এখনও মুসলমানের গৃহে বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারা এই ঐতিহাসিকদিগের সাহায্য করিতে হইবে। স্থল বিশেষে মূল বহি প্রভৃতি হস্তান্তর করিবার পক্ষে অসুবিধা থাকিলে তাহার নকল প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে। রেভিনিউবোর্ডে এখনও এমন অনেক প্রাচীন দলিল পত্রাদি আছে, যাহা হইতে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বঙ্গেতিহাস সম্পর্কে অনেক বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এইরূপ ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, আশা করা যায়, কোনও উপযুক্ত মুসলমানের হস্তে বাঙ্গলার মুসলমান শাসনের ইতিহাস খুব খাঁটি ভাবে নিশ্চয়ই আলোচিত হইবে। মুসলমান ঐতিহাস যশোলিপ্সা হইতে প্রাণের টানেই এ কার্য্যে অধিক মনঃসংযোগ করিবেন, কারণ এস্থলে নিজ জাতিকে কলঙ্ক নির্মুক্ত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, শিক্ষিত মুসলমানসমাজ এ বিষয়ে একবার চিন্তা করিবেন এবং শীঘ্রই আমরা তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিব। এ দেশে যে জাতির মধ্যে আবুল ফজল, কাফি খাঁর ন্যায় বড় ঐতিহাসিকের জন্ম হইয়াছিল, সেই জাতিতে আবার কি প্রকৃত ঐতিহাসিকের পুনরুত্থান হইবে না? উত্থান-পতন জগতের নিয়ম। আমরা একবার পড়িয়া ছিলাম, একরূপ মরিয়াই ছিলাম, কিন্তু আবার উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাই পূর্ব্বাহ্নে সকলকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। আমাদের শিক্ষিতগণ একবার উদাসীন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্য তৎপরতার পরিচয় প্রদান আকাঙ্ক্ষায় নানা দ্বার দিয়া জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করুন, তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে সমাজ উপকৃত হইবে, তাঁহারাও চিরধন্য হইবেন।

প্রতিবাদে অনুরোধ।

মানুষের ভ্রম ত্রুটি নানা কারণে হয়। জ্ঞানের উপর, কোন বিষয়ে অজ্ঞতা থাকিলে তদ্বিষয় লইয়া আলোচনায় ভ্রম হওয়া যেমন স্বাভাবিক, সেই আলোচনা যদি হৃদয়ের আবেগের অধীন হয়, তবে তাহার মধ্যে ভ্রম সম্ভাবনা একেবারে অনিবার্য। কারণ, এই সত্যের সমাবেশের সহিত, আলোচক, কতক হৃদয়ের তাৎকালিক ভাবে বাধ্য হইয়া, কতক অজ্ঞতা, অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্ত অথবা একদেশদর্শন হইতেই সমষ্টির একটা আনুমানিক ধারণা (যাহা ভ্রমপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে) প্রকাশ করিয়া বসেন। এজন্য তৎকালীক দেশ কাল পাত্রানিবিশেষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সেই আলোচক সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করাই সঙ্গত। বর্ত্তমান শুভবর্ষের বৈশাখের "ভারতীতে" ও "নবনূরে" শ্রদ্ধাস্পদ মৌলভী ইমদাদুল হক্ বি, এ, মহোদয় লিখিত দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। দুইটী প্রবন্ধেই মাননীয় লেখক, হিন্দু সাহিত্যসেবীরা যে চিরকালই মুসলমানকে বৃথা গালাগালি দিয়া আসিতেছেন তাহারই উল্লেখ এবং প্রতিবাদ করিয়াছেন। "ভারতীর" প্রবন্ধে সাধারণ সাহিত্যসেবীর এবং "নবনূরে" আলোচিকার মুসলমান বিদ্বেষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় লেখক সাহেব প্রবন্ধ দুইটীতে প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দু সাহিত্যসেবীরা মুসলমান দ্বেষের বহু পরিচয় দিয়াছেন ইহা তিনি যেমন নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, আমরাও তাহা জানি এবং মানি। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রবন্ধের গতি অন্যদিকে বদলাইয়া, ভিন্ন উপায়ে ঐ সকলের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন, বর্ত্তমান কালে সেইরূপ হইলেই ভাল হইত। "ভারতীতে" প্রকাশিত প্রবন্ধটীর সহিত "নবনূরে" প্রকাশিত প্রবন্ধের তুলনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। হিন্দু প্রচারিত পত্রিকায় লিখিতেছেন বলিয়াই হউক, কিম্বা শ্রদ্ধেয়া 'ভারতী' সম্পাদিকা মহাশয়ার সুকৌশলেই হউক, "ভারতীর" প্রবন্ধটীর মধ্যে এমন একটী ভাব ছিল, যাহা পাঠ করিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার অনুভব করিয়াছিলাম, নবনূরের লেখা পাঠে সে আশা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ করি। ভারতীর প্রবন্ধে যেরূপ সংযম, শৃঙ্খলা ও

সজ্জার বিন্যাস দেখিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, নবনূরের উজ্জ্বলগতি জলধারা যে আশার তট সদা প্রহৃত করিয়া দেয়। কেন একথা বলিতেছি, ক্রমশঃ তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

ইংরাজশাসনে ঘন ঘন গোরার অত্যাচারে, চা-করের নির্মমতায় (কিছু-কাল পূর্ব্বে নীলকরের দৌরাত্ম্যে) আমরা হিন্দু-মুসলমান ব্যক্তিগত ভাব হইতে ক্রমশঃ ইংরাজ জাতির উপরে যেমন বিশ্বাস ও সহানুভূতি হারা হইতে বসিয়াছি, এবং যাহার ফলে "নীলদর্পণ" ও কুলীপীড়ন-সম্পর্কীয় নানা স্থায়ী গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে, সেই প্রভুশক্তির অপব্যবহারই হিন্দুসাহিত্যে মুসলমান-বিদ্বেষের উৎপাদক। * আজ আমরা নিরীহ প্রতিবাসী, গলায় গলায় ধরিয়া পরস্পরের সুখদুঃখ বাটিয়া লইবার অবস্থায় আসিয়াছি, কিন্তু একদিন কি এমন ছিলনা যে, ভারতের মুসলমান হিন্দুর ধন, বিত্ত, আচার, শিল্প, ধর্ম্মবিশ্বাস সকলের উপর আপন প্রভুশক্তির অযথা † পরিচালনা করিয়াছিলেন ? ইতিহাস কি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না ? কিন্তু, তাহা লইয়া বিতর্ক এ সময় সমীচিন বলিয়া মনে করিনা। জগতের ইতিহাসে, বিজিত এবং বিজেতার প্রথমকাল হইতে অন্তরের অসামঞ্জস্য ভাব প্রসূত বিযোদগার যে তাহাদের পরবর্ত্তী পুরুষেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভোগ করিতে বাধ্য, তাহা বিরল নহে। ইংরেজের এত শাসন, এত উদার আইনের রাজ্যেও হিন্দু-মুসলমান "গোরার" নামে চমকিয়া উঠেন কেন ? এবং তাহাদের সম্বন্ধে নিজেরা যেরূপ সমালোচনা ব্যক্ত করি, পরবর্ত্তীদের হৃদয়ে তাহার ভাব আরও উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত হইয়া উঠে কেন ? ইংরাজ রাজত্বের এই কলঙ্ক (পৃথিবীর ইতিহাসে সকল বিজেতাই এ কলঙ্কে কলঙ্কী) দূরীভূত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সাহিত্যের শতছত্রে তাহাদের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ভাবে অঙ্কিত হইবে ভিন্ন আর কিছু আশা করা যাইতে পারে কি ? হিন্দুরাও আদিমবাসীদের নাম কত রূপ বিকৃত করিয়াছিলেন, (রাক্ষস, বানর, পক্ষী ইত্যাদি) অনার্য্যগণও যে তাহা করে নাই তাহা নহে, তাহাদের সাহিত্য প্রবল ছিল না, (কোন কোন

---

* প্রতিদ্বন্দিতাও এইরূপ বিদ্বেষ উদ্গার করিয়া থাকে, হিন্দুমুসলমান-ক্ষেত্রে প্রভুশক্তির অন্যায় ব্যবহারের ন্যায় প্রতিদ্বন্দিতাও বিদ্বেষ প্রসব করিয়াছিল। (লেখক)

† সুধী লেখক এই স্থানে নিজের মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ইতিহাস সরাসরি ভাবে কখনও এমন সাক্ষ্য দিবেনা যে মুসলমানগণ কেবলই 'প্রভুশক্তির অযথা পরিচালনা' করিয়াছিলেন। নঃ সঃ।

সম্প্রদায়ের একেবারেই ছিলনা) সুতরাং তাহারা নানারূপ উৎপাত করিয়া নানা-রূপ সং সাজিয়া বিজেতা আর্য্যগণের প্রতি হৃদয়ের বিদ্বেষ প্রকটিত করিত। মূল রামায়ণ পাঠে এ সকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। "Boadicia" শীর্ষক তীব্র কবিতাটী রোমকদিগের প্রতি ইংরেজের (ব্রিটনের) কতখানি বিদ্বেষ উদ্গার করিতেছে? Byronএর "Ode to Napoleon" পড়িলে বুঝিতে পারা যায় কবি কিরূপ কুটিল ফণা তুলিয়া ফরাসী-সম্রাটের উদ্দেশে বহ্নির মত বিষ ঢালিয়াছেন। জগতে এ ভাব নিত্য; কে কাহার দোষ দেখাইবে? বাস্তবিক, নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিতে গেলে, আমার বিশ্বাস, যিনি হৃদয়বান, প্রেমিক, স্বীয় ত্রুটির প্রতি লক্ষ রাখিয়া অপরের দোষ ভুলিয়া তিনি ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দান ভিন্ন, প্রতিক্রোধে পরস্পরকে দংশন করিবেন না। জগতের অন্য জাতি এখনও এসব বিষয় লইয়া বৃথা তর্ক করিতে পারে করুক, কিন্তু আমারা হিন্দু মুসলমান পুরাতন আগুন উস্কাইয়া তুলিতে গেলে এক, জগতের নিকট উপহাসাস্পদ হইব, আর, নিজেরা জ্বলিয়া মরিব। আমাদের যে সময়, তাহাতে, কেহ কাহাকেও তীব্র আক্রমণ করা নিতান্ত অন্যায়; কেবল বন্ধুর মত, সংযত আলোচনায় পরস্পরের ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। নহিলে শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব "অগ্নিকায় অগ্নিসংযোগ"-সূত্রে হিন্দুর "খড়ের ঘরে" অগ্নি প্রদান করিতে গেলে তাঁহাকে দোষারোপ করিবার সুযোগ পাই কৈ? নানা শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া লেখক মহোদয় হিন্দুনারীর মর্য্যাদাহীনত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া যে সকল তীব্র ও শ্লেষপূর্ণ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আগুন বাড়িবে বৈ কি কমিবে?* এ দীন লেখক ইস্লামীয় শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ

---

* এ ক্ষেত্রে, কাহারা পূর্ব্বে অযথা আক্রমণ দ্বারা দুর্ব্বল মুসলমানের প্রাণে ব্যথা প্রদান করেন, তাহাই অনুধাবনীয়। আমরা যে কোন দেশের, যে কোন জাতির, নারীমণ্ডলীকে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। মৌলভী এমদাদুল হক্ প্রকৃত দোষী না সাবিত্রী প্রবন্ধাবলির পুরস্কার দাতাগণ কি শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী সে আলোচনা অগ্রে লেখকের করা উচিত ছিল। আগুন যাহারা জ্বালাইয়াছেন তাহারাই যদি প্রাণপণে তাহা উস্কাইয়া প্রজ্জ্বলিত করিতে চান, তবে আর আগুন কেমন করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে? বুঝিতাম, হিন্দু সমাজ সত্যই মুসলমানকে ভাই বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে প্রস্তুত, যদি দেখিতাম, কোনও সক্ষম হিন্দু লেখক শ্যামাসুন্দরীর প্রবন্ধের প্রকৃত সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের বুঝা উচিত, তিনি 'হিন্দুনারীর মুসলমানে ঘৃণা' লেখকের যে শ্লেষাত্মক উক্তি পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন, মুসলমান সমাজ ও মৌলভী সাহেব শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর প্রবন্ধ পাঠেও ততোধিক মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আপনার মাতা দুহিতা স্ত্রী বা ভগিনীর স্কন্ধে মিথ্যা

সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা ইস্লামশাস্ত্র বিস্তৃত কি সঙ্কীর্ণ তাঁহার জ্ঞান নাই, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, বিরাট হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্রে তাঁহার মত সমর্থন কারী ঐ শ্লোক সমূহ উঁহার বিরুদ্ধ-বাদ-বিষয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর। গতবর্ষের "ভারতীতে" শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখিত "হিন্দুর নারী মর্য্যাদা" শীর্ষক প্রবন্ধটী যদি তিনি পাঠ করিয়া থাকেন তবে জানিতে পারিয়াছেন, জ্ঞান বাবু যদিও ঐ প্রবন্ধে বহু গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি হিন্দুশাস্ত্রের কতটুকু মাত্র লইয়া তিনি ঐ প্রবন্ধের অস্থি, মজ্জা ও মেদ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রবন্ধটী নারীমর্য্যাদা প্রমাণ সম্বন্ধে কতদূর দুর্বলভিত্তির উপর স্থাপিত ও সম্পূর্ণ তাহা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

ভারত কাহারও নিকট "শিভালরিয় দৃষ্টান্ত" অনুকরণ না করিয়াও কি উন্নত ছিলনা? মুসলমানের বিরাট সমাজ মধ্যে ঐ শক্তি আপনা হইতেই ত উদ্ভূত হইয়াছিল? আবার কত বিষয়ে উভয় সমাজ জগতের এমন সব ক্ষতি করিয়াছে যে, তাহার পূরণ করিতে হইলে দ্বিগুণ শক্তির সমুত্থান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সে সব লইয়া তুলনা করিতে গেলে সে বড় বিরাট ব্যাপার; স্পর্দ্ধা করিয়া এক কথায় কে কাহাকে বড় বলিতে পারে? যে হিন্দু মুসলমানকে গালি দিয়াছে নিজ সমাজের মন্দ চিত্রখানিও ত তাহারা প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া জগতের সমক্ষে ধরিয়াছে? আর তাহা লইয়া সমালোচনা করিতে গিয়া আজ মুসলমান যদি আপন সমাজকে একেবারে নির্দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহাতে কি প্রকৃত সত্য প্রকটিত করা হয়? * জগতে কোন্ সমাজে ভালর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দ নাই? স্বীকার করি, সেই মন্দ ভাগ লইয়া বহুকাল পরস্পরের মধ্যে আন্দোলন আলোচন চলিয়া আসিতেছে—কিন্তু তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুরে। যিনি তাহার মীমাংসার বা প্রতিকার প্রত্যাশায় অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার উদার হৃদয়ের প্রশংসা না করিলে অকৃতজ্ঞতা হয়, কিন্তু এ পথে ধীরতাই ত তাঁহার পক্ষে মীমাংসা সহজে সংঘটন করাইতে পারে?

কলঙ্কের বোঝা অর্পিত হইতে দেখিলে কাহার না হৃদয়ে জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হয়? যদি সে সময়েও কেহ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মস্থ থাকিতে পারেন তবে, হয় তিনি মনুষ্য শ্রেণীর বহির্ভূত, নয় তিনি পুত্র, পিতা, স্বামী বা ভ্রাতা নামের কলঙ্ক। নঃ সঃ।

* কখনই নহে। মুসলমান সমাজেও ঐ সব ত্রুটী বিদ্যমান, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তৎ সংশোধন উদ্দেশে সমর ঘোষিত হইবে। ইহা সমাজ বিজ্ঞানের এক অতি সাধারণ কথা। নঃ সঃ

যে সমাজের যত বেশী মন্দ, তথায় তত বেশী ভাল আছে জানিতে হইবে, কারণ ভালর অভাবেত মন্দের সৃষ্টি। হিন্দু কবি ও মুসলমানের মন্দ ভাগের সহিত বেশী পরিচিত হইয়াছিলেন, অথচ ভাল ভাগ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশদ অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই মন্দের দিকটাই বেশী চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু, তাই বলিয়া শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব আত্মশ্লাঘার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া—হিন্দুর ভালর দিক একেবারে ভুলিয়া মন্দ দিক্‌টা লক্ষ্য পূর্ব্বক তাহার প্রতিবাদ করিলে ভাল দেখায় কি? না তাহাতে মীমাংসার আশা করা যায়, অথবা হিন্দু লেখকদের অন্যায় তাহাকে আর একটু উদার বলিতে পারিব? আপনার সমাজ নির্দ্দোষ, অধুনা সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আপনার সমাজের আদ্যন্ত-দেশ উদ্ভাসিত, যদি এরূপ জ্ঞান থাকে, তবে সেই অতি মহৎ হৃদয়ে চৈতন্য দেবের মত অনাবিল প্রেমে আক্রমণকারী হিন্দুকে আলিঙ্গন করুন, হিন্দু কতদিন পরে চলিবা থাকিবে? আপনি যদি পূর্ণ সৎ তবে সেইরূপ প্রেমে হিন্দুর নিন্দা শ্রবণ করিতে থাকেন। হিন্দু নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিবে। এ অধিপত্যের লোভ কেহ করেন নাই। তিনি যে মহদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেরূপ যাহোক ধীর ধীর ভাবে যদি প্রকৃত সত্য সকল আমাদের সম্মুখে ধরেন, আমাদের যাহা ত্রুটি কেন আমরা লজ্জিত হৃদয়ে তাহার সংশোধন করিব না? কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনে করিয়া পরস্পর আক্রমণপ্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে গেলে যুগ যুগান্তরেও সে যুদ্ধ মিটিবে না। কিন্তু, এরূপ অনাবশ্যক যুদ্ধ করিবার মত সম্পর্ক হিন্দু-মুসলমানে এখন আর নাই। পূর্ব্ব স্রোতের 'জের' স্বরূপ এখনও অনেক হিন্দুর লেখনী যেমন মুসলমানের নিন্দা হঠাৎ করিয়া বসেন, অনেক হিন্দু ইংরাজরাও কিন্তু মুসলমানদিগের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনেও ত তেমনই মনোযোগী? সমস্ত কথা বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়, কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশে ভাল করিতে চাহিলে ফল মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, "কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়ে।" কারণ শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব যে শুভ-ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই প্রবন্ধ দুইটী লিখিয়াছেন তাহা হৃদয়বান মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাকে আমার বিনীত অনুরোধ, আগুন নিভাইতে যাইয়া স্বয়ং নূতন বহ্নির সৃষ্টি যেন কেহ না করিয়া বসেন। তাহা হইলে আমাদের পোড়া অদৃষ্টে নূতন করিয়া পুড়িবার স্থান কোথায়?

ভাই মুসলমান, তোমরা বহুকাল আমাদের দেশের রাজা ছিলে, আমাদের

কিছু মন্দ করিয়াছ, বহু ভালও করিয়াছ। আমরা আমাদের সাহিত্যে তোমাদের নিন্দা গাই সত্য, প্রসংশা কি করি না? সম্রাট আকবরকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" সম্মান কাহারা দিয়াছিল? যে সিরাজকে বড় বড় ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা অনন্ত পাতক ও বিভৎস অপরাধের তলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের প্রতিবাসী হিন্দুভ্রাতা অক্ষয়কুমার ও বিহারীলাল কি দিবারাত্র গবেষণা করিয়া সেই সিরাজের কলঙ্ক মোক্ষন করেন নাই? এবং আজিও, আমাদের ভাগ্যবিধাতা লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিলেও, অন্ধকূপহত্যার অমূলকতা আমরা আমাদের সহস্র ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দিই না? *

আজও যদি বিজিত বিজেতা সম্পর্ক থাকিত, তবে এত কথা বলিতাম না; এখন পরস্পরের আক্রমণে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করি। বহু যুগ গিয়াছে, সময় স্রোত এখন অভিনব এক 'খাদে' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ সময় প্রতিবহ্নি না জ্বালাইয়া, দাও দেখি ভাই বন্ধুর মত আমার ত্রুটি বুঝাইয়া দাও, তোমার তুষ্টমুখের সংশোধনবাণী হৃষ্ট হইয়া মানিয়া লইব, নহিলে যাহার দোষ দেখাইয়া দিতে যাইতেছ, আপনি পুনঃ তাহার নিকট দোষী হইয়া পড়িলে না কি?

ক্রমশঃ সাম্যের দিকে আসিব ইহাই আশা করি, যাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না, অথচ সংস্কার করিতে সাহস নাই, এক হিসাবে তাহা চিরশ্রেষ্ঠ রহুক না; যাহা সত্য, তাহা একদিন প্রকটিত হইবেই। "পলাসীর যুদ্ধ" আমরা ডুবাইয়া দেই নাই, সংস্কারও করি নাই, কিন্তু সিরাজ কি আজ আর নবীনের সিরাজ? অথচ অক্ষয়, বিহারী, নবীন কাহাকে না আমরা আদর করি? বহুপূর্ব্বের "ভারতী"তে অক্ষয় বাবু বঙ্কিমের সীতারাম, চন্দ্রশেখর ইত্যাদির ঐতিহাসিকভ্রম নিরাকরণ করিয়াছিলেন, তাহা ত আমরা সাদরে মানিয়া লইয়াছি, বঙ্কিমকে কি বিসর্জ্জন দিয়াছি? না কাহাকেও বিসর্জ্জন দিতে পারিব? এখন হিন্দুমুসলমান (বঙ্গের) উভয়ের সম্পত্তি এক, একে ত ক্ষুদ্র সম্পত্তি, কোন্ অংশ ত্যাগ করিব? করিলে থাকেই বা কি? কিন্তু, যাহা সত্য, দিন দিন তাহা ত আপনিই প্রকটিত হইতেছে। তাই বলি, নিজেরা ঘরে ঘরে কাটাকাটী করিবার এখন সময় নহে, যাহা আবর্জ্জনা মনে

* ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঘোষযাত্রা পর্ব্বে ও গন্ধর্ব্বরাজের সহিত যুদ্ধ সময়ে তাঁহার সহিত এক হইয়া বলিয়াছিলেন বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট, আমরা একশত পাঁচ ভাই।

করি, অথচ তাহা অত্য মহৎ উপকারে আসিতেছে, তাহাকে বর্জ্জনে গৌরব নাই, বরং ভবিষ্যতের জন্য মহাপ্রাণতায় মিলিয়া মিলিয়া হাস্যমুখে হাতে হাতে ধরিয়া পথ চলিতে হইবে। এখন আক্রমণ না করিয়া, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যে আপনাদের যাহা সত্য তাহা প্রকাশিত করিতে থাকুন, আমরা ত প্রকাশ করিতেছি, ধীরে ধীরে যতই পরস্পরের অভ্যন্তরের কথা জানিতে পারিব, ততই মিলনের পথ নিকট হইয়া আসিবে। 'নবনূর' যেন প্রকৃতই নূতন জ্যোতিঃ আনিয়া আমাদের তিমিরাবৃত পথ আলোকিত করে। *

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

আমাদের শিক্ষা।

একক্ষণে দেখা যাউক, স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অনেকে অবলাগণের উচ্চশিক্ষার একান্ত বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু উচ্চশিক্ষা নিম্নশিক্ষা বুঝি না। শিক্ষা যদি দিতে হইল, তাহা হইলে শিক্ষাই দিতে হইবে। যদি সম্যক্ অর্জ্জিত না হইল, তাহা হইলে শিক্ষা দেওয়ায় আর না দেওয়ায় প্রভেদ কোথায় রহিল? শিক্ষা অর্থে সুশিক্ষা। ভাল মন্দ বাছিয়া চলিতে শিক্ষা করা এবং অসত্য অপেক্ষা সত্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইতে শিক্ষা

---

* দক্ষিণা বাবুর লেখনী ধন্য হউক। তিনি পতিত মুসলমানজাতির প্রতি যে বিপুল সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা সাদরে জ্ঞাপন করিতেছি। ঈশ্বর করুন, আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি বিদ্বেষবিষ দূরে, অতি দূরে, বিসর্জ্জন করিয়া যেন একই উদ্দেশে, একই মায়ের সন্তান বলিয়া জগতের মাঝে পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হই। আমরা দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষী প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। হিন্দু যদি মুসলমানকে প্রকৃত ভাইয়ের অধিকার প্রদান করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন, অক্ষমের উপরে তাঁহার স্নেহ অর্পিত হয় নাই।

যে সমুদয় পূজনীয় হিন্দু লেখক মুসলমানজাতিকে নানা কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, মুসলমানসমাজ তাঁহাদিগকে কত দূর শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করেন, তাহা মুখেক কলে প্রকাশ করা যায় না। যে স্থানেই শিক্ষিত মুসলমানের সম্মিলন হয়, তথায়ই তাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হন, একথা অতি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা প্রকৃত মিলন প্রত্যাশী, আমরা 'মুক্তদেহী' বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নবনূরের প্রচার করি নাই।

করার নামই জ্ঞানলাভ। এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে কুসংস্কার দূর হইয়া তাহাদিগের মন যেন সুসংস্কৃত হয় এবং তাহারা সন্তানগণকে মানুষ হইতে শিক্ষা দিতে পারে। আমরা দুর্ব্বল, কেন না আমাদিগের মাতৃগণ দুর্ব্বল। আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ, কেন না আমাদের মাতৃগণ তদ্রূপ। কিন্তু যখন আমাদের সমাজ উন্নত ছিল তখন ত আমাদের মাতৃগণ এরূপ ছিলেন না। তখন বীরহৃদয়া রমণীগণ বীরকেশরী সন্তান প্রসব করিতেন। গ্রানাডার রাজ্য হারাইয়া আবু আবদুল্লাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"যাহা তুমি পুরুষের ন্যায় রক্ষা করিতে পারিলে না, তাহার জন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছ?" এইরূপ বীরহৃদয়া মাতা না হইলে কি পুরুষসিংহ জন্মিতে পারে? কিন্তু সেদিন আর নাই। এখন মাতৃগণ ভূতের ভয় দেখাইয়া বালকগণের হৃদয় ভীতি-সঙ্কুচিত করিয়া দিতে শিখিয়াছেন। এমন কি অন্ধকার রাত্রে ভূতের ভয়ে বৃদ্ধেরও হৃদয় কম্পিত হইয়া থাকে। বাল্যকালে বিখ্যাত বীর নেলসন একদিন খেলা করিতে করিতে গৃহ ছাড়িয়া বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ক্ষুধায় কাতর হইয়া একটী ক্ষুদ্র নদীর তীরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া একাকী দূর নদী তীরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোর প্রাণে কি একটুও ভয় নেই?" বালক নেলসন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ভয়? সে কাহাকে বলে? আমি ত তাহাকে কখনো দেখি নাই!" বীরত্ব আর কাহাকে বলে? মাতার হৃদয় কতদূর বীরত্বপূর্ণ হইলে তিনি এইরূপ একটী সন্তানলাভ করিতে পারেন? এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, যে শিক্ষার দ্বারা এই সকল চিত্তদৌর্ব্বল্য, পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার রমণীকুলের হৃদয় হইতে দূর করিতে পারা যায় সেইরূপ শিক্ষার বিধান করাই বিধেয়।

যৎকালে আরবজাতি নব ধর্ম্মের আলোক লইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, যখন ইস্লামের গৌরব স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া উন্নত মস্তক আকাশভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তখন স্পেন রাজ্যে অসংখ্য মুসলমান স্ত্রীলোক বিখ্যাত বক্তা, সাহিত্য ইতিহাসে সুপণ্ডিতা, গণিত বিজ্ঞানে পারদর্শিনী, রাজনীতি কুশলা, এমন কি চিকিৎসাশাস্ত্রেও অদ্বিতীয়া ছিলেন। সেই বিদুষী রমণীগণের গর্ভে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্ঞান ও বিদ্যার অভিনব স্রোত তাঁহারাই ইউরোপে প্রথম

প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আজ যে মহাদেশ গগনস্পর্শী তরঙ্গ মালায় পৃথিবী বিলোড়িত করিতেছে, ও গভীর অন্তঃস্পর্শী জ্ঞান-সাগর সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দিতেছে।

সুদূর ইউরোপের কথায় আমাদের কাজ কি? এই ভারতবর্ষে যখন মোগল-শক্তি অমিত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিত, তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নারীজাতি 'অসূর্য্যম্পশ্যা' থাকিয়া শরীর ভগ্ন ও চিত্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতেন না। এখনকার অন্তঃপুর বাসিনীগণের ন্যায় তখনকার রমণী পৃথিবী ও রাষ্ট্র পরিচালন সম্বন্ধে অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক জ্ঞানদৈন্য প্রকাশ করিতেন না। রেজিয়া বেগম, চাঁদ, নূরজাহান, মুমতাজ, জেবউন্নিসা প্রভৃতির যশশ্চন্দ্রমা অনন্তকাল ইতিহাসাকাশে বিচরণ করিবে। অধুনাও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর রহিয়াছে; মহামান্য তুরস্কের সুলতানের শ্রীমতী রাজনীতি কুশলা জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ও বিদুষী নারী-সম্পাদিত ছয়খানা প্রধান পত্রিকা তাহার প্রমাণ।

উচ্চশিক্ষার—অর্থাৎ উচ্চস্ত্রীশিক্ষার উচ্চজ্ঞানদানের—স্ত্রীলোকের সুফল বই কুফল কখনো ফলে না। হিন্দুদিগের ব্রাহ্মসমাজ অনেকটা সুশিক্ষিত। তাঁহাদিগের মধ্যে খুব বড় লোকের গৃহিণীও সংসারের কাজকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন ও সেই সঙ্গে সন্তানগণের সুশিক্ষার বিধান করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। এক দৃষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে উন্নতির পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে, মুসলমানগণের অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা প্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণ যদি একটু স্বামীর আদরিণী হইলেন, অমনি দশটা পাঁচটা দাসী বাঁদী রাখিয়া নিজের সুখ সম্ভোগের বেশ সুবিধা করিয়া লইতে ও মান বজায় রাখিতে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলেন; এবং সন্তানগণের শিক্ষাদিবার জন্য এক পয়সাও অবশিষ্ট রাখেন না। কিন্তু হিন্দু-গণের বড় বড় ব্যারিষ্টার, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বড় বড় জমীদার, সকলের গৃহিণীই স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুসভ্য, উন্নত, শিক্ষিত, ধনী, তাহাতে তাঁহাদের মান যায় না, আর আমরা দরিদ্র, অশিক্ষিত, অবনত, তাই আমাদের একটুতেই মান খসিয়া পড়ে। উচ্চশিক্ষা না হইলে স্ত্রীলোকদিগের এই সর্ব্বনাশকারী মানজ্ঞান বিদূরিত হইবে না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার বিস্তার না হইলে আমাদের কোন ক্রমে উন্নতিলাভ করিবার আশা নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সত্বর না হইলে

আর উপায় নাই। যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছি বোধ হয় তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে মানুষের মাতৃসমাজই উন্নতির গর্ভধারিনী। সমাজ যখন উচ্চশিক্ষিত হইয়া উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, ধর্ম্মও আপনা হইতে সেই সঙ্গে আপনার ভিত্তি দৃঢ় করিতে থাকিবে, কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মের অনাবশ্যকীয় কূটতর্ক লইয়া সময় ও শক্তি নষ্টকরা উচিত নহে। ধর্ম্মের মূল বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। যে সম্প্রদায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সর্ব্বথা যত্নবান, যাঁহারা বাস্তবিক শিক্ষার ও জ্ঞানের আদর করিতে জানেন, যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেবল কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া স্বজাতির প্রতি প্রেম, জন সাধারণের প্রতি দয়া, সমাজের হিতার্থে সদনুষ্ঠান প্রভৃতিতে সময় শক্তি ও অর্থ উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক ধার্ম্মিক। যদি ধার্ম্মিকের জন্য ঈশ্বর কোন স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল মহাপুরুষেরাই সেই স্বর্গলাভ করিবেন। আর আমরা জ্ঞান ও শিক্ষা অবহেলা করিয়া, স্বজাতির অনিষ্টসাধন করিয়া, দয়া ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া হিংসাবৃত্তির সেবা করিয়া, স্বার্থপরতার ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া কেবল মুসলিম-বেশে "মসলা তলব" করিয়া ও সুন্নত আদায় করিয়া এবং কলুষপূর্ণ চিত্তে লোক দেখান নমাজ পড়িয়া কখনো স্বপ্নেও সে স্বর্গলাভের আশা করিতে পারিব না। বরং স্বহস্তে এইরূপে স্বীয় সমাজের অধঃপতনের সহায়তা করিয়া কেবল মাত্র নরকের পথই পরিষ্কার করিব।

আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অন্তরায় আছে, সে গুলির মূলেও কুঠারাঘাত করা আবশ্যক। খাইয়াও পাঁচ জনকে খাওয়াইয়া আমোদ করিয়া সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিতে পৃথিবীর কোন জাতিই আমাদের সমকক্ষ নহে। যাঁহার দুপয়সার সংস্থান আছে, তাঁহার ৩।৪ প্রকার কোরমা না হইলে এক বেলার আহার হয় না। হিন্দুরা খাইতে জানেনা কিন্তু শাক ভাত খাইয়াই তাহারা আমাদের অপেক্ষা কত উন্নত। দুবেলা মুরগী খাইয়া সহস্র বৎসর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেও আমরা তাহা-দিগকে ধরিতে পারিব না। একজন হিন্দু মাসে ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া দশ বৎসরের মধ্যে ৩।৪ হাজার টাকার সংস্থান করিয়া ফেলে, আর একজন মুসলমান মাসে ৪০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও দশ বৎসরের মধ্যে দশ হাজার টাকা দেনা করিয়া ফেলে। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! কোন সন্তানহীন ধনী মুসলমানের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক মহাভোজ দিয়া

নাম বাড়াইয়া যাইবেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে মহাত্মা মহসিনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার্থ টাকা জমি দান করিয়া যাইতে বলেন। তাহা শুনিয়া ভদ্রলোকটী হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। এইত আমাদের অবস্থা!

মুসলমান ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা বলেন, লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে। যাহা আছে তাহাই খাইয়া শেষ করিতে পারিব না। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, যাহাদের আহারের সংস্থান নাই, তাহারাই ভিক্ষা করিয়া কোন মতে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া চাকরীর উপায় করিতে যত্নবান হয়। তাই ক্ষুদ্র মুসলমান শিক্ষিত-সম্প্রদায় এত দরিদ্র। অর্থ না হইলে কোন কাজই হয় না। আর সেই অর্থ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সমাজের উন্নতিকল্পে কোন কার্য্যই করেন না। আমাদের উন্নতি কিসে হইবে? হিন্দুগণ সামান্য আহার করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, আর আমরা দূরে বসিয়া খাইয়া খাইয়া অধঃপাতে যাইব। ইহাই আমাদের সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজের দোষগুলি বাহির করিয়া অনর্থক সমালোচনার আর প্রয়োজন নাই। কেবল এই টুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে উচ্চ সৎশিক্ষার অভাবেই আমাদের সমাজে এতগুলি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। এবং আমাদের উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। যখন আমাদের সমাজে শিক্ষার বিস্তার হইবে, কেবল তখনই ঐ সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত হইবে। তাহার পূর্ব্বে কেবল গগনভেদী চীৎকার করিয়া বেড়াইলে কোন ফলই দর্শিবে না।

এক্ষণে মুসলমান যুবকবৃন্দের নিকট এই অনুরোধ যে, সমাজে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এবং স্ত্রীলোকগণ যাহাতে সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহারই জন্য যেন তাঁহারা আপনাপন শক্তি সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করেন। যে সমাজের জ্ঞান বলে একদিন পৃথিবী গৌরবান্বিত ছিল, উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিয়া ধর্ম্মের শিথিলভিত্তি দৃঢ় করিয়া যেন তাঁহারা সেই লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া অমিত উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এক্ষণে সেই পরম কারুণিক সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা, যেন তিনি আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ আশার আধার যুবকবৃন্দের সহায় হইয়া পতিত সমাজের উদ্ধার সাধন করেন। আমিন।

সমাপ্ত।

আলি পাশা।

—ঃ০ঃ—

ভূমিকা।

মহামান্য তুরষ্ক সুলতানের সহিত মুসলমান জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক শুদ্ধ ইহলৌকিক নহে, ইহাতে পারত্রিক বিষয়ও গাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট আছে। সেইজন্য জগতের ইস্লামসমাজ মহামান্য খলিফার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুরষ্কপতির মন্ত্রী-সমাজের প্রত্যেকেই "পাশা" উপাধি ভূষিত। এই গৌরবান্বিত উপাধি সম্বলিত নাম শ্রবণ মাত্র কেবল মুসলমানগণ কেন অনেক ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরও অন্তরে কি এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রীতির উদ্রেক হইয়া থাকে। ভুবনবিখ্যাত প্লেবনা-সমর-বিজয়ী দেবপ্রতিম মহাবীর গাজী ওসমান পাশার মধুময় নাম শ্রবণে কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? কোন্ বীর না সে মহান্ নাম শ্রবণ করিয়া মস্তক অবনত করতঃ সম্মান প্রদর্শন করেন? ফলতঃ পাশাগণ যে সকলেই এই আদর্শ মহাপুরুষের ন্যায় দেবচরিত্র বিশিষ্ট, তাহা নহে। জগতের সকল সমাজেই ভালর পাশে মন্দ, মন্দের পশ্চাতে ভালর সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং পাশাগণের মধ্যেও যে পিশাচ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন বা আছেন, বিগত রুষতুরষ্ক যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি পাশাল আবদুল করিম পাশার চরিত্র আলোচনা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আজ আমরা পাঠকবর্গকে জনৈক পাশার জীবনকাহিনী উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই চরিতাখ্যানটী অবশ্য আদর্শ ও উচ্চাঙ্গের না হইতে পারে, কিন্তু মানুষ যে বিপদে ধৈর্য্যধারণ, সম্পদে শ্রীবৃদ্ধি সাধন, ক্ষমতায় দুঃসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং স্বার্থে ভীষণ পৈশাচিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে, তাহার উজ্জ্বল চিত্র ইহাতে পরিলক্ষিত হইবে। ইঁহার নাম আলি পাশা; উপনাম এস্লান (Aslan) অর্থাৎ সিংহ। আমরা ক্রমশঃ এই সিংহবিক্রান্ত পুরুষের জীবনকাহিনী পাঠকগণের গোচরীভূত করিব।

প্রথম অধ্যায়।

আলি পাশা কোন্ সময়ে যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিঃসংশয়িত [illegible] নিরূপণ করা সাতিশয় কঠিন। তবে তিনি যে খৃষ্টীয় ১৭৪০ ও ১৭৫০ শকে [illegible]

মহাভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্থির নিশ্চয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের আইওয়ানিনা প্রদেশের ৭০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমস্থ টিপেলেনী নামক স্থানে তাঁহার জন্মভূমি। প্রাচীন উস্ নদীর বাম তীরে অপ্রীতিকর পর্ব্বতমালা বেষ্টিত বৃক্ষ লতাদি হীন একটী মরুময় উপত্যকায় এই টিপেলেনী অবস্থিত। ইহা ১৪০১ খৃঃ তুরস্কের শাসনাধীনে আইসে।

আলির পিতামহের নাম মোক্তার। মোক্তার গৌরবান্বিত পাশার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৭১৬ খৃঃ করফু অবরোধের সময়ে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষরূপে ভীমপ্রতাপ তুর্কিবাহিনী পরিচালনা করিয়া স্বকীয় শৌর্য্য বীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদানে প্রকৃত যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অমিত সাহসী কাউন্ট স্থলেনবর্গের অধীন সৈন্যদলের সহ যুদ্ধে তিনি নিধনপ্রাপ্ত হন। সালেক, মোহাম্মদ এবং ভেলী নামে তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভেলী দাসী-গর্ভসম্ভূত; সেই জন্য জ্যেষ্ঠদ্বয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে হেয় জ্ঞান করিত ও বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, এবং পৈতৃক ধন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিল। মন্দভাগ্য ভেলী পরিশেষে নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠদ্বয় কর্তৃক নিগৃহীত এবং গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

এইরূপে নিঃসহায় অবস্থায় দেশান্তরিত হইয়া তেজস্বী ভেলী তরবারি সাহায্যে স্বীয় স্বত্ব সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া লইবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাহাতে মনবল ও জনবল উভয়ই আবশ্যক। সেইজন্য তিনি প্রথমতঃ কঠোর দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্য, উৎসাহ, উদ্যম প্রভাবে এরূপ দৃঢ়তার সহিত লুণ্ঠনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন যে, অচিরেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে তাঁহার প্রতি অনুকূল হইবেন, তিনি সেই শুভ লক্ষণ পরিস্ফুট করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বিপুল অর্থ তাঁহার করায়ত্ত হইল এবং তিনি কতকগুলি কষ্ট সহিষ্ণু ভীমবিক্রান্ত নিষ্ঠুর অনুচর সহজেই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে যে প্রকার দুরূহ কার্য্যই হউক না কেন, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য নিয়তই প্রস্তুত আছে। এদিকে ভ্রাতৃদ্বয়ের নিষ্ঠুর ব্যবহার ভেলীর অন্তঃকরণে নিরন্তর কণ্টক ছিল। একণে তিনি প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ করিবেন স্থির হইলেন। তিনি আপনার দুর্দ্ধর্ষ অনুচরগণসহ টিপে-লিনাকৃষ্ট হইয়া অনায়াসেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সালেক

এবং মোহাম্মদ এই আকস্মিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার্থ বাধাবিঘ্ন ফলপ্রদ হইল না—ভীষণ ভেলী দুর্গ-দ্বার ভগ্ন করতঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পলায়নপর ভ্রাতৃদ্বয়ের বধ সাধন করিলেন।

এই ঘটনার পর ভেলী টিপেলেনীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তথাকার প্রধান "আগার" পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে তিনি ঘৃণ্য এবং বিপজ্জনক লুণ্ঠনকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ক্রীতদাসীর গর্ভজাত তাঁহার একটী পুত্র ছিল, আবার নিজেও দাসীপুত্র; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি লোকের অন্তরে স্বভাবতঃ বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হইয়া থাকে বলিয়া তিনি তৎপ্রতি-কারার্থ মনোনিবেশ করিলেন। আর অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাহার মনে না উচ্চাভিলাষ জন্মিয়া থাকে? বুদ্ধিমান ভেলী এই কারণে কোনও ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি অবিলম্বে কনিৎজার অধি-পতির খাম্‌কো নাম্নী একটী সুন্দরী দুহিতার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই বিবাহের ফলে তিনি দেশের বহুল গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের আত্মীয়তা লাভ করিলেন। ফলতঃ খাম্‌কো স্বামীর প্রকৃতির উপযোগিনী পাত্রীই হইয়াছিলেন; অতঃপর কার্য্যের দ্বারা পাঠকগণ সে পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

অনন্তর ভেলী উন্নতির চরম সীমায় সমুপস্থিত হয়েন; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সুখসমৃদ্ধি তিনি অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। মহামান্য তুরস্কাধিপতির অসন্তোষ উৎপাদন করাতে তিনি পুনর্ব্বার অবনতির গভীর গর্ত্তে নিপতিত হন। নৈরাশ্যের নিদারুণ নিষ্পেষণে তাঁহার হৃদয় চূর্ণীকৃত হওয়ায় তিনি ইহার অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তদীয় প্রথমা স্ত্রী ক্রীতদাসীর গর্ভজ তিনটী সন্তান রাখিয়া যান; দ্বিতীয় সহধর্ম্মিণী খাম্‌কোর গর্ভে তাঁহার দুইটী সন্তানের জন্ম হয়। একটী আমাদের প্রস্তাবোক্ত প্রসিদ্ধ আলি পাশা, ২য়টী সাইনিৎজা নাম্নী একটী কন্যা।

আলি পরিণামে যে একজন ভীষণ প্রকৃতির ক্রূরকর্ম্মা লোক হইবেন, তাহা তাঁহার বাল্যজীবনেই আভাস পাওয়া গিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যকালে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন—আলির স্বভাব চাঞ্চল্য অন্দর মহল পরিত্যাগের

সময় হইতেই পরিস্ফুট হয়। কারণ তখনই তাঁহার বাচালতা, কৌটিল্য ও বক্রতা এত অধিক জন্মিয়াছিল যে, তদ্রূপ কখনও কোন তুরুক যুবকে পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রায়ই পিতামাতার অজ্ঞাতসারে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দুরারোহ পর্ব্বত, নির্জ্জন বন এবং বরফাবৃত প্রান্তর পরিভ্রমণ করিতেন। আমির পিতা আমিরকে শিষ্ট ও সুব্যবস্থিতচিত্ত করিতে বহুল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সমান একগুঁয়ে ও অবাধ্য হইয়া তিনি শিক্ষকের সম্মুখ হইতে পলায়ন ও তাঁহার প্রতি অসদাচরণ করিতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার উদ্ধত ভাব অনেকাংশে তিরোহিত হয় এবং বিদ্যাশিক্ষাতেও উৎকর্ষ লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি সর্ব্বকার্য্যে মাতৃ-অনুগত হইয়া চলিতেন। মাতা যাহা বলিতেন, ভাল হউক, মন্দ হউক, তিনি তৎসম্পাদনে যত্নবান হইতেন; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ ব্যতীত কোন একটী সামান্য কার্য্যেও স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিতেন না। এস্থলে আবশ্যক বোধে আর একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। সপত্নীপুত্রদিগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করা ললনাকুলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! আমির জননী উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এ ধর্ম্ম পরিহার করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহার সপত্নীপুত্রদ্বয়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও হিংসা প্রকাশ ত করিতেনই, তদ্ভিন্ন পুত্র আমিরকেও তদ্রূপ আচরণ করিতে উপদেশ দিতেন। (ক্রমশঃ)

মোজাম্মেল হক্।

শিক্ষিত মুসলমানের ফটো।

শিক্ষিত মুসলমানের ফটোর কথা শুনিয়া হয়ত পাঠকবর্গ অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ফটোদর্শনাভিলাষে অত্যন্ত ব্যগ্র হইবেন; এবং চিত্রের অভাবে প্রবন্ধ লেখককে উপহাসও করিবেন। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে জীব ফটো উঠান নিষেধ সত্ত্বেও, উহার উল্লেখ কেন হইল পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

শিক্ষাই অজ্ঞান তিমিররাশি বিনাশ করিতে সক্ষম। শিক্ষার অভাবে

মানব জন্তু অপেক্ষাও হীনতার পরিচয় দিয়াছে। মহাজ্ঞানী সক্রেটিসকেও এথেন্সবাসীদের অশিক্ষা বশতঃ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্ঠুরভাবে মহা-জীবন শেষ করিতে হইয়াছিল। দুর্বুদ্ধি মানবই মহর্ষি মনসুরকে খণ্ড খণ্ড করতঃ হত্যা করিয়াছিল। কে না জানে মক্কার অজ্ঞানতাই মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) জন্মভূমি পরিত্যাগের কারণ। শিক্ষাই পোপের একাধিপত্য চূর্ণ করিয়াছে। শিক্ষাই পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য মণ্ডলীকে একতা ও প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ করিতেছে—শিক্ষাই তার বিহীন টেলিগ্রাফ প্রচলন করিতেছে—শিক্ষাই জড় জগতে জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে—শিক্ষাই মানবকে ঐশ্বরিক অবিচ্ছিন্ন প্রেমে বন্ধন করিতেছে—শিক্ষাই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতেছে। কে বলিতে পারে শিক্ষা আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট হইতে নিকটতর লইয়া যাইবে না?

সেই মহাশক্তি শিক্ষার অভাবেই মুসলমানসমাজ আজ মৃত, পদদলিত, ঘৃণিত এবং লাঞ্ছিত। মুসলমানের অশিক্ষাই হিন্দুজাতির দৌর্ব্বল্য। মুসল-মানের সহানুভূতি ব্যতিরেকে হিন্দু নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল। সেই সমাজে শিক্ষা বিস্তার নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্র। তাহাদের ঘোর মূর্খতায় গবর্ণমেণ্টও ভীত হইয়াছেন। পুলিশের অসীম ক্ষমতাও হার মানিয়াছে—বিচারকের কঠিন শাস্তিও পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তাই ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে নিম্নশিক্ষা বিস্তার নিমিত্ত ৪ চারি লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রাতঃস্মরণীয় হাজী মহসিন যিনি মুসলমানের শিক্ষার নিমিত্ত সমস্ত সম্পত্তি এবং নগদ ১২ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন তিনিই ধন্য। তিনি মরিয়াও অমর। তিনি স্বর্গের দেবতা। বঙ্গের প্রত্যেক কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসায় তাঁহার সাহায্যে কত যুবক অল্প ব্যয়ে সুখে ভোগ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। যিনি সমাজের এরূপ মহদুপকার করিয়া-ছেন, তিনি ইহলোকে পুজনীয় এবং পরলোকে ঈশ্বরের পরম প্রিয়। মহাত্মা হাজী মহসিনের সাহায্য ব্যতিরেকে অতি অল্প সংখ্যক যুবকই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন!

বড়ই পরিতাপের বিষয়, শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাদের এই সাহায্য দাতার কথা—এই ঋণের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন কিন্তু ডসনের বুট, এবং লেডল বার্ড্রার ঘড়ি ও জ্যাকেট এবং স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করিতেই তাঁহাদের অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। আবার

মনে করেন নাই যে তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কেহ কেহ অনুকরণ করিবে? হে অকৃতজ্ঞ মুসলমান হাকিম উকিলগণ আপনারা একবার ঋণের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত আছেন কি? অপরের নিকট আপনারা যেরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, অন্যেও কি আপনাদের নিকট সেইরূপ সাহায্য আশা করিতে পারে না?

ধর্ম্মের দোহাই দিতেছি না কারণ আপনারা ধর্ম্মের ধার ধারেন না। কর্ত্তব্যের দোহাই দিতেছি না কারণ আপনাদের অকর্ত্তব্য ভিন্ন কর্ত্তব্য নাই। আলস্য, নিদ্রা, এবং জড়তা পরিত্যাগ করুন। অপরিশোধনীয় ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে বা মুক্তিলাভের কি উপায় করিয়াছেন, বড় দুঃখে আজ তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রত্যেকে সেই মহাঋণ পরিশোধার্থে কি করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আর কতকাল অকৃতজ্ঞ নামে অভিহিত হইতে অভিলাষ আছে? নিজের এই অত্যুজ্জ্বল বিকৃত ফটো দেখিয়াও কি একবার কর্ত্তব্যের সাধনে তৎপর হইতে ইচ্ছা হয় না?

আজিজ মেছের।

শোক-স্মৃতি।

(কবিবর হেমচন্দ্রের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে)

তোমার 'ভারত ভিক্ষা',
জানাইল সুপ্তজনে
জননীর দুঃখ সমাচার।
মনে ইন্দুবালা
...পর শচী,
...ড়ে মনে পুলোম-নন্দিনী,

...শে
...ন দিবস যামিনী।

সে নহে ত দূরের কথা,
দেখিয়াছে জীবন-সাঁঝে
বীণায় বাঁধিলে পুনঃ তার,
"চিত্ত বিকাশে"তে সোনা
ব্যাকুল প্রাণের তব
শুনিলাম শেষ মোহ-তান!
ভেবে ছিনু ওগো কবি,
আর একবার তব
শুনিব কণ্ঠের বীণাতান,
সেই সাধ না পুরিতে,
আজি তুমি গেলে চ'লে
আকুলিয়া বঙ্গবাসী প্রাণ।
যাও তবে স্বর্গধামে,
দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ ধরা
থাক্ তব পশ্চাতে পড়িয়া,
অনন্ত শান্তির রাজ্যে
আছে বাল্মীকির পাশে
নিজ স্থান লও গো বাছিয়া!
দেখিবে তথায় তব
স্বদেশের প্রিয় কবি
বাণীপুত্র শ্রীমধুসূদনে,
জয়দেব, কৃত্তিবাস,
কাশীরাম, চণ্ডিদাস,
বিরাজিছে একই আসনে!
দেখিবে তথায় তুমি
ফেরদৌসী হাফেজ-সাদী
উজালিছে অমর আসর,
প্রতিভার পূর্ণ তেজে
দেখিবে তাঁদের মুখ
কি প্রশান্ত চিরদীপ্তিময়!
যে আভন-কবিহংসে
'জগতের কবি' বলি'
বরেছিলে পরম যতনে,
সে মহাকবিও তথা
বিহরে আনন্দ মনে;—
প্রেম-গীতি উছলে আননে!
'ভারতের কালিদাস',
বাণভট্ট ভবভূতি
কবিকুলে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
সকলে দেখিবে তথা,
শুনিবে তাঁহাদের বাণী,—
নবরসে অমৃত সঞ্চার!

ছিলাম বিজাতি আমরা ভারতে।

বিজাতি ছিলাম, আচার-বিচার, সকলি মোদের পৃথক ছিল,
প্রাণের বন্ধন সমাজ-মিলন তোমার সহিত কিছু না ছিল।
বসন ভূষণ সকলি পৃথক ভাষাও আপন পৃথক ছিল,
অভিনব জাতি ছিলাম আমরা, তোমার মনেতে সখ্য না ছিল।

স্বজাতি বলিয়া কভু তব সনে যদিও গো হায় বন্ধন না ছিল,
জানিগো কেমনে স্বজাতি মোদের আঁখির পুতলি তোমার হ'ল।
তোমারি প্রসাদে বাড়িল বিভব বিজয় দুন্দুভি ঘোষিত হ'ল,
অর্দ্ধচন্দ্র সহ ময়ূর আসন হীরা কোহেনূরে শোভিত হ'ল !
তোমারি কৃপায় বিপুল বিক্রমে সসাগরা ধরা কম্পিত হ'ল,
তোমার সহিত মিশিয়ে গেলাম, সুখের বাজার গুলজার ভেল !
কৃতজ্ঞতাপাশে চির বাঁধা মোরা, হায়, কি দুর্দ্দিন আজিকে এ'ল,
ভারত ! তোমার সে সকল দান, দুঃখের আঁধারে মিশিয়ে গেল।
আর কি বলিব,—তোমার ধনেতে পূর্ণ অধিকার তোমারি ছিল,
ইচ্ছামত তাই নিয়েছ কাড়িয়ে, দিলে পুনঃ যদি করুণা হ'ল।
দিয়েছিলে যাহা নিয়েছ কাড়িয়ে, তায় না মোদের আক্ষেপ ছিল,
তোমারি গো দান 'তাজ', 'মতি' আজ তোমারি বুকেতে দাঁড়িয়ে র'ল !
কিন্তু ফাটে প্রাণ হইলে স্মরণ, যাহা কিছু মম আপন ছিল,
ভারতে আসিয়ে খোয়ালেম তাহা, অধম কাঙ্গাল সাজিতে হ'ল !
মনুষ্যত্ব আহা, অপার্থিব ধন, মোসলেমের যাহা ভূষণ ছিল,
হারালেম তাহা ভারত প্রান্তরে, এই অবশেষে ললাটে ছিল !

নওশের আলি খান ইউসফজী।

স্বর্ণ-রেণু।

১। জীবন প্রজ্বলিত দীপতুল্য ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইহার শিখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। অথবা জীবন ভূধর-শিখরস্থ দ্রবশীল বরফরাশি সদৃশ; প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহার হ্রাস হয়।

২। অর্থের সদ্ব্যয়ে সম্মান উপার্জ্জন কর। তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া যদি জমা করিয়া রাখ, তাহা জমা থাকিবে না ; অন্যের উপভোগ্যে পরিণত হইবে।

৩। এই নশ্বর জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। সন্জর বাদশার রাজত্ব গিয়াছে; সোলেমানের অঙ্গুরীও তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে।

৪। অনন্ত কালে অনন্ত কোটী লোক কালের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এই প্রকার অনন্ত কাল চলিবে। জ্ঞানিগণ তাই ত সংসারে আসক্ত হয়েন না।

৫। তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাও, তজ্জন্য পুরস্কারের আশা করিও না। তোমার পরপারে স্বরূপ তোমার বাসস্থান, হয় অনন্ত সুখধাম স্বর্গে, না হয়, নরকে নির্দিষ্ট হইবে, কদাচ এই দুই স্থানের বাহিরে নহে।

৬। হে শক্তিশালিন! যে সময়ে তোমার সমস্ত শক্তি-সামর্থের প্রয়োগ করিলেও কিছু ফলোদয় হইবে না, সেই সময় আসিবার পূর্ব্বে তোমার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কর।

৭। তুমি যেটী যেমন দেখিয়াছিলে, সেটী তেমন ছিল না; আবার যেটী যেমন দেখিবে, সেটী তেমন থাকিবে না। হে মূঢ়, তবে কেন এ ছাই সংসারে আশার ঘর বাঁধিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ?

৮। তোমার শত্রুগণের মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হইও না, কারণ,—তোমাকেও ত একদিন মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

৯। নিজকে অজর ও অমর জ্ঞান করিয়া বিদ্যা এবং ধন উপার্জ্জন করিবে কিন্তু মৃত্যু শিরে দাঁড়াইয়া জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে।

১০। সুখ দুঃখ একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন, তজ্জন্য মানুষকে দোষী করা অন্যায়। মানুষের দ্বারা অনিষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহারই ইচ্ছায় তাহা; অন্য নহে!

আবদুল করিম।

সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন।

—:০:—

ইহা চির সত্য যে, গল্প গুজবের দ্বারা কদাপি জাতীয় জীবনের সংগঠন এবং পরিচালনা হইতে পারে না। বৈদিক যুগের পরে যখন অসংখ্য গল্প গুজব-পূর্ণ পুরাণ সমূহ রচিত হইয়াছিল উপনিষদ আয়ুর্ব্বেদ ও দর্শনালোচনা পরি-ত্যাগ করিয়া যখন আর্য্যকবিগণ পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তখন হইতে কি ভারতীয় আর্য্যগণ আর্য্যত্ব নষ্ট হইয়া "হিন্দু"তে পরিণত হয় নাই?

তাই বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ছড়াছড়ি, কুৎসিত উলঙ্গ কবিতার বহুল প্রচার এবং গল্প গুজবের বাড়াবাড়ি দেখিয়া মনে বড়ই আশঙ্কা হয়। বঙ্গের কবিকুলকে বিরহাকুল দেখিয়া অনেক সময়েই আমাদিগকে ভয়াকুল হইতে হয়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দুগণের দেখাদেখি, নব অভ্যুত্থিত মুসলমান লেখক-দিগের মধ্যেও অনেকেই উপন্যাস বিন্যাসে, ধর্ম্মহীন ভাসা কবিতা এবং উলঙ্গ প্রেমের অভিনয়ে একান্তই মাতিয়া পড়িয়াছেন। হায়! ইহা বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের পক্ষে নিতান্ত দুঃখ এবং অনুতাপের কারণ। অধঃপতিত সমাজ ইহাতে আরও অধঃপাতে যাইবে। এজন্য তাহাদের সাহিত্যক্ষেত্র এখনও কিছুমাত্র সংগঠিত হয় নাই—কেবল সূচনা হইতেছে মাত্র। এই অঙ্কুরাবস্থাতেই যদি সাহিত্যক্ষেত্রে বিষাক্ত 'আগাছা' সমূহ রোপিত হয়; তাহা হইলে, উহাতে আর উৎকৃষ্ট ফল ফুলের বৃক্ষবল্লী জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই বলিতেছি, ভ্রাতঃ! যদি প্রতিভা না থাকে—স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা না থাকে—যদি স্বর্গ হইতে কোনও শক্তি না লইয়া আসিয়া থাক—যদি ইতিহাস জীবনী প্রণয়নের ক্ষমতা না থাকে—যদি কাব্য ও প্রবন্ধ লিখিবার মস্তিষ্ক না থাকে—যদি দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলনের ধৈর্য্য ও শক্তি না থাকে—তবে অনর্থক এ পরিশ্রম ও বিড়ম্বনা কেন? যদি দেশের ও দশের উপকারের জন্য উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য লেখনী পরিচালনা করিতে পার, তবে সে লেখনী ধন্য! নতুবা লেখনীকে ইন্ধনে পরিণত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাই বলি, ভ্রাতঃ! নিজে মজিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। দেশকে দশকে মজাইয়া মহাপাপের বোঝা মাথায় লইবার আবশ্যকতা কি? লেখক হওয়া, কবি হওয়া বহুভাগ্য এবং বংশ পরম্পরায় সাধনার ফল। বহু সাধনা এবং তপস্যাবলে এ মহাপদ লাভ করা যায়। ইতিহাস খুলিয়া দেখ, মুসলমানদের উন্নতির যুগে তপস্তেজপূর্ণ ধর্ম্মপ্রাণ উন্নতহৃদয় প্রতিভাশালী—মহাজনগণ ব্যতীত আর কেহ লেখনী ধারণ করেন নাই। সাহিত্যক্ষেত্র যাহার তাহার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। প্রেমের হার, তৃষ্ণার জ্বালা, প্রথম মিলন ও বিদায় চুম্বনের জন্য সাহিত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিলনা। ভাইগণ, সাবধান হও—সাধ করিয়া মহাপাপীর মধ্যে গণ্য হইও না। বঙ্গীয় মুসলমানগণ পাপে পাপে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর মৃত দেহকে বিষাক্ত প্রেম-রস-বারি সিঞ্চনে পচাইও না। তাহা হইলে উহাতে আর জীবনীশক্তি সঞ্চারের আশা থাকিবে না। মনে রাখিও—তোমরা সম্পূর্ণ একটী ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। পরন্তু তোমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ও

উন্নয়ন। মনে রাখিও ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তোমারা মনের বল ও আত্মার তেজ হারাইয়াছ, জাতীয় আচার ব্যবহার ও সভ্যতা শূন্য হইয়া মুসলমান-জগতের বাহিরে পড়িয়াছ। তোমাদের সেই জলন্ত তেজঃপুঞ্জ পূর্ণ বীরমূর্ত্তি ভীরুতার ছায়ায় কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। স্মরণ করিও—তোমরা মুসলমান—পৃথিবীজয়ী অনলপ্রতাপসম্পন্ন একেশ্বরবাদী মহাজাতির অংশ। তোমাদিগকে সমগ্র জগতের মুসলমানদের সহিত একযোগে একই ভাবে ইস্লামের গূঢ় উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। মনে রাখিও, তুমি পবিত্র ও জলন্ত ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং তোমার সাহিত্যশক্তি যাহাতে পবিত্র ও জলন্ত ভাব লাভ করিয়া তোমার জাতীয় জীবনকে ও তদ্রূপ করিয়া তুলিতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখাই তোমার কর্ত্তব্য।

কবি, বক্তা এবং লেখকগণই এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় জীবন সংগঠনের একমাত্র উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে, উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা এবং সতর্কতার সহিত রসনা ও লেখনী পরিচালনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদিগেরই উপর বঙ্গীয় বিরাট মুসলমানজাতির পুনরভ্যুত্থান এবং সুখসৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সাহিত্যশক্তি এক্ষণে মুসলমানদিগের জাতীয় রাজশক্তি স্বরূপ। সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া—নিজের সখ মিটাইতে গেলে চলিবে না। আমাদের প্রতিবেশীর সাহিত্যের অনুকরণে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পুষ্ট করিলে কদাপি প্রকৃত মঙ্গলের আশা খুব বিরল। আমাদিগকে জাতীয় পবিত্র ভাষা আরবী, পারসী ও উর্দ্দু হইতে জাতীয় ভাব রুচি ও তেজঃরাশি লইয়া বঙ্গভাষাকে গঠন করতঃ আমাদিগের জন্য জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য আমাদিগের জাতীয় উন্নতিও জাতীয় জড় জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে। জাতীয় ভাষা আরবী, পারসী ও উর্দ্দু হইতে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রাদির অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতিহাস মুসলমানজাতির প্রাণ স্বরূপ। জাতীয় ইতিহাস ও মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যতীত মুসলমান-দিগের মৃতদেহে শক্তি সঞ্চারের কিছুমাত্র আশা নাই। কিন্তু হায়! আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস ও জীবন চরিত সঙ্কলনের অনুরাগ প্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে না। তৎপর যাহার তাহার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে—জাতীয় সাহিত্যের

এই ভিত্তি সংগঠনের সময়ে—লেখনী ও রসনা পরিচালনা করা কখনও মঙ্গলজনক নহে। তপস্তেজপূর্ণ পবিত্রহৃদয় জাতীয় হিত-চিন্তামগ্ন ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাজনগণই লেখনী ও রসনা পরিচালনার উপযুক্ত। যাঁহারা সত্যসনাতন পবিত্রতম ইস্‌লাম ধর্ম্মের গভীর উদ্দেশ্যে সদা অনুপ্রাণিত, জাতীয় অধঃপতনে যাঁহাদের হৃদয় নিয়ত মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধ হইতেছে, যাঁহাদের মনোবল স্বর্গীয় তেজে সদা উদ্দীপ্ত, তাঁহারাই এক্ষণে লেখনী পরিচালনা ও সাহিত্য সংগঠনের জন্য অগ্রগণ্য হইবার উপযুক্ত। কোন্ কালেই ব্রহ্মতেজ সন্দীপ্ত মহাপুরুষগণ ব্যতীত অপর কেহ জাতিসংগঠনে সক্ষম হন নাই। তাহা হওয়াও অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ভাই, বঙ্গীয় মুসলমান লেখক ও কবিগণ! কেবল নিজের সখ মিটাইবার জন্য বা ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা ও অনুরাগ ভাজন হইবার জন্য কদাপি লেখনী পরিচালনা করিও না। তাহা কি নিতান্তই স্বার্থান্ধতার পরিচায়ক নহে? তোমাদের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা অবতীর্ণ হও;—বিমল উদার হৃদয়ে জাতীয় জড়জীবনে ধর্ম্মবত্তা এবং বৈদ্যুতিক তেজঃ সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী সঞ্চালনার্থ প্রবৃত্ত হও। পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ যেমন বজ্র-বহ্নি-বিদ্যুৎ-ঝঙ্কার-প্রতাপ লইয়া জলজিহ্ব কৃপাণ সঞ্চালনে বাধাবিঘ্ন এবং পাপ তাপরাশি নাশ করিয়া আপনাদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমাদের লেখনী ও রসনা সত্য ও পবিত্রতায় দীপ্ত তেজঃরাশি লইয়া সেইরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হউক। তোমাদের লেখনী হইতে ইস্‌লামের প্রদীপ্ত প্রভাপুঞ্জ, মেঘবিচ্ছিন্ন মধ্যাহ্ন-মিহিরের প্রোজ্জ্বল ময়ূখমালার ন্যায় অযুত প্রবাহে বিচ্ছুরিত হইয়া জাতীয় জীবনকে আলোকিত পুলকিত ও সুশোভিত করিয়া তুলুক। জাতীয় জীবনের আলস্য-ঔদাস্য-জড়তা-মূর্খতা-দীনতা-মলিনতারূপ ধ্বান্ত তিমির পটল একেবারে বিলুপ্ত হউক।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, সাহিত্যশক্তি 'জাতীয় জীবন' সংগঠনের প্রধানতম এবং প্রবলতম উপায়। দেশে দিন দিন সাহিত্যের আলোচনা বৃদ্ধি ইতেছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশের লোক তদনুরূপ ধার্ম্মিক চরিত্রবান ন্তাশীল ও সন্নীতি পরায়ণ হইতেছে কি? চরিত্র ও নীতিবল ব্যতীত তি ও কোন্ দেশ কবে অবনতি-গহ্বর হইতে উদ্ধৃত ও উন্নত হইয়াছে? কৈ দূরে থাক্—আমাদের দেশের লোক কি দিন দিন চরিত্র ও সততা ষ্ট হইতেছে না? আমাদের শিক্ষিতদের—বিশ্ববিদ্যালয়ের

জাস্যুয়েটদের মধ্যেই বা কয়জন চরিত্রবান আদর্শ মহাত্মা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? এই যে, দেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রতি লোমকূপ হইতে কাম প্রবৃত্তির সুতীব্র পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে—এই যে দিন দিন পল্লীতে পল্লীতে থিয়েটার ও বারাঙ্গনালয় স্থাপিত হইতেছে—দেশ হইতে সংযম ও সাধুতা পবিত্রতা ও সরলতা একেবারে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; সাহিত্যের কুৎসিত উত্তেজনা ও অশ্লীল দৃশ্য কি ইহার একটী প্রধান শক্তিশালী কারণ নহে? যে বারাঙ্গনা স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পাপের সাক্ষাৎ অবতার এবং নরকের কীট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত—যে দেশের সাহিত্যে এহেন ঘৃণিত নরকবাহিনী-কুলটা, কবির কল্পনা ও লেখনী সংযোগে "যৌবনে যোগিনী" রূপে বর্ণিত এবং পবিত্রতায় পুষ্পের সহিত উপমিত; সে দেশে আর নৈতিক জীবন ও ধর্ম্মবলের আশা কোথায়? যে দেশের শান্তিরসময় ব্রহ্মসঙ্গীতের পার্শ্বেই পিশাচ পিশাচিনীর উলঙ্গ প্রেমসঙ্গীত স্থান পায়, সে দেশে যে হার্কিউলিনিয়াম বা পম্পেয়াই নগরের ন্যায় বিধাতার অভিসম্পাতরূপ কালানলে এখনও ভস্মীভূত হয় নাই, ইহাই বিধাতার অপরিসীম করুণা! এই যে, দেশের স্কুলের কোমলমতি ছাত্র হইতে কলেজের তরুণ বয়স্ক যুবক এবং আফিসের পরিণত বয়স্ক কেরাণী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই নানাবিধ কুৎসিত কদর্য্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বঙ্গের ভাবী বংশধরগণকে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য এবং শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে; এই যে, অনবরত দেশের সর্ব্বত্র মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার জন্য অসংখ্য প্রকারের তৈল এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য সংখ্যাহীন পেটেণ্ট ঔষধ বাহির হইতেছে—এই যে, দেশের শত শত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রত্যহ পাপজনিত কদর্য্য পীড়া সমূহের ঔষধ ও চিকিৎসার অশ্লীল বিজ্ঞাপনমালা অঙ্গে ধারণ করিয়া লজ্জা ও নীতির মাথা খাইয়া পাপের দিকে—ব্যভিচার ও কদাচারের দিকে জন সাধারণকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে; ইহা দ্বারা কি দেশের ধর্ম্মভাব চরিত্রবল এবং পবিত্রতার পরিমাণ করা যায় না? এ সমস্তের মূলে কি দেশের যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, প্রহসন, গীতি কবিতা, প্রেম কবিতা, প্রেম কাহিনী এবং কদর্য্য সঙ্গীতের আদৌ প্ররোচনা ও প্রবর্ত্তনা নাই, ইহা কি কেহ বলিতে পারেন? যিনি যাহাই বলুন না কেন, কুৎসিত সাহিত্যের অশ্লীল ভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে!! হায়! এমন কি কেহ নাই—যিনি এই পৈশাচিক কদর্য্য

সাহিত্যের মূলে সমালোচনার বিষদিগ্ধ তীব্র কুঠার প্রহার করেন ? কে আছ বঙ্গের সুসন্তান ? এস, পবিত্রতম মাতৃপ্রতিম বঙ্গভাষাকে চরিত্রহীন কুৎসিত-স্বভাব ঔপন্যাসিক এবং ভণ্ড কবিকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও। কে আছ, স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত ! এস, কুকল্পনা কুচিন্তা কুদৃশ্য এবং কদর্য্য-ভাব হইতে মাতাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসেবকগণ, সাবধান এবং সতর্ক হও। পরের অনুকরণ করিতে যাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িও না। ইস্লামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া ভ্রমেও সাহিত্যসেবা করিও না। যদি বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও, যদি সাহিত্যশক্তি-প্রভাবে জাতীয়জীবনতরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও—যদি বঙ্গসাহিত্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও কুশল কামনা কর; তাহা হইলে সর্ব্ব-প্রকার কুচিন্তা কুকল্পনা ভীরুতা এবং দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও, বদ্ধপরিকর হও। সুচিন্তার উদ্যানে উচ্চ কল্পনার স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বায়ুতে ইহাকে বিচরণ করিতে দাও। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মবীরদিগের পবিত্র জীবনীর সৌন্দর্য্যরাশি সাহিত্যে প্রতিফলিত কর। পুরাবৃত্তের দৃশ্য প্রকটন করিয়া মানব জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন্ কোন্ গুণে উন্নত এবং কোন্ কোন্ দোষে অধঃপতিত বা ধ্বংসের আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে, তৎসমুদয় দেখাইয়া দাও। জাতীয় ইতিহাস হইতে মহর্ষিগণ ও বীরেন্দ্রবর্গের প্রোজ্জ্বল জীবন চরিতাবলী সঙ্কলন কর। যে সমস্ত দোষে আমরা প্রকৃত মুসলমানের প্রভাব ও জীবন হইতে সহস্র যোজন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি; তৎসমুদয়ের মূলোৎপাটনে অগ্নিময়ী লেখনী এবং বজ্রনাদিনী রসনা পরিচালনা কর। উচ্চচিন্তায় উচ্চকল্পনায় সমাজকে মাতাইয়া তোল। প্রাণের উচ্ছ্বাসে—হৃদয়ের তেজেঃ—সত্যের প্রচারে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ কর। দেখিবে, সাহিত্যশক্তির ঝটিকা প্রভাবে অচিরেই জাতীয়-জীবন মেঘোন্মুক্ত হইয়া সৌভাগ্যশশীর অমল ধবল কৌমুদীচ্ছটায় আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়াছে।

সমাপ্ত।

সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন।

বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য।

পৃথিবীতে সভ্য ও অসভ্য সকল জাতিরই এক একটা নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য আছে। দেশ প্রচলিত ভাষাই কোন জাতির মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের সকলের মধ্যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা 'মাতৃভাষার' স্থানাধিকার করিয়া নাই। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা মুসলমান-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গলার অন্যতর অধিবাসী হিন্দুগণের সহিত একতার কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও একটা ভাষাগত একতা সংস্থাপিত হইতে পারিতেছে না; এবং এই একতার অভাবই বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তি-বিকাশের একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অস্বাভাবিক অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা কি কর্ত্তব্য নহে?

বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত আমরা সর্ব্বতোভাবে এক দশাপন্ন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার। কত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ হিন্দুগণ বাঙ্গালীজাতির নেতৃত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন! সুসময়ে উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজবপন করিতে পারিলে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। রাজা রামমোহন, ভূদেব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি স্বনামধন্য মহাত্মাগণের ঐকান্তিক সাধনা ফলপ্রদ না হইয়া যাইবে কেন? তাঁহাদের উদ্দীপনায় মোহনিদ্রা টুটিবে না ত কি? হিন্দুজাতির এই অভ্যুত্থানে বঙ্গভাষার কার্য্যকারিতা কে অস্বীকার করিবে? জাতি বিশেষকে স্বকর্ত্তব্যে প্রণোদিত করিবার পক্ষে জাতীয় সাহিত্যই এক প্রধান উপায়। বস্তুতঃ কোন জাতিকে মন্ত্র বিশেষে দীক্ষিত করিতে হইলে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য দ্বারাই সেই মন্ত্র দিতে হয়। কিন্তু আমাদের সেই ভাষাই কই? সেই মন্ত্রদাতাই কই? দেশে ভাষা ও সাহিত্য যাহা আছে, তাহাকে আমরা পর বলিয়া অবহেলা করিয়াছি এবং করিতেছি,—অথচ নিজ চেষ্টায়ও নিজস্ব জাতীয় সাহিত্যের গঠন করি নাই। আমরা কোথায় পাইব উদ্দীপনা? কোথায় পাইব মন্ত্র? লোক যে মাটীতে আছাড় পড়ে, তাহার পক্ষে সেই মাটী ধরিয়া উঠাই নিয়ম

কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিয়া সেই সনাতন নিয়মের ব্যাঘাত করিতেছি। আমাদের দুর্দ্দশা না হইবে, ত হইবে কাহার?

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের কিছুই নাই, বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ‘নাই, নাই,’ বলিয়া চীৎকার করিলেই আমাদের নিজস্ব একটা ভাষা হইবে? না, অবশ্য চেষ্টা করিতে হইবে? কিন্তু কই চেষ্টা? কই চেষ্টা করিবার লোক? যাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের দৃষ্টি নাচ গানে, অর্থের দিকে এবং উপাধির দিকে। সভা করিয়া বক্তৃতার চোটে গগন বিদীর্ণ করিলে ত ‘কিছু নাই’ কখন ‘কিছু’ হইবে না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া পাথর ছেদ করিতে পারে; একটু একটু কাজ করিয়া কি আমরা কিছুই করিতে পারি না? কিন্তু যার মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা হইবে কেন? আমাদের যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নাই, তখন চেষ্টা করিব কোন্ ভাষায়? উর্দ্দু, পারস্য ইত্যাদি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মাতৃভাষা বা জাতীয়ভাষা স্বীকার করিলেও, বর্ত্তমান কালে তাহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালার ভাষা স্বীকার না করিলে কোন প্রত্যবায় নাই এবং সত্যেরও অপলাপ হয় না। তাহাদিগকে আমরা সসম্মানে জাতীয় ধর্ম্ম-ভাষার আসনে বসাইয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। মাতৃভাষা জাতীয় ভাষার স্থানীয় না হইলে কোন জাতির অভ্যুদয়ের আশা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাক্ অত কথা। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বকালে হিন্দুদের মত বঙ্গীয় মুসলমানগণও একটা নিজস্ব বাঙ্গালাসাহিত্য গঠনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। সে ক্রম অবিচ্ছিন্ন ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে আজ আমাদিগকে "বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান পাঠ্য কিছুই নাই" বলিয়া হা হুতাশ করিতে হইত না। এ অকিঞ্চন লেখক আজ বহু বৎসর ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত। তাঁহার গবেষণার ফল সমস্ত প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, বস্তুতই মুসলমানদেরও একটা স্বজাতীয় ভাষা বাঙ্গালায় গঠিত হইতেছিল। সেই ভাষাই ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। মধ্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমরা লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার পর ইংরেজ সমাগমে নূতন কুহকে পড়িয়া সেই লক্ষ্যচ্যুত হই, তাহাতেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ। আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুর বিপরীত আচরণ করিতে পারিলেই আমাদের পবিত্র স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইল।

তাহাই ও হিন্দুগণ ভাষা বাঙ্গালাকে অবহেলা করিয়া আজ আমরা সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া! আবার যে পাঠক সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!"]

বলিতে কি, বাঙ্গালাভাষা ত্যাগ করিলে বঙ্গীয় মুসলমানের কোন মঙ্গল আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। যদি কখনো অধঃপতিত বাঙ্গালীর উদ্বোধন হয়, তবে বাঙ্গালার অনুতাপ-গামিনী বাণী ও অনলগর্ভা উদ্দীপনাতেই হইবে। তবে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেইরূপ স্বজাতীয় ভাষা আমাদিগকে গঠন করিয়া লইতে হইবে। সকলে সমবেত চেষ্টা করিলে তাহাতে সফলকাম হইব না কেন, তাহার সন্দেহ নাই। জগতে চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

নূতনকে বরাবরই প্রাচীনের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? জাতীয় গৌরব হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম না হইলে কোন জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে না। কি পরিতাপ, আমরা এতদূর অধঃপাতে গিয়াছি যে, আমাদের কি ছিল, না ছিল, তাহা দেখিবার প্রবৃত্তিও কাহারো হইতেছে না! উন্নতিই বল, আর স্বজাতীয় সাহিত্যই বল, তাহা কি আপনিই হয়। বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের এখনো যাহা আছে, তাহা রক্ষা করিয়া তাহাকে সহজেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থানীয় করিতে পারি, এবং সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা স্বজাতীয় সাহিত্যের নূতন সূত্রপাত করিতে পারি। এই নবীন যুগের সার মন্ত্র, গোঁড়া গোঁড়ামী বর্জ্জন সকলের কঠোর সাধনা চাই। কারণ "যতন নহিলে, কোথা মিলয়ে রতন!" সকলে ঐকান্তিক মনে একবার এই সাধনায় প্রবৃত্ত হউন, দেখিবেন বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য সৃষ্ট হইতে বেশী দিন বিলম্ব হইবে না। * মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হইবেন। যেই দিন আমাদের মতিগতি এই শুভকার্য্যের দিকে ফিরিবে, সেই দিন বঙ্গীয় মুসলমানজাতির জীবনে নবযুগের অবতারণা হইবে। তদ্ব্যতীত কেবল বাক্য প্রণালিতে কিছুই ফলোদয় হওয়ার নহে।

আবদুল করিম।

* আমরা আমাদের স্বজাতীয় বন্ধুগণকে একবার বোম্বের পার্শী সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। উঁহারা গুজরাটি ভাষাকে মাতৃভাষার পদে বরণ করিয়া নিজেদের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়া লইয়াছেন। পার্শী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত গুজরাটি ভাষা আজকাল তাঁহাদের সম্যক চেষ্টাবলে উন্নত হইতেছে। আমরাও কি উন্নতিশীল পার্শী সম্প্রদায়ের পদানুবর্ত্তী হইয়া বঙ্গভাষার সেবা করিতে পারি না? এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে? সং সং।

কবিতা-গুচ্ছ ।

প্রেমের চিত্র ।

দূরে সে দাঁড়ায়ে আছে যেন
অভ্রভেদী উচ্চশৃঙ্গ গিরি,
বহিতেছে প্রেম-প্রস্রবণ,
হিয়া তার ফাটি ধীরি ধীরি !

আমি মহাপাতকীর মত
পবিত্র সে প্রণয়ের স্রোতে
দেহ-মন দিয়েছি ভাসায়ে,
পুণ্যে তার উদ্ধার লভিতে !

বাসনা ।

সংসারের যাতনার মাঝে
কেন মোরে টানিবারে চাও,
দূরে দূরে আছি আমি বেশ,
দূরে দূরে থাকিবারে দাও ।
আমি ত বুঝি না ভাল হায়,
কারে বলে সংসারের জ্ঞান,
কি যে সুখ লভিব তাহাতে
প্রাণ মোর পায়না সন্ধান !
পরের মুখের গ্রাস নিতি
কাড়ি নিয়া কি লাভ আমার ?—
পরের সুখের পথে সদা
বিছাইয়া কণ্টক অপার !
কাহারো নয়নে অশ্রুরাশি
দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত করি,
আমি কি লভিব শান্তি ?—হায়,
প্রাণ যে গো উঠিবে শিহরি ।
হারাইয়া সর্ব্বস্ব তাহার
কে কোথা কাঁদিছে দিবানিশি,
আমি কি তাহার কাছে গিয়ে
হাসিব গো উপেক্ষার হাসি ?
আজি আমি অপরের প্রাণে
ঢালি যদি বিষাদের ভার,
একদিন হতে পারে কভু,
যেদিন এ জীবন আমার
অশান্তি, বিদ্রোহ মাঝে পড়ি,
শান্তি আশে বেড়াবে ঘুরিয়া
ঝঞ্ঝাহত নক্ষত্রের মত ;
হৃদয়ের কূল-কূল ছাপিয়া
উঠিবে বিষাদ-গান সদা ।
সেই দিন, সেই দিন যদি,
যাতনার অঙ্কুশ-প্রহারে
ব্যথা দেয় মোরে নিরবধি
সে কি তার হবে দোষ ?
সে নহে কি পূর্ণ প্রতিদান ?
যেমন দিয়েছি আমি তারে
এ নহে কি তাহারি সমান ?
এই যদি সংসারের খেলা,
এ খেলা খেলিতে সাধ নাই,
আছে কি না কোথা শান্তিধাম
আমি তাহা খুঁজিয়া বেড়াই ।
কোন দূর তটিনীর কূলে,
লোকহীন কোন গিরিবুকে,
যদি পাই সে কাম্য-আশ্রম,
জীবন কাটাব তথা সুখে ।
গিরি নদী উপলে চুম্বিয়া
বহে যাবে আকুলিয়া প্রাণ,
আশে পাশে শ্যামল বিটপি
দাঁড়াইবে ভেদিয়া পাষাণ ।
তারি মাঝে লুকাইয়া দেহ
অনুদিন প্রদোষে-উষায়,
পাখীগুলি উঠিবে কূজিয়া,
উল্লাসে বহিবে মৃদু বায় ।
প্রভাতে অরুণ আগে উঠি
শত শত হরিণের পালা,
নেহারিবে আমারে নির্ভয়ে
আনন্দে করিবে কত খেলা ।
সংসারের ঘোর কোলাহল
তথা নাহি পশিবে কখন ;
আমি শুধু দেখিব এ সব,
স্বপনে রহিব নিমগন ।
গান শুধু পশিবে এ কাণে,
ভাব তার সকলি সুখময়

প্রভাতের মলয় পবনে
হবে তাহা আরো মনোহর।
কলকণ্ঠ পাখীগুলি গাহিবে
উল্লাসে ফিরিবে নীড়ে সবে,
ফুটিবে এ অতুল পরাণ,
আকাশ উথলি গানে গানে।
ধীরে ধীরে ভাসিবে গগনে
শত শত তারকার রাশি,
মাঝে মাঝে তাহাদের সনে
ফুটিয়া উঠিবে শশী হাসি।
কভু কাল বৈশাখী সন্ধ্যায়
মেঘে মেঘে আকাশ ছাইবে,
চঞ্চলা চপলা বালা সাজে
মনো সাথে ছুটিয়া বেড়াবে।
সৌন্দর্য্যের সে মহা সাগরে
আপনারে দিব ডুবাইয়া,
অমর সে অতলপরশে
চিরদিন রহিব ঘুমিয়া।

আশ্রিতা।

শত অপরাধী যেন অভাগিনী তব পায়,
তবুও ত অভাগিনী ও চরণে ক্ষমা চায়।
ক্ষমিবে কি প্রভু তারে, বল তাই একবার,
ইহা ছাড়া আর কিছু নাহি মোর সুধাবার।
ভুলে যদি থাক নাথ, ভুলে তবে যাও তারে,
কোন প্রভু মনে মনে ভুলিবে না যে তোমারে।
শুধু স্নেহমাখা তার লিপিকা লেখখানি,
তোমা ছাড়া আর কারে জানেনা সে অভাগিনী
তোমাতে সরল মনে যে ঢেলেছে মন প্রাণ,
নিঠুর হইয়ে তারে করিবে কি প্রত্যাখান?

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতা।

ভ্রাতঃ
যুগ যুগ ব্যাপি' দারুণ অবজ্ঞা
পরস্পর পরস্পরে,
করেছি দোঁহেই ক্ষুদ্র মাঝারে
ভুলিনি অপেক্ষা ভবে।
তুমিও আমারে দিয়েছ বেদনা
আমিও দিয়েছি ব্যথা,
আমিও শুনিনি বচন তোমার
তুমিও শোননি কথা।
জনমের পর জনম আসিয়া
গেছে সব রাশি রাশি,
নিয়তির চক্রে-ঘুরিয়া ফিরিয়া
নিয়ত ফেলিছে শ্বাস'।
আসিয়াছে আজ ;—বুঝেছি এখন
যার দয়া মোর প্রাণ,
তিনিও তোমায় আমারি মতন
করেন সুখ দান।
বুঝেছি এখন মায়ের তনয়
তুমি যে মোদের ভাই,
বুঝেছি এখন যথা মোর গেহ
তথায় তোমার ঠাঁই।
বুঝেছি এখন ঘেরিয়ে মোদের
দারুণ দুখের ঘোর,
হরিছে মোদের মুখের অন্ন
বঞ্চক বিদেশী চোর।
বুঝেছি মোদের বিদেশ ঘৃণায়
ভারত জননী—মরি,
দিনমান আজি দুঃখ-দীনতায়
দাসত্ব-নিগড় পরি।
বুঝেছি এখন একতা বিহীন
হেরিয়ে মোদের হায়,
শৃগাল কুকুরে নিতুই অধমে
দলিছে কঠিন পায়।
বুঝেছি সকল তবু মোরা ভাই
এখনো রয়েছি সুপ্ত,
অতীতের সাথে অতীত গৌরব
এমনি হয়েছে লুপ্ত।
উন্নতির পথে ধাবিত জগত ;—
বিচারি' মানাপমান,
রয়েছি আমরা শ্মশান-শয়নে
এখনো মুহ্যমান।
মোদের জননী ভুবন পালিনী
ক্ষুধায় মরিব মোরা?
শত পদাঘাতে কেহই মোদের
পারেনা করিতে সোজা?
বিস্মৃতির জলে ডুবায়ে সকল
আসি' নবজীবন-মাঝে,
এস আজি ধীরে জাগরি মোরা'
একই মহান কাজে।

দু'জনা দু'জনে ক্ষমি' অপরাধ
এস আজি মোরা ভাই,
প্রেম-আলিঙ্গনে দোঁহে বাঁধি দোঁহে
সব ব্যথা ভুলে যাই।
দু'জনার অশ্রু দু'জনে মুছা'য়
এস আজি করি পণ,
দু'জনার বলে দু'জনা বলিষ্ঠ
হয়ে রব আমরণ;

দু'জনার শক্তি মিশায়ে তা'পর
মহাশক্তি করি এক,
এক যজ্ঞে তাহা অর্পি' মায়ের
মুছিতে মরম-শোক।
হেরিবে বিশ্ব সবিস্ময়ে চাহি'
ভারত নহে গো মরা,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় নাহিকো বিরোধ
পারে গো শাসিতে ধরা।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মাসিক সাহিত্য।

বঙ্গভাষা। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। আমরা আমাদের এই নবীন সহযোগিনীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি আগরতলা রাজপরিবারের যে প্রাণের টান আছে, এই পত্রিকাখানা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'বর্ণ ও ভাষা' এবং 'প্রকৃতির পাঠশালা' বর্ত্তমান সংখ্যার উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ। 'বর্ণ ও ভাষায়' লেখক স্ত্রীলোক হইতে ভাষার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ব্যাকরণ শাস্ত্র আলোড়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই, কোষশাস্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গের সহিত শব্দাবলীর যত প্রবল সম্পর্ক, পুংলিঙ্গের সহিত তত নহে। প্রধান প্রধান রূঢ় ও যৌগিক শব্দ এবং তাহাদের মৌলিক ধাতু লইয়া বিচার করিলে, স্ত্রীলিঙ্গের প্রাধান্য ও লঘুতা দেখিতে পাই; সুতরাং লিঙ্গের সহিত ভাষার সম্পর্কের কথা উঠিলে, আমরা বলিতে বাধ্য যে স্ত্রীলিঙ্গ ও স্ত্রীজাতির সহিত ভাষার যেন একটা স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।" লেখকের মতে "শ্বেতবর্ণ বা সৌন্দর্য্যের সহিত ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। যে জাতির চর্ম্মের বর্ণ শ্বেত বা সুন্দর সেই জাতির ভাষা সমধিক উন্নতিশালিনী, তেজোময়ী, সৌন্দর্য্যসম্পন্না, সমৃদ্ধিপূর্ণা এবং স্বাধীনভাবসমন্বিতা। যাঁহারা সুন্দর শরীরী আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের দ্বারা এ বিশাল বিশ্বের কেবল সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে, এরূপ নহে, ইঁহাদের চেষ্টায় ভাষার উৎপত্তি, উন্নতি এবং বিস্তৃতি সম্পাদিত হইয়াছে। আর্য্যেরা ভাষা বিষয়ে অনার্য্যকে চিরকালই পরাস্ত করিয়াছে। সুন্দরবর্ণের মানব কদর্য্যবর্ণের মানবকে ভাষা ও সাহিত্যে কখনও মস্তকোত্তলন করিতে দেয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, বর্ণের সহিত ভাষার যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।" আমরা নবীন সহযোগিনীর নিয়মিত প্রচার এবং দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

আরতি। পৌষ ও মাঘ, ১৩০৯। ৭ম, ৮ম সংখ্যা। এবারকার আরতি যদিও পূর্ব্বের মত নয়নরঞ্জন বেশে বাহির হয় নাই, তথাপিও আমরা বলিতে বাধ্য প্রবন্ধ-গৌরবে আরতি বড়ই উজ্জ্বল হইয়াছে। অনিয়মিত প্রচার আরতির প্রধান দোষ, নতুবা সাহিত্যের হিসাবে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত কোন পত্রিকাই ইহার সমকক্ষ নহে। 'কটিকগ্রথ' তত ভাল হয় নাই। লেখক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের ভাষা স্থানে স্থানে বড়ই কর্কশ এবং বহু স্থানে ব্যাকরণ-দুষ্ট। তাঁহার 'বঙ্গবাসিনী মুসলমানী রমণী' পদ পাঠ করিয়া আমরা

ও মুসলমানের সর্ব্বাংশে সুধার চক্ষে দেখেন ; আমরা নির্ভীকতাতিশয় সহকারে তাঁহাদিগকে আরতির এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে তাঁহাদের ও আমাদের উভয়েরই লাভ আছে। আরতির অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'চাকিয়া 'পত্রের' নামক কবিতাটী বড়ই ভাল লাগিল।

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। হরিসাধন বাবু উৎসাহের এই সংখ্যায় 'বাদশাহী রাজ-দণ্ডবিধি'র আলোচনা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন আমরা এমতও ভরসা করিতে পারি। তিনি সপ্তদশ শতাব্দির ভারতবর্ষীয় দণ্ডের ইতিহাস পাঠে কঠোরতার নির্মম ছবি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং মুসলমান নৃপতিগণ যে অতিমাত্রে কঠোর ছিলেন একথা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহার ইহাও স্মরণ করা উচিত ছিল যে, যে সুসভ্য ন্যায়পরায়ণ জাতির অধীনে তাঁহারা ও আমরা এখন বাস করিতেছি সেই জাতির দণ্ডের ইতিহাসও ৬০ বৎসরের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ কলঙ্কশূন্য ছিল না, বরং কঠোরতায় তাহা মুসল-মান রাজগণের দণ্ডবিধানকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সামান্য চৌর্য্যাপরাধেও ইংলণ্ডে প্রাণদণ্ড হইত লেখক কি সে কথাও বিস্মৃত হইয়াছেন? সপ্তদশ শতাব্দির সহিত বিংশ শতাব্দির শাসনেতিহাসের তুলনা করা বাতুলতা বই আর কি বলিব। জগৎ যে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এ কথাটীও কি তাঁহার মনে নাই? ঐতিহাসিক আলোচনায় নানাস্থানে তাড়না প্রাপ্ত হইয়াও হরিসাধন বাবু যে তাঁহার চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। 'মক্কাযাত্রা' দ্বিতীয় প্রস্তাবে মহাভারতী মহাশয় মক্কার যৎসামান্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই তিনি পরিব্রাজক বেশে কখন মক্কা গিয়াছিলেন? আমরা সর্ব্বদাই অনৃত বাক্য শ্রবণ করিতে ঘৃণবোধ করি। তিনি হিন্দুবেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থে মক্কা গমন করিলেন, আরব-বাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল, তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইল, এসব কথা কি ঠিক? যে আরববাসীগণ ইস্‌লাম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের চর্চ্চা, কোরাণ শরিফ ভিন্ন অন্য গ্রন্থ পাঠ, পাপ বলিয়া মনে করে, তাহারা কি যথার্থই মহাভারতী মহাশয়ের বাক্যসুধাপানে প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন? আমাদের বিশ্বাস তিনি কোনও খৃষ্টান মিশনরীর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ করিয়া বাহাদুরী নিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ভিরো জিয়ো ও তাঁহার শিক্ষার প্রভাব' নামের হিসাবে খুব চিত্তাকর্ষক ; কিন্তু প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সেই উদারহৃদয় অধ্যাপকের শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। 'উৎসাহে' ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের সংখ্যা কম হইতে দেখিলে সুখী হইব।

সুধা। ৩য় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। প্রথমেই সহকারী সম্পাদকের 'সিন্ধুযাত্রা' নামক কবিতা। সমুদ্রতটস্থিত পুরীতে লিখিত হইলেও ইহাতে উদার উচ্ছ্বাসের কণামাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং 'উদল' 'উদাম' প্রভৃতি শব্দ অতি কষ্টে সহ্য করা যায়। 'ভারতে মুসলমানাধিকার' অতি পুরাতন কথার পুনরালোচনা। 'নীতিশিক্ষার' উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ডাক্তার মল্লিকের জীবনী পরিস্ফুট হয় নাই। আমরা সাপ্তাহিকে এই কর্ম্মবীরের জীবনের যেমন ঘটনার কথা পাঠ করিয়াছি, সুধার লেখক তাহারও অনেকগুলির উল্লেখ করেন নাই। 'ঢাকার প্রাচীন কাহিনী' ও 'মোগলরাজত্বে ঢাকা' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এতদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অন্ধকারাবৃত প্রাদেশিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইবে। আমরা ভরসা করি, সুধায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের যথোপযুক্ত আলোচনা দেখিতে পাইব। সুধার নিয়মিত প্রচার দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম।
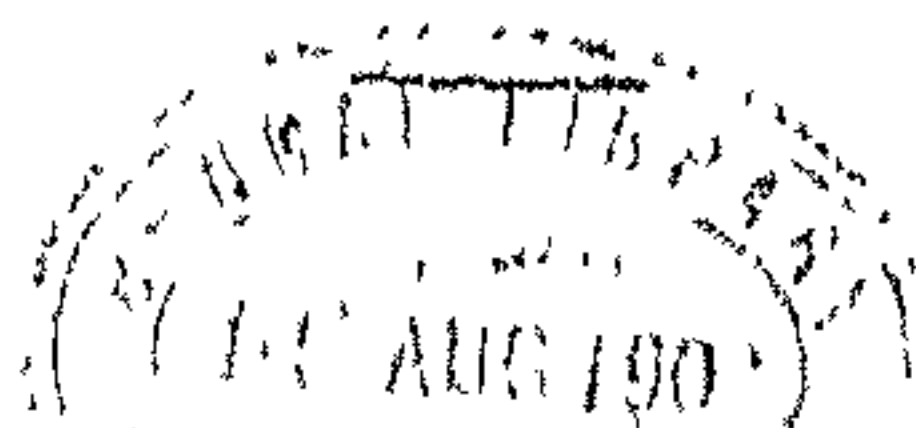
প্রাচীন মুসলমানী গীত-মালা।

প্রাচীন বাঙ্গালা-পুঁথি-অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি আমরা এ পর্য্যন্ত এতগুলি পুঁথির আবিষ্কার করিয়াছি যে, দীনেশ বাবু ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, সমগ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও তত-গুলি পুঁথির সত্তা অনেকে অনুমান করিতে পারেন নাই। এ বিশাল বাঙ্গালা দেশে প্রাচীনকালে কত পুঁথি বিরচিত হইয়াছিল, আজও তাহা সম্যক্ নিশ্চিত হইতে বিলম্ব আছে। আমাদের অনুসন্ধানফলে চট্টগ্রাম হইতেই বহুল হিন্দু ও মুসলমান কবির আবির্ভাব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এখনো কোথায় কত কবি অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া অভিশপ্ত বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার দিতেছেন, কে বলিবে? দুঃখের কথা, এই বিস্তীর্ণ বঙ্গরাজ্য হইতে আর কোন মুসলমান এইরূপ কার্য্যে ইতিপূর্ব্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই; তাহাতে মুসলমানগণের নিজস্ব কোন সাহিত্য বঙ্গভাষায় ছিল কি না, জানিবার সুযোগ কেহ পান নাই। এই বিষয়ে আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা হইতে আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, প্রাচীন মুসলমানগণও তাঁহাদের নিজস্ব একটা বাঙ্গলা-সাহিত্য গঠনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। দৈবযোগে সেই ক্রম-সূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই বর্দ্ধমান সাহিত্য অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে যে অল্পসংখ্যক মুসলমান উক্ত শুভকার্য্য সম্পাদনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, আজ যদি তাঁহাদের কীর্ত্তিরাজি বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তবে বঙ্গদেশে মুসলমানরাজত্বের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিন্ন আর কিছুতেই সূচিত করিতে পারিত না! আনন্দের কথা যে বঙ্গভাষার প্রতি আমাদের ঐকান্তিকী উদাসীনতা সত্ত্বেও বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসে মুসলমান কবির কীর্ত্তিকথা বাদ যাইতে পারে নাই! অধঃপাতে গেলে, লোকের নাকি বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। আমরাও আজ অধঃপাতে যাইয়া বুদ্ধিহারা হইয়াছি। বুদ্ধিহীনতার দোষেই আমরা আজ বঙ্গভাষা ত্যাগ করিয়া অধঃপাতের পথ আরো প্রশস্ত করিয়া লইতে বসিয়াছি। কিন্তু সে দুঃখকাহিনী আজ এখানে কেন?

বলিতেছিলাম, চট্টগ্রামে আমরা বহুতর হিন্দুমুসলমান কবির আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত নানাবিধ মাসিক পত্রে আমাদের গবেষণার

কাল প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি 'মুসলমান-বৈষ্ণব কবির * পদাবলী', 'প্রাচীন সাধনসঙ্গীত', 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' এবং 'বাঙ্গালার গ্রাম্যগীতি' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সংগ্রহের মধ্যে নানা শ্রেণীর কবিতা আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কবিতা ভিন্ন অপর অনেকগুলি আজও অপ্রকাশিত আছে। বক্ষ্যমাণ কবিতাগুলি 'নবনূরে' প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেকালের কবিতাগুলি রাগরাগিণী-নিবদ্ধ গীত বিশেষ। আমাদের সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলি গীত কবিত্ব-হিসাবে সুন্দর। গীতগুলিতে কি তীব্র মাদকতা রহিয়াছে, তাহা গীত হইতে না শুনিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সৌন্দর্য্যের কথা না ধরিলেও, ঐতিহাসিক হিসাবেও এই সকল গীত সম্বন্ধে রক্ষিতব্য, বোধ করি, তৎ সম্বন্ধে কাহারো মতদ্বৈধ হইবে না।

জানা যাইতেছে, সেকালে বঙ্গের প্রায় প্রতি গ্রামেই একজন না একজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তর কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা কিছুই দুঃসাহস নহে। তাহার খোঁজ করা হিন্দু মুসলমান সকলেরই কর্ত্তব্য ও গৌরবের বিষয় বটে। অধঃপতিত মুসলমানসমাজের মধ্যে এই আত্মগৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এমন কি কেহ নাই? এই কার্য্যে সামান্য আত্মত্যাগ করিয়া জাতীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার লোক আমাদের সমাজে নাই কি? আজ এতদিন ধরিয়া আমরা তারস্বরে আন্দোলন করিয়া আসিতেছি, তাহার ফলে কি একটি মুসলমান-হৃদয়ও মোহ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবে না? তাহা যদি না হয়, তবে বঙ্গের 'মুসলমান' নাম কর্ম্মনাশার অতল জলে বিলীন হইয়া যাইলেই বা ক্ষতি কি?

* 'মুসলমান-বৈষ্ণব কবি' পদটির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের বড় আপত্তি আছে। এক ব্যক্তির একই সময়ে মুসলমান ও বৈষ্ণব হওয়া কি সম্ভবপর? হয়, শ্রদ্ধাস্পদ লেখক তাঁহাকে 'মুসলমান কবি' লিখিবেন বা 'বৈষ্ণবকবি' লিখিবেন। শেষোক্ত পদদ্বারাই এইরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারী কবিকে অভিহিত করা একান্ত উচিত। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাই যাঁহাদের একমাত্র জীবনব্রত ছিল, তাঁহারা কি মুসলমান? আমাদের ধারণা হয় লেখক নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিকের প্রদত্ত হাস্যাস্পদ নামই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সবিনয় অনুরোধ, তিনি ভবিষ্যতে যেন এই নাম পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রকৃত আখ্যা প্রদান করেন। লেখক স্বয়ং মুসলমান, অতএব তাঁহার নিকট হইতে এতটুকু আশা করার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া ভরসা করি। নঃ সঃ।

এই গীতলেখক কবিগণের কোন বিশেষ পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাঁহারা চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে অন্ততঃ পূর্ববঙ্গ-বাসী বলা যায়, মাত্র। কাহারো বিবরণ সংগৃহীত হইলে, তাহা আমরা যথা-স্থানে লিপিবদ্ধ করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আবদুল নাবীর একটি, সৈয়দ আইনদ্দীনের একটি, নাসি-রুদ্দীনের তিনটি গীত প্রকাশিত হইল। এই তিন কবিরই নাম আমরা চট্ট-গ্রামের বৈষ্ণব কবিগণের তালিকায় দেখিতেছি। তবে তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি কি না, সে সম্বন্ধে কল্পনার তীব্র তীর-নিক্ষেপ ভিন্ন আমাদের আর উপায়ান্তর নাই।

একমাত্র প্রতিলিপির সাহায্যে প্রাচীন কালের কোন কবিতা ইত্যাদি বিশুদ্ধরূপে প্রচারিত করা যাইতে পারে না। এজন্য প্রবন্ধধৃত গীতগুলিতে কিছু কিছু পাঠ-বিকৃতি-দোষ থাকিবার খুব সম্ভাবনা। প্রাচীন সাহিত্যের সংশোধন অনুচিত বোধে বর্ণবিন্যাসে অনেক স্থলে প্রাচীন রীতির অনুসরণ করা হইল।

রাগ—ভাটিয়ারি।

পরাণ-বেদনি সই !
জনম বিফলে গেল বৈইআ॥ ধু।
বস (বয়স ?) মিছা রস মিছা রূপ মিছা হরি।
মিছা মিছা মায়াজালে বন্দী হইয়া মরি॥
ন চিনিলাম ঘাটের ঘাটিয়াল কেমন জনা।
এ তন (১) ভেদিআ দেখ কেহ নহে আপনা॥
দুঃখ-নিবারণ-বাণী কহে আবদুল নাবী।
বিচারিলে কি ধন পাইবা ভাণ্ড হৈল খালি॥ ১॥

---:০:---

রাগ—আসোয়ারী।

কি কর (অবোধ ?) ভাই অবোধ-চরিত।
এ সুন্দর কায়াখানি মাজ্জিব মাটিত॥ ধু।
ভালা হেন জানিআ না করহ মান (গুমান ?)।
মৃত্যু হৈলে পরিণামে না রৈব গুমান॥

১। তন—তনু, দেহ।

দরিআ তরঙ্গ দেখি স্থির নহে মন।
নাছিরদ্দিনে কহে ভাব নিরঞ্জন ॥ ২॥

--:০:--

রাগ—মালশী।

করুণাসাগর পীর বদর আলাম।
তরায় (তরাও) সঙ্কট হন্তে চরণ ভজিলাম ॥ ধু।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম (পৃষ্ঠ ?) আরোহি সমুদ্র হৈতে (হৈও ?) পার।
কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥
চাটিগাতে (৭) আসিআ হইল উপস্থিত।
সেবক জনেরে (তে ?) তাকে পুরায় (পুরাও ?) বাঞ্ছিত ॥
এতিম (৮) নাছিরে কহে ভজ (ভজি ?) বাঞ্ছা পাও।
সাহা আফ্‌ঝল পীর বহিতে সহায় ॥ ৩॥

—:০:—

আবদুল করিম।

“দাঁতুনে দিন দুই।”

আমরা মেদিনীপুরের দক্ষিণ প্রান্তসীমা দাঁতুনে যাইতে ছিলাম। সে আজ দশ বৎসরের কথা। সে সময় বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হয় নাই। দাঁতুন সহর ছাড়িয়া আসিলেই উড়িষ্যায় পড়িতে হয়।

১৩০১ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ রাত্রি তিন ঘটিকার সময় ঢাকা জেলার কমলাঘাট ষ্টেশন হইতে দাঁতুন যাত্রা করি। সে সময় এই লাইন গবর্ণমেণ্টের ছিল;—তখনকার বন্দোবস্তও ভাল ছিল। খরচ বাঁচাইবার জন্য রাজনীতিজ্ঞ ইলিয়ট (Sir Charles Elliot) সাহেব এই লাইন I. G. S. N. কোম্পানির হাতে সমর্পণ করেন। ইলিয়ট সাহেবের economyর দিকে বেশ একটু নজর ছিল। ইনি রাজকর্ম্মচারিদিগের হস্তে হংসপুচ্ছের পরিবর্ত্তে ষ্টীলপেনের

৭। চাটিগা—চট্টগ্রাম।
৮। এতিম—পিতৃমাতৃহীন।

ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, যেহেতু তৎসমুদয়ের মূল্য অত্যধিক! এই মহোদয়ের শ্যেনদৃষ্টি সরকারী stampএর sticking paste (আঠা) এর উপরেও পড়িয়াছিল। তাঁহার কঠোর শাসনে আজ পর্য্যন্ত সরকারী stamp সকল কেরাণীকে পুনর্ব্বার আঠা সংযুক্ত করাইয়া কাগজে বসাইতে হয়, খরচাও এখন হইতে গবর্ণমেণ্ট বাঁচিয়া গেছে আর stamp গুলিতে পূর্ব্বের মত যথোচিত আঠা দেওয়া হয় না। কথিত আছে যে, একদা পরিদর্শন উপলক্ষে কলিকাতার কোন হিন্দুহোষ্টেলে কোনও ছাত্রের দুগ্ধের হিসাব দেখিয়াও ইনি নীরব থাকিতে পারেন নাই, পরন্তু বাঙ্গালার অমিতব্যয় সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে চলিয়ট সাহেবের economy বাঙ্গালায় চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পরদিন প্রাতে ষ্টীমারে চাপিয়া বেলা ৪—৩০ মিনিটের সময় গোয়ালন্দ পৌঁছি। H. বাবু আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি মধ্যবর্ত্তী বড় ষ্টেশনে পূর্ব্বেই নামিয়াছিলেন। গোয়ালন্দ পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে খুলেশ্বরী Service এর ষ্টীমারে আমার আত্মীয় ম—বাবু ও প বাবু আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। হ্যাটকোট ধারী প—বাবুকে প্রথমে চিনিতে ভুল হইয়াছিল। তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া স্মিত মুখে আমাকে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন "কিহে কোথায় চলিয়াছ।" বিদেশ দর্শনের কৌতূহলের সহিত যে লোভনীয় আকর্ষণ আমাদিগকে সুদূর মেদিনীপুরের প্রান্তসীমায় লইয়া যাইতেছিল, তাহা প—বাবুর অবিদিত ছিল না; তাই তিনি রহস্য করিতে ছাড়িলেন না। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ সদুত্তর প্রত্যুত্তর দিলাম। মেলট্রেনে পরদিন আমরা কলিকাতা পৌঁছি। ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার metropolis দেখিয়াছিলাম। সুতরাং metropolis আমাদের বেশী চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না।

৭ই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে আমরা কলিকাতা ছাড়ি। যাত্রীদিগকে আরমানি ঘাটে ষ্টীমারে চাপিতে হয়। আমরা সওয়া তিন বজে আরমানি ঘাট হইতে বিজলী ষ্টীমারের বিজলীগতি সাহায্যে সন্ধ্যার সময় উলুবেড়িয়া পৌঁছি। ষ্টীমারখানা ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছিল। গার্ডেনরিচ্, শিবপুর কলেজ এবং বোটানিকেল গার্ডেন ছাড়িয়া আসিলে ষ্টীমারখানা ঊর্ম্মির সংঘাতে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। "বিজলী" তরঙ্গের প্রতি আঘাতেই চমকিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা তরঙ্গান্দোলিত ষ্টীমারের মৃদু কম্পনে মৃদু কম্পিত—সুশীতল পবন আকর্ষণে স্নিগ্ধ শান্ত হইয়া উভয় তীরের নয়নাভিরাম

দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হর্ষোৎফুল্ল মনে উলুবেড়িয়া পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে নদীর দৃশ্য বড়ই মধুর হইয়াছিল; তরঙ্গান্দোলিত নদীর স্বচ্ছ সলিলে সুনীল গগনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তদুপরি কুঙ্কুম চূর্ণের ন্যায় অস্তগমনোন্মুখ রবি কিরণের অপূর্ব্ব মিশ্রণ প্রকৃতই বর্ণনাতীত। আমরা সে সময়ের দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না।

উলুবেড়িয়া হইতে Canal Steamerএ চড়িতে হয়। এই সব প্রদেশের নানা স্থানে Irrigation ও Conveyanceএর সুবিধার জন্য Canal এর সৃষ্টি হইয়াছে। এই Canal এর জলের level তথাকার নদীর জলের levelএর সহিত সর্ব্বত্র সমান নহে। সুতরাং যেসব স্থানে নদীর সহিত এই সব Canal এর সংযোগ হইয়াছে তথায় সর্ব্বত্রই এক একটি Lockgate আছে। এই Lockgate গুলি সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত চৌবাচ্চা বিশেষ। প্রয়োজনানুসারে নদী ও Canal এর সংযোগ স্থলের জলের level এর সমতা রক্ষা করিয়া এই Lockgate গুলি Canal দিয়া Steamer যাতায়াতের সাহায্য করিয়া থাকে। Canal অতিবাহিত করিয়া যাওয়ার পথে নদীর সংযোগ স্থল সমূহে এই Lockgate গুলি পার হইতে হয়। ষ্টিমার Lockgate এর নিকট আসিলে Lock এর দ্বার উন্মুক্ত হয়; তখন Lock ও Canal এর জলের level সমান থাকে। Canal হইতে Steamer Lock এর মধ্যে যখন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন আমরা ভূগর্ভস্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতাল-পুরীর দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছি। Lock এর মধ্যে ষ্টিমার খানা সম্পূর্ণ প্রবেশলাভ করিলে পূর্ব্ব কথিত দ্বারটী বন্ধ করা হয়। তখন অনভ্যস্ত নূতন যাত্রিগণ সত্য সত্যই কাল্পনিক পাতালপুরী প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তৎপর নদীর জলের level এর সহিত Lockএর জলের level যাহাতে সমান হয়, তজ্জন্য এঞ্জিন যোগে Lock এর জল স্থানান্তরিত অথবা Lockএ আরও জল সংগৃহীত হয়। এইরূপে যখন নদী ও Lock এর জলের level সমান হয়, তখন অপর দিকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, এবং ষ্টিমারখানা সেই বিভীষিকাপূর্ণ অন্ধকারময় পাতালপুরী হইতে আলোকপূর্ণ সৌরজগতের সমক্ষে হাসি হাসি মুখে প্রকাশমান হয়—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র আরোহী যেন নবজীবন লাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া উঠে। এই জন্যে ক্রমে ক্রমে Canal মধ্যস্থ Lockgate গুলি পার হইতে, অনভ্যস্ত বাঙ্গালী যে একেবারেই আশঙ্কা বা উদ্বেগ বোধ করে না এমন কথা অস্বীকার করা যায় না তবে Lockgate

ব্যাপারটী প্রথমতঃ দেখিয়া আমরা যেরূপ আশঙ্কার উদ্রেক হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাতে তত আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

আমরা ৭ই মে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় উলুবেড়িয়া হইতে Canal এর "অম্বা" ষ্টীমারে পরদিন প্রাতে ৮।৩০ মিনিট সময় মেদিনীপুর ঘাটে পৌঁছি। রাত্রিতে সামান্য একটু বৃষ্টি হইয়াছিল। দামোদর নদ পার হইবার সময় আমরা বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম; দামোদরের বাণ দেশপ্রসিদ্ধ,—সে দিনকার লক্ষণ দেখিয়া অভিজ্ঞ খালাসী সকলেই "বাণের" আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দামোদরের বাণ কখনও দেখি নাই—কিন্তু বিভীষিকাটী পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এই রাত্রিকালে জলপথে সে অপূর্ব্ব-দৃষ্ট সেই সাক্ষাৎ যমকিঙ্কর হঠাৎ আসিয়া কখন দর্শনদান করিবেন এ ভাবনায় একটু বিব্রত না হইয়া পড়ে প্রাণের মমতাহীন এমন প্রাণী জগতে বিরল। যাহা হউক তথাপি আমরা নিজেদের জন্য তত ব্যস্তসমস্ত বা উদ্বিগ্ন হই নাই। বিপদ উপস্থিত হইলে অগত্যা যে কোন সদুপায় সম্ভবপর অবলম্বন করার জন্য এবং যত্নবান্ হইবার চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু আমাদের ষ্টীমারে ১০।১২টী সম্ভ্রান্ত মহিলা শিশুসন্তানসহ ছিলেন। তাঁহাদের সহচরগণ বাণের আশঙ্কায় বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের আশঙ্কায় আমরাও বাস্তবিক দুশ্চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলাম। যদি নিতান্তই দৈব তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় তবে এই শিশু সন্তানগুলি নিশ্চয়ই এবং ভয় মহিলাদের ও তাঁহাদের সহচর কয়জনকে নিতান্তই বিপন্ন হইতে হইবে, নিজ নিজ প্রাণরক্ষার্থে যখন সকলেই ব্যস্ত থাকিবে তখন অপর কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশাও ইহারা করিতে পারিবে না। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে বাণ আসিবার পূর্ব্বেই আমাদের ষ্টীমার খানা পরপারের Lock এ প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বাণের ভীষণ রব আমাদের শ্রুতি-গোচর হইল। দামোদরের বিভীষণ বাণের দুর্দমনীয় বেগ যে আমাদের প্রত্যক্ষ করিতে হয় নাই তজ্জন্য সকলের সহিত অবনত মস্তকে আমরাও ভগবানকে প্রণাম করিলাম।

মেদিনীপুরের ঘাটে কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল। অতঃপর কাঁসাই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা মোহনপুর চটীতে আসিলাম। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে পাঠক পাঠিকাগণ "চটী" জিনিষটীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছেন, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পুরীযাত্রিদিগের সুবিধার জন্য এই পথের স্থানে স্থানে দুচারিখানি দোকান ঘর ও তৎসংলগ্ন দুই একখানা বিশ্রামাগার(?)

দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমণ কাহিনীতে চটীরক্ষকদিগের সম্বন্ধে যাহাই শুনিনা কেন প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাঁরা জনহীন পথে পান্থগণের বিশেষ উপকারে আইসে সন্দেহ নাই। ইহাঁরা সামান্য অর্থ বিনিময়ে পথিকগণের জন্য তদ্দেশসুলভ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকে; পরন্তু রাত্রিকালে হিংস্র বন্য জন্তু হইতে আত্মরক্ষার্থে গৃহের অভাবও বিদূরিত না করে এমত নহে। তবে ঐ সব পথে যে দস্যুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই;— ক্রমশঃ ব্রিটীশ রাজের সুশাসন গুণে দেশের সর্ব্বত্রই এই সব উপদ্রবের শান্তি হইতেছে, এই ভরসার কথা। কথিত সময়ে চোর দস্যুর কথা প্রায় কাহিনীতেই পরিণত হইয়াছিল। এবং আমরা দাঁতুনের পথে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ দেখি নাই।

দাঁতুন হইতে আমাদের জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। মোহনপুরে আহারাদি করিয়া গো-যানে পরদিন বেলা ৪টার সময় দাঁতুনে পৌঁছি। গো-যানের আস্বাদ ইতিপূর্ব্বে কখনও আমরা অনুভব করি নাই। কিন্তু কর্ম্মভোগে একবার সম্পূর্ণ দেড় দিন অর্থাৎ ৩৬ ঘণ্টাকাল ঐ এক গো-যানের উপর যাপন করিতে হইয়াছিল। অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায়ই গোযানে অবস্থান করিতে হয়; অথচ তদবস্থায় রাত্রিদিন থাকা যে কিরূপ বিড়ম্বনাদায়ক ও কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহ বুঝিবে না। যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি গো-যানে একবার আরোহণ করেন তিনি বিনিদ্র অবস্থায় যে রাত্রিটী যাপন করিবেন তজ্জন্য তাঁহার প্রস্তুত থাকা ত একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্ত গাড়ীর অনিয়মিত গতিতে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন গুরুতররূপে সঞ্চালিত হয় যে সর্ব্বাঙ্গে বেদনার জন্য তাঁহাকে পরবর্ত্তী কয়দিনও যে দারুণ ক্লেশভোগ করিতে হইবে তাহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, দাঁতুনে পৌঁছিয়া আমরা আমাদের আত্মীয়—মুন্সেফ বাবুর বাসায় সমাদরে গৃহীত হইলাম; আমাদের জন্য তিনি ও তৎপরিবারবর্গ সকলেই উৎসুক চিত্তে প্রতিক্ষা করিতে ছিলেন —তাঁহাদের সঙ্গলাভে এবং আদর ও স্নেহাশীর্ব্বাদে পথক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম।

দাঁতুন সহরে আমরা প্রায় মাসাধিককাল অবস্থান করি। তথায় অবস্থানকালে দাঁতুন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছি, পাঠকগণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

দাঁতুন ঃ—দাঁতুন মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত একটী চৌকি। দাঁতুন মেদিনীপুর হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিণে প্রান্তসীমায় অবস্থিত। মহামতি শেরসাহ প্রতিষ্ঠিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড্ (Grand Trank Road) প্রথমতঃ লাহোর হইতে আরম্ভ হইয়া বাঙ্গালার মধ্য দিয়া মেদিনীপুর পর্যন্ত আসিয়াছে। মেদিনী-পুরের দক্ষিণ কাঁসাই নদী, নদীর দক্ষিণ তীরে মোহনপুর। কাঁসাই-এর পরপারে মোহনপুরে আবার গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্করোড্ পাওয়া যায়। এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থল-বর্ত্ম দাঁতুন ভেদ করিয়া দক্ষিণ পুরীধাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। দাঁতুন এই রোডের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পার্শে অবস্থিত। ট্রাঙ্করোডের সম্যক্ বর্ণনা দু চারি ছত্রে করা অসম্ভব। প্রকৃত ইহা কেবল শেরসাহের রাজত্বের উজ্জল কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে, পরন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বেরও অন্যতম সুমহৎ গৌরবের নিদর্শন সন্দেহ নাই। এখন এই ভগ্ন শেষাবস্থায় ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়াই অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়, না জানি, যিনি সাধ করিয়া এই বর্ত্ম নির্মাণে অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তখন ইহা কি অতুলনীয় শোভার আধারই হইয়াছিল। আর এই প্রশস্ত স্থলবর্ত্মের প্রতিষ্ঠাতা যে সে লোক নহেন তিনি তখনকার ভারতের ভাগ্য বিধাতা—আসমুদ্র হিমালয় পর্য্যন্ত কোটি কোটি কণ্ঠে যাঁহার জয় ঘোষণা করিত—অবনত মস্তকে কোটি কোটি লোক যাঁহার আদেশ শিরো-ধার্য্য করিত—সেই দ্বিতীয় সম্রাট্ বীরবর শেরসাহ। জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে সেই উদারচরিত মহাপুরুষ প্রবৃত্ত হইলে যে অনুষ্ঠানও তদুপযোগী হইয়াছিল। বস্তুতঃ সম্রাটের আদেশে এই সুবৃহৎ রোডের উভয়পার্শ্বে অসংখ্য দ্রুমরাজি ও তড়াগমালায় সুশোভিত এবং স্থানে স্থানে রমণীয় পান্থনিবাস সমূহে অলঙ্কৃত হইয়া একদিকে যেমন নয়নরঞ্জন শোভার আধার হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি ইহা সর্ব্বসাধারণের অশেষ মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ফলপত্র শোভিত অগণ্য বিটপ শ্রেণী ও নাতি গভীর তড়াগ সমূহ এই পথের উভয় পার্শ্বে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে ও একেবারে ইহাকে শ্রীহীন করিতে পারে নাই। এই সুবৃহৎ স্থলবর্ত্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—আজ এ ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ণ জয় জয়কারের সময়—(যেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ লৌহবর্ত্মে প্রায় শৃঙ্খলিত ও কণ্টকিত হইয়াছে বলিলেই চলে) ও বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীও নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে সহস্র সহস্র পথিক এ পথের আশ্রয়ে দিবানিশি নিজ নিজ প্রয়োজন সাধন মানসে গন্তব্যস্থানে গমনা-

গমন করিতেছে। এহেন প্রাচীন সুপ্রশস্ত স্থলবর্ত্ম দাঁতুন সহরটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করায় দাঁতুন সহর বড়ই মনোহারী হইয়াছে।

সীমা :—দাঁতুনের উত্তরদিকে শাখারী বাজার, দক্ষিণে তকিনগর, পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী ও বেলমুনা, পূর্ব্বে অতি প্রাচীন সড়শঙ্খ দিঘী।

জাতি :—দাঁতুনের আদিম অধিবাসী অৰ্দ্ধসভ্য। সম্প্রতি নানাস্থান হইতে শিক্ষিত জনগণ তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন, তবে ইঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প। এখানকার আদিম অধিবাসীবর্গ নানা সম্প্রদায় অথবা জাতিতে বিভক্ত। যথা :—(১) ব্রাহ্মণ, (২) রাজু, (৩) কদমা (এই তিন শ্রেণীই কৃষি-কার্য্য করিয়া থাকে); (৪) উড়িয়া, (৫) গুড়িয়া অর্থাৎ ময়রা, (৬) আবমন্, (ইহারা বেগুণ,তরীতরকারী ইত্যাদি বিক্রয় করে); (৭) রাজপুত, (৮) মাঝি, (৯) বেমাল (দুগ্ধ ব্যবসায়ী), (১০) বাগিয়া, (১১) সেক্‌রা, (১২) কুম্ভকার, (১৩) রামথ (রামায়তের অপভ্রংশ) ইহারা বৈষ্ণব; (১৪) রাউৎ (ইহারা মৎস্যজীবি)।

দাঁতুনের ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্য করে—বলিতে গেলে ইহারা আজ পর্য্যন্ত আর্য্য-ধর্ম্মটী অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে! এখানকার অধিবাসীবর্গের মধ্যে জনসংখ্যায় উড়িয়াগণের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। ইতর প্রাণীর মধ্যে এখানে বানরের সংখ্যাই বেশী। ইহারা বড় উপদ্রবও করিয়া থাকে। পুরুষ বানর-দিগকে সচরাচর "সন্ন্যাসী" আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে।

দাঁতুনের অধিবাসিগণ স্বভাবতঃ অলস; কৃষিকার্য্য অধিকাংশ লোকের ব্যবসা; সহরের চতুর্দ্দিকে চাষ আবাদের জন্য বিস্তৃত ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে; কাজেই এখানে ধান চালের অভাব কেহ বড় টের পায় না; চাউলের মণ টাকা হইতে আড়াই টাকা। সকলের ঘরেই প্রায় খাবার আছে—ভিখারি য় দেখা যায় না। তবে এখানকার অধিবাসিগণ অলস বলিয়া শিল্প বাণিজ্যে হাদের দৃষ্টি নাই, ইহারা শিল্পসৌন্দর্য্যে একরূপ অনভিজ্ঞ বলিলে বলা যায়। খানকার "মাদুর" (বসিবার জন্য mat) ও কাঁসার জিনিষ বেশ প্রসিদ্ধ। ত্তম মিষ্টান্ন এখানে দুর্ল্লভ। ময়রার দোকানে একরূপ "বাতাসা" ব্যতীত াহারের উপযোগী অন্য কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। তবে এখানকার বাতাসা" বাস্তবিক উপাদেয় পদার্থ। এমন বাতাসা বঙ্গদেশের অন্যত্র পাওয়া ায় না; সন্দেশ ফেলিয়াও এই বাতাসার আস্বাদ গ্রহণ করিতে লোভ জন্মে। আমাদের উপদ্রবে (?) আমাদের Host মহোদয় নিজ বাসায় নানাবিধ মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়াও ময়রা দোকানের 'বাতাসার' bill গ্রহণ করিতে

প্রাচীনগণই বাধ্য না হইয়া থাকিতে পারিতেন না । এখানে অতি উত্তম মহিষের ঘি পাওয়া যায়, 'খাওয়া' ঘি সহজ-প্রাপ্য নহে । ক্রমশঃ ।

শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

বণিক ও শুকপাখী ।

(মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃত্যু)

অনুবাদিত ।

ইরাণী বণিক একজন
পুষেছিল শুক এক করিয়া যতন,
পিঞ্জর মধ্যেতে থাকি, ভাবিত সদাই পাখী,
আপনার অদৃষ্টের অশক্ত লিখন,
কখন বিষাদ গীতি গাইত আপন ।

কখন বা দয়াল ঈশ্বরে,
ডাকিয়ে মনের বেগে সুমধুর স্বরে,
বলিত বিনীত ভাবে, দয়াময় আমি কবে,
নিষ্কৃতি পাইয়ে এই কারাগার হ'তে,
বেড়াব স্বাধীন ভাবে নিবিড় বনেতে ।

সদাগর কিছুদিন পরে
যাইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের তরে,
সঙ্কল্প করিয়া মনে, নিজ পুত্রকন্যাগণে,
ডাকি জিজ্ঞাসিল আমি তোমাদের তরে
কি দ্রব্য আনিব বল প্রফুল্ল অন্তরে ।

এক বাক্যে কহিল তখন
পিতৃমুখে শুনি ইহা পুত্রকন্যাগণ,
"আপনার ইচ্ছা যাহা, পিতঃ আনিবেন তাহা,
তাহাতেই তুষ্ট হ'বে আমাদের মন",
নিবেদিল সদাগরে সুতবালাগণ ।

হাস্যমুখে বণিক সুজন
প্রিয়তম শুক কাছে করিয়া গমন,
জিজ্ঞাসা করিল তারে, "কি আনিব তব তরে ?
ভারত হইতে আমি ফিরিব যখন
কি দ্রব্য আনিব পাখি বলরে এখন !"

শুনি স্বীয় প্রভুর বচন,
পিঞ্জর আবদ্ধ শুক কহিল তখন,
"প্রভো ! তব পথধারে, সঙ্গীগণ বাস করে,
আমার স্বজাতি আর সহচরগণ
ভারত সীমান্তে যথা করিবে গমন।

ভালবাসা জানায়ে আমার
কহিও, আবদ্ধ আছি পিঞ্জর মাঝার,
আমিও, তাদের সনে, বেড়াতাম বনে বনে,
গাইতাম কতদিন তাদের সঙ্গেতে
স্বাধীনতা হারাইয়া অদৃষ্ট দোষেতে,—

হইয়াছি এবে মৃতপ্রায়
আবদ্ধ হইয়ে আজি পিঞ্জরেতে হায়,
পেতেছি ভীষণ ব্যথা, আমার দুঃখের কথা,
কহিও দীনের প্রতি দয়া প্রকাশিয়া,
কেমনে পাইব মুক্তি এ'সো জিজ্ঞাসিয়া।"

শুভদিন দেখিয়া তখন
চলিল বাণিজ্যে সেই পণ্যজীবিজন,
ল'য়ে পণ্যদ্রব্য যত, ভ্রমি পথ ক্রমাগত,
পৌঁছিয়া সীমান্তে এক কাননের ধারে
দেখিল অসংখ্য শুক আনন্দে বিচরে।

আহারাদি করি সমাপন
দাঁড়াইল তরুতলে যথা শুকগণ,
ল'য়ে সব সঙ্গীগণে, এক মনে এক তানে,

"কি বলিব পাখীরে তোমায়
কহিতে বারতা মম বুক ফেটে যায়,
উপজিয়ে আমি তথা, তোমার দুঃখের কথা,
কহিলাম যবে সব করিয়ে বিস্তার,
পড়িল ভূমেতে মরি সুহৃদ তোমার"।

এই কথা বিহগ যখন
বণিকের মুখ হ'তে করিল শ্রবণ,
মৃতবৎ দাঁড় হ'তে, পিঞ্জরের ভিতরেতে,
পড়িল যেমতি সেও ত্যজিল জীবন
অধৈর্য্য হইয়ে শোকে পণ্যজীবিজন ;—

কহিল "রে মম প্রিয়ধন!
গেলাম বাণিজ্যে তোর মৃত্যুর কারণ!
হায় তোর সহচরে, বধিলাম বাক্যশরে,
মহাপাপ কিসে মম হইবে খণ্ডন।"
এতেক বলিয়া সাধু করিয়া রোদন ;—

ফেলি দিল পিঞ্জর হইতে
মৃত শুকে আপনার গৃহ প্রাঙ্গনেতে,
অমনি বিহঙ্গ উড়ি, সম্মুখের বৃক্ষোপরি,
বসিল, অবাক সাধু করিয়া দর্শন ;
সম্বোধি বণিকে পাখী কহিল তখন।
"মরে নাই আমার সুহৃদ

মুক্তি-পন্থা বলেছিল করিয়া ইঙ্গিত ;
তোমরাও এ জগতে, এ ভবযন্ত্রণা হ'তে,
লভিবে মুকতি যদি মৃত্যুর পূর্ব্বেতে,
আমার মতন সবে পাররে মরিতে।"

মোহাম্মদ এব্‌রার আন্‌সারী।

বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ রণজিতের দরবারে উপস্থিত হইলে, আজিজুদ্দীনই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। ১৮০৮ খৃঃ ইংরাজগণ শতদ্রু নদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত মহারাজার অধিকার নিবদ্ধ করিয়া যখন তাঁহার ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করেন, তখন ইংরাজের সহিত শিখের যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, কেবলমাত্র বৈদেশিক মন্ত্রী আজিজুদ্দীনের দূরদর্শিনী নীতি বলেই তাহা প্রশমিত হয়। মহারাজা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে এতদূর নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, তাঁহার সহিত যথাযথ আলোচনা না করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন না। ইউরোপীয় কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত হইলে, মহারাজা আজিজুদ্দীনকেই তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য নিয়োগ করিতেন। ইহা বলা অতিরিক্ত নহে যে কেবল তাঁহার বৈদেশিক মন্ত্রির উদার এবং উপযুক্ত উপদেশেই মহারাজা রণজিত সিংহ তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশেষভাবে বন্ধুত্ব স্থায়ী রাখিয়াছিলেন। * আজিজুদ্দীনের শক্তির যথার্থ পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়াই মহারাজা রণজিত, দূরতর প্রদেশে সমগ্র বাহিনীসহ অভিযান কালে, লাহোর রক্ষার্থে কতিপয় পার্শ্বচর এবং ফকিরের মানসিক বলকেই যথেষ্ট মনে করিতেন। আজিজুদ্দীনকেও সময় সময় যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। ১৮৩১ খৃঃ পঞ্জাব-কেশরী লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট এবং ১৮৩৫ খৃঃ অঃ আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর নিকট যে দূতদল প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে আজিজুদ্দীনই অগ্রণী ছিলেন। উচ্চ রাজনীতির চর্চ্চায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়াই এই সমুদয় কঠিন কাজে রণজিতের দৃষ্টি একেবারে আগে তাঁহার উপরে পতিত হইত। রণজিত জানিতেন তাঁহার দরবারে এই মুসলমান মন্ত্রী ভিন্ন এই সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত লোক আর নাই। ১৮৩১ খৃঃ মহারাজার সহিত গবর্ণর জেনারেলের রূপরে যে সাক্ষাৎ হয় তাহাতে এবং ১৮৩৮ খৃঃ লর্ড অকল্যাণ্ডের ফিরোজপুর পরিদর্শন কালে, সমুদয় গঠন কার্য্যের ভার আজিজুদ্দীনের উপরই অর্পিত হইয়াছিল। রণজিত সিংহের মৃত্যুর পরেও

---

* In all matters connected with Europeans and the English Government, Azizuddin was specially employed, and to his enlightened and liberal counsels it may be attributed that *throughout his long reign* the Maharaja maintained such close friendship with the English Government. Ranjit Singh, Rulers of India Series, Page 118

সহিত শিখদূতদিগের সাক্ষাতের সময় সৌজন্যজ্ঞান জনিত সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, যে মহাশয় লর্ড ১৮৩৮ খৃঃ ফিরোজপুরের মহা দরবারে সমাগমকে সেকথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিয়া ছিলেন না। তিনি কেবল তাঁহাকে উভয় রাজ্যের বন্ধুত্ব সংরক্ষক বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার একান্ত প্রীতি লাভের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে নিজের স্বর্ণমণ্ডিত ওয়াচ্ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রণজিতের চরিতাখ্যায়ক স্যার লেপেল গ্রিফিন ফকিরের পুত্র লাহোরের মীর মুন্সী সৈয়দ জামালুদ্দীনকে সর্ব্বদা উক্ত ওয়াচ্ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন।

লাহোর দরবারের শ্রেষ্ঠরত্ন ফকির আজিজুদ্দীন প্রথম শিখ যুদ্ধের ভীষণ পরাজয়ের কিছু পূর্ব্বে ১৮৪৫ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মরণের কোলে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি শিখ সৈন্যের ইংরাজাধিকারে প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালের কণ্ঠনির্গত অমূল্য উপদেশ বাণী, গর্ব্বিত শিখ সৈন্যের কর্ণে প্রবেশলাভ করিয়া তাহাদের উন্মত্তভাব প্রশমিত করিতে পারিয়াছিল না। তাহা না হইলেও তিনি লাহোর ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের জন্য স্বীয় শেষ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনের চেষ্টায় বিরত হন নাই। ফকিরের জীবনে মহত্ত্বের এই পূর্ণ বিকাশ, বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক মোস্লেম সন্তানের অনুধাবনীয়।

আজিজুদ্দীনের কনিষ্ঠ সহোদর ইমামুদ্দীন ও নুরুদ্দীনও মহারাজার দরবারের বিশিষ্ট লোক ছিলেন। পঞ্জাবের সর্ব্বসাধারণে নুরুদ্দীনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। ১৮৪৬ খৃঃ যুদ্ধাবসানে রাজা লালসিংহ ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া সিংহাসনচ্যুত হইলে, শিশু মহারাজা দলিপসিংহ বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য যে অভিভাবক সভা গঠিত হয়, নুরুদ্দীন তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইমামুদ্দীন দরবারে সাধারণতঃ 'ফকির সাহেব' নামে প্রখ্যাত হইতেন। এবং নুরুদ্দীনকে সকলে 'খলিফা সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিত। ফকির সাহেব রণজিত সিংহের রাজত্বকালে এবং শের সিংহের সময় পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ দুর্গ গোবিন্দগড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

যে জাতির মধ্যে এরূপ রত্ননিচয় জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোর মোস্লেম-বিদ্বেষী হিন্দুরাজপতির রাজ্যেও উচ্চপদাভিষিক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আজ কর্ম্মদোষে বিংশ শতাব্দির জ্ঞান বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া সেই জাতিরই বংশধরগণ তাঁহাদেরই স্বজাতীয় ধনকুবের ভূস্বামীদের নিকট অকর্ম্মণ্য বলিয়া সাধারণত ও

তাই আসিয়াছি আজি,
কত আশে করিতে অর্পণ,
তব প্রিয় নাম স্মরি,
ভকতির সুরভি চন্দন।
তুমি যদি লহ কবি,
এ দীনের ক্ষুদ্র উপহার,
জীবন সার্থক হবে,
নবশক্তি লভিব অপার।
কবিকুঞ্জধাম হ'তে
হে বরেণ্য বঙ্গের ভূষণ,
স্বদেশের তরে সদা
সুমঙ্গল করহে সাধন।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

খৃষ্টীয় ১৭৪৭ অব্দে মহম্মদ শাহের রাজত্ব-রবি যখন অস্তমিত হইতেছিল, সেই সময় আবদালাধিপতি * আহ্মদ শাহ্ লাহোর আক্রমণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ রণকুশল নাদের শাহের বংশধর; সুতরাং লাহোরের প্রতি তাঁহার অধিকার পূর্ব্ব হইতেই প্রবল ছিল। মহম্মদ শাহ্ আততায়ীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার পুত্র আহ্মদ শাহকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য মন্ত্রী কমর উদ্দীন খাঁ এবং মন্ত্রী-তনয় মহিম-উল্-মুলক্ও প্রেরিত হইলেন। কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্কশায়িনী হইলেন—আবদালাধিপতি পরাজিত হইয়া পলায়ন পর হইতে বাধ্য হইলেন।

এই যুদ্ধে মন্ত্রী কমর উদ্দীন নিহত হওয়ায়, তৎ পুত্র মহিম-উল্-মুলক্ লাহোরের সুবাদার হইলেন এবং সম্রাট-কুমার বিজয়বৈজয়ন্তী হস্তে লইয়া সগৌরবে রাজধান্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাণিপথে পদার্পণ করিবা-মাত্র তিনি পিতার নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। তিনি সিংহাসনা-রোহণের পর অযোধ্যার সুবাদার মন্সুর আলী খাঁকে স্বমন্ত্রীপদে মনোনীত করিলেন। মন্সুর আলীও মন্ত্রীত্ব প্রাপ্তির পর গাজি উদ্দীন খাঁকে বক্সী নিযুক্ত করিলেন।

---

* আহ্মদ শাহ্ দোররানী। ইঁহার সংক্ষিপ্ত নাম আবদেলা। কোথাও কোথাও ইনি শাহান্শাহ্ অর্থাৎ রাজার রাজা নামে অভিহিত হইয়াছেন।

নবীন সম্রাট, রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া আপনার বিপুল বিলাস-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার অবসর পাইলেন। রাজকার্য্য সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তিনি নৃত্য-গীতাদি আমোদ প্রমোদে দিবা-বিভাবরী বিভোর থাকিতেন। এইরূপ ভোগ বিলাসী সম্রাটের ভাগ্যে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই হইল—মন্ত্রীর একাধিপত্যে ও রাজ্যশাসন প্রণালীতে আমীর ওমরাহ্ প্রভৃতি সকলেই নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া, মন্ত্রীর প্রতি বিশেষ কটাক্ষানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে একদল ষড়যন্ত্রকারী গঠিত হইল। তাঁহারা ইন্তেজামদ্দৌলাকে মন্ত্রীপদে মনোনীত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। স্বয়ং সম্রাটও মন্ত্রীর কোন কোন ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাজেই এ প্রস্তাবের সহিত তিনি ভিন্ন মত হইলেন না।

মন্ত্রীর ভাগ্যাকাশে যে প্রলয়-ঝটিকা নৃত্য করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং সম্রাটকে কৌশলক্রমে পদচ্যুত করিয়া এই বিষম বাত্যা ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ একদল সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া তিনি রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু হায়! এত করিয়াও তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। প্রধান ষড়যন্ত্রকারী গাজি উদ্দীন খাঁ অসংখ্য সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক সম্রাটের সাহায্যের অবসর পাইলেন। উভয় পক্ষের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। বিজয়লক্ষ্মী যে কাহার ক্রোড়ালঙ্কৃত করিবেন, তাহা প্রথমে ঠিক করা কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে মন্ত্রীই পরাজিত হইয়া, তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্র জাঠদিগের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইন্তেজামদ্দৌলা তৎপরিবর্ত্তে মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু বিগত সমরাঙ্গণে গাজি উদ্দীন যেরূপ রণনৈপুণ্য, অপূর্ব্ব সুচতুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হইয়া উঠিল। নবীন মন্ত্রী ভীতিবিহ্বল-চিত্তে পলায়িত মন্ত্রীকে ক্ষমা করিয়া, জাঠদিগের মধ্যবর্ত্তিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সম্রাটকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সম্রাট সম্মত হইলেন এবং মনসুর আলীকে তাহার কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ও তাহাকে সুবাদারী প্রদানের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করিয়া, একখানি পত্রসহ কিছু খেলাত পাঠাইলেন। গাজি উদ্দীন তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় সম্রাটের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি এতদিন ধরিয়া যে রাজ্য-ক্ষেত্রে আপনার একাধিপত্য কর্ষণ করিয়া আশাতরু বর্দ্ধিত করিতেছিলেন, তাহার ফলভোগ করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখন কোনরূপ প্রতিবন্ধক তাঁহার অসহ্য।

জাঠদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য তিনি যথাসাধ্য উজীর আর কোনরূপে ইহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মনসুর আলী খাঁর প্রতি কর্ত্তব্যাবধারণ আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া গাজি উদ্দীন জাঠরাজ্যে সেনা চালনা করিলেন এবং আকবরাবাদের নিকটবর্ত্তী তাহাদের একটী সুরক্ষিত দুর্গবাটীও সহজেই করতলগত করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহার গোলা বারুদ প্রভৃতি সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু রাজ্য-জয়-স্পৃহা এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। তিনি আবদুল মাজিদ খাঁ নামক এক-জন কর্ম্মচারীকে রাজভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার জন্য রাজধানী পাঠাইলেন। কিন্তু জাঠরাজের অকুশল হইবে ভাবিয়া সম্রাট অস্ত্রাদি দিতে অস্বীকার পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদের প্রাচীর মধ্যে কামান হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে অপমানিত হওয়ায় গাজি উদ্দীন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, প্রতিশোধ লইবার মত ততদূর শক্তি সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। কাজেই নীরবে মনের রোষ মনে চাপিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার রাখিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।—মহারাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি মালহার রাও তৎকালে রাজপুতনায় অবস্থান করিতেছিলেন, গাজি উদ্দীন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। মালহার রাওয়ের প্রিয়তম পুত্র জাঠদের সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তিনিও পূর্ব্ব হইতেই আপনার মনোবাঞ্ছা নিবারণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে গাজি উদ্দীনের প্রস্তাব তিনি আগ্রহাতিশয্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। উভয়ে বন্ধুভাবে পরস্পর উভয়ের মঙ্গল কামনায় বদ্ধপরিকর হইলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ আত্মীয়তাও সংস্থাপিত হইল,—গাজি উদ্দীন মালহারকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, মালহার তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্নেহালিঙ্গন করিলেন। তৎপর তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে সম্বদ্ধ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে রাজধানী অভিমুখে সেনা চালনা করিলেন। পথিমধ্যে সম্রাট ও মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয় সেনার বাহুবল পরীক্ষা হইবার আয়োজন আরব্ধ হইল। কিছু-ক্ষণ শক্তি চালনার পর সম্রাট পরাজিত হইয়া, সমাত্য সহচর রাজপ্রাসাদের সুদৃঢ় প্রাচীর মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য পলায়ন পর হইলেন।

গাজি উদ্দীনের সৌভাগ্য-রবি পুনরুদিত দেখিয়া আমীর ওমরাহগণ একে একে অনেকেই তাঁহার পক্ষভুক্ত হইলেন। যতক্ষণ তিনি রাজধানী প্রত্যা-

যাঁহার হস্তে ন্যস্ত, যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ, তিনি একজন বিদেশীয় মহারাষ্ট্রের কণ্ঠলগ্ন, বশংবদ সূত্রচালিত ক্রীড়নক মাত্র! প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই রাজ্যআক্রমণকারীর পক্ষভুক্ত এবং ভারত-বক্ষ-সিন্দুকের অর্গল স্বরূপ লাহোর সুবা একজন রমণীর দ্বারা অধিকৃত!

রাজ্যের এবম্বিধ অবস্থার সময় আবদালী ভারতাক্রমণে আপনার কুলীশ কঠিন ভীমবাহু প্রসারণ করিলেন।

আবদালী আসিয়া কিশোর সম্রাটকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। মালহার রাওয়ের সেনাপতি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মালহার রাও হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বালাজিকে স্বয়ং আগমন করিতে অথবা একদল প্রবল সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে বালাজি দেকানের সুবাদার সালাবত জঙ্গের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি আততায়ীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং সর্ত্তানুসারে আওরঙ্গাবাদের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলেন।

হিন্দুস্থানে অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিবার মানসে বালাজি দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজ পুত্র বিশ্বাস রাওকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিলেন,—তাঁহার জারজ ভ্রাতা শামসের বাহাদুর, ইব্রাহিম খাঁ, ইন্তেজামদ্দৌলা, জয়াজি প্রভৃতি তন্মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা বরাবর জাঠ প্রদেশ দিয়া গিয়া নদীর তীরে মন্ত্রী, মালহার ও জাঠদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তৎকালে যমুনা নদীর তীরভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় উভয় পক্ষই কিয়দ্দিবস নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

স্বর্ণ-রেণু।

—:০:—

১১। বড় বড় নদী, বৃক্ষ এবং গুণশালী ব্যক্তিগণ নিজের জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না; পরোপকারের জন্যই তাঁহাদের সৃষ্টি। অতএব, হে গুণিন্, তোমার গুণরাজি পরহিতে ব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘন করিতেছ কেন?

পারে না। তবে কেন মায়ামুগ্ধ জীব! তোমার অবর্ত্তমানে তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ভাবিয়া অস্থির হইতেছ?

২০। যাহারা 'শেষের সেই দিনে' বন্ধুত্ব-প্রদর্শনে অক্ষম, তুমি তাহাদিগকে বন্ধু মনে করিতেছ কিন্তু যিনি জীবন মরণে সহায়, যিনি এই ভবার্ণবের ভেলা স্বরূপ, তুমি তাঁহার কথা একটি বারও ভাব না। মূঢ় মানব! তোমার এ কেমন বিবেচনা?

আবদুল করিম।

সিরাজুদ্দৌলা।

হে সিরাজ! হে নবাব! শেষ স্বাধীনতা রবি!
হে মানিন্! অন্তিমের হে করুণ-ছবি!
বঙ্গের অদৃষ্ট-লক্ষ্মী মহা আবর্ত্তনে
ডুবাইতে পলাশীর সমর-প্রাঙ্গনে—
বলি দিতে ষড়যন্ত্রী বণিকের পায়,
এসেছিলে হে সিরাজ! তুমি কি ধরায়?
শুনাতে কি এসেছিলে অলীক কল্পিত
তোমার পাপের শত বীভৎস সঙ্গীত?
এসেছিলে দেখাতে কি কেমন নির্মম,
কালের দুরন্ত গতি?—ভিখারী অধম
কল্য সেই—আজি যেবা রাজরাজেশ্বর!
কল্য সেই শৃঙ্খলিত প্রাসাদ ভিতর
আপনার!—প্রাণপ্রার্থী দাসের দয়ায়!—
এসেছিলে হে সিরাজ! দেখাতে কি তায়?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত।

মম অঙ্গ তুমি দেহ, তব প্রাণ মোরে দহ,
ভু'লে যাও গত বিসংবাদ,
এস ধরি' করে করে মুক্ত দেশে উঠি হ'য়ে
ভবে ঘোষি' আনন্দ-সংবাদ।

মহাজ্যোতিঃ, শূন্যপথে আসিয়া পড়িছে শিরে
কেন্দ্রে আজি মঙ্গল উচ্ছ্বাসে,
প্রেমোদ্বেগে হৃদে হৃদে প্রেমোচ্ছ্বাস অশ্রুনীরে
আলিঙ্গন অনন্ত উল্লাসে।

তব উদারতা স্মরি' পুলকে শিহরি' উঠি',
তুমি প্রাণ মম প্রীতি-স্নেহ,
আনন্দের মুক্তহাস্যে আজি সেই মুঞ্জরিয়া
স্বর্গ দীনা ধরার পুণ্য-গেহ !!

শ্রীকাব্যানন্দ।

ঘুড়ি।

—:০:—

পাঠক, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে সমুদায় পদার্থ বিরাজ করিতেছে একজন দার্শনিক বা জ্ঞানী ব্যক্তি তৎসমুদয় পদার্থ যে চক্ষে নিরীক্ষণ করেন আপনি কি সেই চক্ষে দর্শন করেন? সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেক পদার্থ অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবনিচয়ের উদয় হয় সেই ভাব কি আপনার অন্তরেও জাগরিত হইয়া থাকে? একটি সামান্য দ্রব্য হইতে তিনি যে উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন আপনিও কি সেই উপকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন বা সক্ষম হইতে আশা করেন? ইহার উত্তরে বোধ হয় আপনাকে বাধ্য হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইবে। তবে আপনি জ্ঞানী বা বহুদর্শী হইলে স্বতন্ত্র কথা।

যাহা হউক যে বস্তুকে আমরা সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকি, যে বস্তুকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞানে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি অথবা যে বস্তুকে আমাদের সামান্য ক্রীড়ার সামগ্রী বোধে অকিঞ্চিৎকর মনে করি সেই সেই বস্তু হইতে প্রকৃত জ্ঞানী বা প্রকৃত দার্শনিক ব্যক্তি কিরূপে মহদুপকার সাধনে সমর্থ হন তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অবশ্য এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমুদয় পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব; কেবলমাত্র আমাদের প্রিয় ক্রীড়ার সামগ্রী ঘুড়ি সম্বন্ধেই এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শুধু আমাদের দেশে কেন সর্ব্ব দেশেই ঘুড়ি উড়ান একটি প্রসিদ্ধ আমোদ-জনক ক্রীড়া। Flying kite is a pleasant game এ কথা আমরা অনেকেই পাঠ করিয়াছি। কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই ঘুড়ি উড়ান খেলায় অতিশয় আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকে

করিতে হইলে আমাদের একটী "প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতির" সৃষ্টি হওয়া একান্ত আবশ্যক। পরম আহ্লাদের বিষয় বর্ত্তমান ১৯০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে "কলিকাতা মহমেডান ইউনিয়নের" বাৎসরিক উৎসব কালীন অনারেবল জষ্টিস সৈয়দ আমীর আলী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিত যে এমন কোন কারণ নাই যাহাতে কোন স্বজাতিবৎসল, সমাজহিতৈষী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মুসলমান ভ্রাতা নিজেদের পদগৌরবরূপ লুপ্ত-রত্নের পুনরুদ্ধারে উক্ত মতের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে সক্ষম হন। আমরা প্রাণের সহিত এই মতের অনুমোদন করি এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন "প্রাদেশিক মুসলমান-শিক্ষা-সমিতি" সংস্থাপিত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব-বিশ্রুত পবিত্র ইস্লামের জ্যোতিতে এ অধঃ-পতিত সমাজকে আলোকিত করেন।

মির্জ্জা আবুল ফজল।

কবিতা-গুচ্ছ।

সংসার।

পুলকে খেলে বালকে
সংসারের খেলা,
উৎসাহে সংসারে পশে
যুবকের দল;
প্রৌঢ় বলে বিষময়
সংসারের জ্বালা,
বৃদ্ধে দগ্ধ করে শুধু
অনুতাপানল॥

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রেম ও মৃত্যু।

সৃজিলা বিধাতা যবে বিশ্ব চরাচর,
মৃত্যু আসি সৃষ্টি জুড়ি' পাতিল আসন।
শিশু-প্রেম সে সময়ে স্বর্গের উপর
আলো ক'রে ব'সেছিল স্রষ্টার চরণ।
শেষে নেমে এল প্রেম, রোমাঞ্চিত করি
কটাক্ষে বিপুল বিশ্ব। হেরিয়া তাহারে
রুষিয়া কহিল মৃত্যু ভীম মূর্ত্তি ধরি,—
"আসিয়াছে আমার এ রাজ্যের মাঝারে।"
কাঁদিয়া কহিল শিশু,—"তাই, যাই চ'লে
বিশ্বের হৃদয়-মাঝে লইতে আশ্রয়।

র অন্তর তরে
তিমির ভেদিয়া উঠে
য গগনে তাই
কিরণ মরণ ফুটে।
। যে হাসি রেখা
মেঘ সনে গেল মিশি
য বিশাল বিশ্ব
অবসাদ-তিমির রাশি।
কায়া দুই জনে
রহিয়াছে পাশাপাশি
নর ছলে তাই
ঝরিতেছে বারি রাশি।

আফতাব উদ্দীন আহ্‌মদ

আহ্বান।

ঐ বাজে রণ-ভেরী।
মি যুদ্ধে যেতে হ'বে, চল,
ক'রোনা দেরী।
সম্মুখে বিস্তার কর্ত্তব্য সিন্ধু,
এস মুসলমান, এস হে হিন্দু,
আজো প্রিয়ার বদন-ইন্দু
বারেক হেরি',—
। সমরে হও অগ্রসর,
ক'রোনা দেরী।
হায়, কতদিন আর
যে রে হেন, বিদ্বেষ-বহ্নি
হৃদয়ে সবার!
এক মাতৃস্তন্যে হইয়া পুষ্ট,
কেন পরস্পরে বিভিন্ন, রুষ্ট,
হ'য়ে একতায় পুনঃ পরিতুষ্ট
এস একবার,
ন আর এ বহ্নি জ্বলিবে
হৃদয়ে সবার?
শুন বিপক্ষ-আহ্বান,—
যত শির, স্পর্দ্ধা মণ্ডিত
বিজয়-গান।
প্রাণে প্রাণে করি প্রাণ সম্মিলন,
অতীত গৌরব করিয়া স্মরণ,
কর কর্ম্ম যোগে, কর্ত্তব্য পালন,
চ'লে আগুয়ান,
ভাঙ্গ বিপক্ষের স্পর্দ্ধা মণ্ডিত
বিজয় গান।
আবার সকলি হবে,
কীর্ত্তি-গরিমা, গগনে গগনে
ফুটিয়া র'বে।
হাসিবে পুলকে বিধুরা বঙ্গ,
ছুটিবে বিশ্বে সুধা-তরঙ্গ,
নাচিবে নবীন উৎসাহে অঙ্গ,
জাগিবে সবে,—
কীর্ত্তি-গরিমা, গগনে গগনে
ফুটিয়া র'বে।

শ্রীঅটল বিহারী দাস।

নিবেদন।

একা মোরে বাসনে ফেলিয়া
বিস্মৃতির গভীর আঁধারে,
আমিও তোদেরি একজন
একথাটা কইতা তাই ফিরে।
এতকাল ছিনু ঘুম ঘোরে
অসার অবশ অচেতন,
একে একে চলে গেছে সবে
মোরে কেউ ডাকেনি কখন।
না জানি কেমন করি আজ
আঁখি পাতা গিয়াছে খুলিয়া,
চকিতে চাহিয়া দেখি সব
চলে গেছে—রয়েছি পড়িয়া।
অনল জ্বলিছে হৃদি মাঝে
যাতনায় পুরিত পরাণ,
অতীতের কথা মনে পড়ে
হৃদি ভেঙ্গে হয় শত খান।
পিছে যারা ছিল সবে আজি
চলে গেছে এক এক করে,
আমি শুধু রয়েছি পড়িয়া,
এ বিষম কুহেলিকা ঘোরে।
একা মোরে বাসনে ফেলিয়া,
দাঁড়া ভাই, দাঁড়া একবার,—
হাতে ধরে নিয়ে চল মোরে,
দূরে যাক্ হৃদয় আঁধার॥

মোহাম্মদ আলী খান।

আরবীয় দর্শনালোচনা।

(১)

পরকাল সম্বন্ধীয় মত।
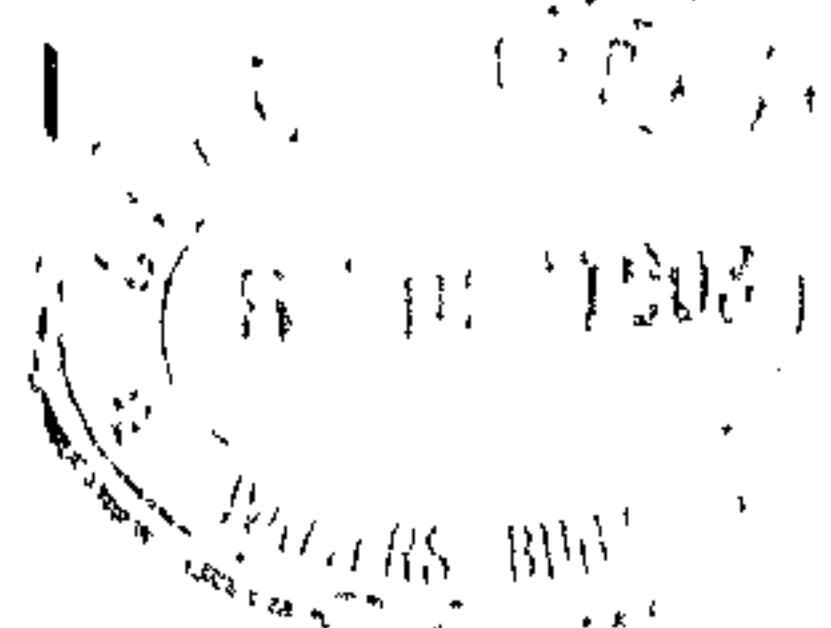
শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী ও অকপট বান্ধব সম্প্রদায় রচিত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহের তৃতীয় গ্রন্থ।

ভারতবর্ষে 'রেসায়েলো ইখ্‌ওয়ানুস্‌ সাফা' প্রায় একখানি অপরিজ্ঞাত মহাগ্রন্থ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এতদ্দেশীয় মাদ্রাসা সমূহের, আরবী বিভাগের ছাত্রবর্গের নিকট ইহা মুনাজারার * অন্তর্গত গ্রন্থ বিশেষ রূপেই পরিগণিত। উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় অনূদিত হইয়া 'ইখ্‌ওয়ানুস্‌ সাফা' কথঞ্চিতরূপে সাধারণ পাঠকদের পরিচয়লাভে সমর্থ হইয়াছে, এবং মাদ্রাসা সমূহের নিম্নশ্রেণীতেও ইহার কিয়দংশ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু তাহাই সমগ্র গ্রন্থ বলিয়া অনেকের ভুল ধারণা। আলোচ্য গ্রন্থের অপকৃষ্টাংশই মাত্র মাদ্রাসা নিচয়ে অধীত হয়। 'ইখ্‌ওয়ানুস্‌ সাফা' কেবল শিশুপাঠ্য পুস্তক নয়, ইহা শিশুর ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধেরও গভীর আলোচনার উপযুক্ত। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহার অধিকার সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞতা একরূপ অবিসংবাদিত। অতি অল্পসংখ্যক লোকেই ইহা পরিজ্ঞাত আছেন যে, যে একাধিক পঞ্চাশিংশ অংশে ইহা বিভক্ত, 'মানব ও মানবেতর প্রাণী এবং প্রজ্ঞা ও সহজাতজ্ঞান সম্বন্ধে মীমাংসা' কেবল তাহার একাংশ মাত্র। অপর পক্ষে, অনেকে 'ইখ্‌ওয়ানুস্‌ সাফা' নামধেয় এই পুস্তকের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ এবং যদিও বা কেহ কেহ তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছেন,

* এতৎসম্বন্ধে মৃত মহাত্মা মৌলভী ওবেইদুল্লা আল্‌-ওবেদী সোহরাওয়ার্দী, তদীয় Essay on the Arabic Language and Literature গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"This is a sort of writing in the form of a dialogue in which two persons are imagined disputing with each other on the merits and demerits of two different things, each trying to give preference to his own chosen object."

তথাপি তাঁহারা মনে করেন, প্রথমোক্ত অংশের ন্যায় অপরাপর অংশ সমূহও কেবল মীমাংসা-ঘটিত।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বর্ণনা পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করিবার পূর্বে গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনার সময় নিরূপণ সম্বন্ধে যে বিভিন্নমত প্রচলিত আছে, আমরা তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

মোহাম্মদ আলী রামপুরী 'আইয়ুন-আল্-আকবর' নামক গ্রন্থ লেখক ইদরিস্ ইমামুদ্দীনের প্রদত্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে আবদুল্লা-তনয় সৈয়দ আহ্মদ ইহার রচয়িতা এবং তাহার মতে এ বিষয়ে আর কোন সংশয়ই নাই। তিনি অপরাপর অনুমান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, "ইস্লামের প্রসিদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ইমাম জাফর-অস্-সাদেকের বংশধর ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে।" *

মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন বলেন, 'ইহা আবদুল্লার পুত্র আহ্মদ কর্ত্তৃকই সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য মতানুসারে হিজিরার দ্বিতীয় কি চতুর্থ শতাব্দির কতিপয় প্রধান পণ্ডিতই ইহার সঙ্কলয়িতা। †

তৈমুরের রাজত্ব সময়ে মির্জ্জা মোহাম্মদ সিরাজী কৃত 'ইখ্ওয়ানুস্ সাফার' সমগ্র অংশের যে এক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাহির হয়, তাহাতে আবদুল ওয়ালি ইস্মাইলির পুত্র মোল্লা আশরফ কৃত 'রিয়াজুল্রিজাল' গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে,—"ইমাম জাফর-অস্-সাদেকের প্রপৌত্রের পৌত্র সৈয়দ আহ্মদই এই গ্রন্থের রচয়িতা। মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) বংশধর-দিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হওয়াতে সৈয়দ আহ্মদ সংসার কোলাহল হইতে বহুদূরে অজ্ঞাতবাস করিতেন। তাঁহারই পুত্র ওবেদুল্লা আল্-মেহ্দী। আফ্রিকা মহাদেশে 'বনি ফাতেমা' বংশীয় প্রথম খলিফা। সৈয়দ আহ্মদ ছদ্ম-বেশে বণিকরূপে কখনও কুফায়, কখনও সল্মাসাতে এবং কখনও বা সারা-মনরা-রাতে বাস করিতেন। খলিফা হারুণের সুবিখ্যাত আলমিয়ামু পুত্রের

---

* "Rasail-o-Ikhwa'n-us-safa" published in 4 vols. at Bombay in 1305 A. H by Haji Nuruddin, vol iv. P. 409.

† 'Rasail o Ikhwa'n-us-Safa' P. 411.

‡ Ibn Khaldoon and Makrizi mention two different names (Ja-afar al-Musaddak and Muhammadal-Habib) for Syed Ahmad and Abdullah, in Obaidulla'h's Geneology.

দাজ্ঞ সময়ে যখন বিদ্বৎসমাজ গ্রীক দর্শনালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন সৈয়দ আহ্‌মদ আলোচ্য গ্রন্থের ৫১ খণ্ড রচনা করিয়া নিজ নাম গোপন করতঃ তাহা খলিফাকে উপহার প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াই খলিফা বুঝিতে পারিলেন যে জগৎ তখনও মহাপুরুষের বংশীয় দার্শনিক হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি সমগ্র গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহার আল্‌জামেয়া (সার-সংগ্রহ) নামকরণ করেন। তাঁহার আর একখানি পুস্তকের তিনি নাম রাখেন জামেয়াতুল-জামেয়া (সংক্ষিপ্ত সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—Compendium of Compendium).

হাজি খলিফা তাঁহার গ্রন্থবিবরণ সম্বন্ধীয় অভিধানে বলিয়াছেন, 'রেসায়েলো ইখ্‌ওয়ানুস্ সাফা' আল্-মোকাদ্দাসী, আবুল হাসান আলী, আবু আহ্‌মদ আল্ মহ্‌রে জওরি, আল্ আওফি, এবং জায়েদের পরিশ্রমের ফল। এই সমুদয় দার্শনিকগণই একযোগে আলোচ্য গ্রন্থের ৫১ অংশ * রচনা করেন।"

Mr. T. T. Thomason বলেন, "এই গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে কিছুই ঠিক নাই। কোনও বিশেষ প্রামাণ্য দলিল অনুসারে ইবনে জামিদ এই সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। অপর আর একমতে বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে ৫১টী বিভিন্ন ভাগযুক্ত যে মহাগ্রন্থ 'ইখ্‌ওয়ানুস্ সাফা' নামে বুধমণ্ডলীর নিকট পরিচিত, তাহা উক্ত নামধেয় কোনও সমিতি বিশেষেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।" †

উপরোক্ত নানা বিরুদ্ধ মত হইতে আমরা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত এই বুঝিতে পারি যে 'শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী' নামে একটি সমিতি ছিল, এবং এই সমগ্র গ্রন্থ তাঁহাদেরই পরিশ্রমের অমৃতায়মান ফল। ইহা খুব সম্ভব যে সৈয়দ আহ্‌মদ (যিনি তিন খানারও অধিক প্রামাণ্য দলিল অনুসারে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত) উক্ত সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং সমগ্র গ্রন্থের অনেকাংশ তাঁহারই রচনা-প্রসূত।

আরবীয় লেখকদিগের বিশ্বকোষ রচনা করিবার শক্তির কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া Prof. Wallace বলিয়াছেন, "দশম শতাব্দির অবসান কালে ন্যায় ও গণিত শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধর্ম্মমতের নানা বিভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিষয়ের একটি সম্পূর্ণ 'মুসাবিদা' আল্ কেন্দির জন্মভূমি বসরা নগরে একটি সমিতি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃ-

* Kashf-uz-Zunoon, vol. III, (ed. Fluegel).

† Catalogue of Arabic Mss. in the Asiatic Society of Bengal, P. 69.

মণ্ডলী নামে এই সমিতি চারি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং কি বিজ্ঞান কি ধর্ম্ম এতদুভয়ের যে কোনও একটির উন্নতিকল্পে ইঁহারা জীবনপণ করিয়া খাটিতেন। যদিও তাঁহাদের বিশ্বকোষ (Encyclopædia) প্রণয়নের এই চেষ্টা সময়োপযোগী হয় নাই, তথাপি ইহা ঠিক যে এতদ্দারা চারিদিকে জ্ঞানালোচনার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সংশোধিত করা হয় নাই, কারণ তৎকালে এই সামঞ্জস্য সাধনে কোন দলই তুষ্ট হইত না। যে ৫১ ভাগে এই বিশ্বকোষ বিভক্ত, তৎসমুদয়ের স্থানে স্থানে প্রাচ্য আদর্শানুসারে বহু নৈতিক উপাখ্যানের (apologue) অবতারণা করা হইয়াছে এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে জ্ঞান (Idea of goodness) ও নৈতিক সম্পূর্ণতাই (Moral perfection) প্রত্যেক সন্দর্ভের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। এই গ্রন্থের উপাদান প্রধানতঃ Aristotle হইতে প্রাপ্ত, কিন্তু তাহা Platoর ছাঁচে ঢালিয়া নেওয়া হইয়াছে।"

'শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী' এবং তাঁহাদের বিশ্বকোষের বিবরণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা Spirit of Islamএর প্রাজ্ঞলেখকের উক্তি উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন:—"সত্যপ্রিয়গণের নিকট দুঃসময় রূপে দশম শতাব্দির যে অংশ বিবেচিত, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মোস্লেমদিগের মধ্যে জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিতে, জন সাধারণের প্রাণে মঙ্গলপূর্ণ ভাবের অবতারণা করিতে, মূর্খতা ও উৎকট ধর্ম্মবিশ্বাসরূপ অধঃপতনের গতিরোধ করিতে, মোট কথায় সমাজ-সঙ্ঘকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে, কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদ্বারা একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারাই নিজেদের নামকরণ করিয়া ছিলেন, ইখ্ওয়ানুস্ সাফা—শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী। যৌক্তিকধর্ম্ম (Rationalism) এবং মানসিক তৎপরতার (Intellectual activity) আদি স্থান বসরাতে এই সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বসরা তখনও ক্রতক্ষয়শীল খলিফীয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী। এই ভ্রাতৃমণ্ডলীতে কেবল মাত্র পরম নীতিপরায়ণ অকলঙ্কচরিত্রের লোকেরাই গৃহীত হইতেন। জ্ঞান ও পরসেবার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন কেবল তাঁহারাই ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহাদের প্রকৃতিতে কিছুই ইতরব্যাবর্ত্তক বা রহস্যপূর্ণ ছিলনা, যদিও তদানীন্তন অবস্থানুসারে ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় কঠোর শাসনের মধ্যে থাকা বশতঃ তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী প্রহেলিকাচ্ছন্ন ছিল। মণ্ডলীর প্রধান পুরুষ জায়ে-

দের গৃহে তাঁহারা শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্মিলিত হইতেন এবং তথায় এরূপ উদারভাবে ধর্ম্ম ও দর্শনের আলোচনা করিতেন যে তদনুরূপ উদারতা বর্ত্তমান সময়েও দুর্লভ। খলিফার সাম্রাজ্যের সীমাভ্যন্তরে প্রত্যেক নগরে যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদেরই মত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই মণ্ডলীর শাখা প্রতিষ্ঠিত হইত। এই উদার বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের মূলে লক্ষ্‌-মণ্ডলীর জীবন স্বরূপ জায়েদসহ আরও পাঁচটী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের মত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব ধর্ম্মের সার লইয়া গঠিত। চিন্তা রাজ্যের কোন প্রদেশকেই তাঁহারা ঘৃণা করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেক উন্মুক্ত মাঠ হইতেই পুষ্পাহরণ করিতেন। গূঢ় জ্ঞানবাদ (তান্ত্রিকতা) তাঁহাদের দার্শনিক মতকে কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত করিলেও, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত অতি বাস্তব এবং বদান্যতা পূর্ণ। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তাঁহারা একই মহাগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে তদানীন্তন জ্ঞান রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সেই গ্রন্থাংশ সমূহই একত্রে 'রেসায়েলো ইখ্‌ওয়ানুস্‌ সাফা' নামে প্রখ্যাত। এই রেসালা সমূহে মানবীয় শিক্ষার সর্ব্ববিভাগের যথাযথ আলোচনা করা হইয়াছে—গণিত, জ্যোতিষ, প্রাকৃতিক ভূগোল, সঙ্গীত, যন্ত্র-বিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, উল্কা বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জীবনী, প্রাণীতত্ত্ব, শারীরস্থান বিদ্যা, উদ্ভিজ বিদ্যা, ন্যায়, ব্যাকরণ, মনোবিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, পরকাল সম্বন্ধে মত, প্রভৃতি বিষয়ের কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। মোট কথা সে সময়ে দর্শন—বিজ্ঞানের যে সব বিভাগ মানব সমাজে পরিজ্ঞাত ছিল তৎসমুদয়ের আলোচনাতেই এই বিশ্বকোষ পূর্ণ। জীব শরীরের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে দশম শতাব্দির এই বিবর্ত্তনবাদীদলের মতের সহিত বর্ত্তমান সময়ের মতের তুলনা করিলে তাঁহাদিগকে কোন প্রকারেই হীন বলিয়া মনে হয় না, বরং প্রশংসার ভাগ তাঁহাদেরই বেশী প্রাপ্য হয়। কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক বা মানসিক গবেষণা হইতে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার সহিতই আমাদের অধিক সম্পর্ক। এই শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী রচিত নীতি-শাস্ত্র, আত্মানুশীলন এবং সর্ব্ববিধ অপবিত্রতা হইতে চিত্তার বিশুদ্ধি সাধারণের উপরেই স্থাপিত। ইহাতে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি হইতে নৈতিক গুণেরই অধিক প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সহিষ্ণুতার সহিত আত্মশাসনলব্ধ আত্মার বল ও আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠধর্ম্মরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, "কর্ম্মহীন ভক্তি এবং কার্য্য শূন্য জ্ঞান বৃথা।"

সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা, কোমলতা ও বিনয়, ন্যায়পরতা, দয়া ও সত্যবাদিতা, ধর্ম্মের মহত্তাব, পরার্থে আত্ম বলিদান প্রভৃতি এই মহাগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় কপটতা, ভণ্ডামি ও প্রতারণা, হিংসা ও অহঙ্কার, অত্যাচার ও মিথ্যাবাদিতা সর্ব্বাপেক্ষা হেয় বলিয়া ঘৃণার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। চিন্তার বিশুদ্ধতা, মানবজাতির প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, মানবের ক্রমন্নতির উপরে অটুট বিশ্বাস, বিশ্বজনিন বদান্যতা,— এই সমুদয় বিষয়েই গ্রন্থের আদ্যন্ত পূর্ণ। এমন কি ইতর জীবগণও এই আলোচনার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। "মানব ও মানবেতর প্রাণী সম্বন্ধে মীমাংসা" হইতে আর কি অধিক সুন্দর, অধিক করুণা পূর্ণ হইতে পারে? তাঁহাদের নীতি-শাস্ত্রই তদন্তর্গত পরবর্ত্তী গ্রন্থ নিচয়ের ভিত্তিভূমি। তাঁহাদের ধর্ম্মমত ফরাবী ও ইব্‌নে সিনার অনুরূপ ছিল। তাঁহাদের মতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে নহে; Primal Absolute cause (আদি কারণ) ই নিমিত্তের (Reason) স্রষ্টা। এবং এই "নিমিত্ত" হইতেই নাফ্‌সো নাফুসের (Abstract soul) উৎপত্তি। ইহা হইতে আবার মৌলিক অণু অথবা জড়পদার্থ সমূহের Protoplasm নিজ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। "নিমিত্ত" এই "মৌলিক অণু" কে গঠিত করিয়া আকৃতি বিশিষ্ট হইবার উপযোগী করিয়াছে। "আদি কারণ" (Primal Absolute Cause) যে তাঁহার অতি নিকৃষ্ট সৃষ্ট পদার্থের সহিত ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এই মতের উপরেই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি গঠিত; কারণ মানবের মুক্ত, মনঃকল্পিত, আত্মা, (Abstract soul) যে "আদি কারণ" হইতে সে নিসৃত হইয়াছিল তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য জীবনের বিশুদ্ধতা, আত্মসংযম ও মানসিক শিক্ষা দ্বারা অবিরত চেষ্টা করিতেছে। ইহাই মাদ (MaAd), ইহাই প্রত্যাবর্ত্তন (Return), যাহা আমাদের প্রাণপ্রিয়তম পয়গম্বর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাই চিরবিশ্রাম ও শান্তি, যাহা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উপদেশ স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী ইহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব (Psychology) সম্বন্ধে আমরা যাহাই বিবেচনা করিনা কেন, কিন্তু তাঁহাদের নীতি-শাস্ত্র যে পবিত্র উচ্চভাবপূর্ণ, ইহা কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না।"

(ক্রমশঃ)

আব্দুল্লা আল্‌মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী।

মুসলমানের প্রতি হিন্দু-লেখকের অত্যাচার।

কোন চিন্তাশীল মহাত্মা একবার বাঙ্গালা ভাষাকে 'বেওয়ারিশী সম্পত্তি' বলিয়া অভিহিত করায় মাতৃ-ভাষানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। উক্ত আখ্যা বঙ্গভাষার প্রতি সুষ্ঠু প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা, সে বিচারের স্থান ইহা নহে। ওয়ারিশ থাকুক আর নাই থাকুক, বঙ্গভাষার যে কোন মুরব্বি বা নিয়ন্তা নাই, সে বিষয় প্রমাণের জন্য বড় দূর যাইতে হয় না। দিন দিন বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে অপরিমেয় রাবিস, হিংসাবিদ্বেষ, ব্যক্তিগত ও জাতিগত কুৎসা, অনন্ত পথে উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহা দেখিয়া কোন্ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বাঙ্গালাকে মুরব্বিহীন মনে না করিয়া থাকিতে পারেন? অরাজক দেশের মত বাঙ্গালা সাহিত্যের পথে ঘাটে অবিচার, অনাচার, অন্যায়, যুক্তিহীনতা ও হিংসাবিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা কি বাঙ্গালীর পক্ষে সুখ্যাতির কথা, না গৌরবের বিষয়?

ঈশ্বরেচ্ছায় ও পুরুষকারের বলে হিন্দুগণ এখন বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতেই বিদ্যা বুদ্ধিতে অপর সকলের উপর প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া লইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান-রূপ-শাখাদ্বয়-সমন্বিত ভারত-বৃক্ষের এক শাখার উন্নতিতে যেমন ভারত-হিতৈষীর আনন্দিত হওয়ার কথা, অপর শাখার অবনতিতেও কি তিনি তেমনি দুঃখিত নন? অঙ্গ-বিশেষের সমস্ত অংশ সমান না হইলে যেমন তাহাকে নীরোগ ও বলশালী বলা যায় না; তেমনি এক শাখার রুগ্নতাতেও ভারত রুগ্নই রহিয়া যায়; এরূপ নানা কথা ভারত-হিতেচ্ছুগণের শ্রীমুখে সর্ব্বদাই শ্রবণ করা যায়।

সমাজতত্ত্ব-বিৎ বলেন, সবলের অনুপ্রাণনে দুর্ব্বলের উত্থান হইয়া থাকে কিন্তু সবল যেখানে দুর্ব্বলের মুণ্ড টিপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, সেখানে দুর্ব্বলের আশা কোথায়? বর্ত্তমান কালে ভারতে প্রবলে দুর্ব্বলে কিরূপ ব্যবহার চলিতেছে; এবং ভাবীফল কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সকলেরই দেখিবার ও ভাবিবার বিষয় বটে।

দুর্ব্বলের উপর স্বাভাবিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে কোমল ব্যবহার ও সহৃদয়তা ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য। এই ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার না করিয়া যাহারা অস্ত্রোপায়-

বলশী হয়, তাহাদিগকে অবিমৃষ্যকারী ও নীচাশয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারিলেই পুরুষকার হয় না, অথবা তদ্দ্বারা গুণবত্তাও বিজ্ঞাপিত হয় না, ইহা ত আমাদের শত্রুপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইবে। 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবার লোক জগতে অনেক আছে জানি, কিন্তু সে কার্য্যকে কোন ন্যায়বান লোকই ন্যায় ও নীতি সঙ্গত মনে করিতে পারেন না। শত্রুকে পদদলিত করিবার সাধু অসাধু অনেক উপায় আছে সত্য ; কিন্তু সাধু ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা ক্ষমতা সত্বেও অসাধু উপায় বিষবৎ পরিহার করতঃ সন্মার্গেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকল সভ্য সমাজেই সাধু ও ন্যায়পর লোকের কোনই অভাব নাই ; কিন্তু বিজাতীয়দের সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সত্যের ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে ন্যায়পরায়ণ লোকেরাও কুণ্ঠিত হয়েন না, ইহাই সমধিক পরিতাপের বিষয় !

বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা। সুতরাং হিন্দুগণই যে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চায় অগ্রণী ও প্রধান হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বঙ্গসাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহাদের লেখনীর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই সকল বিভাগে কার্য্য করিতে যাইয়া তাঁহাদের দুর্ব্বল অধঃপতিত জড়ধর্ম্মী প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি তাঁহারা কিরূপ অত্যাচার করেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে গেলে একখানা অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। সাহিত্য রথী সুধীপ্রবর বঙ্কিম বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্য্যন্ত মুসলমান-সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎসমাজকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছেন এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা ? বিলাতী সভ্যতার ফলে ইতিহাসচর্চ্চার বিবৃদ্ধিতে ভারতের মোসলেম-ললাটে কত অপরিমেয় কলঙ্ককালিমা বিলেপিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিবার ক্ষমতা ত মাদৃশ ক্ষুদ্র লোকের নাই। সত্য কথা ঘোষণা করিতে, সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া কাহারো ভ্রুকুটি বা অসন্তোষভয়ে ভীত হওয়া উচিত নহে,এবং 'অপ্রিয়ং সত্যং মাব্রুয়াৎ',শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ থাকা সত্বেও মুসলমানসমাজ কাহাকেও তদ্বিরুদ্ধে অপ্রিয় সত্য ঘোষণা করিতে নিষেধ করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহেন না। মুসলমানের পক্ষে হাজার অপ্রিয় হইলেও, তাহা ঢাক বাজাইয়া কেহ ঘোষণা করুক,ইহাতে তাহাদিগকে কেবল শাস্ত্র-অবমাননাকারী ভিন্ন আর কোন অপরাধে অপরাধী কেহ করিবে না,

সাঁড়াশে মারেন এবং কেহ বা ভাতে মারেন। মুমূর্ষুর পক্ষে কি যে কোন প্রকারে মরাই ভাল নহে? সম্মুখে যাহারা চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইতে পারে, তাহাদিগের স্তুতি করিবার জন্য তোমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত; তোমাদের মধ্যে তেত্রিশ কোটী দেবতার আবির্ভাব দেখিয়াও কি আমরা তাহা বুঝি না মনে কর? তোমরা বুদ্ধিমান ও পরম জ্ঞানী বলিয়া জগন্ময় প্রসিদ্ধ, তোমাদিগকে আর বেশী কি বলিব?

হিন্দুগণ সাহিত্যরাজ্যে যে আমাদিগকে নানা প্রকারে অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত করেন, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিবার জন্য বহুদূর যাইতে হয় না। তাঁহাদের সাহিত্যের সর্ব্বত্রই তাহা জাজ্জ্বল্যমান। যে সকল অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এতক্ষণ মনের ক্ষোভে এত কথা বলিয়া ফেলিলাম, নিম্নে তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দিলাম। কত ধুরন্ধর লেখক পবিত্র সাহিত্য-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া, ন্যায়ের মস্তকে সম্মার্জ্জনী-তাড়না করিয়া, আমাদের নামে অযথা কলঙ্ক আরোপিত করেন, তাহার সবটা তীব্র প্রতিবাদ যোগ্য হইলেও, সময় ও সুযোগের অভাবে সর্ব্বদা তাহা ঘটিয়া উঠে না। 'আরতি' পত্রিকার জনৈক লেখক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় একটি প্রবন্ধের এক স্থানে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন:—

"এদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা সাহিত্যও.................পূর্ণতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী মুসলমানের করাল ধ্বংসনীতির অন্তবর্ত্তী হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। মুসলমানের ধ্বংসনীতি যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিলুপ্তির কারণ না হইত, তবে তাহা.............যে প্রাচীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমানের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বহু হস্ত-লিখিত সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানের খরদৃষ্টি সহসা এই নিরীহ সাহিত্যের উপর নিপতিত না হইলে আমরা......বহু কমনীয় কুসুমের বিমল সৌরভ অনুভব করিতে পারিতাম।" * এই ভুঁইফোঁড় লেখকের মুসলমান-বিদ্বেষ ও প্রাচীন সাহিত্যে অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বিদ্বেষ থাকে, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া তাহা প্রকাশ কর, কেহ কোন আপত্তি করিবে না। অযৌক্তিক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন কথা বলিয়া

* আরতি—২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় 'সঞ্চয়ের নূতন গ্রন্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাহারো হৃদয়ে আঘাত দিতে যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। হিন্দুগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে মুসলমানগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টকে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিতে গেলে, তাহাতে শ্রেষ্ঠের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়, ইহা কে না জানেন ?

উপরে যে কথাগুলি লিখিত হইয়াছে, লেখক ঐতিহাসিক প্রমাণ সহ তাহা লিখিলে আমরা কোন কথা বলিবার অবসর পাইতাম না। তিনি মুসলমান-বিদ্বেষে জর্জর, ইতিহাস ঘাঁটিবার অবসর তাঁহার কোথায় ? অথবা ইতিহাস ঘাঁটিলেও বা তাহাতে আত্মমত সমর্থক প্রমাণ পাওয়ার যো নাই বলিয়া তিনি সে দিকে একবার উঁকি দিয়া দেখাও আবশ্যক মনে করেন নাই! পবিত্র সাহিত্য-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি কেন যে এ রকম জঘন্য রুচির পরিচয় প্রদান করিতে গেলেন, কে বলিবে ? বঙ্গসাহিত্য-রাজ্য কলুষিত না করিয়া তাঁহার পক্ষে অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে যাইয়া বিষোদগীরণ করিলেই যে ভাল ছিল! কিন্তু হিন্দু-সমাজে তাঁহার মত খামখেয়ালী লোকের প্রাদুর্ভাব শোভা পায় না! লেখক যেস্থানে ঐ কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা না লিখিলে তাঁহার প্রবন্ধের কোনই অঙ্গহানি হইত না; কিন্তু কবে জানি কোন্ মুসলমান তাঁহাকে কি কারণে তাড়না করিয়াছিল, সে রাগে তিনি এমন যুক্তিহীন কথা বলিয়া,—ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়া,—স্বীয় কলুষিত মনের অন্তশ্চিত্র প্রকাশ করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়াছেন। তিনিই যেন এই গর্হিত কাজ করিলেন; বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজ কেন তাঁহার এই অন্যায় কার্য্য দেখিয়াও নীরব রহিলেন ? ইহা দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা হয় না যে, মুখে যাহাই বলুন, সমস্ত হিন্দুই এখন মুসলমানের সহিত বাদবিসংবাদ বাধাইতে উৎসুক ? বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে কি একজন সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বান লোকও নাই ? সকলেই কি ন্যায়ের মুণ্ড চর্ব্বণ করিবার জন্য বদ্ধমুষ্টি ? যাঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মরেন, স্বদেশপ্রেমে যাঁহারা সানুনাসিক স্বরে কান্না ধরেন, এই ক্ষেত্রে তাঁহারা কোথায় ? এই কি তাঁহাদের হিন্দু-মুসলমানকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টার অভি-ব্যক্তি ? ন্যায়ের খাতিরে সত্য কথা বলিবার লোক হিন্দু-সমাজে এমন বিরল হইয়াছে, আগে জানিতাম না! পরনিন্দা ও পরহিংসা সম্বন্ধে যাঁহাদের শাস্ত্রে ভুরি ভুরি নিষেধ-বিধি আছে, পরনিন্দা শুনিবার জন্য তাঁহারাই আজ উৎকর্ণ ? হায় রে! স্বার্থের মায়া মানুষকে এমনি অন্ধ করে!

বঙ্গসাহিত্যে এখন বিস্তর সাময়িক পত্রের পরিচালনা হইতেছে। সাময়িক

কোন পরিচয়ই যে পায় নাই, তাহা ধ্রুব সত্য। সম্রাট হোসেন শাহ্, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ, সাগর ঠাকুর, সৈয়দ মোহাম্মদ খাঁ, সৈয়দ মুসা, শ্রীমন্ত সোদাগর, নজম পাল, আলাবল খাঁ প্রভৃতির উৎসাহে বঙ্গসাহিত্যে যে কয়েক খানি কাব্যগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাইত মুসলমানের 'বঙ্গভাষা-প্রীতির পরিচয় দিতেছে। তদ্ভিন্ন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' যে সকল প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা দ্বারাও মুসলমানদের বঙ্গভাষানুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে মাননীয় দীনেশ বাবু, 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু, মৃণালকান্তি বাবু প্রমুখ মহাত্মাগণের ন্যায় গবেষণা কেহই করেন নাই; কিন্তু তাঁহারাও ত মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর কথা বলেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই লেখক রাতারাতি পণ্ডিত হইয়াই ইতিহাসের একটি বিলুপ্ত গোপ্য সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন! জানি না, হিন্দুসমাজ তাঁহার এ মহাবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে কোনরূপ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না! ছি! এমন নীচাশয়তাও করিতে আছে!

হুজুগে বাঙ্গালী অদ্ভুত জাতি, তাহা বলিতে কি কাহারো বাকী আছে? ভাতে ভাইয়ে বিবাদ করতঃ নিজে পরের হস্তে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া দিয়া তৎপর আবার পরকে গালি দিতে বাঙ্গালীর মত এমন মজবুত আর কেহ আছে কি? উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইবার এমন শক্তি বাঙ্গালীর মত আর কাহারো নাই, এত দিনের পরও কি জগৎ তাহা জানিতে পারে নাই? এমন কুটিলবুদ্ধি লোক জগতে আর একটি থাকিলে না জানি কি কাণ্ডটা হইত। মুসলমানেরা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিলুপ্তির কারণই হইয়াছিল, তবে আজও দেশ মধ্যে সহস্র সহস্র প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে কেমন করিয়া? বস্তুত আমরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত একতারই আকাঙ্ক্ষা করি; কারণ তাহা ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের মঙ্গল নাই। হিন্দুগণের প্রীতি-কামনা করি বলিয়াই আমরা এতদিন নীরবে তাঁহাদের এরূপ নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছি। নতুবা একটু ফুৎকারে মূর্খ-মুসলমানদের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, তাহার নির্ব্বাণ করিতে রাজশক্তিকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে; কিন্তু তাহা ন্যায়ানুমোদিতও নহে, রাজবিধির বিধান-সঙ্গতও নহে; বাঞ্ছনীয়ও কোন মতেই নহে। পক্ষান্তরে, হিন্দুগণের সাহচর্য্যে মুসলমানদের বিশেষ লাভ ভিন্ন অলাভ নাই, ইহাও তাঁহাদের অত্যাচারে মুসলমানদের

উদাসীনতার একতম কারণ বটে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে; যেদিন সেই চরম সীমা উল্লঙ্ঘিত হইবে, সেদিন ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইবে, ইহা ধ্রুব বাক্য।

হতভাগ্য অধঃপতিত মুসলমানেরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া মান অপমান বুঝে না; তা না হইলে, বঙ্গভাষার প্রতি তাহারা এত উদাসীন থাকিবে কেন? এরূপ উদাসীনতার সুযোগেই ত হিন্দুগণ আমাদের উপর এরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার করিতে সাহস করেন। [সাহিত্য-রাজ্যে ঘুসির বদলে ঘুসি যদি আমরাও দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারত-ইতিহাসে ইস্‌লাম-মস্তকের এমন শোচনীয় চর্ব্বণ কদাচ দেখিতে হইত না। তাঁহারা ন্যায় অন্যায় যাহাই বলুন না কেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার লোক বা সামর্থ্য মুসলমানসমাজের নাই; তাহা জানেন বলিয়াইত তাঁহারা এমন দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছেন। কই ইংরেজের বিরুদ্ধে ত তাঁহারা এমন মিথ্যা কথা রটাইতে সাহসী হয়েন না! যে হতভাগ্য বঙ্গদেশে এত মুসলমান নামধারী লোক থাকাতেও তাহাদের মুখপত্র স্বরূপ একখানি শক্তিশালী পত্রও নাই; সেই দেশে তাহাদের নামে কলঙ্কারোপ করিয়া বাহবা লইবার প্রবৃত্তি না হইবেই বা কেন? আমরা কি সেই ভুবনবিজয়ী মুসলমান-দের বংশধর? তাঁহাদের রক্ত কি আমরা উত্তরাধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি? কখনই না। তাহা হইলে, আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা হইবে কেন? সাধুর সহিত সাধুতা, শঠে শাঠ্যং, এরূপ না হইলে আজকাল চলা য় না। যেসব অত্যাচার আমরা এখন নীরবে সহ্য করিতেছি, ইস্‌লামের উষ্ণ-রক্ত যদি আজও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত থাকিত, তবে তাহার প্রতি-শোধার্থ কৃতসঙ্কল্প না হইয়া কখনই পারিতাম না। যেসব অত্যাচারের প্রতি-বিধান-ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই, তাহা অবশ্য নিরবে সহ্য করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; কিন্তু প্রতিবিধেয় অত্যাচারও যাহারা অম্লানবদনে সহিয়া লয়, তাহা-দিগকে মানুষ বলে কোন্ মূর্খে? ধিক্ মুসলমান! তোমরা অধঃপাতে গিয়াছ! তোমাদের মরণই যে শতগুণে শ্রেয়ঃ!

কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

(২)

এই সময়ে বিশ্বেশ্বর রাও, নাদের শাহের সহিত যে সর্ত্তে সন্ধি হইয়াছিল, ঠিক সেই সর্ত্তে আবদালির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। আবদালী ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া পাঠান, 'যাহাদিগকে আমি অবজ্ঞার সহিত ডেক্কানের জমীদার বলিয়া থাকি সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে এবং তাহাদের রাজ্যের সীমা নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে। আমার নিজের ক্ষমতা পাণিপত এবং কর্ণাল পর্য্যন্ত পরিচালিত হইবে। রাজ্যের বাজস্ব রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ সংগ্রহ করিবে এবং তাহারা নিয়মিতরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে 'চৌথ' প্রদান করিবে, ইহাতে তাহাদিগের কোন সংস্রব থাকিবে না।'

শাহজাহানাবাদ নগর এ পর্য্যন্ত ইয়াকুব আলির অধীনেই ছিল। তাহার অধীনস্থ দুই সহস্র সেনানী মধ্যে পাঁচ শত আবদালী সৈন্য ছিল। বিশ্বেশ্বর রাও এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়া মাত্র নগর আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ ইয়াকুবকে অন্য কোন শাস্তি না দিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। তিনি নগরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিলেন এবং সকলের প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিয়া মহারাষ্ট্রীয় শিবির হইতে দুই ক্রোশ দূরে কর্ণাহরি নামক স্থানে অল্পসংখ্যক অনুচরসহ শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

হইতে পারে এই সময় বিশ্বেশ্বর রাও শুজাওদ্দৌলাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার গুপ্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শীঘ্রই আবদালির শিবিরে গমন করেন। আবদালী রোহিলাদিগের পরামর্শানুসারে জাঠদিগের মধ্যস্থতায় সন্ধির নূতন প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। সখ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বেশ্বর উজিররূপে অভ্যর্থিত হইলেন,—গাজি উদ্দীনের উকীল রাজা দেলওয়ার সিং শিবির হইতে বিদূরিত হইলেন। গাজি উদ্দীন এইভাবে চতুর্দ্দিক হইতে উপেক্ষিত হইয়া জাঠদিগের শরণাপন্ন হইল।

শুজাওদ্দৌলার প্রস্তাব ঠিক জানা যায় নাই। সন্ধির কোনরূপ কার্য্য না

হইয়াই নানা বিষয়ে দুই দল অভিলাষিত হইল। আবদালির সহিত সম্মিলিত প্রত্যেক পক্ষই নিজ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। কেবল এক বিষয়ে তাহারা সকলেই ঐকমত হইয়াছিল,—গাজি উদ্দীনের সহিত শত্রুতা করিতে তাহাদের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা ছিল। এতদ্ভিন্ন সুজাউদ্দৌলার আরো কয়েকটী উদ্দেশ্য ছিল,—যুবরাজ আলি গহরের কারামোক্ষ করা ও নিজে মন্ত্রী হওয়া। গাজি উদ্দীন পূর্ব্বেই অপসারিত হইয়াছে, যুবরাজ সম্রাটরূপে আবদালী কর্ত্তৃক প্রকাশ্যে ঘোষিত হইয়াছে, এখন তাঁহার ক্ষমতা স্থাপনের কিছুই অভাব নাই কেবল মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত একমত হওয়া বাকী আছে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিবার মানসে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাহার গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল। ইহার ফলে বিশ্বেশ্বর, আলি গহরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহার পুত্রকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া পিতার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসন করিতে আজ্ঞা করিলেন। বিশ্বেশ্বর রাওকে পঞ্চলক্ষ মুদ্রা প্রদানে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। যুবরাজের মাতা টাকা দিতে না পারায় তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। এই ঘটনায় আবদালী শঙ্কিত ও সুজাউদ্দৌলার প্রতি কুপিত হইলেন। পরবর্ত্তী আর একটি ঘটনায় তাহার উপরে আবদালির সন্দেহ আরো ঘনীভূত হইল। কুঞ্জপুর, দুর্গাদি দ্বারা একটি সুরক্ষিত নগর,—শাহ্‌জাহানাবাদ হইতে সাত দিনের পথ। আবদালির পক্ষ হইতে সাহারাণপুরের ফৌজদার আবদুস্ সমদ খাঁ এবং রোহিলাদিগের পক্ষ হইতে কুতব খাঁ এই স্থানে অবস্থান করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই নগর আক্রমণ করতঃ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নগর অধিকার করতঃ প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করিল। সর্দারদ্বয় বন্দীভাবে বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রেরিত হইল। তিনি আবদুস্ সমদকে নিহত ও কুতবকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আবদালী এই মহান্ অনিষ্টপাতের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। নদীর জল এ পর্য্যন্ত না কমায় তৎকালে তিনি বিপক্ষের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সুজাউদ্দৌলাকে রাজ-বিদ্রোহী ও কলহ বৃদ্ধিকর্ত্তা বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ পদ হইতে বিচ্যুত করিলেন। পরে রোহিলাদিগের মধ্যবর্ত্তীতায় তাহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় আহ্বান করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাহার প্রতি আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। শাহ্‌জাহানাবাদের ন্যায় একটি নগর হস্তচ্যুত ও অসংখ্য

লোকক্ষয়ে তিনি উত্তেজিত হইয়া শীঘ্র প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদীর কোনস্থানে জল অল্প তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন স্থানেই অল্প জল না দেখিতে পাইয়া তিনি সন্তরণ দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণও প্রভুর অনুকরণ করিল এবং অচিরে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহারা নির্বিঘ্নে নদীর পরপারে উপনীত হইল।

আবদালী পরপারে উপস্থিত হইয়াই সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুর্গে নিজ সৈন্যাপেক্ষা অধিক সৈন্য থাকায় এবং যুদ্ধাস্ত্রের অল্পতা হেতু তিনি সে সংকল্পত্যাগ করিয়া বিশ্বেশ্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিলেন। তাহার পর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আর কোনও যুদ্ধ হয় নাই। পাণিপতের চারিক্রোশ পূর্ব্বে সেহানা এবং পাণিপতের সন্নিকটে সেগার নামক স্থানে আবদালী ও মহারাষ্ট্রীয়গণ অবস্থান করিতে লাগিল। ডিসেম্বর মাসে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য আসিয়া আবদালির সহিত সম্মিলিত হইল এবং ঠিক সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ; দাক্ষিণাত্য হইতে ৩৭ লক্ষ টাকা ও আট হাজার সৈন্য প্রাপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়-গণ আবদালি-সৈন্য হইতে এত হীনবল ছিল যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না, তাহারা সুদৃঢ় ব্যুহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। আবদালী চতুর্দ্দিকের প্রভু হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং বিপক্ষের রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

কুঞ্জপুরের জমীদার দলীল খাঁ রোহিলার রাজধানী এযাবৎকাল মহারাষ্ট্রীয়-দিগের করতলগত ছিল। আবদালী এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথম শত্রুগণ যে সকল দেশ হইতে রসদ সংগ্রহ করে সেই সকল দেশ লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার অন্য একদল সৈন্য দেশের অন্যান্য অংশেও ঐরূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল কাজেই বিপ-ক্ষের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল—প্রতিবিধানের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল, খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গেল, মনুষ্য এবং পশ্বাদি আহারাভাবে প্রত্যহ কালকবলে পতিত হইতে লাগিল। এই দুঃসময়ে বিশ্বেশ্বর রাও সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণকে একত্র আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই ভাবে ক্ষুধায় নিষ্পেষিত হওয়া অপেক্ষা দুরূহ যুদ্ধযাত্রায়

প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়স্কর। ইহা স্থির করিয়া ১৭৬২ খৃঃ অঃ ১৪ই জানুয়ারী তারিখে প্রত্যূষে তাঁহারা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আবদালির শিবির হইতে দুইক্রোশ ব্যবধান থাকিতে তাঁহারা গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিপক্ষেরাও তদুত্তর দিতে বিলম্ব করিলনা। মধ্যাহ্ন সময় উভয় পক্ষ এত সন্নিকট হইল যে তাহারা সঙ্গিন চালনা করিতে বাধ্য হইল। সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল, জয় পরাজয় কাহার ভাগ্যে ঘটে তাহার স্থিরতা নাই। অবশেষে সন্ধ্যার সময় মহারাষ্ট্রীয়েরাই বিজয় লাভ করিল। একদল সৈন্য আবদালির শিবিরে প্রবেশ করিল। এই সময় শুজাওদ্দৌলার একদল সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল এবং হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে পর দিবস দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। আততায়ীর হস্তে লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় বিশেশ্বর রাও তাঁহার স্ত্রী পরিজনকে বিষ প্রয়োগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের নরনোয়ালে পলায়ন করিলেন। কেহ্ কেহ্ বলেন, বিশেশ্বর রাও মালহর রাও ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহা মিথ্যা। যুদ্ধাবসানে আবদালী, যাঁহার বিক্রম ও সাহসে যুদ্ধে জয়লাভ হইল, সেই শুজাওদ্দৌলাকে সম্মানিত করিলেন। সম্রাট তাহাকে পুত্র ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার দ্বারাই যে জয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন। ১৬ই জানুয়ারী তারিখে আবদালির আদেশে শুজাওদ্দৌলা ও নজীব খাঁ সেখানে মহারাষ্ট্রীয় শিবির লুণ্ঠন করিতে প্রেরিত হন। শিবিরে বহুতর মূল্যবান সামগ্রী ছিল।

শাহজাহানাবাদের মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা নরুশঙ্কর যুদ্ধাবসানে মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া আকবরাবাদে পলায়ন পর হন। শুনা যায় পথি মধ্যে সুর্য্যমল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া ভিক্ষুকবেশে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। পরদিবস শুজাওদ্দৌলা কর্ত্তৃক প্রেরিত অল্পসংখ্যক সৈন্য ঐ নগর অধিকার করে। পূর্ব্ব সুবাদার জাহান খাঁ, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ন্যায়শাসনে নগরবাসীর স্নেহ ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন,—তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ১৬ই তারিখে আলি গওহরের পুত্র মির্জ্জা বাবর অনুচরসহ আবদালির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করেন।

এখন বঙ্গদেশের একটু পরিচয় প্রদান করি।—যুবরাজ প্রচুর সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া জাফর আলী খাঁর বেহারের সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা রামনারেনকে পরাভূত করেন কিন্তু শীঘ্রই তিনিও, ছোট নবাব ও মেজর কেইল্ড কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। কাসগর খাঁর পরামর্শে তিনি অকস্মাৎ ছোট নবাবকে আক্রমণ করিতে পার্ব্বত্য-পথাবলম্বনে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন কিন্তু বিপক্ষ-পক্ষ কর্ত্তৃক পশ্চাৎ ধাবিত হওয়ায় যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পাটনা আক্রমণ করেন। কাপ্তেন নক্স তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। যুবরাজ টেকারি নামক স্থানে প্রস্থান করিয়া বর্ষা অতিবাহিত করেন। ছোট নবাব ও মেজর কেইল্ড তথায় উপস্থিত হন। কিয়দ্দিবস পূর্ণিয়ার নায়েব খাদেম হোসেনের অনুসরণে অতিবাহিত হয়,—ইনি যুবরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ছোট নবাবের বজ্রপাতে মৃত্যু সংঘটিত হয়। সৈন্য সকল পাটনায় অবস্থান করিতে লাগিল। অক্টোবর মাসে নবাব জাফর আলী খাঁ তাঁহার জামাতা কাসেম আলী খাঁকে রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বর্ষাবসানে দুইদল পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিল। এই সময় একটি সন্ধির প্রস্তাব উঠিয়াছিল কিন্তু কাসগর তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয়। অবশেষে ইংরেজ সৈন্যের অধিনায়ক মেজর কারনক ১৭৬২ খৃঃ অঃ ১৫ই জানুয়ারী তারিখে যুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়া এম, ল এবং ফরাসীদলকে বন্দী করেন। তৎপর কিয়দ্দিবস তিনি যুবরাজের অনুসরণ করেন। যুবরাজ ভীত হইয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় ভিক্ষা করেন এবং ১৭৬৫ খৃঃ অঃ ১৮ই জানুয়ারী ইংরেজ-শিবিরে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে পাটনায় গমন করেন।

এলাহবাদ প্রদেশ এবং কোরা জেলার বাৎসরিক রাজস্ব ২২ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া তাঁহাকে প্রদান করা হয়। এতদ্ভিন্ন কোম্পানির তরফ হইতে বৃটীশ শাসনকর্ত্তা, রাজকীয় ভাণ্ডারে, বঙ্গপ্রদেশের রাজস্ব হইতে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হন। এই সকল অনুগ্রহের জন্য শাহ্ আলম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করেন। এলাহবাদে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি অতি জাঁকজমকে এখানে দরবার স্থাপন করেন। বিশ্বস্ত অনুচর পরি-বেষ্টিত হইয়া ইংরেজরাজের শান্তি-শীতল আশ্রয়তলে থাকিয়া শাহ্ আলম

যদি তাঁহার অবস্থার কথা সম্যক বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইত সন্দেহ নাই।

যাহা হউক পরে দেখা গেল যে, যুবরাজের চরিত্র এবং মনের গতি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন তাহার ঠিক বিপরীত। শৈশবে তিনি কর্মিষ্ঠ এবং দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। গাজি উদ্দীনের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণের সময় তাঁহার চরিত্রের ও মনের তেজস্বিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিনি দুর্ব্বল, নিস্তেজের ন্যায় সর্ব্বদাই অন্যের ইচ্ছানুসারে চালিত হইতেন। যদিও বাহ্যিক ভাবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট দেখা যাইত, তথাচ তাঁহার হৃদয়ে গুপ্ত-ভাবে পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকৃত এলাহাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতিজ্ঞায় আশস্থ হইয়া তিনি তাঁহার একদেশদর্শী মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণায় একচ্ছত্র রাজত্ব করিবার আশায় ইংরেজদিগের বশ্যতা অস্বীকার করতঃ নিজের ক্ষমতা ঘোষিত করিলেন এবং দিল্লী অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল এলাহবাদে অশান্তিতে বাস করিয়া, তিনি পরিণাম না ভাবিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে সাহসী হইলেন। ইহাই তাঁহার ও তদীয় পরিবারবর্গের অবিশ্রান্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। *

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

"দাঁতুনে দিন দুই।"

(৩)

মন্দির :—দাঁতুন উড়িষ্যা প্রবেশের তোরণ স্বরূপ। এখানে জগন্নাথ-দেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দাঁতুন মন্দির প্রধান স্থান। এই ক্ষুদ্র সহরটীর চারিদিকেই দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান দেবমন্দিরের বিবরণ সন্নিবেশিত হইল।

(১) শ্যামলেশ্বর :—এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মন্দিরের চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের সম্মুখ আঙ্গিনায় বৃষের সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি যেন প্রভুর প্রত্যাগমন অবসরে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছে। বৃষটী ভগ্নপদ।

* Captain Franklin's Shah Alam.

মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরটী কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন নাই; তবে মন্দিরের গঠন প্রণালীতে অনুমান হয় যে মহারাষ্ট্র গৌরবের মধ্যভাগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে (পশ্চিম ভাগে) সুন্দর একটি জলাশয় আছে। মন্দির ও জলাশয় প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীর গাত্রে মন্দির প্রবেশের তিনটী পথ আছে। পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার।

শ্যামলেশ্বরের একটি স্নানাগার আছে; স্নানের জল নির্গমের জন্য একটি পয়ঃপ্রণালী আছে, এই পয়ঃপ্রণালীর উপরিভাগে পদচারণ করা নিষিদ্ধ।

শ্যামলেশ্বর দেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। গল্পটী নব্যশিক্ষিত পাঠক পাঠিকাগণের নিকট যতই আষাঢ়ে বোধ হউক না কেন, মন্দির প্রাঙ্গনে প্রদোষের আরতির সময়ে যখন তথাকার অধিবাসী জনৈক ভক্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহা সবিস্তারে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছিল; তখন তাহার বিশ্বাস ও ভক্তির দৃঢ়তায় মুহূর্ত্তের জন্য আমরাও মোহিত হইয়াছিলাম। গল্পটী যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে বক্তার সেই অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গী ও হৃদয়ের সম্যক অভাব সুতরাং আশঙ্কা হয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের মত রসাস্বাদন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ!

অতি প্রাচীনকালে ময়ূরভঞ্জে এক মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রতিদিন টাট্‌কা মৌরলা মৎস্য আহার করিতেন। মৎস্য সংগ্রহের জন্য কোন ধীবর 'নাম্ কর' ভোগ করিত। স্বর্ণরেখা নদী হইতে মৌরলা মৎস্য সংগৃহিত হইত। দৈববশে একদিন নদীতে ভীষণ ঝড় উঠিল। সে সময় স্বর্ণরেখায় জাল নিক্ষেপ করা অসম্ভব। অথচ অন্যত্র মৌরলা মৎস্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এদিকে ঝড়ের বিরাম নাই, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা মানবের সাধ্যাতীত। রাজাও ছাড়িবেন না; প্রতিদিন উক্ত মৎস্য যোগাইতে না পারিলে জেলেকে সবংশে বিনষ্ট হইতে হইবে, রাজার এরূপ আদেশ। ধীবর ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ; এ দুর্দ্দিনে স্বর্ণরেখায় মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় যে বিপদ রাজার কোপানল তাহা হইতেও ভয়াবহ।

"না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ।" ধীবর অগত্যা পরিজনের মমতায় নিজ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণরেখায় মৎস্য ধরিতে দৃঢ়সংকল্প হইল। ৺ভগবান্ মহেশ্বরের নাম স্মরণান্তর অসীম সাহসে নির্ভর

করিয়া ধীবর এবার সুবর্ণরেখায় জাল নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ভীষণ ঝড়ের প্রবল তাড়নে নৌকাসহ সে বহুদূরে ভাসিয়া গেল সৌভাগ্যক্রমে নৌকা ডুবিয়া প্রাণে মারা পড়িল না। এইরূপে বিষম বিপন্ন দশায় পতিত হইয়া জেলে যখন দুশ্চিন্তায় আকুল, তখন তাহার নিকটে অকস্মাৎ এক দিব্য-জ্যোতির আবির্ভাব হইল। সেই অপূর্ব জ্যোতি বিকাশে জেলে সংজ্ঞা হারা হইল না বটে, কিন্তু আরও আকুল হইয়া পড়িল, ভীতিবিহ্বল মনে ভাবিতে লাগিল এ আবার কি, কোন অপদেবতা নয় ত? জেলের মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া দিব্যমূর্ত্তি অভয়-হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আমি স্বয়ং মহাদেব, তোমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি—ঐ যে পরপারে বন দেখিতেছ, উহার ভিতর "অমৃত-কুণ্ড" নামে একটি কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডে জাল নিক্ষেপ করিলে তোমার অভিপ্সিত মৎস্য পাইবে।" ধীবর দেবতার আদেশ মত জাল ফেলিয়া কুণ্ড হইতে দুইটি সৌরলা মৎস্য পাইল। প্রফুল্ল চিত্তে সে মৎস্য দুইটি লইয়া রাজাকে উপহার দিল। মহারাজ ধীবরের প্রমুখাৎ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহাকে কুণ্ডটা দেখাইবার জন্য আদেশ করিলেন। ধীবর তদনুসারে মহারাজকে কুণ্ডের নিকট লইয়া চলিল। এদিকে ভগবান্ শ্যামলেশ্বর মহা রাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই অমৃতকুণ্ড চাপিয়া বসিলেন। মহারাজ আর কুণ্ড দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু ভগবান্ শ্যামলেশ্বর মহা রাজকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিলেন। অতঃপর তথায় শ্যামলেশ্বর স্থাপনের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও দৈনিক পূজার জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে মহারাজের উপর স্বপ্নাদেশ হইল। তদনুসারে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আজিও ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ এই শ্যামলেশ্বরকে পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন।

(২) কালী চণ্ডিকে—এই স্থানে কোন মন্দির নাই। দাঁতনের উত্তর দিকের মাঠে একটি বৃহৎকায় অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের গায়ে মা কালী চণ্ডিকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত। উপরে ছাদ নাই;—একমাত্র বৃক্ষপত্রই চন্দ্রাতপ ও ছাদ উভয়ের কাজ করিতেছে। প্রবাদ এরূপ, অবিরল ধারে বৃষ্টিপাত হইলেও দেবীমূর্ত্তির গায়ে বারিবিন্দু পতিত হয় না। বরিষার সময় চতুর্দ্দিকস্থ মাঠ জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, কিন্তু মার অশ্বত্থ প্রাঙ্গনে নাকি কখনও জলস্রোত প্রবাহিত হয় নাই। কথিত আছে

মহাকবি কালিদাস এই অরণ্য মূলে সিদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছিলেন (!)। আমরা বিশেষ অনুসন্ধানেও কিন্তু ২।৩ মাইলের মধ্যে কালিদাসের সিদ্ধিস্থান কিংবা প্রসিদ্ধ [illegible] নামধেয় কোন বস্তুর দর্শন পাইলাম না। বিশেষ [illegible] যে যাহাই থাকুক, মহাকবির এতপুরের সিদ্ধি লাভের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানাদির সমাবেশ আছে বলিয়া ধারণা না করিলে দর্শকের কোন প্রতারণায় ভাগী হওয়ার আশঙ্কা নাই, একথা নিশ্চিত। মা কালী-চণ্ডিকার অনুচর দুইটি ভীষণ ব্যাঘ্র আছে, লোকের এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল; যাহা হউক শাস্ত্র এ সংস্কারের সমর্থন করে না—যেহেতু পুরাণের চণ্ডিকা সিংহ-বাহিনী। উপসংহারে একটি কথা না বলিলে অন্যায় হয়, কালীচণ্ডিকা বড় জাগ্রত দেবতা—জন সাধারণের দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি; বহু দূর দূরান্তর হইতে লোক সমূহ দেবী পূজার্থ এখানে সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকে।

(৩) দাঁতন কাঠি:—জনশ্রুতি এরূপ যে দাঁতন কাঠি হইতে স্থানটীর নাম দাঁতুন হইয়াছে। আমরা দাঁতন কাঠি দেখিয়াছি। একখানা ছোট মেটে কোঠা; উপরে যে চালাটুকু ছিল, তাহা প্রায় জীর্ণ হইয়াছে। এই স্থানে একখানা কাল প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহাসন ও লাল প্রস্তরের দাঁতন করিবার কাঠি আছে। সিংহাসনখানার অর্দ্ধেক মাটীতে বসিয়া গিয়াছে, উপরের অর্দ্ধাংশ হেলান ভাবে রহিয়াছে। কাঠিখানা দৈর্ঘ্যে দেড়হাত, প্রস্থে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হইবে। সিংহাসনখানির দৈর্ঘ্য তিন হাত। কথিত আছে জগন্নাথ দেব এইস্থানে বসিয়া দন্ত ধাবন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ দেবের পাদুকার অস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

অন্যান্য কয়েকটী মন্দিরের নাম মাত্র উল্লেখ করা গেল;—যথা (১) বাহেনা চণ্ডী, (২) নর্ম্মদেশ্বর (৩) ঝাঁটেশ্বর (৪) জগন্নাথ—এই জগন্নাথের মন্দিরটী পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। (৫) শীতলা (৬) চন্দনেশ্বর (৭) মুক্তেশ্বর (৮) ফুলেশ্বর (৯) জয়চণ্ডী ও (১০) সাতবাহিনী।

জলাশয়:—দাঁতুন মন্দিরের ন্যায় সুন্দর ও সুবৃহৎ জলাশয়ের জন্যও বিখ্যাত। কিন্তু তন্মধ্যে দুই তিনটী ব্যতীত প্রায় সমস্ত পুকুরের জলই পান করিবার উপযোগী নহে। এ দেশের জল স্বভাবতঃই ঘোলা।

(১) বিদ্যাধর:—এই সরোবরটী দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন পোয়া মাইল ও প্রস্থে সিকি মাইল হইবে। দাঁতুনের গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্বদিকে পুলিশ ষ্টেসনের সন্নিকট বিদ্যাধর সরোবর অবস্থিত। স্থানীয় লোকের পক্ষে এই পুকুরের

জল বেশ স্বাস্থ্যকর। আমরা এই জলাশয়ে দশ বার দিন অবগাহন করিয়াছি, আমাদের কোন অসুখ করে নাই। কথিত আছে বিনাট রাজার পুরোহিত বিদ্যাধর এই সরোবর খনন করান। পুকুরের উত্তর পারের ঘাটে একখণ্ড মনুষ্যাকৃতি প্রস্তর আছে। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে এই প্রস্তর প্রথমে দেবতা ছিল। দেবতা প্রতি রাত্রিতে সরোবর হইতে উঠিয়া আহার সংগ্রহের জন্য গ্রামে যাইত। কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক ইহা জানিতে পারিয়া দেবতার গাত্রে অপবিত্র পদার্থ নিক্ষেপ করে, তদবধি দেবতা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে!!

(২) যড়শঙ্কা :—সহর হইতে দুই মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থ তিন পোয়া মাইল হইবে। এত বড় জলাশয় এদেশে আর নাই। জনশ্রুতি যড়শঙ্কা নামধেয় জনৈক নৃপতি এই সুবৃহৎ সরোবর খনন করান। পুকুরের পাড়গুলি অতি উচ্চ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বলিলেও হয়। আমরা ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার এই সরোবর দেখিতে গিয়াছিলাম। তীরগুলি প্রস্থে দেড়শত হাত হইবে। পশ্চিম তীরের নিম্নদেশে তিনটী পুরাতন মন্দির আছে, যথা :—শিবমন্দির, জগন্নাথ ও রামচন্দ্র। আমরা পশ্চিম দ্বার দিয়া পুকুরের তীরে উঠিয়া ছিলাম। দক্ষিণ দিক দিয়া বাহির হইয়া আসি। আমরা বৈকালে ৪টা ৩০ মিনিটের সময় বাসা হইতে রওয়ানা হই; রাত্রি ৮টা ১৬ মিঃ সময় বাসায় ফিরিয়া আসি। জলাশয়ের মধ্যভাগে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটী ভালরূপ দেখা যায় না, বোধ হয় যেন চারিদিক জলে ডুবিয়া আছে। সরোবরে বড় বড় চিতল মাছ আছে। এই গুলকেই স্থানীয় লোকেরা কুমীর বলিয়া থাকে। আমরা যড়শঙ্কার চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে পারি নাই। এই সকল সরোবরের একটী বিশেষত্ব এই যে ইহাদের অধিকাংশের মধ্যভাগেই এক একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার সবগুলি জলাশয়ের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব; নিম্নে আরও কতকগুলি জলাশয়ের নাম প্রদত্ত হইল। যথা :—ধর্ম্মশালা (মধ্যভাগে মন্দির); রাউলিয়া; কাজলী এক নামের দুইটি পুকুর আছে; মহালিয়া; জাহানা (মধ্যভাগে মন্দির); পান-পুকুর; কাহানিয়া; দাণ্ডুরা; ঘোলপোনিয়া; ডোমনিয়া; ভাটী; পাহানা; রাহানা; কৌশল্যা (মধ্যভাগে মন্দির) এই জলাশয়ের পানীয় জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট; রায়বার-নূতন খনিত—দেওয়ানী আদালতের সন্নিকট; ভাট-গাম্রিয়া; বানিয়া পুকুর ও কারখা।

ভাষা :—দাঁতুনবাসিদের ভাষা উড়িয়া সংমিশ্রিত। দাঁতুনে অনেক

সাঁওতাল আছে; ইহাদের ভাষা ভিন্ন। ইহারা বাজারে জিনিষাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে আইসে। ইহারা বড় শান্ত। নিম্নে কতক গুলি প্রচলিত উড়িয়া শব্দের মূল ও অনুবাদ দেওয়া গেল:—

বাঙ্গলা		উড়িয়া
চাউল	..	চাউর
ডাল	...	ডালি
জল	...	পানি
বেগুণ	...	বাংগনো
কদলী	...	কলা
কুমড়া	...	বৈতাল কোথুড়ো
চাল কুমড়া	...	পানি কোথুড়ো
আক	...	আকু
লবন	..	লুনো
তৈল	...	মালপো
কাপড়	...	লুগা
কলসী	...	গাগরা
ছাগল	...	ছেলি
ধামা	...	পাছিয়া
ঝাটা	...	ঝাচুনী
দেওয়াল	...	কাদো
দা	...	কাতান
বেড়াইতে যাইব	...	বুলতে যাবা
শীঘ্র আইস	...	সটকারী আসমী।

আইন আদালত:—দাঁতুন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটি দেওয়ানী আদালত, সব্‌রেজিষ্টার আফিস্, পোষ্টাফিস্ ও পুলিশ ষ্টেশন আছে। এখানকার অধিবাসীরা বেশ মোকদ্দমাপ্রিয়। এখানে পাঁচটী মাত্র উকিল আছেন, তন্মধ্যে একজন বি, এল।

হাটবাজার:—দাঁতুনে দুইটি বাজার আছে। একটীর নাম 'দাঁতুন বাজার' ও অপরটী 'সরাই বাজার' নামে পরিচিত। সাঁওতাল রমণীগণ ক্রয় বিক্রয় করিতে এখানে আসিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্য ঃ—দাঁতুনের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। দূর হইতে দেখিতে দাঁতুন একটি বাঁশবন বলিয়া বোধ হয়। এখানকার বাঁশগুলি কাঁটা বিশিষ্ট। দাঁতুন সহরটী দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ইহার জলবায়ু ভাল নয়। এখানে ম্যালেরিয়া বার মাসই লাগিয়া আছে। বিদেশীর পক্ষে দাঁতুন বড়ই অস্বাস্থ্যকর। দাঁতুন উষ্ণপ্রধান স্থান, এখানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে।

গৃহ ইত্যাদি ঃ—এখানে সমস্তই মেটে কোঠা। এদেশে উলুবন পাওয়া যায় না; ধানের খড় চালার ছাউনিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে সামান্য দু'চারখানা দালান আছে, সেগুলি গবর্ণমেণ্ট বিল্ডিং।

হাঁসপাতাল ঃ—সে সময়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন। ইনি ব্যবসায়ে বেশ দক্ষ ও ব্যবহারে অমায়িক। ইঁহার বাড়ী কটকে। ইঁহারা পূর্ব্ববাস কলিকাতা ছাড়িয়া এখন এদেশবাসী হইয়াছেন। কলেরা রোগীর জন্য সহরের বাহিরে একটি স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল আছে।

বিদ্যালয় ঃ—দাঁতুনের অধিবাসীরা লেখাপড়ার দিকে বড় মনোযোগী নয়। তথায় জীবনসংগ্রাম কঠোর নয় বলিয়া দাঁতুনবাসিরা উচ্চশিক্ষার দিকে লক্ষ্য করে না। এখানে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

দাঁতুনের দক্ষিণ-পশ্চিমে রায়বনের গড়। এখানেই না কি বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ ছিল। দুঃখের বিষয় নানা অসুবিধায় আমরা রায়বনের গড় দেখিয়া আসিতে পারি নাই। ১০ই আষাঢ় দাঁতুন ছাড়িয়া আসি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দাঁতুনের স্বাস্থ্য বড় ভাল নয়। আমাদের আত্মীয় বাবু (যাঁহার বাসায় আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম) অকস্মাৎ উৎকট রেমিটেণ্ট জ্বরে (Remittent Fivar) আক্রান্ত হইয়া কয়েক মাসের অবসর গ্রহণ করেন। কাজেই সপরিবারে তিনি স্বদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে দাঁতুনের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

ফিরিবার পথে প্রথমতঃ দাঁতুন হইতে মোহনপুর পর্য্যন্ত পুনরায় গো-যানই কয়দিন আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। দিবাভাগে সূর্য্যের প্রখর কিরণে গো-যানে অতিকষ্টে কালযাপন করিতে বাধ্য হইলেও রজনীযোগে যখনই জ্যোৎস্নার বিকাশ হইত, তখনই পদব্রজে অগ্রসর হইতে আমরা সমবয়স্ক কয়জন বড়ই আরাম বোধ করিতাম। এইরূপে পদব্রজে আমরা কখন বা পূর্ব্ববর্ত্তী গাড়ীর

পেছন পেছন যাইতাম কখনও বা গাড়ীর অগ্রগামী হইতাম। আমাদের এই আমোদে একটি সঙ্গিনীও জুটিয়াছিল। সঙ্গিনী একটি বালিকা। আমাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিবার জন্য সেই তরলমতি বালিকার তদানীন্তন উদ্যম ও তদীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরণের চঞ্চল গতি, শতবার বিফলপ্রযত্ন হইলেও বড়ই মনোহারী হইয়াছিল; আজিও তাহা স্মৃতিপথে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সরলা বালিকা যখন আলুলায়িত কুন্তলে, অর্দ্ধস্খলিত বসনে শুভ্রজ্যোৎস্না পরিবৃতা হইয়া বন্যহরিণীর ন্যায় সেই সুদূর সাগরতীর সন্নিহিত মেদিনীপুরের প্রান্তর মধ্যে মৃদু মৃদু পদবিক্ষেপে—তরঙ্গ হিল্লোল সদৃশ নাচিয়া নাচিয়া অগ্রসর হইত তখন প্রকৃতই সেই অদৃষ্ট পূর্ব্ব কপালকুণ্ডলার মোহময়ী অস্ফুট-স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিত—তখন মুহূর্ত্তের তরে সেই স্বপ্নজগৎ আমাদের নিকট প্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। হায়! পৃথিবী তখন কি সুখেরই না বোধ হইয়াছিল!

পথে আমরা তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। পাশকুড়োর বাংলায় (Bungalow) একটি দিন বড়ই আমোদে কাটাইয়াছিলাম। মোহনপুর লক্ (Lock) হইতে পাশকুড়ো পর্য্যন্ত আমরা Canal Boatএ আসিয়াছিলাম Canal এর ভিতর দিয়া নৌকায় ভ্রমণ বড়ই আমোদ জনক। সে সময়ে একটা লক্ (Lock) খারাপ হইয়া যাওয়াতে ষ্টীমার পাশকুড়োর এদিকে আসিত না। আমরা একদিন নারায়ণ গড়ে halt হল্ট করি। তথায়—— বাবু স্থানীয় স্কুলের কয়েকটী ছেলেকে ছবির বহি প্রাইজ্ দেন।

চতুর্থ দিবসে আমরা সকলে নিরাপদে কলিকাতা পৌছি।*

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* 'দাঁতনে দিন দুই' প্রবন্ধে হিন্দুলেখক তাঁহার নিজের মর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সহিত মুসলমানসমাজের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই। আমরা মুসলমান লেখকদিগকে ভ্রমণকাহিনী লিখিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিবার আশাতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা ভরসা করি, শ্রদ্ধাস্পদ মুসলমান লেখকগণ শীঘ্রই এই বিষয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আমরা জানি বন্ধুবর মৌলভী মতিয়র রহমান সাহেব প্রমুখ অনেকেই দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর শিক্রী প্রভৃতি ইতিহাসবিখ্যাত স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান লেখকগণের নিকট আমরা এ বিষয়ে অনেক আশা রাখি। নঃ সঃ।

একটি পরিব্রাজক বন্ধুর প্রতি।

প্রিয় সখে!

তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে?

যবে তুমি ক্লান্ত প্রাণে, ভারতের নানা স্থানে,

ঘুরে ঘুরে যৌবনের ভগ্নস্তূপ দেখিবে!

তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে?

অতীতের কত স্মৃতি, কত পুণ্যময়ী কীর্ত্তি,

একে একে হৃদি তলে যবে জেগে উঠিবে!

সে সৌভাগ্য সে গৌরব, সে বিগত দৃশ্য সব

হৃদয়ের মূলে যবে শোক-ঝঞ্ঝা তুলিবে!

তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে?

সে অতীত হিন্দুরাজ্য, হিন্দু সমাজের পূজ্য,

সে মৃত নৃপতিবৃন্দ যবে হৃদে জাগিবে!

ভীষ্ম কর্ণ যুধিষ্ঠির, পার্থ দ্রোণ মহাবীর

সে হস্তিনা, ইন্দ্রপ্রস্থ যবে মনে পড়িবে!

তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে?

অতীতের কত কথা, প্রাণে দিবে শত ব্যথা,

সে বিগত চিত্রগুলি যবে হৃদে ভাসিবে!

সে দ্রৌপদী সে সাবিত্রী, সে সীতা পদ্মিনী সতী,

সেই কৃষ্ণ, সেই রাম যবে মনে পড়িবে!

তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে?

সে সরযূ, সে যমুনা, সেই লীলাবতী, খনা,

পৃথ্বীরাজ, ভীমসেন যবে হৃদে জাগিবে!

সে চিতোর, গোবর্দ্ধন, সে মথুরা বৃন্দাবন

বাপ্পা রাও, সে প্রতাপ যবে মনে পড়িবে!

তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে?

সে আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আলমগীর,
সে মোমতাজ, নুরজাহান যবে হৃদে জাগিবে !
সে আগ্রা, সে অর্দ্ধচন্দ্র, সে গৌরব সে বীরেন্দ্র,
সে দিল্লী, সে লক্ষ্নৌ যবে মনে পড়িবে !
তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে ?

সে জুমা মসজিদ-দ্বারে, সে রম্য মিনার পরে,
দাঁড়াইয়া তুমি হায় যবে দিল্লী দেখিবে !
ইস্লামের সে গৌরব, দিল্লীর বৈভব সব,
যবে তব স্মৃতিপথে একে একে জাগিবে !
তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে ?

মোস্লেম গৌরব রবি, ইস্লামের পূর্ণ ছবি
দিল্লীর শ্মশান ভস্মে যবে সুপ্ত দেখিবে !
সম্রাটের সে হেরেম, স্বর্গ সম অনুপম
দীপাভাবে যবে তুমি তমোময় হেরিবে !
তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে ?

আরো হায় কত কথা, প্রদানিবে কত ব্যথা,
হৃদয়ের মাঝে তব কত ঝঞ্ঝা তুলিবে !
সে শৌর্য্য ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তি, অতীতের সুধা স্মৃতি,
একে একে হৃদিতলে যবে জে'গে উঠিবে !
তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে ?

আর সেই ভিক্টোরিয়া, মাতৃ সম বুকে নিয়া,
ছিলা যেই এত দিন, যবে হৃদে জাগিবে !
তাঁর সে উদার নীতি, তাঁর সে গৌরব-গীতি,
তাঁর সে ঘোষণাপত্র যবে মনে পড়িবে !
তুমি হাসিবে কি কাঁদিবে ?

কায়কোবাদ ।

বিধবা।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু-শয্যায়।

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া অমরনাথ একদিন অপরাহ্নের স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কনিষ্ঠ সহোদর যোগনাথকে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিতে ইসারা করিলেন। অমরনাথের দীর্ঘ গৌরদেহে নব যৌবনের প্রস্ফুটিত অথচ ম্লান মুখোপরি নৈরাশ্যের ও মৃত্যুর কালো ছায়া অলক্ষ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। সে ম্লান বড় বড় কালো চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছিল;—সে করুণ কাতর দৃষ্টি আত্মীয় স্বজনের ম্লানমুখে কেন জানি পূর্ব্ব হইতেই একটা নিরাশার ঘন অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছিল।

কাতর কণ্ঠে অমরনাথ ডাকিলেন "যোগনাথ!" যোগনাথ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি দাদা! বড় কষ্ট হচ্চে? বাতাস করবো?"

যোগনাথ একথা গুলি একেবারে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন। শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তিনি এতক্ষণ কত কথাই না ভাবিতেছিলেন! অতীত জীবনের কত কথাই না তাহার মানসপটে উদিত হইতেছিল। জ্যেষ্ঠ সহোদর অমরনাথের সেই প্রাণভরা প্রেমভরা স্নেহ—সেই কত যত্ন, কত ভালবাসা;—কোন্ দিন যোগনাথ অমরনাথকে মন্দ বলিয়াছিলেন,—অমরনাথ তাহা বিশ্বাস করেন নাই।—কোন্ দিন অমরনাথকে মা একটি কমলালেবু দিয়াছিলেন, যোগনাথ তখন বাড়ী ছিলেন না, অমরনাথ শত অনুরোধেও তাহা খাইলেন না, যোগনাথের জন্য রাখিয়া দিলেন।

সেই শৈশবে নদীর তীরে বসিয়া গল্পকরা, তারা গণা, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি,—জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুর বেলা আম্ তলায় বসিয়া আম কুড়ানো,—অতীত জীবনের,—শৈশবের সেই মধুর কল্পনাময়ী স্মৃতি, অতীত ইতিহাস, একে একে ছায়ার মত আসিয়া যোগনাথের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিল। অলক্ষ্যে দুইটি অশ্রুকণা আসিয়া নয়ন প্রান্তে দেখা দিল। হায়! হায়! এমন স্নেহময়—প্রেমময় পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিয়োগ-দুঃখও কি তাহার সহ্য করিতে হইবে? হায়! ভগবান্! এই কি তোমার মনে ছিল? অমরনাথের কাতর আহ্বানে

তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন দাদা, কেন ডেকেছেন ? আজ কি বড় কষ্ট হচ্চে ? বাতাস করবো ?"

"না ভাই ! আমার কষ্ট কি ? আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। নারায়ণ ! আমায় ত্রাণ কর, ভাই ! আজ আমি তোমায় কয়েকটি কথা বলবো। একবার জানালাটি খুলিয়া দাও ! একবার জন্মের মত,— এদেহে জীবনীশক্তি থাকিতে প্রকৃতির প্রাণভরা হাসি দেখিয়া লই ! মা বিশ্বজননী ! আমায় তোর কোলে নে মা !" ধীরে ধীরে ছুই ফোঁটা নয়ন-জল রুগ্নের শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, দূরে নীলাকাশে ফুলের ন্যায় অনন্ত তারকাগুলি হাসিতেছিল,—সান্ধ্যপবন লতা পল্লব দোলাইয়া—নাচিয়া ছুটিয়া সুরভি কুসুম-পুঞ্জ চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ আকাশে উঁকি মারিতেছিল —সে দৃশ্য বড় করুণ, বড় সুন্দর !

রুগ্নের ম্লানমুখে প্রকৃতির হাস্য বিভাসিত মুখখানির রূপোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পড়িয়া এক অপূর্ব্ব প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া অমরনাথ সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় না জানি কত কি ভাবিতেছিলেন। হায়, এ মানব জীবন কি ফুলের মত দুদণ্ড ফুটিয়াই ঝরিয়া পড়ে, না ঐই আকা-শের তারার মত যুগ যুগ নিজের আলো পর-সেবায় বিতরণ করে ?

ধীরে অতি ধীরে অমরনাথ যোগনাথের হাতখানি স্বীয় শীর্ণ হাতের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন—"ভাই, আমি চলিলাম, আমি বুঝিতে পারিয়াছি আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর অধিক সময় নাই,—আমি চলি-লাম, —জানিনা কোথায় যাইব ? ভাই ! যদি কোন দিন কোনও অপরাধ করিয়া থাকি মার্জ্জনা করিও, আমি সুখে মরিব। হতভাগিনী বালবিধবা রহিল, দেখিও উহার জাতি,শীল,কুল মানের দায়ী তুমি,অভাগিনী যেন কোনও কষ্ট না পায়,অভাগিনীর এ জগতে আর কেহই রহিল না।"

অমরনাথের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল,—অজস্র ধারে নয়ন-জল ঝরিতে লাগিল। ভ্রাতার মলিন, মৃত্যুকাতর মুখের দিকে চাহিয়া যোগনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "না দাদা ! উপরে ধর্ম্ম আছেন, আমি জীবিত থাকিতে বৌ-দিদির কোনও কষ্ট হইবে না।" মুমূর্ষুর ম্লান মুখে হাস্যরেখা দেখা দিল। যোগনাথ উত্তরীয়-বসনে নয়ন-জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া স্রীয়মানা সুষমা।

সুষমা কাঁদিতেছিল,—সংসারজ্ঞানবিরহিতা কোমলা বালিকা জীবনের

যৌবনের সেই বাসন্তী উষার আশা, সুখ, উৎসাহের গীতি পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ভবিষ্য জীবনের একটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন পরিণাম ভাবিয়া ভাবিয়া নৈরাশ্য সাগরে ভাসিতেছিল।

অমরনাথ ডাকিলেন,—"সুষমা"!

সে স্বর শুনিয়া সুষমার অশ্রুপ্রবাহ যেন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল! অভাগিনী পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিতেছিল। অমরনাথ আবার ডাকিলেন "সুষমা, আমার কথা শোন, এ কাঁদিবার সময় নয়, আমার এ জীবনের খেলাধূলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমি চলিলাম,—বড় কষ্ট রহিল তোমায় আমি সুখী করিতে পারিলাম না, জীবনের শত আশা আকাঙ্ক্ষা সকলি অলীক কল্পনায় পরিণত হইল। কে জানিত জীবনের শুভ্র প্রভাতেই আমাকে এই কাল ব্যাধি আক্রমণ করিবে? তুমি হতভাগিনী তাই এ জীবনের সুখ সাধ সকলি তোমার অপূর্ণ রহিয়া গেল; আশীর্ব্বাদ করি জন্মান্তরে সুখী হইও। যোগনাথ রহিল তাহাকে আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত দেখিও। সংসারের পথ বড় পিচ্ছিল,—পদে পদে পথভ্রম হইবার সম্ভাবনা, সাবধান! যেন পদস্খলিত না হয়! ধর্ম্ম আছেন, ঈশ্বর আছেন, নিরুপায়ের উপায় ভগবান্—তিনিই তোমার ন্যায় হতভাগিনীকে চরণে আশ্রয় দিবেন;—প্রিয়তমে। জন্মের মত বিদায় দাও!—" আর কথা বাহির হইল না পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অমরনাথ উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুষমাও গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, অভাগিনীর মুখে আর কথা ফুটিলনা!

অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া একজন হাসিতেছিল,—সে সর্ব্ব নিয়ন্তা বিভীষিকাময় বিশ্ববিজয়ী মৃত্যু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মণিহারা ফণিনী।

নিদাঘের এক সুন্দর ম্লান অপরাহ্ণে অমরনাথের অমরআত্মা দেহের পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া পলাইল! হায়, মানবাত্মার প্রস্থানের পথের যদি কেহ সন্ধান জানিত!

অভাগিনী সুষমা হতভাগা স্বামীর মৃত্যুকালীন কাতর নব শয্যাপ্রান্তে পদ-

তলে বসিয়া বসিয়া শুনিল,—দেখিয়া শুনিয়া কাঁদিল,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে দেখিল—সে বুঝিল তাহার সুখের স্বপ্ন, শান্তির আশা জন্মের মত নির্বাপিত হইয়াছে,—সে চোখের জল মুছিয়া নয়ন মেলিয়া চাহিল,—দেখিল বাহিরে বড় অন্ধকার—অন্ধকারের পর অন্ধকার;—সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, বাহিরে ভীমা তামসী নিশি। তাহার হৃদয়েও কি তাই? সে অন্তরের অন্তরের দিকে চাহিল, চাহিয়া বুঝিল, এ বাহিরের অন্ধকারের শেষ আছে—নিশাবসানে আবার আলোক রেখা দেখা দিবে, জগত জাগিবে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্ধকারের পার নাই—কূল নাই—এ জীবনে আর সে অন্ধকারে দামিনী চমকিবে না—চাঁদ হাসিবে না—পাখী আর হৃদয়কুঞ্জে গাহিবে না—সে কোথায়? হায়! হায়! নব যৌবনের পবিত্র উন্মেষে বসন্তের নববিকশিতা ব্রততী অকালে ধূল্যাবলুণ্ঠিতা, অকালে দলিতা! সে তাহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল! হায়! জগদীশ! কেন তাহার এমন হইল? সে যে তখনও আপনাকে ভাল করিয়া বোঝে নাই—সে যে সংসারানভিজ্ঞা কোমলা সরলা বালিকা।

দূরে,—গঙ্গা নদীর তীরে নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুষমা সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল—তখনও কপালে সিন্দুর শোভিতেছিল,—সে একে একে শরীরের সমুদয় অলঙ্কার খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল, তারপরে পাগলিনীর মত ধূলায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—হায়! হায়! সে যে মণিহারা ফণিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরের পাখী।

অমরনাথের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, বসন্ত, বর্ষা, হাসিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছে,—বসন্ত হাসিয়াও হতভাগ্য পরিবারের ক্রন্দন থামাইতে পারে নাই, বর্ষাও দিবা নিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহারও নয়ন-জল মুছাইতে পারে নাই। সে শোক কাতর তাহার হৃদয়ে শান্তি আসিবে কোথা হইতে? যোগনাথ প্রবীণ মানুষ, তিনি সংসারের দশ দিক দেখিয়া শোকাবেগ রোধ করিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু সে দারুণ ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত শোক একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তি প্রেম ও ভালবাসা আছে, সে প্রিয় জনের মৃত্যুতে তাহার পবিত্র স্মৃতি ভুলিতে পারে

না ;—যে ভোলে সে প্রেমিক নহে, তাহার হৃদয়ের ভালবাসার গভীরতা নাই। প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ মৃত্যু।

অভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার এরূপ অবস্থায় যতদূর সুখ, শান্তি হইতে পারে সে বিষয়ে তিনি সদাসর্ব্বদা যত্ন করিতেন।

জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুকালীন করুণ অনুরোধ বাঁশীর রাগিণীর ন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া দিবানিশি তাঁহাকে কর্ত্তব্য সাধনে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিত। তিনি সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন।

যোগনাথ ভ্রাতৃজায়াকে সংসারের সমুদয় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। সুষমাও দেবরের সংসারের শৃঙ্খলা বিধানে প্রাণপণে যত্ন করিতেন, তাঁহার সচ্চরিত্রতায় ও অমায়িক ব্যবহারে সহজেই তাঁহার প্রতি সকলের স্নেহ ও প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর সুখ কোথায়? বিহঙ্গীর কত কথা মনে জাগে, সে দেখে দলে দলে পাখীগুলি পাখা মেলিয়া মেলিয়া নীলাকাশে উড়িয়া বেড়ায়—বনে বনে শ্যামল পত্রপল্লব পরিশোভিত বিটপী-শাখে বসিয়া গান গায়,—রসাল ফল খায়, কি সুন্দর মুক্ত স্বাধীনতা! সুষমারও ঐ পাখীগুলির মত অমনি করিয়া প্রিয়জনান্বেষণে উড়িয়া বেড়াইবার সাধ যাইত!

তাহার যদি পাখা থাকিত তাহা হইলে সে কি করিত? উড়িয়া পলাইত;—তারার দেশে চাঁদের দেশে যাইত,—সে খুঁজিয়া বাহির করিত কোথায় তাহার জীবনের ধ্রুবতারা! সুষমা ভাবিত,—ভগবান্ আমায়ও তোমার কোলে টানিয়া লও, এ সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া আর কতদিন এমনি করিয়া জ্বালাইবে? যদি আমাকে সংসারে রাখিতেই তোমার ইচ্ছা ছিল, তবে তাঁহাকে কেন নিলে? যদি তাঁহাকেই নিলে তবে আমাকে রাখিলে কেন? সেই দিন—হায়! হায়! যেদিন অভাগিনীর কপাল পুড়িল,—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ গেলনা কেন? আমি মরিলাম না কেন? বাঁচিয়া থাকিয়া আমার ফল কি? আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে সারা জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব?

সে কত কথা ভাবিত—কত কথা চিন্তা করিত—পলকের জন্যও তাহার হৃদয়ে শান্তি ছিলনা,—নিশীথ আঁধারে কমলিনী হাসে কবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কার দোষ ?

আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?
তুমিই আপন হাতে চিঠীর শেষের পাতে
লিখিতে শিখালে মোরে 'হেমলতা বোস' ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

প্রতিদিন নিজ হাতে সিন্দুর মুছিয়া নিতে,
ঘোমটা খুলিয়া দিতে—সাধের মুখোস্ ।
এখনো পরিলে শাড়ী তুমি বল গেঁয়ে নারী,
গাউন্ বডী প'রে তাই মিটাই আপশোষ্
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

প্রভাতে সন্ধ্যার বেলা ঘর লেপা দীপ জ্বালা,
ছিল মোর নিত্যকর্ম্ম—পরম সন্তোষ,
তুমিত শিখালে সখা কাদা ও গোবর মাখা,
অতিশয় অসভ্যতা—জাতিগত দোষ !
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

আমিত জানিনি কভু ওহে রমণীর প্রভু,
বাটনা বাটিতে যায় নখের খোলোস্ ;
রাঁধিতে দাওনি মোরে, গায়ে যদি কালি ভরে,
কাজেই বসেছি পুড়ে এই তক্তপোষ ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

তুমিত শিখালে মোরে উঠিতে হবেনা ভোরে,
স্বাস্থ্য-হানি করে রাত ও উপোস্ ;
চিঠী-লেখা, বই দেখা, সেলাই, বুনন শেখা,
আতর গোলাব মাখা, আমোদ নির্দ্দোষ ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

রং মেখে সং সেজে কভু ছাদে কভু মেজে
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অবশ ;
প্রতিদিন সে সময়ে গৃহস্থের বউ মেয়ে
পুকুরের ঘাটে যায় ভরিতে কলস।
আমি যে পারিনা তাহা, সে কাহার দোষ ?

দিছে আমোদে, খেলায় ভুলায়েছ দেবতায়,
প্রণয়ের ইতিহাসে করেছ বেহুশ্‌
এখন এখন আর কেন কর তিরস্কার,
মন্থনে উঠেছে বিষ পিয়ে আশুতোষ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ? *

—:০:—

কে, এ, সিদ্দিকী।

কবিতা-গুচ্ছ।

পাপিয়া।

—:০:—

গাও গো পাপিয়া গাও !
মধুর তোমার কুহুটুকু হতে
বিশ্ব ভরিয়া দাও।
মুরলী তুমি গো স্বভাবের করে,
নীল নভে কোথা সুর অধরে
চাপি চুমে পরী, সুখ বায়ু ভরে
তাই গো ফুকরি যাও !
উড়িয়া উড়িয়া গাও !
বিস্মিতা কত অমর হাতের
অমিয়া জিনিয়া যাও ;
আঁচল তুলিয়া ছুটে গিছে তারা,
তুমি যাও যদি স্বর্গসুখ পারা,
ধরা পড়ি শেষে মধু স্পর্শে যারা
শিহরিয়া গালি দাও !
গাও গো পাপিয়া গাও !
যৌবন মদে তুমি ওগো নটী
উলসি নাচিয়া যাও !
চপল চরণ, সসাজ আলগা,
মাধুরীরে বুঝি কে বেঁধেছে বাসা,
গেয়ে গেয়ে গেয়ে গীত আপনারা
তাহারে মজাতে চাও !

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বিজন-মাধুরী।

—:০:—

নীরব নিশীথে ফুটি' নীরবে প্রসূন চয়
আনমনে সৌরভ বিলায়,
নীরবে ঝরিছে কত আশা মধুময়
আলোজাল দেখিতে না চায়।

* এই কবিতাটির রচয়িতা লেখক ঢাকা—বলিয়াদীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। তাঁহাকে আমরা পরম সমাদরে সাহিত্য চর্চার জন্য আহ্বান করিতেছি। নঃ সঃ।

নধর পালিব আঁখি   নাহি করে দরশন
তাদের এ অপূর্ব্ব মাধুরী,
উষার পাইলে সাড়া   শিশির যেমন
সভয়ে তারারা পড়ে ঝরি।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বিরহ।

আমি বড় ভালবাসি মনে।
প্রেমময় বিরহ সৃজনে ;
সে যে উভয়ের চিত্র আঁকে
কত রঙ্গে উভয়ের মনে।
এ যে নিতি নিতি বাড়াইছে
উভয়ের প্রীতি কত ছন্দে ;
তুলিছে তরঙ্গ কত শত
কি সুন্দর! প্রেমের সলিলে।
'মিলন'—চাহি না তায়, থা'ক
আজ হ'তে দূরেতে পড়িয়া ;
মিশে যেন দুইটি তাড়িত
চির তরে দামিনী খেলিয়া।
মিলনের চির নীরবতা
(যদি) ভালবাস ; শতধন্য তোমা।
আমায় ও পথে টেনে লবে।
নিওনাকো চাহি আমি ক্ষমা।
আমি চাহি চিন্তা বিরহের
জাগাইতে নিত্য প্রীতিময় ;
আমি চাহি ক্ষুদ্র মেঘ সহ
ঝঞ্ঝা বৃষ্টি হউক উদয়।
তোমারে জড়ায়ে থাক্ সদা
মিলনের স্থির ভালবাসা।
বসিব বিরহ-তরু ছায়ে
জাগাইয়া তৃপ্তিহীন আশা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

খোকা।

কে তুই স্বর্গের শিশু এলিরে ধরায়,
ঢালিতে অমিয়ধারা এ দগ্ধ হিয়ায় ?
এ দুই আঁখির তারা তুইরে আমার,
ক্ষণ তরে দূরে গেলে সব অন্ধকার!
আধ আধ কথা শুনি জুড়ে যায় প্রাণ,
তোরে বুকে করি পাই স্বর্গের সন্ধান
তোর ওই হাসি মুখে যবে চুমো খাই,
কি জানি কি সুখস্রোতে আমি ভেসে যাই।
সেই দিন এলি তুই নূতন প্রভাতে
নব অতিথির মত, নীরব ভাষাতে
জানাইলি আপনার স্নেহ অধিকার,
জীবনেতে সেই দিন বুঝিনু আবার,
দুঃখের যামিনী গতে সুখ উষাভাসে,
অন্ধকার দেশে ওগো জোছনা বিকাশে।
নিরাশার গুরুভারে ক্লান্ত ছিল হিয়া,
তোরে লভি সব আমি গেনু পাশরিয়া।
থাক ওরে থাক বাছা এই দীন গেহে,
দেব-আশীর্ব্বাদ লভি, পূর্ণ মাতৃ-স্নেহে।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

আশীর্ব্বাদ।

লাবণ্যের খনি, মধুরতা ময়,
কি সুন্দর মরি! ও শুভ্র আনন ;
হাসি হাসি সদা মুখখানি তোর,
দেখিলেই স্নেহ হয় সঞ্চারণ।
সংসার ভাবনা নাহি কিছু মনে,
পূর্ণচন্দ্র সম প্রফুল্ল অন্তর ;
সুখ দুঃখ এবে, করেনি আশ্রয়,
তাইত হাসিছে বদন সুন্দর।
মাখিয়ে শরীরে ধূলা বালি কত,
টোপা ঠাসি দিয়ে করিতেছ খেলা ;
পুতুলের সনে পুতুলের বিয়ে
কি সুন্দর তুমি দিতেছ একেলা!
তোমার হৃদয় সরলতাময়
জানি জানি ওগো স্নেহের প্রতিমা,
কারে বলে বিয়ে নাহি জান তুমি,
সে খেলায় তবু সদাই মগনা।
প্রকৃতির বক্ষঃ হতে লও তুলি
পবিত্র সুন্দর কুসুম রাশি,
নিজে সাজি তাতে, পুতুলে সাজায়ে
ফুটি উঠে মুখে কি মধুর হাসি।
ওই ফুল মত যদি তুই বাছা
হইতে পারিস্ নির্ম্মল উজ্জ্বল,

ওরে মত যদি যশের সৌরভে
পূর্ণ হয় তোর জীবন চপল ;—
তোর প্রতিকার্য্যে তোর প্রতি ভাবে
স্বদেশের ছবি যদি প্রাণে জাগে,
তবেই মা তোর সার্থক জীবন ;—
কবি ধন্য হবে সবার আগে।
কুটিল সংসার বাহু প্রসারিয়া
আদরে সকলে নিয়ত ডাকে,
যে তারে চিনেনা, সে তারে বুঝেনা,
সেই সুরে মনে আর মোহপাকে।
তুই মা যখন সাজিস সংসারী,
ঠিক যেন থাকে আদর্শ তোর ;
আপনার মনে পরাজয়ী হবে
আঁটুনি বাঁধিয়া স্নেহের ডোরে।
পরদেশ পথে রাখি মতি গতি
জীবনের পথে হবে অগ্রসর,
আপনার নিজ অধিকার মাঝে
হবে নিস্ মাগো সরল সুন্দর।

হবিব উল্লা।

মাসিক সাহিত্য।

সোপান। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ। প্রেসের গণ্ডগোলে পড়িয়া এই পত্রিকা খানার প্রথম সংখ্যা শ্রাবণে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি 'সোপানের' পরিচালকগণ ইহার সুনিয়মিত প্রচারে যত্নবান হইবেন। 'সোপানের' 'আত্ম-কথা'য় লিখিত আছে, 'সে ক্ষুদ্র হউক, হীন হউক, গড্ডলিকা প্রবাহে মিশিয়া যাইবেনা। বরং লেখা ছাপা ও চিত্র বিষয়ে সতত আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গ্রাহকবর্গের চিত্তরঞ্জনে চেষ্টা করিবে। যে স্ফীতবক্ষে দাম্ভিকতার শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার গৌরব প্রকাশ করিতে সাহস করে না। তবে যেখানে বড় বড় জাহাজ বা তরণী বানচাল হইয়া অকালে ডুবিয়া গিয়াছে —সেখানে সে ক্ষুদ্র ডিঙ্গীর ন্যায় চলিয়া যাইতে পারিবে এরূপ আশাও মনে রাখে।' তথাস্তু। কিন্তু কথা এই, নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিতে যাইয়া 'সোপান' যেন অশ্লীলতার প্রশ্রয় না দেন। 'মাধা কাটারী'র 'মধুর মধুর পিয়া কটি বেআদব, মন মন ঘুঁসাে মারলো' প্রভৃতি বিকৃত-ভাবপূর্ণ পদগুলি আমাদের নিকট বড়ই অশ্লীল বোধ হইল। ব্যঙ্গ কবিতা হিসাবেও এরূপ কবিতা প্রকাশ যোগ্য নহে। Fine Art এর বিকাশ ও উৎকর্ষ সম্পাদনার্থে অনেক সময় চিত্রকর নগ্নমূর্ত্তি রচনা করেন ; কিন্তু সেই নগ্নমূর্ত্তির মধ্যেও তাঁহারা এমন একটু স্বাধীনতা, এমন একটু পবিত্রতার ভাব অঙ্কিত করিয়া দেন যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে কেবলই শুভ্র সৌন্দর্য্যের বিমল প্রভায় হৃদয় আলোকিত হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্রও কামগন্ধ থাকেনা। মৌলবী মোহাম্মদ আজিজ-উল্-হাক্ সাহেবের লিখিবার যথেষ্ট শক্তি আছে, তিনি কেন যে সেই শক্তির শোচনীয় অপচয় করিতেছেন বুঝিতে পারিনা। 'মজিদ' একটী ক্ষুদ্র গল্প ; ইহাকে গল্প না বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'আলিবাবা'র বিজ্ঞাপন বলিলেও চলে। লেখক ইচ্ছা করিলে মজিদকে সৎপথে রাখিয়াও তাহার প্রতিভাপূর্ণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার থিয়েটারের প্রতি একটু বেশী ঝোঁক দেখা যায়, তাই যুবকের মেয়েকে তিনি কুৎসিৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেও দ্বিধা করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবেনা যে ক্ষীরোদ বাবুর নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে যদিও সাধারণ দর্শকের নিকট খুব বাহ্‌বা নিতেছে তথাপি সমজদার লোকের নিকট সে গুলি সাহিত্যের হিসাবে 'রাবিশ' বই আর কিছুই নয়। এই সব নাটক দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছে। 'শিব দরবারে হরিশবাঞ্ছার' প্রবন্ধটিই সোপানের বর্ত্তমান সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। 'প্রকৃতির পুরস্কার' ও 'ভারতবন্ধু কেইন' মন্দ নয়। 'জীবের উৎপত্তি' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কিন্তু বড়ই সংক্ষিপ্ত। বিষয়ের গুরুত্ব

অনুসারে আলোচনা আরও বিশদ হওয়া উচিত ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এত সংক্ষিপ্ত হইলে সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। 'বুড়া বুড়ির প্রেম' পাঠ করিতে করিতে স্বদেশের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই 'বুড়ো-বুড়ি' সম্বন্ধে হাসির গান মনে পড়ে। সেই একই কথা প্রকাশের জন্য এই অক্ষম প্রয়াস কেন? 'কুমার-বাসিনী'—উপন্যাস, মাত্র দুইটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলিকাতা-প্রত্যাগত'—বাখরগঞ্জবাসী মুসলমানের কলিকাতা বর্ণন। সোপান-সম্পাদক কেন যে এইরূপ সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি শ্লেষোক্তিপূর্ণ কবিতা প্রকাশ করিলেন, বুঝিতে পারিনা। আমরা কোন মতেই তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে পারিনা। এমন করিয়াই কি তিনি তাঁহার পত্রিকার বিশেষত্ব বজায় রাখিতে চান? পূর্বে কানু ছাড়া যেমন প্রেমের গান রচিত হইতনা, এখন বুঝি মুসলমানকে নায়ক না করিলে তেমনি ব্যঙ্গ কবিতার রস উদ্দীপিত হয় না। আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন সাধনের জন্য উভয় সম্প্রদায় হইতে চেষ্টা চলিতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে আবার এসব কেন? আমরা স্বীকার করি, বরিশালবাসী মুসলমানদের ভাষায় যথেষ্ট গ্রাম্যতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকায় তাহার ব্যঙ্গ করিতে হইবে? মুসলমানের ব্যয়ে আমোদ উপভোগ করিতে অনেক হিন্দুকেই যত্নশীল দেখা যায়, কিন্তু তাহা দেশের পক্ষে বড়ই মারাত্মক। ইহারই অবশ্য ফলে একদিন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রবল বিদ্বেষের ভাব বিশেষরূপে প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।

আরতি। ফাল্গুন ও চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। এই কয়সংখ্যায় 'মোহাম্মদ' (দঃ) নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত ইহার রচয়িতা। আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে শেষ পর্য্যন্ত উহার অনুসরণ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, 'ক্ষমতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মসুখ মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিলনা। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত আরবসমাজের উদ্ধার এবং বহুধা বিভক্ত আরবজাতির ঐক্যবন্ধন মোহাম্মদের প্রতি কার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার সফল জীবন; তিনি স্বীয় মূলমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরবদেশে সত্যধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সে রশ্মিসম্পাতে আরবদেশের সর্ব্বপ্রকার কুপ্রথা, কদাচার ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং দেশবাসিগণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। আরবগণ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয় এবং ঐক্যবলে অসাধ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে।' "মহেশের জীবন উৎসর্গ" একটী গল্প। ইহা 'নব্য' পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ 'আরতির' অনিয়মিত প্রচারই ইহার কারণ। 'ইতর প্রাণীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি' 'জীবাণুকোষের শোচনীয় ফল ও তৎপ্রতিষেধক উপায়' সাধারণের উপভোগ্য দুইটী ক্ষুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা। 'সাহিত্যে সহায়তা'য় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় বঙ্গভাষায় প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ 'ঐ সকল শব্দ দ্বারা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।'

ভারতী। ভাদ্র। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', উক্ত নামধেয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ। বর্ত্তমান সংখ্যার ভারতীর সর্ব্বাপেক্ষা আলোচ্য প্রবন্ধ, থিওজফিক্যাল সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত শ্রীমতী সরলা দেবী লিখিত 'ভারতের হিন্দু ও মুসলমান'। উদার লেখিকাকে কি বলিয়া যে আমরা আমাদের প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব, ভাবিয়া পাইনা। এই বিরোধ বিবাদের দিনে মহাশয়া লেখিকা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুভ সম্মিলন সাধন প্রয়াসে যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজ এজন্য তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু হায়, তাঁহার আশা কি কখনও সফল হইবে? ভারতের ভাগ্যে কি কখনও এমন দিন আসিবে যেদিন হিন্দু আর মুসলমান উভয়ে উভয়কে একই মায়ের সন্তান বলিয়া বিশ্বাসপূর্ণ ভাবে আলিঙ্গন করিবে? আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা যদি বাস্তব হইত! 'বাঙ্গালার ইতিহাস' পণ্ডিত প্রবর

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গভীর গবেষণার ফল। অল্পসংখ্যক লেখকের এমন বিশুদ্ধ সরল মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিবার শক্তি অসাধারণ। আমরা যত্নের সহিত ইহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। "রমাসুন্দরী", শরৎচন্দ্র বাবুর উপন্যাস। কাহিনীর বর্ণনা বেশ চিত্তাকর্ষক। 'আমাদের শিল্পশিক্ষা' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

বঙ্গীয় মুসলমান। মৌলভী মহম্মদ আলী খাঁ ইউসুফজয়ী প্রণীত। বহুদিন হইল পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন পরেও তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার আবশ্যক পড়ে নাই। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এমন একখানা সদ্‌গ্রন্থের কেন যে আদর হইল না বুঝিতে পারি না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানেরই একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা উচিত। আমরাও লেখকের সহিত একমত হইয়া বলি, "বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটী কোটী প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি মুসলমান নরনারী বাস করিতেছে কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের চেতনা বা অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহের বিষয়।" আমরা যে, সকলের নিকট হেয় হইয়া পড়িয়াছি তাহার কি কোন কারণ নাই? আর সেই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া আমাদের জীবন সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করা কি আমাদের পক্ষে "ফরজ" তুল্য নহে? কোনও এক সংখ্যক Islamic World এ পড়িয়াছিলাম, 'Numerically we are like the sands of a desert, but politically we are none.'' এ কথাগুলির মূলে কি কোনও কঠোর সত্য নিহিত নাই? বিগত সেন্সস রিপোর্টে দেখা গিয়াছে বঙ্গীয় মুসলমান সংখ্যায় প্রায় বঙ্গীয় হিন্দুর কাছাকাছি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কি তাহারা তাহাদের উন্নত প্রতিবাসীর নিকটবর্ত্তী হইবার উপযুক্ত? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বর্ত্তমান সময়ে এসব বিষয়ে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত।

শৈশব-কুসুম। উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "গোলাপ ও গন্ধরাজের নিকট পলাশ ও শিমুলও স্থান পায় তাই বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানে এই শৈশব-কুসুম লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইলাম।" পুস্তকের ছাপা খারাপ, অনেক স্থানে অপাঠ্য। তবুও লেখকের শৈশব-স্মৃতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে আমরা বলিতে বাধ্য, তাঁহার কুসুমে পলাশ ও শিমুলের অন্তর্নিহিত মধুর ন্যায় দু'এক ফোঁটা মধুর স্বাদ পাওয়া যায়।

মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-সোপান। ১ম খণ্ড—কলেমা। বিজ্ঞ প্রচারক মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান সাহেব প্রভৃতির সাহায্যে নজরপুর—বাখরগঞ্জ নিবাসী মুন্সী জমির উদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি এবং পঞ্জিকার ন্যায় ইহা প্রত্যেক মুসলমানের গৃহে ব্যবহৃত হইতে দেখিলে পরম পুলকিত হইব। এই নিকৃষ্ট-স্বার্থের দিনে ধর্ম্ম গ্রন্থ যতই অধিক প্রচার হয় ততই মঙ্গল। ভরসা করি 'মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-সোপান' বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সোপানেরই কাজ করিবে। এই স্থলে পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রকাশককে দু একটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক। শত পৃষ্ঠার একখানা পুস্তকের মূল্য বার আনা না করিয়া আট আনা করিলেই অনেকের পক্ষে ইহা সহজপ্রাপ্য হইত। সদ্‌গ্রন্থের মূল্য সুলভ হইলে তাহার প্রচারও বেশী হয়। দরিদ্র মুসলমান সমাজের উপকারার্থে যাঁহারা কোন গ্রন্থ প্রচার প্রয়াসী, তাঁহারা আমাদের এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন কি?
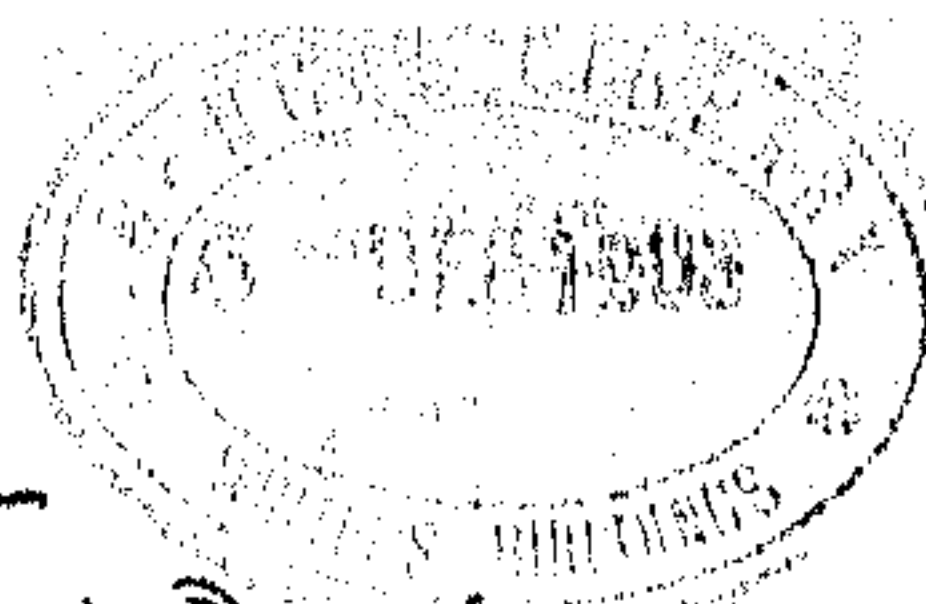
আরবীয় দর্শনালোচনা।

(২)

আমরা আলোচ্য মহাগ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি-সংক্ষেপে কতিপয় মহাত্মার মত উদ্ধার করিয়া যাহা বলিয়াছি, ভরসা করি পাঠকবর্গ তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই মহাগ্রন্থই জগতে বিশ্বকোষ প্রণয়নের আদি চেষ্টার ফল। ইহা নিখিল মুসলমানসমাজের এক মহাপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ। কুতব-মিনার, তাজমহল, জামে মসজিদ, আল্‌হামরার লোহিত-প্রাসাদ প্রভৃতি ইষ্টক-প্রস্তর গঠিত মহাকীর্ত্তি নিচয় হয় ত কালের প্রভাবে একদিন ধরা-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যতদিন জগৎ আছে, মানবজাতি আছে, ততদিন ইহাও থাকিবে। ইহা জ্ঞানরাজ্যের জিনিস, ইহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি, অতএব ইহার বিনাশ নাই।

আমরা নিম্নে 'শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী ও ঈশ্বরভক্ত দলের বিশ্বাস' সম্বন্ধে তৃতীয় রেসালায় (Tract) যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম।

"ঈশ্বরের প্রশংসা গীত হউক, এবং যাঁহারা তাঁহার আর কোনও সঙ্গী নির্দ্দেশ করেন না তাঁহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহারই শক্তিতে শক্তিশালী করুন, যেহেতু আমরা ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ ও ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের বিবরণ এই মাত্র শেষ করিয়াছি। হে ভ্রাতঃ, জ্ঞাত হও, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভই মানব জীবনের চরমোদ্দেশ্য। এখন আমরা শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী ও ঈশ্বরভক্তদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলিব এবং আমরা সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইব যে আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও (স্বাভাবিক মৃত্যুর পরও) বর্ত্তমান থাকে।

"কথিত আছে, পুরাকালে জনৈক চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ ঋষি কোনও নগরে প্রবেশ করিয়া তথাকার অধিবাসিদিগকে একটি অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম গুপ্ত পীড়ায় আক্রান্ত দেখিয়াছিলেন। কিন্তু নগরবাসিগণ তাহাদের দেহে কোনও পীড়ার লক্ষণ অনুভব করিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সাধুপুরুষ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তিনি তাহাদিগকে পীড়ার

বিষয় অবগত করাইবেন এবং তাহাদের দেহাভ্যন্তরে যে ব্যাধি বহুদিন ধরিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, তাহা বিনষ্ট করিবেন। তিনি ইহা জানিতেন যে তাহাদিগকে ইহা বলিলে তাহারা তাঁহার কথা বিন্দুমাত্রও শ্রবণ করিবে না, তাঁহার উপদেশ মোটেই গ্রহণ করিবে না, বরং তাহারা তাঁহার মত অঠিক, তাঁহার প্রণালি দুষ্ট, এবং তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। তাই তিনি অত্যধিক বদান্য ও পরদুঃখকাতর বলিয়া ঈশ্বরপ্রীতিলাভার্থ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি নগরের একজন রোগাক্রান্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কিছু সরবত পান করিতে ও একটা সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ নিতে বাধ্য করিলেন। লোকটী তখনই হাঁচি দিলেন এবং দেহে খুব লঘুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য, শরীরে স্বাস্থ্য ও হৃদয়ে প্রভূত বল অনুভব করিলেন। তিনি সেই ঋষিকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ঈশ্বর যেন তাঁহার এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমি আপনার কোন কাজে আসিতে পারি কি?" ঋষি বলিলেন, "হাঁ, তোমার একটি ভাইকে রোগমুক্ত করিবার পক্ষে সাহায্য করিতে পার।" তিনি উত্তর করিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।" অতএব এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সংস্কারোপযোগী আর একটি লোকের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দ্বারা এই ব্যক্তিকেও রোগমুক্ত করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পীড়া হইতে আরোগ্য হওয়ায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আমি কি আপনাদের কোন কাজে আসিতে পারি?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ, তোমার একটি ভাইকে নীরোগ করিতে সাহায্য করিতে পার।" তৎপর তাঁহারা এতদুপায়ে আরও একটির রোগ আরোগ্য করিয়া দিলেন এবং তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিয়া সেই একই উত্তর পাইলেন। এই রূপে একটির পর একটি করিয়া তাঁহারা নগরের আরও বহুলোককে নীরোগ করিলেন। ইহাতে এই দলের ভ্রাতৃবর্গ, সাহায্য ও সমর্থনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তখন তাঁহারা সর্ব্ব সমক্ষে বাহির হইয়া প্রকাশ্যে বহুলোককে আরোগ্য করিলেন এবং অনেককে তাঁহাদের চিকিৎসাধীন হইতে বাধ্য করিলেন। তাঁহারা লোকদিগকে ধরিয়া ভূপতিত করিতেন এবং যাহাতে রোগিগণ হস্তপদ চালনা না করিতে পারে একদল তদুপায় সাধন করিতেন এবং অপর দল তাহাদিগকে সরবত

পান করাইতেন ও সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লওয়াইতেন। যে পর্য্যন্ত সমস্ত নগর রোগমুক্ত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাঁহারা এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হে পুণ্যশীল দয়ালু ভ্রাতা, অবগত হও, পরমেশ্বর তাঁহার শক্তি দ্বারা তোমাকে এবং আমাদিগকে শক্তিশালী করুন। ইহাই জনসমাজকে পরকাল ও প্রত্যাবর্ত্তনের (Return) বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে, অজ্ঞানতা-সম্ভূত নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে, আত্মবিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করিতে, অর্থাৎ আত্মার সর্ব্ববিধ পীড়া আরোগ্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পয়গম্বর-গণের আহ্বানের সাদৃশ্য।

আমাদের পুণ্যশ্লোক পয়গম্বর সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার সহধর্ম্মিনী বিবী খদিজাকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপর তাঁহার পিতৃব্যতনয় আলী, বন্ধু আবুবকর, মালেক, আবু জায়ার, সোহায়েব, বিলাল, সাল্মান, জাবের, বিশার প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই রূপে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া বিশ্বাসীদলের সংখ্যা ৩৯ হইল। তৎপর ধর্ম্মপ্রচারক প্রার্থনা করিলেন যেন খোদাতালা আবু জহল কি ওমর বিন্ খাত্তাব এতদুভয়ের যে কোনও একজনকে তাঁহার দলভুক্ত করিয়া ইস্লামকে গৌরবান্বিত করেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ওমর ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বিশ্বাসীদল এখন সংখ্যায় ৪০ জন হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কি রূপে তাঁহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজন বিদিত দীর্ঘকাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রচারকার্য্যের প্রারম্ভে মিসরে প্রবেশকালে পুণ্যাত্মা মুসা (আঃ) ও সেইরূপ করিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত না সংখ্যায় দশজন হইয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত তিনিও তাঁহার ভ্রাতা (Aaron) ও অন্যান্য শিক্ষিত বনি ইস্রায়িলগণের সহিত এইরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া "ফেরাও"কে ধর্ম্মসংযোগে আহ্বান করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন।

জেরুসালেমে যিশুখ্রীষ্টও তাঁহার প্রচার কার্য্যের প্রারম্ভে সেইরূপ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃগণ, অবগত হও, বিজ্ঞানের দুইটি শাখা আছে,—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান। পয়গম্বরগণ, তাঁহাদের শিষ্যবর্গ (apostles) এবং প্রতিনিধিগণ আত্মার চিকিৎসক। ইহাই আমাদের সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলীর মত, এবং এই মতানুসরণের জন্যই আমরা আমাদের অপরাপর ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিতেছি। অতএব হে ধর্ম্মাত্মা, সহৃদয় ভ্রাতা, তোমার ভ্রাতৃবর্গের আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হও।

অবগত হও যে, বহুলোক পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাসবান হইয়াও এক বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছে। তাহারা না ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, না ঠিক পথলাভে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু পুরুষানুক্রমে নির্ব্বোধের মত তাহারা সেই এক কথাই আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে তাহারা একদল ভ্রমণশীল অন্ধের মত, যাহারা একের হস্ত অপরের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া উষ্ট্রদলের মত চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যদি কোন চক্ষুষ্মান দলপতি না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইত। হে ভ্রাতঃ, আমি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিতেছি, তুমি অন্ধদের একজন হইও না, কিন্তু মুক্তদৃষ্টি দলপতি হও, অন্ধ ও কুষ্ঠাক্রান্তদিগকে আরোগ্যকারী দয়ালু চিকিৎসক হও; কিন্তু চিকিৎসকের সাহায্য যাহার দরকার এমন রোগী হইও না। জ্ঞাত হও, যখন চিকিৎসকগণ কোনও রোগীর রোগের সন্ধান পাইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে একমত হন এবং একই ঔষধ প্রদান করিতে সম্মত করেন, তাঁহারা বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া একে অন্যের উপদেশ শুনিয়া, একে অন্যকে ভালবাসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরমেশ্বর তখনই কেবল অল্প চেষ্টায় তাঁহাদের দ্বারা রোগীকে নীরোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যদি ঝগড়াঝাটি হয় এবং একে অন্যের প্রতিকূলাচরণ করেন, রোগী শুশ্রূষার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহাদের জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে রোগমুক্ত করেন না; তাঁহারাও তাঁহাদের জ্ঞান দ্বারা লাভবান হইতে পারেন না।

অতএব, ভ্রাতঃ, অপরের সঙ্গে একমত হইয়া, অপরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল ভাইয়ের সাহায্যকারী হও। তোমাদ্বারা ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যবর্গের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাঁহাদের অবস্থা উন্নত করিবেন। কারণ পরমেশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, "পুরুষসমাজ হইতে একজন আর একজন স্ত্রীসমাজ

হইতে একজন মধ্যস্থ প্রেরণ কর। যদি তাহারা ভাল চায় এবং সামঞ্জস্য বিধান আশা করে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে একমত করিবেন।"* কিংবদন্তি আছে মধ্যস্থ দুইজন ভাল চাহেন নাই, সামঞ্জস্য বিধানে আশাও করেন নাই, বরং একে অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ, পবিত্র উপায়ে শান্তি সংস্থাপনে একমত হইতে পারে নাই ; বিশ্বাসীদলের নেতা † মধ্যস্থগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে পর্য্যন্ত মহামহিমান্বিত প্রভুর রাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে নির্দ্দিষ্ট সময় না আসিয়াছিল এবং আমরা ঊর্দ্ধে আধ্যাত্মিক নগরী (Spritual city) দর্শন না করিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত কালের মহা আবর্ত্তনে ঘূর্ণিত হইয়া এবং অবস্থার ফেরে পড়িয়া আমরা শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃমণ্ডলী আদিপিতা আদমের গুহাতে ‡ বহুদিন পর্য্যন্ত নিদ্রাগত ছিলাম। উল্লিখিত আধ্যাত্মিক নগরী হইতেই প্রধান শত্রু শয়তান দ্বারা প্রতারিত হইয়া আমাদের পিতা আদম, স্ত্রী কলত্র ও সন্তান সন্ততিসহ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সয়তান বলিয়াছিল, "আমি কি তোমাদিগকে নিত্যবৃক্ষ ও চিরস্থায়ী রাজ্যে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব ?" তাঁহারা তাহার কথায় প্রতারিত হইয়া প্রবল ইচ্ছার বশে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাদের পক্ষে যাহা গ্রহণ করিবার প্রকৃত সময় আসিয়াছিল না তাহাই চাহিলেন। এই কারণেই তাঁহারা তাঁহাদের উন্নত অবস্থা হইতে পতিত হইলেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা ক্ষীণ হইয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহাদিগকে বলা হইল, "নীচে নামিয়া যাও এবং তথায় পৃথিবীতে তোমাদের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং এক নির্দ্দিষ্ট

---

* কোরাণ, চতুর্থ অধ্যায়।

† চতুর্থ খলিফা হজরত আলী।

‡ 'সপ্ত নিদ্রাতুরের' নিবাস। ইফিসাসের সাতজন ভদ্র যুবা সম্রাট ডিসিয়াসের (আরবগণ যাঁহাকে দাকিয়ানুস বলিয়া থাকেন) অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একটি গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা নিদ্রিত হইয়া পড়েন এবং তদবস্থাতেই আশ্চর্য্যরূপে বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। কোরাণ, অষ্টাদশ অধ্যায়।

সময়ের জন্য সব বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।"* ইহাতেই তোমরা জীবিত থাকিবে, এইখানেই মরিবে এবং এখান হইতেই তোমাদিগকে শেষ বিচারের দিন—যে দিন তোমরা অজ্ঞানতা সম্ভূত নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, আত্মবিস্মৃতির সুষুপ্তি হইতে যেদিন তোমাদিগকে জাগরিত করা যাইবে, আর যেদিন প্রলয়শিঙ্গার নিনাদে সমাধিগৃহ বিদীর্ণ হইয়া তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ বিনির্গত করিয়া দিবে এবং যখন তোমরা দ্রুতপদে সমাধি হইতে বাহির হইয়া আসিবে—মহাদরবারে উপস্থিত করা যাইবে। (ক্রমশঃ)।

আবদুল্লা আল্‌মামুন সোহরাওয়ার্দী।

মোগলশাসনের দুটী কথা।

বিগত বৈশাখ মাসের "উৎসাহ" পত্রিকায় এতদসম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে দেখাইয়াছিলাম যে সভ্যতার উচ্চ-শিখরাসীন পাশ্চাত্যজাতিদিগের কৃপায় আমরা প্রথম সভ্যতা শিক্ষা করি নাই—সভ্যতার অঙ্গীভূত সংবাদপত্র প্রচার ও টেলিগ্রাফ (হিলিওগ্রাফ) প্রভৃতি ভারতবর্ষে এই নূতন নহে। ইতিহাসের পত্রপৃষ্ঠায় কি আছে তাহা দেখিবার আমাদিগের সামর্থ নাই তাই আমরা ইংলণ্ডীয় সভ্যতার বিশেষত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হই। আমাদিগের ঘরের সম্পত্তি এখনও চিনিতে পারি নাই, তাই আমরা পরের জিনিস দেখিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে তাহা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করি। কিন্তু অতীতের প্রতি আজকাল আমাদের যে একটা প্রাণের টান পরিলক্ষিত হয়, তাহা ইংরাজী শিক্ষার ফল। আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষ ভাবে ইংরাজের নিকট ইহার জন্য ঋণী।

যে সংবাদপত্রের কল্যাণে আজকাল দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতেছে—দুইটী বিরুদ্ধধর্মীয় জাতির মধ্যে অলক্ষিতে স্বর্গীয় সৌভ্রাতৃত্ব সংস্থাপিত হইতেছে; পাশ্চাত্য সভ্যতাগর্বির শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মুখরোচক যে সংবাদপত্র, আজকাল আমরা যাহা ইংরাজের নিকট হইতে প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া কৃতার্থ হই সেই সংবাদপত্র মোগলশাসনে নিয়মিত রূপে

* কোরাণ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সঙ্গে লইয়া এই ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইত। এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিলেও এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি না।

পারস্য ভাষায় সংবাদপত্রের নাম "আখ্‌বার" * ইহার অর্থ খবরের কাগজ, ইহা অতি পুরাতন শব্দ। সংবাদপত্রের প্রচলন না থাকিলে প্রাচীনকাল হইতে এই শব্দের প্রচলন থাকিত না। সম্রাট আকবরের সময় সরকারী গেজেটের ন্যায় রাজকীয় সংবাদপত্র প্রচারিত হইত। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে :—"পানিপত যুদ্ধে বাবর শাহ্‌ নিজ শিবিকায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন এমত সময় হিন্দুরাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।" †

সম্রাট শাহ্‌জাহান মহরম দরবারে বসিয়া বলিয়াছিলেন, "এলাহাবাদে হিন্দু-প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিষাদিত হইলাম।"

ইহার পর সম্রাট আওরঙ্গজেব আওরঙ্গাবাদ নামক স্থানে ইহলোক সংবরণ করেন। তাঁহার পীড়ার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক মুশোমন জোঁর গ্রন্থে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার অনুবাদ এইরূপ :—"ধর্ম্মের রক্ষক, কোরাণের ভক্ত, মুসলমানের পালক, বীরের শ্রেষ্ঠ, জগতের অধিপতি এবং যুদ্ধে অমিত বীর্য্যশালী নেতা মহাসাধু সম্রাট প্রবর মহামহিম শাহান শাহ্‌ আওরঙ্গজেব বাহাদুর উদরের এক পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন ; সময়ে সময়ে জ্বর দেখা দেয় এবং পৃষ্ঠদেশে দারুণ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। সকল প্রজার এজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত, কারণ এই প্রার্থনায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। গত সপ্তাহে বড় মসজিদে বহুশত ভক্ত মুসলমানের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহারা সম্রাটের শারীরিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" ‡

অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নাই ; ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সেকালে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

---

* "আখ্‌বার", "খবর" শব্দের বহুবচন। নঃ সঃ।

† বাবরের সমসাময়িক "কানুনে-জং" প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ পাঠ করা যায়।

‡ দিল্লীর "পয়গাম-এ হিন্দ" পারস্য সংবাদপত্রে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের সময়ে টেলিগ্রাফও ছিল সে সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় এক বার আলোচনা করিয়াছি। দর্পণ সঙ্কেতে টেলিগ্রাফ চলিত। বর্ত্তমান সময়ে তাহা হিলিওগ্রাফ নামে পরিচিত। বিগত ট্রান্সভাল সমরেও ইংরাজ সেনানী-বর্গ দূরতর স্থানে তদ্দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজের Public works department (পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট) এর সহিত মোগলশাসনের "মহরৎ-এ-আম" এর সৌসাদৃশ্য বিলক্ষণ রহিয়াছে। "তোয়ারিখ" নামক পারস্য গ্রন্থ প্রণেতা সৈয়দ মকবর আলী এই বিভাগীয় কার্য্যাবলীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ—

১। ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনের সাহায্য।

২। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবারণ।

৩। পানীয় জলের সুবিধা।

৪। ডাকখানার বন্দোবস্ত।

৫। সমাচার পত্রের যথারীতি প্রচার।

৬। কোন প্রয়োজনীয় শুভাশুভ সম্বাদ অতি অল্পকালে প্রেরণের উপায়।

৭। খাল, ইমারৎ প্রভৃতি প্রস্তুত হইবার উপায়।

৮। গুরুতর প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংবাদ প্রজা সাধারণের মধ্যে সত্বরে প্রকাশ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ।

৯। বিদ্যালয়, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদির স্থাপন অথবা নির্ম্মাণ।

১০। অনাথাশ্রম বা পথিকাশ্রম নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

পাঠক! উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, মহামহিম বৃটিশরাজ প্রজা সাধারণের সুবিধার্থ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বহুবর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান সম্রাটগণও তদপেক্ষা কোন কোন অংশে উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বনে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রজা সাধারণের সুবিধার দিকে যেমন সম্রাটগণের দৃষ্টি ছিল তাহাদিগের রক্ষণ ও শাসন বিষয়েও তাঁহাদিগের উন্নতদৃষ্টি কখনও প্রতিহত ছিল না। পুলিস বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং গুরুতর রাজনৈতিক বিষয় সকলে সমস্ত রাজকর্ম্মচারীগণের স্বার্থ সমান ভাবে রাজ্য ও দেশের মঙ্গলার্থ কার্য্য করিত। তথাপি দেশে বিদ্রোহ হইত, রাজ পরিবর্ত্তনের সময় অরাজ-কতাও হইত। কেন হইত তাহারও কারণ আছে; সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্ট,

তৎকালে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত দেশের উপর শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। এই গবর্ণমেণ্টের আকর্ষণী শক্তিতে শৈথিল্য উপস্থিত হইলেই বিপ্লব-বাত্যায় দেশ উজাড় হইত। আবার যখন সেই শৈথিল্য তিরোহিত হইত—দেশে তখনই সুবাতাস বহিত। এরূপ সহস্র সহস্র বিপ্লবে প্রজা সাধারণ উপদ্রুত হইলেও প্রজাদিগের সুখশান্তির অভাব ছিলনা; কারণ তখন ভারতে অন্ন ছিল; মুসলমান সম্রাট হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুস্থানকে মুসলমানীয় ভাবে আপনার কোলের দিকে টানিয়া লইতেন—ভারতের ধন ভারতে থাকিত। দুর্ভিক্ষে প্রজা মরিতেছে ধনকোষ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অজস্র অর্থধারা বর্ষিত হইয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করিতেছে, এরূপ শাসন ও পালনের আদর্শ দৃষ্টান্ত কেমন ধীরে ধীরে জগতের চক্ষে আপনি ফুটিয়া উঠিত; তাই মোগলসম্রাট কীর্ত্তিমান, তাই মুসলমানশাসনে ভারতে সুখ ও সৌভাগ্য, সেই জন্যই অতীতকে এত প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

দেশ শস্যশালিনী—উর্ব্বরা—সুশ্যাম তৃণমণ্ডিতা, মানব পশ্বাদির প্রতিপালনোপযোগী খাদ্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণা ছিল। মস্তকের উপর সহস্র সহস্র বিপ্লবের বজ্রহুঙ্কার চলিয়া গেলেও নীরোগ, উৎফুল্ল প্রজাগণ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য হাহাকার করিত না—তাই বিপদের বজ্রপাত ধড় গ্রাহ্য হইত না। শুধু কি তাই? প্রজার স্বার্থ ও তাহার উন্নতিপক্ষে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। দেশে জলের বন্দোবস্ত অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত। আজ কাল যেমন কলের জলের দ্বারা বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ হয় তৎকালে তেমনি বিশুদ্ধ পানীয় সংগ্রহার্থ অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বিত হইত। যাঁহারা গ্রেট ইণ্ডিয়ান-পেনিনসুলার রেলওয়ে দিয়া মধ্যপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা 'বোরহানপুর' নগরী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর মোগলসম্রাটদিগের দ্বারা অধিকাংশ সময় সরগরম থাকিত। বৃটিশদূত স্যার টমাস রো এইখানে শাহান্‌শাহ্‌ জাঁহাগীর বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হন—এইখানে সম্রাট সমীপে তিনি সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। তাপ্তী নদীতটে এই বৃহৎ নগরীতে মোগলসম্রাটদিগের বাসভবনের ধ্বংসস্তূপ সময়ের অনন্ত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া সাক্ষী স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই নগরীতে সুবৃহৎ জলের কলের কারখানা অদ্যাপি ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কারখানা দেখিলে

অবাক হইয়া যাইতে হয়। প্রায় ২।৩ মাইল হইতে সুবৃহৎ নল দ্বারা নির্ম্মল পার্ব্বতীয় ঝরণার জল আনাইয়া সহরবাসিদিগকে দিবারাত্রি যোগান হইত। রোহিলাগণ এই স্থান আক্রমণ করিলে চল্লিশ সহস্র মুসলমান সেনা যুদ্ধক্ষেত্র পার্শ্বে তিনমাস কাল এই জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। এখনকার কালে যেমন "ওয়াটার ওয়ার্কস্" (Water works) আছে মুসলমানদিগের সময়েও তাহাই ছিল। তবে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রভাবে এঞ্জিন সাহায্যে দূর হইতে জল আমদানী হয় তৎকালে এঞ্জিন ব্যতীত অতি স্বল্পায়াসে কেমন সুন্দরভাবে জল যোগান হইত। আরো পার্থক্য এই যে, এখন যেমন লোককে পয়সা দিয়া জল কিনিতে হয় তৎকালে সেরূপ ছিল না। পয়সা লইয়া জল বিক্রয় "ওরিয়েণ্টাল" (এসিয়াটিক) রাজাদিগের ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ ছিল। আজকালও রাজপুতানায় সেই প্রাচীন জলসংগ্রহ প্রথা দৃষ্ট হয়। বহুদূর হইতে জল আনা হইত—অপরিষ্কার জল, হইলে বালুকা ও কয়লা প্রভৃতি সাহায্যে পরিষ্কার করা হইত। সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজল লিখিয়াছেন "যতদূর জানি তাহাতে গত বৎসরে (আকবরের চতুর্দ্দশবার্ষিকী শাসনের বৎসর) আমাদের রাজ্যে ১৫ শতের অধিক নির্ম্মল জলের কারখানা ছিল।" মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "পাঠান কুলতিলক শের শাহ্ বাঙ্গলা ও বিহারের নানাস্থানে বড় বড় পুষ্করিণী ও খাল কাটাইয়া প্রজাসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা অনেক স্থানে পানীয় জল আনাইবার জন্য বড় বড় নল স্থাপন করা হইয়াছিল।" স্যার টমাস রো লিখিত বিবরণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়:—"মুসলমানেরা প্রজাসাধারণের নির্ম্মল জল পানের বিশেষ সুবিধা ও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক-একটা কারখানা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগিয়াছি।"

মুসলমানশাসনে যে প্রজাসাধারণের জন্য সুপেয় পানীয় যোগান হইত তাহার অনেক প্রাচীন কারখানার নিদর্শন এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তৎপর পোষ্টাফিসের কথা,—মাত্যবর মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "শের শাহের সময়ে প্রজাসাধারণের পত্রাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্য ডাকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ডাক হরকরাগণ ঘোড়ার পিঠে ডাক লইয়া যাইত।" ফলতঃ মুসলমানের ডাকঘরের অনুকরণে এতদ্দেশে ইংরাজেরা প্রথম ডাকঘর স্থাপন করেন। তৎকালে চিঠীর নির্দ্দিষ্ট কোনরূপ

মাশুল ছিলনা মাইল বা ক্রোশ হিসাবে চিঠীর মাশুল নির্দ্দিষ্ট হইত। ইংরাজের প্রথম ডাকখানায় এইরূপ আদবকায়দা প্রচলিত ছিল তৎপর ক্রমে ক্রমে টিকিট প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। তখন দিল্লী অথবা আগ্রা হইতে ৪দিনে জয়পুরে ডাক পঁহুছিত, আজমীর হইতে এক সপ্তাহে চিঠি আগ্রায় পঁহুছিত। ডাক বিভাগীয় কোতোয়ালের তত্ত্বাবধানে ডাক গমনাগমন করিত; নিরাপদ করনার্থ স্থানে স্থানে ঘাঁটি এবং প্রহরীও ছিল। কোন স্থানে ডাক লুণ্ঠিত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে জরিমানাস্বরূপ ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া হইত। পত্রে পিত্তলের মোহর থাকিত—কোতোয়ালের দস্তখত থাকিলে সে পত্র অত্যন্ত জরুরী বলিয়া বিবেচিত হইত।

যদিও মুসলমানকাল ভারতে বর্ত্তমান সভ্যতার বীজবপন করে নাই—চশমাধারী উন্নতনাসিকা বিলাতী পরিচ্ছদ পরিহিত প্রচণ্ড গম্ভীর বক্তৃতা উদ্গারী অপূর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করে নাই তথাপি সভ্যতার অনেকগুলি উপাদান কেমন নিরবে ও শান্তভাবে অস্মদ্দেশে কার্য্যকারী হইয়াছিল।

তৎপর আমরা পুলিশ বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অদ্যকার মত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একজন প্রসিদ্ধ লেখকের মতে "মোগল রাজত্বে বিশেষতঃ আকবরের সময়ে ভারতবর্ষে 'সিবিল গবর্ণমেণ্ট' বলিয়া একটা পরিচ্ছন্ন সজীব শাসন প্রণালী ছিলনা।" বাদশাহেরা রাজ্যবিস্তারে ও বিজিত সাম্রাজ্যরক্ষার্থে যুদ্ধাদিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন তাহাতেই বোধ হয় দেশটা আগাগোড়া সৈনিকনিয়মে শাসিত হইত। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া সুবাদার থাকিতেন। কোতোয়াল মহাশয় পুলিশ বিভাগে ও কাজি সাহেব দেওয়ানী বিভাগে কার্য্য করিতেন।

তখন দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির অমানুষিক উপকরণ স্বরূপ বিষয় ঘটিত এত মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইত না। যাহা কিছু ঘটিত তাহা সংখ্যায় অতি অল্প। উহা কখনও বা কাজির আদালতে এবং অধিকাংশস্থলে বাদশাহের দরবারে নিষ্পত্তি হইত। কাজি সাহেবের কাজ সুতরাং কম পড়িয়া যাইত। আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁহার আমলে কাজি সাহেবদের অনেক কাজ বাড়িয়াছিল। আল্‌কোরাণের বিধান অনুসারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মামলা মোকদ্দমায়, স্বামী ও স্ত্রীত্যাগ ঘটনায় কাজি সাহেবেরাই বিচার করিতেন। আকবরের সময়ে যদিও মদ্য বিক্রয় প্রথা রাজ্য মধ্য হইতে একবারে উঠিয়া গিয়াছিল তথাপি নিয়ম মদ্যপায়ী তাঁহা-

গীরের আমলে ও শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে উহা বাড়িয়া উঠে। তখন বিলাতী মদের আমদানী ছিলনা। ইক্ষুরস ও চিনি হইতে এক প্রকার মদ্য চোয়ান হইত, তাহা "আরক" বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব এই "আরক" বিক্রয় প্রথা একবারে রাজ্য মধ্য হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য কাজিদিগের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করেন। মদের দোকান উঠাইয়া দেওয়া, মদ্যপদিগের আড্ডাধ্বংস করা, খুচরা মদ্য বিক্রেতাদের দণ্ড-বিধান করা এই সমস্ত কার্য্য লইয়া কাজি সাহেবদের অনেক সময় অতিবাহিত হইত। "সহর কোতোয়ালই" পুলিস বিভাগের প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। কাজি সাহেব কেবল কাজ বাড়িয়া পড়ার জন্য তাহার সহায়তা করিতেন। কোতোয়াল সহরের, নগরের, গ্রামের সর্ব্বত্রই গুপ্ত ও প্রকাশ্য পুলিস পাহারা দ্বারা শান্তিরক্ষা করিতেন। প্রতি রজনীতে যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম হইত বা চুরি ডাকাতি ঘটিত তাহার এত্তেলা তৎপর দিনই বাদশাহের সন্নিধানে পাঠাইয়া দিতেন।

কোতোয়ালের আর একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি কেবল ফৌজদারী বিভাগের ও পুলিস বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন এমন নহে; সাংসারিক ঘটনা-বলির উপরও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। কে কোথায় নিজ সংসারে মার-পিট করিল, কে কোথায় জাল ফেরেব করিল, কে কোথায় ভ্রূণহত্যা করিল, কে কোথায় কাহাকে বিষ খাওয়াইল, কে কোথায় কাহার সহিত বিবাদ করিল এ সমস্তও পুলিসের তদারকের সীমার মধ্যে ছিল; বাদশাহের দৃঢ় আদেশ নিশা দ্বিপ্রহরের পর কেহ কোন স্থানে জনতা করিলে অপরাধী বলিয়া ধৃত হইবে। এরূপ আদেশ প্রচার অবশ্য কঠোর নীতির অনুযায়ী; কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি সে সময়ে আইনের এত দৃঢ়তা সত্ত্বেও গৃহে গৃহে বিদ্রোহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত।

মোগলরাজত্বের আর একটি সুনিয়ম এই, যাহা আমরা আজি কাল এই উদার হৃদয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেও দেখিতে পাই না। সকল শ্রেণীর প্রজাই ইচ্ছা হইলে কাজি বা কোতোয়ালের নিকট অভিযোগ না করিয়া খাস দরবারে অভিযোগ করিতে পারিত। বাদশাহ্‌ শিবিরেই থাকুন, সহরেই থাকুন বা রাজধানীতেই থাকুন সকল স্থলেই দরবার ক্ষেত্রে প্রজাগণ দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মনিবেদন করিতে পারিত। পূর্ব্বে কোতোয়াল সাহেবের যে গোয়েন্দা বিভাগের কথা বলিয়াছি তাহার

কার্য্যপ্রণালী বড় অদ্ভুত রকমের ছিল। কোতোয়াল সামান্য শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া কতকগুলি ভৃত্য রাখিতেন। তখন মজুর ও চাকর প্রতিদিন প্রাতে প্রকাশ্য রাজপথে ফিরি করিয়া কাজে লাগিত। অন্যান্য মজুরের সহিত মিশিয়া কোতোয়ালের নিযুক্ত গুপ্ত প্রতিনিধিরা চাকরের বেশে লোকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া কখন বা মিষ্টান্ন বিক্রেতা ফল বিক্রেতা অথবা চিকিৎসক রূপে লোকের সদরে অন্দরে ঢুকিয়া ঘরের কথা বাহির করিয়া লইয়া যাইত।

এই রূপে আমরা দেখিতে পাই মোগলশাসনের সবই দোষপূর্ণ ছিল না, তাহাতে গুণের ভাগও অনেক বেশী ছিল। আমরা আজকাল শিক্ষিত হইয়াছি, তাই আমরা সময়ে অসময়ে মুসলমানজাতির প্রতি সর্ব্ববিধ অপকার্য্যের বোঝা চাপাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু ইহাতে জন্মভূমির বড়ই অপকার সাধিত হইতেছে। আমরা জননী জন্মভূমিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে, প্রাণের সহিত সেবা করিতে চাহিলে, কখনই মায়ের কোলের আর একটি ছেলেকে, আমাদের আর একটি ভাইকে, বিদ্রোহী করিতে চেষ্টিত হইতাম না।

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

দৌলত উজীর ও লয়লা মজনু।

স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে, প্রাচীনকালে হিন্দু-সাহিত্যের মত মুসলমানগণেরও একটা স্বকীয় সাহিত্যের গঠন হইতেছিল। সে ক্রম অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত হইয়া আসিলে, আমাদের মুসলমানী সাহিত্যও আজ বিরাটাকার ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে আমাদের সেই আশাতরু শৈশবেই—পরিপোষিকা-শক্তি-বিরহিত হইয়া গিয়াছিল। সে সাধের তরু আমাদের, প্রবল বাত্যাহত শাখাপত্র-বিহীন নগ্ন মহীরুহের ন্যায় অদ্যাপি ম্রিয়মান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। যত্ন করিলে এখনো তাহার পুনরুজ্জীবনের আশা করা যাইতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু-ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে ও নব্য সাহিত্যের

শ্রীবৃদ্ধি কামনায় নানা সভা সমিতি সংস্থাপিত করিয়া কত চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মুসলমানী সাহিত্যের হিতকল্পে আমাদের কোন রূপ যত্ন ও চেষ্টা মাত্রই নাই। আমরা যেমন কীর্ত্তি-বহুল জাতি, ইতিহাসের খাতিরে আমাদের সে পুরাকীর্ত্তি সমূহের উদ্ধার যে অতীব আবশ্যক, তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে? সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে হিন্দুগণের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কি আমাদের উচিত নহে? 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষার অনুশীলন করণার্থে আমাদের মধ্যেও কোন সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত; এবং তাহা হইলে আমাদের সমূহ উপকারও হইতে পারে। জগতে আমরা যে এখন পদে পদে ও যথা তথা নানারূপে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে হয়তঃ সে সমস্তেরও একটা উপায় আমরা করিয়া লইতে পারিব। আমাদের স্বজাতি-হিতৈষী মহাশয়গণকে এই বিষয়টি সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করিয়া আমরা উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' পক্ষ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির সংগ্রহ ও উদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবধি আমি এ পর্য্যন্ত বহুতর মুসলমানী কাব্য গ্রন্থের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইয়াছি। সে সমস্ত গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশ করা যাইতেছে। অদ্য তন্মধ্য হইতেই প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত এক অপরিজ্ঞাত কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা "নবনূরের" পাঠকবৃন্দকে শুনাইব, বাসনা করিয়াছি।

এই 'লয়লা মজনুর' দুইখানি প্রাচীন প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। একখানি ১১৯১ মঘী সনে লিখিত, অপর খানিতে লিপিকালটি ছিন্ন। অবস্থা দৃষ্টে ২য় পুঁথি খানিকে ১ম পুঁথি অপেক্ষা কিছু আধুনিক বোধ হয়। প্রথম ও ২য় পুঁথিতে পত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৮৬ ও ১২৫; পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। দুই প্রতিলিপিই জীর্ণাবস্থ। ১ম প্রতিলিপিটি বড়ই ভ্রান্তিসঙ্কুল। ২য় খানি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। এই উভয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালা পুঁথি মাত্রেরই ইহা স্বভাব-ধর্ম্ম। গ্রন্থের আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে।

এই কাব্যের রচয়িতা দৌলত উজীর অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। তাঁহার প্রকৃত নাম বাহ্‌রাম খাঁ। চট্টগ্রামের নবাব জাফর মোহাম্মদ নেজাম বাহাদুর তাঁহাকে ও তৎপিতা মোবারক খাঁকে 'দৌলত উজীর' উপাধিতে অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি সম্রাটশিরোমণি আওরঙ্গজেব বাহাদুর, গৌড়ের সম্রাটকুলভূষণ সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রধান উজীর হামিদ খাঁ ও প্রাগুক্ত নেজাম শাহের গুণানুবাদ করিয়াছেন। সে অংশটি কিছু বিস্তৃত হইলেও এখানে আগে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; পশ্চাৎ আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।:—

আওরঙ্গ সাহা দিল্লীশ্বর মহামতি।
অশ্বপতি গজপতি নরলোক-পতি ॥
সহস্রেক ছত্রধারী অধিক তাহান। (?) *
পৃথিবী-পূজিত সাহা মহা বলবান ॥
মহারোল অবিরল চতুরঙ্গ দল।
সৈন্যের নাহিক অন্ত যোদ্ধাহ সকল ॥
এক বৎসরের পন্থ পাষাণ-আসন।
ত্রিভুবন ভরি তান কীর্ত্তির বাখান ॥
দক্ষিণে সাগর কুল উত্তরে হিমাল।
এ সকল অধিকারী নৃপ মহাবল ॥
* * * *
মনোহর মনোরম কনক প্রাচীর।
তার মধ্যে শোভা করে স্বর্ণ মন্দির ॥
শিরেত স্বর্ণ তাজ শোভিত প্রধান।
কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা পঞ্চবাণ ॥
হীরা-মণি-শোভিত জড়িত সিংহাসন।
পণ্ডিত-মণ্ডিত সভা অতি বিলক্ষণ ॥
সপ্ত দ্বীপ নবখণ্ড মহিমা প্রকাশ।
বাহুদর্পে রিপুদল করিলা বিনাশ ॥
কথেক কহিতে পারি তাহান মহিমা।
দয়াল ধার্ম্মিক সাহা দিতে নাহি সীমা ॥

দীর্ঘ ছন্দ।

ছদর আহান পীর, মহিমা-সাগর বীর,
গৌরবে স্থজিলা তানে বিধি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, রূপে গুণে বিদগধ,
ভুবন বিখ্যাত সাহা সিধি ॥

---

* 'তাহান,' "তাঁহার" শব্দের অপপ্রয়োগ। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে অশিক্ষিত সমাজে এখন ও ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

তাহান নন্দন নাম, সর্ব্ব গুণে অনুপাম,
পীর সাহা জমুদ সুমতি।
ধর্ম্মবন্ত কলেবর, পাপ-তাপ-দুঃখ হর,
দয়াশীল অনাথের গতি ॥
তান সুত গুণসিন্ধু, দরিদ্র-দুঃখিত-বন্ধু,
মোহাম্মদ ছৈয়দ সুজান।
অবিরত জপ শক্ত, ধর্ম্মবন্ত সদারত,
প্রভু বিনে আন নাহি মন ॥
পীর স্থির ধীরমতি, বীর বলবন্ত অতি,
মোহাম্মদ ছৈয়দ-তনয়।
ছিদ্দিক সমান জ্ঞান, হাতিম সমান দান,
আছাওদ্দিন দয়াময় ॥
বঙ্গদেশে মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর,
নগর ফতেআবাদ নাম।
আছাওদ্দিন পীর, নির্ম্মল শরীর ধীর,
তথাতে বসতি অনুপাম ॥
তাহান চরণ ধরি, সহস্র প্রণাম করি,
অনুদিন মাগে পরিহার।
মুক্রি পাপী হীনমতি, তুমি বিনে নাহি গতি,
এ ভবসাগর কর পার ॥

পূর্ব্বকালে নরপতি, ভুবন বিখ্যাত অতি,
আছিল হোছেন সাহা বর।
তান রত্ন-সিংহাসন, অতি মহা বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর ॥
প্রধান উজীর তান, সুনাম হামিদ খান,
তাহান গুণের অন্ত নাই।
অন্যথানা স্থানে স্থানে, মছজিদ সুনির্ম্মাণে,
পুষ্করণী দিল ঠাঁই ঠাঁই ॥
অনুদিন মহামতি, পিপীলিকা মক্ষিকা প্রতি,
শর্করা দিলেন্ত খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি, শিবা সেজা * চতুষ্পদী,
যোগাইলা সভান আহার ॥
অন্ধল † আতুর জন, পালিলেন্ত অবিরত,
দান ধর্ম্ম করিলা বিশেষ।

* সেজা—সজারু। † অন্ধল—অন্ধ। 'ল' পাদপূরণে ব্যবহৃত, বোধ হয়।

নাটক পাথর কাল, সত্য অথ হাত তাল, (?)
প্রশংসা হইল সর্ব্বদেশ ॥
শুনিয়া মানের ধ্বনি, ক্রোধ হইল নৃপমণি,
অথ ধন লুটিএ সদাএ।
কেমন ধার্ম্মিক সার, একে একে সপ্তবার,
তাহাকে বুঝএ পরীক্ষাএ ॥
প্রথম বাঘের আগে, ফেলিয়া দেখিলা ভাগে,
বাঘ দেখি নামাইল মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়া শিলা, সাগরেত পরীক্ষিলা,
নমাজ পড়িলা সুখে তথা ॥
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে, দিলেন্ত হস্তীর আগে,
গজে দেখি ছালাম করিলা।
চতুর্থে জোক্তের * ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে,
অনলে দহিয়া পরীক্ষিলা ॥
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে, পরীক্ষিলা নরনাথে,
খড়্গ ভাঙ্গি হৈল খান খান।
ষষ্ঠমে হানিয়া শর, পরীক্ষিলা বহুতর,
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ ॥
সপ্তমে গরল দিলা, মহারাজে পরীক্ষিলা,
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া ধর্ম্মের সাধু, ডাইন বাজু বাম বাজু,
প্রসাদ করিলা দুই দিক (?) ॥
নগর ফতেআবাদ, দেখিআ পুরএ সাধ,
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম, অমর নগর সম,
শতে শতে অনেক নিবাস ॥
লবণাম্বু সন্নিকট, কর্ণফুলী নদীতট,
শুভপুরী অতি দিব্যমান।

* জোক্ত—অগ্নি। জোতির অপভ্রংশ।

চৌদিগে পর্ব্বত গড়, অধিক উঝলবর, *
তাত গাহা বদম পয়ান ॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজীর হামিদ খাঁরে,
অধিকারী হৈলা চাটিগ্রাম।
আত্মরূপে দান ধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম,
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম ॥
অনুক্রমে বংশ কথ, গইলেক এইমত,
গৌড়ের অধীন হইল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি, হইলেন্ত মহামতি,
নৃপতি নেজাম সাহাসুর ॥
একশত ছত্রধারী, সন্তানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গজেশ্বর।
রজনী সময় হইলে, মানিক্য প্রদীপ জ্বলে,
অপরূপ পুরীর অন্তর ॥
এই জে হামিদ খান, আদ্যের উজীর তান,
তাহান বংশেত উৎপত্তি।
মোবারক খান নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
সদাএ ধর্ম্মেত তান মতি ॥
তান প্রতি মহীপাল, খিতাপ অধিক ভাল,
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজীর।
সাধু সৎ লোক সঙ্গে, অনম বঞ্চিলা রঙ্গে,
ধর্ম্মরূপে তেজিলা শরীর ॥
তান পুত্র মূঢ় সম, নাম মোর বহরম,
মহারাজা গৌরব অন্তরে।
পিতা হীন শিশু জানি, দয়া ধর্ম্ম মনে মানি,
বাপের খেতাব দিল মোরে ॥
আছাওদ্দিন বন্ধু, গুণনিধি জ্ঞানসিন্ধু,
তান পদ মনে, করি স্থির।

* উঝলবর—উচ্চবর (উচ্চতর)। 'উজল' বা 'উঝল' লৌকিক প্রয়োগ।

পুস্তক পয়ার সার, যেন মুকুতার হার,
রচিলেন্ত দৌলত উজীর ॥

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। সম্রাট হোসেন শাহ্ ১৪৯৪ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। এবং নবাব আকা মোহম্মদ নেজাম শাহ্ ১১২০—১১২১ মঘী সন (১৭৫৮—৫৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের নায়েবীপদে অধিরূঢ় ছিলেন।* হোসেন শাহের উজীর হামিদ খাঁর নাম বা কালনির্দ্দেশ ইতিহাসে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কবি বিভিন্ন দেশের ও কালের এই তিন জন নরপালের নামোল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন্ নরাধিপের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

কবি বলিতেছেন, নবাব নেজাম শাহ্ই তাঁহাকে ও তৎপিতা মোবারক খাঁকে 'দৌলত উজীর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন; সুতরাং কবি যে নেজাম শাহেরই সমসাময়িক তাহা না বলিলেও চলে।

প্রাগুক্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, কবি হোসেন শাহের উজীর হামিদ খাঁর বংশেই উদ্ভূত। কবি স্বকীয় মহদ্বংশের গৌরব ঘোষণা করিতে যাইয়াই হোসেন শাহ্ ও হামিদ খাঁ-ঘটিত ব্যাপারটি, এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং উক্ত ঘটনাটির বর্ণনা বা হোসেন শাহের নামোল্লেখ এখানে অবান্তর ও প্রাসঙ্গিক মাত্র। কবির সময়াদির নির্দ্দেশে তাহার কোনই কার্য্যকারিতা নাই। কথা হইতেছে এখন সম্রাট আওরঙ্গজেবকে লইয়া।

কিন্তু এই কথার মীমাংসার আগে গ্রন্থখানি কখন বিরচিত হইয়াছে, দেখা আবশ্যক। ইহা হয় নেজাম শাহের শাসনকালে বা তাহার কিছু পরেই রচিত হইয়াছিল; কিন্তু এখানেই যে উভয় সঙ্কট! গ্রন্থখানি যে সময়ে রচিত হওয়ার কথা কবি নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন তিনি শিশুমাত্র। কারণ ইতিহাসে দেখা যায়, নেজাম শাহ্ প্রায় দুইবৎসর মাত্র চট্টগ্রাম শাসন্ করেন। কবিকে তাঁহার উপাধিদান ত এই শাসন-সময়েই হইয়াছিল? উপাধি-প্রাপ্তির সময়ে যদি কবির শৈশবকাল হয়, তাহা হইলে নেজামের শাসনকালে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, বলা যায় কিরূপে? আবার নেজামের

---

* 'তওয়ারিখি-হামিদী' দ্রষ্টব্য। নেজাম শাহের এই সময় সম্বন্ধে কোন ভুল নাই ত?

শাসনের পরে রচিত হইয়াছিল বলিলেও 'চাটিগ্রাম অধিপতি' বলিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিবার অর্থ কি ? বিশেষতঃ ১৭৫৮—৫৯ খৃষ্টাব্দে বা তৎপরে রচিত গ্রন্থে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে উপরত ব্যক্তির নামোল্লেখ দৃষ্টে এই সমস্যা আরো জটিলীভূত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকের অবলম্বিত কুটিল পথে চলিলে এই সমস্যার মিমাংসা যে কোন রূপে হয় না, তাহা নহে; কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া পাঠকগণের উপরেই সে ভার ন্যস্ত করিলাম। আমরা কেবল সন্দেহাদির উল্লেখ ও আবশ্যকীয় কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আশা করি, কোন অভিজ্ঞ পাঠক এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মেজার সাহের নিকট কবি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকৃত ও বাধিত ছিলেন; কাজেই তাঁহার নামোল্লেখ না করিলে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্যই হইত। দিল্লীশ্বর দেশের সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। মুসলমানশাস্ত্রে স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় রাজার স্তুতিবাদ অতি পুণ্য কাজ বলিয়া কীর্ত্তিত। আমাদের 'খোত্‌বায়' রাজার গুণানুকীর্ত্তনই ঐ কথার প্রমাণ। এই হেতুতে ধর্ম্মভীরু কবি স্বদেশীয় রাজার গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়াই সম্ভবতঃ আওরঙ্গজেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। * এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোন্ মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, জানি না।

এখন, আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুর বহুদিন পরে গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া কবি তাঁহার গুণানুবাদ করিতে গেলেন কেন, ইহা ত ভাবিবার কথাই বটে। কবি ত তাঁহার সমকালীন কোন সম্রাটের নামোল্লেখ করিতে পারিতেন ? আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কবির জন্ম হইয়াছিল এবং সেই কিয়দ্বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নানা কীর্ত্তি অকীর্ত্তির কথা শুনিতে শুনিতে কবির মনে তাঁহার চিরায়ুষ্মত্তার ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া হয়ত গ্রন্থরচনার সময় পর্য্যন্ত বাদশাহ জীবিত ছিলেন, কবির এইরূপ বিশ্বাস ছিল অনুমান করিলে চলে বটে; † কিন্তু মনে এই কয়েকটি সন্দেহের উদয় হয় :—(১) গ্রন্থরচনার সময়

* আওরঙ্গজেব আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষে যেরূপ তুমুল ঝটিকার সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম ভারতের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। এবং তাঁহার দেহাবসানের পরেও ভারতের আকাশ যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন নীরদমালা-সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল—যেরূপ ঘন ঘন রাজবিপ্লব ও বিবিধ অশান্তিকর ঘটনার সূচনা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকেই লোকের বিশেষ করিয়া চিনিবার কথা বটে। এইরূপ কোন কারণে কবি তাঁহার গুণ গাহিয়া গিয়াছেন কি ?

† বলিয়া রাখা উচিত যে, ইঁহার স্তুতিবাদটি প্রথম প্রতিলিপিতে পাওয়া যায় না।

কবির বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হয়। (২) নেজাম শাহ্ 'পিতাহীন শিশু জানি' কবিকে 'দৌলত উজীর' উপাধি দেন, এই কথা থাকাতে তখন তাঁহার বয়স তত বেশী হইয়াছিল, অনুমান করা চলে কি ? (৩) আবার কবিকে যেরূপ উচ্চবংশজাত ও রাজসংসারসংশ্লিষ্ট লোক দেখিতেছি, তাহাতে তিনি না জানিয়া না শুনিয়া আওরঙ্গজেবের নাম করিয়া গিয়াছেন,—ইহা বলিতেও সাহস হয় না। (৪) আওরঙ্গজেবের পর ক্রমান্বয়ে কয়জন সম্রাট হইয়া গেলেন অথচ তিনি তাহা একেবারেই জানিতে পারিলেন না, ইহাও কি সম্ভব ? (৫) 'আওরঙ্গজেব' না হইয়া 'আলমগীর' (২য়) নাম হওয়াই উচিত ছিল কি ?— তাহা হইলে কিন্তু কোন গোল থাকে না। (৬) গ্রন্থপাঠে ইহাকে পরিণত বয়সের রচনা বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

আমরা যখন ইহার মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছি, তখন এতৎসম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, অপরাপর কথাই এখন বলিব।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ও নবাব নেজাম শাহ্কে কিছু সমসাময়িক মনে করা যাইতে পারে। তবে তাঁহাদের মধ্যে আওরঙ্গজেব বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সন্দেহ নাই।

কবির স্বকীয় বাক্য হইতে জানা যায় যে, হামিদ খাঁ গৌড়াধিপ হোসেন শাহের আদেশে চট্টগ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে আমরা ইহার সমর্থক প্রমাণ পাইতেছি না। হামিদ খাঁ অবশ্যই হোসেন শাহের সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ ১৪৯৪—১৫২৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায়, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দেই নবাব বুজুর্গ উমেদ খাঁ মঘসর্দার মুকুট রায়ের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম প্রথম কাড়িয়া লয়েন। তৎপূর্ব্বে নাকি চট্টগ্রাম আরাকান-পতির করতলগত ছিল। আমাদের কবির উক্তিটি স্বকপোলকল্পিত কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

হোসেন শাহ্ ও হামিদ খাঁর সম্পর্কে যে ঘটনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অধুনা গাঁজাখোরী গল্প বলিয়াই অনুমিত হইবে। তবে সেকালে নাকি সকলই সম্ভব ছিল এবং এতদপেক্ষা আজগুবি গল্পেও লোকে আস্থা স্থাপন করিত। অপরপক্ষে দৌলত উজীরও যে সে লোক নহেন যে তিনি শুধু মিথ্যা কথাই লিখিয়া যাইবেন। যাহা হউক, কথাগুলি পূর্ণ অত্যুক্তি হইলেও, তাহাতে যে কিছু মাত্র ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই, এমন বলা যায় না।

চট্টগ্রাম পূর্ব্বে চাটিগাঁও,রোসাং বা রোথাং, ইস্‌লামাবাদ প্রভৃতি নামে অভি-হিত হইত কিন্তু চট্টগ্রামের 'ফতেআবাদ' নাম আর কথনো শুনা যায় নাই। চট্টগ্রাম সদরের ৮মাইল উত্তরে আধুনিক ফতেয়াবাদ নামক গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। সেই গ্রামকেই কবি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা কি কথনো সহর ছিল ? *

পাঠকগণ দেখিয়াছেন, কবি স্বীয় কাব্য আপনার পীর আছাওদ্দিন নামক মহাত্মার চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার নিবাস ছিল উক্ত ফতেয়াবাদে। কবি স্বীয় পীরের বাসস্থানের নামোল্লেথ করিয়াছেন কিন্তু আপনার বাসস্থানের নাম অপ্রকাশ রাথিয়াছেন। তাঁহার নিবাস ফতেয়াবাদে ছিল, ইহা নিশ্চয়-রূপে বলা না গেলেও তিনি যে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কবির বংশ চট্টগ্রামের রাজসরকারের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল, বোধ হয়।

ইতিহাসে দেথা যায়, নবাব নেজাম শাহ্ প্রায় দুই বৎসর মাত্র চট্টগ্রামের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। এই নবাবের (তথা চট্টগ্রামের অপরাপর নবাবগণের) বাড়ী চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল ? চট্টগ্রা-মের 'নেজামপুর চাকলা' বোধ হয় এই নেজাম শাহেরই স্থাপিত। ঐতি-হাসিক গবেষণার পক্ষে চট্টগ্রাম অতি উপযুক্ত ও বিস্তৃত ক্ষেত্র। ইহাতে দেথিবার ও শুনিবার মত অনেক পুরাকীর্ত্তি-চিহ্ন আজও বিদ্যমান। কিন্তু হায়! দেথিবার লোক কৈ ? একজন দেথিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু নির্ম্মম কাল সেই নলিনীকান্তকে। অকালে হরণ করিয়া আমাদের বাড়া-ভাতে ছাই দিয়াছে! আজ হতভাগ্য চট্টগ্রাম পূর্ব্বে যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই সমাচ্ছন্ন! দেশে শিক্ষিত ও ক্ষমতাবান লোকের অভাব নাই কিন্তু দুঃথের বিষয়, কাহারো দৃষ্টি দুঃথক্লিষ্টা মাতৃভূমির প্রতি নাই! পোড়া কপাল আর কাহাকে বলে ?

'লয়লা মজনু' কাব্যের প্রতিপাদ্যবিষয় কি, তাহা বোধ হয় কোন পাঠ-ককেই এথন বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। প্রেমজগতে লয়লাও মজনুর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। হায়! চারি চক্ষুর সেই একদিনের সম্মিলনেই যে এত

---

* এই গ্রামের নিকটেই নসরত্ (হোসেন শাহের পুত্র) বাদশাহের প্রকাণ্ড দীঘিও আলাওলের দীঘি আজও বর্ত্তমান।

। ভূতপূর্ব্ব 'আলো' পত্রের সম্পাদক নক্ষত্রম ৺ নলিনীকান্ত সেন বি, এ,।

কাণ্ড হইবে, কে জানিত! অনলে পতঙ্গ পতিত হয়, শেষে পুড়িয়া অনলে মিশিয়া যায়। সুখ বুঝি এই পোড়াতেই! সাগরের সহিত নদী যতক্ষণ মিলিত না হয়, কেবল ততক্ষণই যত কল্লোল; মিশামিশির পর আর কিছুই নাই। তারপর কেবল শান্তি, আর শান্তি! অনন্ত প্রেমসাগরের দুইটি বুদ্বুদ লয়লা ও মজনু,—আজ অনন্তে সান্ত মিশিয়া গিয়াছে। জগজ্জনের কর্ণরন্ধ্রে যে বিয়োগ-গাথা সেই কোন্‌কালে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আজও তাহার প্রতিধ্বনি বিরহীর মর্ম্মে শেলবিদ্ধ করে! লয়লা ও মজনু আজ চিরলুপ্ত কিন্তু সহৃদয়ের কাছে তাহাদের জন্য 'চিরদিন রহিবে শুধু হৃদয়েরি হায়! হায়!'

ইহার রচয়িতা কবি দৌলত উজীর একজন সুন্দর কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সমগ্র গ্রন্থের ভাষাই বিশুদ্ধ কোমল, ললিত ও সরস। ভাষায় অত্যল্প স্থানেই আড়ম্বর পরিলক্ষিত হইবে। মুসলমানের লেখনী হইতে সেকালেও এমন সুন্দর ভাষা নিঃসৃত হইতে পারিত, জানিয়া বড়ই আনন্দ হয়। কবির হৃদয় মজনু ও লায়লির অপূর্ব্ব প্রেমভাবে তন্ময়; সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে কোমলকান্ত পদাবলী ক্ষরিত হইয়া হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ সমাবিষ্ট করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। করুণ-রস-বর্ণনায় লেখক সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে অশ্রুসংবরণ কঠিন হইয়া উঠে। দৌলত কাজী * ও আলাওলকে বাদ দিলে মুসলমানসাহিত্যে ইঁহার আসন অতি উচ্চে, অসঙ্কোচে একথা বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গের প্রাচীনকীর্ত্তিস্বরূপ রক্ষিত হওয়ার একান্ত যোগ্য।

কবির লেখনীর গুণে সমগ্র কাব্যটা কি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রই অন্তর্ম্মুখী;—সে দৃষ্টিসাহায্যে তিনি ভাবুকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তন্নিহিত ভাবরাশি চয়ন করিয়া লইয়া বাহির হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় একান্ত কবি-জনোচিতই ছিল। যাহাকে লোকে 'পাগলামি' মনে করে, সহানুভূতির প্রাবল্যে কবির দৃষ্টিতে তাহাই পবিত্র ও সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। কায়েস 'মজনু' হইয়া গিয়াছেন কিন্তু সহৃদয় কবি তাঁহাকে কি ভাবে আমাদের গোচরীভূত করিয়াছেন, এই দেখুন:—

* বারান্তরে আমরা 'দৌলত কাজী'র বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিব।

সংসারের মায়া মোহ অকারণ জানি।
প্রেমরস ডোর দিয়া বান্ধিয়া পরাণি॥
না বুঝিয়া লোক সবে বোলয় পাগল।
পাগল না হয় অতি গুণের আগল॥
কহিতে অকথ্য কথা শুনিতে অশক্য।
দেখিতে অদেখ্য রূপ লখিতে অলক্ষ্য॥
মধু কটু রস যেন ভখিলে সে জানে।
পটেত লিখিয়া রস বুঝাইব কেমনে॥
শৃঙ্গারের রস যেন নপুংসক ঠাঁই।
কদাচিত না বুঝিব কহিলে বুঝাই॥
তেহেন প্রেমের রস যে করএ পান।
সেই সে বুঝএ তার বিষম সন্ধান॥
উদ্দেশিতে দিশ নাহি দশ দিশ ঘোর।
স্থল নাহি স্থিতি নাহি নাহি অন্ত ওর॥
প্রেম-পন্থ দুর্গম কণ্টক বহুতর।
দুরান্তর দুরন্ত অঘোর ভয়ঙ্কর॥
যাবত সেহেন্দি সম পিষন না যায়।
কদাচিত লাগিতে না পারে রাঙ্গা পায়॥
ভস্ম হৈল সমস্ত প্রেমের হুতাশনে।
পতঙ্গ দহিল যেন দীপ দরশনে॥
বিরহ আনলে ভস্ম করিল তাহানে।
ভ্রমএ উন্মত্ত হৈয়া প্রেমের উদ্যানে॥
বিদরিল হিয়া যেন ডালিম্ব সুপাক।
প্রেম জালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক॥
প্রেমরস পান করি হইল মাতাল।
রবিতাপে রেণু যেন হইল তাতল॥
চরণে ফুটিল প্রেম কণ্টক বিশেষ।
শির ভেদি বিকাশিল লোকে বোলে কেশ॥

প্রিয়-বিরহে বিরহীর মনে চন্দ্রাদির দর্শনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা কবি-হৃদয়ের মত সহানুভূতিশীল না হইলে অপরে জানিতে পারে না। কবিদের অন্তর্দৃষ্টি প্রবল, তাই কবি দৌলত উজীর মজনুর প্রত্যেক মনোভাবটি পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন :—

কর্ণ-পিতা ডুবিলেক সমুদ্র-আলয়।
আনন্দে উদয় ভেল সাগর-তনয়॥
শারদ পূর্ণিমা নিশি উজ্জ্বল রজনী।
বিকাশিত কুমুদিনী উজ্জ্বল ধরণী॥
একেশ্বর বনমধ্যে মজনু দুঃখিত।
অহ নিশি কান্দয় বিরহ-বিষাদিত॥
প্রাণের ঈশ্বরী বিনে আন নাহি জাপ।
চন্দ্রের সহিতে কিছু করয় আলাপ॥
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তুমি অমিয়া-নিকর।
আজু নিশি উদয় হৈলা কিসের অন্তর॥
জগতে বোলএ তোমা সুধাকর নাম।
তোমার শীতল গুণ অতি অনুপাম॥
তোমার সমান মোর ঈশ্বরী-বদন।
তোমারে দেখিতে শ্রদ্ধা এহার কারণ॥
মোর প্রতি কেনে তুমি গরল সমান।
অনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ॥
মোর প্রতি নাহি কিছু তোমার পিরীত।
অমৃত গরল হৈল একি বিপরীত॥
দুঃখিত জনেরে কৃপা নাহিক তোমার।
তেকারণে প্রতিমাসে মৃত্যু একবার॥
দুঃখের বারতা জান রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের দুঃখ না ভাব আপনে॥
বিরহী জনের অঙ্গ দগধ স্বরূপ।
তেকারণে দুই পক্ষ ধর দুই রূপ॥
যদি দুঃখে ঝাম্প দিয়া তোর লাগ পাম।
তোমাই আকাশ হোন্তে সায়রে ডুবাম॥

নিরঞ্জন আরাধিএ জুড়ি দুই হস্ত ।
অবিলম্বে এই চন্দ্র নাশে যাউক অস্ত ॥
চন্দ্রমুখ দেখিতে নাহিয়া থাকি দুখ ।
নক্ষত্র হেরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥
নক্ষত্র গুণিতে মোর নাহি হৈল শেষ ।
অবহু দারুণ নিশি নহে অবশেষ ॥

এসব ছাড়িয়া দিলে, কবি দর্শনরাজ্যে প্রবেশ করিতেও পারগ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তও এ গ্রন্থে বিরল নহে ; অল্প নমুনা দিতেছি :

আকাশের চন্দ্র যেন পশিল মেদিনী ।
গোরের অন্তরে হৈল গয়লা কামিনী ॥
খাট পাট পুষ্পফল তেজিয়া সকল ।
ভূমিত শয়ন কৈলা শরীর নির্ম্মল ॥
* * *
এই মতে সংসার মধ্যে কিছু নহে সার ।
মনেত ভাবিয়া দেখ সব অন্ধকার ॥
* * *
পৃথিবীত পথিক তুলনা নরগণ ।
রাত্রিতে বসতি পুনি দিবসে গমন ॥
হাট বসাইতে যেন আসিছে নগরে ।
অবশেষে গমন করিব নিজ ঘরে ॥
উৎপন্ন নির্জ্জয় * দুই প্রভুর নির্ম্মাণ ।
কেহ আগে কেহ পাছে নাহিক এড়ান ॥
কেহ আসে কেহ যায় তার নাহি অন্ত ।
এক পন্থ ছাড়িআ নাহিক দুই পন্থ ॥
জীবন স্বপন তুল মরণ নিশ্চয় ।
সংসার আপন কেন নাহিক প্রত্যয় ॥

---

* উৎপন্ন নির্জ্জয়—উৎপত্তি ও বিনাশ ।

বিয়োগান্ত দৃশ্য বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। বাস্তবিক বিয়োগের মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনা কোমল হৃদয়ে সহ্য হইবারও নহে।

মজনু ও লয়লার জন্য বড় দুঃখ হয়। তাহাদের অসম্ভাবিত শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে নৈরাশ্যের গুরুভারে হৃদয় একান্ত অবসন্ন ও ব্যথিত হয়।

কান্দএ মজনু বর, না চিনে আপনা পর,
নয়ানে বহয় স্রোতধার।
সতত আকুল মতি, বিরহে বিষাদ অতি,
জগত লাগএ শূন্যাকার॥

* * * *

নিশ্চয় জানিছি আমি, আমার জীবন তুমি,
তুমি বিনু আমার বিনাশ।
জন্ম হৈল পরমাদ, জীবনে নাহিক সাধ,
অন্তরে মিলিব তোমা পাশ॥
কহিআ এসব দুখ, গোরেত রাখিআ মুখ,
প্রেমময় মজনু সুজন।
হাহাকার শব্দ করি, লয়লির নাম ধরি,
ততক্ষণে ত্যেজিলা জীবন॥

এই অংশটি পাঠ করিলে আপনাই দুইটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস না পড়িবে, এমন পাষাণময় হৃদয় সংসারে কাহার আছে?

ইহার সুদীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটি * সাহিত্যামোদীর আদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। তাহার ভাষা বৈষ্ণব কোবিদ-কুল-কুহরিত, দূরাগত নৈশানিল-সঞ্চালিত সঙ্গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট ব্রজবুলি-মিশ্রিত,—প্রেমপ্রবণ বঙ্গ-হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। স্থানাভাবে তাহার অত্যল্প মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল:—

(১) চাতক পীউ পীউ পীউ নাদ শুনি,
বিরহিনী চিত্ত চমকিত।
বরিখত বারিদ জগত ভরি,
রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।
শুন হে হে ধনি বিরহিনী,
যুগল নয়ানে বহে বারি;

* ২য় প্রতিলিপিতে ইহার অভাব। তাহাতে ভিন্ন প্রকারের বর্ণনা আছে।

ডাহুক দাদুর, কলনরত মত্ত ময়ূর,
ঠেকছে জীয়ন নব কামিনী।

(২) পাপ জনম ফল, নাথ বিছোড়ল,
অব নাহিক দুঃখ মোর।
এ সখি দুরজনি, এহেন ন কহো পুনি,
ন করহ কাজ চতুর॥

* * * *

যৌ সুখ পায়ব, হাজি চলাওব, *
তব ফুল হবে হামারি।
ফাগু কুসুম সব মঞ্জল উৎসব
পিয়া বিনে কো নহি ভায়।
আচাওদিন পদ দোহগণ সম্পদ
হীন উজীর বছ। গাএ॥

প্রবন্ধ বড়ই দীর্ঘ হইল, সুতরাং আজকার মত আমরা পাঠকগণ হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

আবদুল করিম।

হিন্দুলেখক ও মুসলমানসমাজ।

বিগত ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত "বেদমাতা গায়ত্রী" নামক প্রবন্ধটী বোধ হয় কোনও মুসলমানভ্রাতার নয়ন গোচর হয় নাই। তাই তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া অপ্রিয় হইলেও কিছু বলিব মনে করিয়াছি।

"বেদমাতা গায়ত্রী"র লেখক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"এদিকে ব্রহ্ম কোপানল যেন প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য যবনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারত অধিকার করিল। যবনেরা আমা-

* হাজি—সাজি (সাজী)। চলাওব—সাজাবন।

† রহ—বস।

[illegible] বুদ্ধি সর্ব্ব নানা প্রকারে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক জাতিকে [illegible] ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ভারতের রত্নরাজি সমস্তই লুণ্ঠন [illegible] এতদিন হল। দেব-মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের [illegible] টার দিয়া, যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে [illegible] করিলে সেই সময়ে আর্য্যজাতি পরিবর্ত্তিত হিন্দু নামে অভিহিত হইল।

* প্রকাশ [illegible] * * * * স্নেহময় পিতা [illegible] যদি বিপথগামী পুত্রকে বহু প্রকারে শাসিত করিয়া, পরে নানারূপ সদুপদেশ [illegible] 'নন্দকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন, তদ্রূপ করুণাময় ব্রহ্ম বৈদিক-[illegible] নীচ কার্য্যে আর্য্যজাতিকে যবনমূর্ত্তি ধারণে প্রথমে বিশিষ্ট রূপে শাসন করতঃ [illegible] উৎকৃষ্ট ইংরাজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহু সদুপদেশচ্ছলে তাহাদিগকে সৎপথে [illegible] চেষ্টা করিতেছেন। তাই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে [illegible] মুসলমানজাতি সুসভ্য ইংরাজজাতির অধিকৃত।" *

[illegible] মুসলমানরি উদ্ধৃত অংশে মুসলমান-বিদ্বেষ বা মুসলমানসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার [illegible] আভিযাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না কি? লেখক মহাশয় অবশ্যই ইহা সরল [illegible] প্রাণে—সদ্ভাবে লিখিয়াছেন, কিন্তু অসরল আমরা, ইহা অন্য ভাবেই গ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের পক্ষে সেরূপ করা স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান সময়ে 'যবন' বলিলে হিন্দুগণ কাহাদিগকে বুঝিয়া থাকেন? "যবন" কি 'মুসলমান' শব্দের এক নিদারুণ প্রতিশব্দ হইয়া পড়ে নাই? 'যখন "যবন" শব্দ "মুসলমান" শব্দেরই প্রতিশব্দ রূপে বাঙ্গালার শব্দসঙ্ঘে স্থান পাইয়াছে, তখন উহার অর্থ মূলে যাহাই থাকুক এখন আর উহা ব্যবহারে গালি বুঝাইতে পারে না', হিন্দুভ্রাতাগণ উত্তরচ্ছলে হয়ত ইহাই বলিতে পারেন। কিন্তু যতদিন "যবন" শব্দের প্রকৃত অর্থের মীমাংসা না হইতেছে ততদিন আমরা—মুসলমানেরা উহাকে একটি বিষম গালি বলিয়াই গ্রহণ করিব। মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় "যবন" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ার্থে বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আমাদের সন্দেহ মিটে নাই। "বেদমাতা গায়ত্রী" লেখক মহাশয় 'যবন' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি বলিতে পারেন কি? তিনি মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়াই 'যবন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন নতুবা 'যবন' ব্রাহ্মণের টিকি কাটিয়া তাহাকে মুসলমান করিবে কেন?

* ভারতী, জ্যৈষ্ঠ; ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমাদের সন্দেহ হয় যে যবন শব্দটি Ionian বা ইউনান শব্দে
অপভ্রংশ। কিন্তু আমরা আমাদের সন্দেহের অনুকূল অর্থেই বু
বঙ্গীয়-অভিধান লিখিত বশিষ্ঠ মুনির নন্দিনী নামক গাভীর মলমূত্র
অসদাচারী জাতি বিশেষকে বুঝিব? পৌরাণিক হিন্দুগণ যদি কো
প্রতি দ্বেষ পরবশ হইয়া এইরূপ অর্থ যোজনা করিয়া থাকেন তবে
অপবাদ-যুক্ত নামটি ব্যবহার না করাই উচিত। আমাদের এ ভু
ঘুচাইবে? আমরা উহার কোন্ অর্থ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিব? কো
দর্শী হিন্দু মহোদয় আমাদের এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন কি?
কি নিরাস হইবে না?

'যবন' Ionian বা ইউনান শব্দের সংস্কৃত নাম হইলে Ionia
নিবাসী গ্রীকদিগকে বুঝাইতে পারে। এবং সেই হিসাবে গ্রী
'যবন'। যদি তাহাই হয় তবে মুসলমানগণ সকলেই বক্ট্রীয় গ্রীকদিগে
অথবা এস্থলে whole for the part বুঝিতে হইবে? হইতে পারে গ্রী
দিগের বংশধরেরা মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল কিন্তু তাই বলি
সমুদয় মুসলমানের প্রতি সে নাম প্রযুজ্য হইতে পারে না। অনেকে আফগা
জাতিকে গ্রীক-বংশধর বলিয়া সন্দেহ করেন। উক্ত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতে
'জাতিভেদ ও ভাষাভেদ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,
মহোদয় আফগান বা কাবুলীদিগকে গ্রীক-বংশধর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন।
উক্ত প্রবন্ধে (ভারতীর ১৮৮ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়াছেন :—

"খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার যে বক্ট্রিয়া রাজ্যের সংস্থাপন
করেন তাহার আজি কি অবস্থা! আজ কাবুল দেশীয় মুসলমানদিগকে
দেখিয়া কে চিনিতে পারে যে উহারা সেই গ্রীকদিগের বংশধর?"

স্বর্গীয় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভারত-কামিনী নামক
কবিতায় যবন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যুনানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যুনানী ও
ইউনানী কি এক শব্দ?

যাহা হউক যদি আফগানেরা বক্ট্রীয় গ্রীকদিগের বংশধর হয় এবং তাহা-
দিগকে যবন বলা যায় তবে আপত্তি কিছু নাই। (অবশ্যই না বুঝাইয়া
বলিলে আপত্তি আছে)। কিন্তু সমুদয় মুসলমানকে ঐ একই নামে অভি-
হিত করা ন্যায়শাস্ত্রানুসারে ও ঐতিহাসিক হিসাবে ভুল নহে কি? সমুদয়
মুসলমানকে ঐ নামে অভিহিত করা কি হিন্দুর অজ্ঞানতা অথবা বিদ্বেষ-

বুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া মনে করিব? জগতের বিজ্ঞতম জাতির এরূপ অজ্ঞতম ব্যবহার মার্জ্জনীয় নহে। যদি হিন্দু বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া এতদিন উক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়া থাকেন তবে এখন এই সত্যপ্রতিষ্ঠার দিনে এই আপত্তিজনক শব্দটাকে বাঙ্গালা শব্দশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিলে কোন ক্ষতি আছে কি? অথবা ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিলে কি ভাল হয় না?

যদি 'যবন' শব্দটি হিন্দুগণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার অর্থে ব্যবহার না করেন, তবে 'ননীচ যবনতঃপর' একথা শুনি কেন? যবন = মুসলমান = যাহা হইতে নীচ জাতি আর নাস্তি ইহাই হিন্দুর ব্যাখ্যা। ইহা অবশ্যই মুসলমান-প্রীতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

লেখক বলেন, 'যবন' ব্রহ্ম কোপানলের অবতার!! সেই জন্যই বুঝি মুসলমান সম্রাট আকবরকে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলা হইত? যবনেরা (মুসলমানেরা) আর্য্যজাতিকে (হিন্দুদিগকে) প্রপীড়িত করিয়াছিল। বিজিত জাতি চিরকালই ত জেতার নিকট অল্প বিস্তর প্রপীড়িত হয়। অধিনতা পীড়াদায়ক ছাড়া আর কি? কিন্তু মুসলমানঅধিকার কালে হিন্দুর দেশ হিন্দুরই ছিল। তখন স্বাধীন ক্ষমতাশালী শত শত রাজা জমিদার ছিলেন। তখন রাজকর্ম্মে উচ্চ পদাসীন অনেক হিন্দুকুলতিলক নিযুক্ত ছিলেন—মানসিংহ, তোডরমল্ল, জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুরুষ ও স্বাধীনতার চির উপাসক মহারাণা প্রতাপসিংহ ও বঙ্গীয় জমিদার প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি হিন্দুকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই তালপাতার ছায়াতেই মারাঠা শিবাজীর বিকাশ! মুসলমান হিন্দুদিগকে এমন পীড়া দেয় নাই যাহাতে তাহাদের প্রতিভা বিকাশে বাধা জন্মাইয়াছিল। তবে সমুদয় দেশের জন্যই একটা অন্ধকার যুগ থাকে, ভারতবর্ষের ও মুসলমানজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়টাই অন্ধকারযুগের অন্তর্ভুক্ত। তখন মুসলমানগণও তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল! জ্ঞানরাজ্যের চাবি তখন আর এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়াছিল! সেই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই বর্ত্তমান জগতের উপদেষ্টা।

মুসলমান কোন্ হিন্দুজাতিকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল? সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে কি তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসন নির্ম্মিত? ইতিহাসে তাহার প্রমাণ যোগ্য কিছু সাক্ষ্য আছে কি? ক্রীতদাসের জাতি বলিয়াই

হিন্দুগণ কি হিন্দু নামে অভিহিত? 'হেন্দ' (গোলাম বা ক্রীতদাস) শব্দ হইতে কি হিন্দু শব্দের উৎপত্তি না হিন্দু হইতে 'হেন্দ' শব্দের সৃষ্টি?

মুসলমানগণ ভারতের রত্নরাজি বিলুণ্ঠন করিয়াই ত গজনী নগরীকে অলকায় পরিণত করিয়াছিলেন তাই হিন্দু কবি গাহিয়াছেন :—

"হিন্দু গর্ব্ব খর্ব্বকারী দুরন্ত যবন
ভারতের সর্ব্বস্ব করি বিলুণ্ঠন -
নিলাছিয়া বিগ্রহের নিধি শিল হ'য়ে
হইল অলকা লাঞ্ছি গজনী নগরে।"

আমরা ইহা স্কুল পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়া অভ্রান্ত রূপে গ্রহণ করিয়াছি। এখন সন্দেহাকুল হৃদয়ে সেই ধারণাই পোষণ করিতেছি। আজিও এ ভ্রান্তির অপনোদন হইল না। হায়! আমাদের এমনই জ্ঞান! এমনই অদৃষ্ট!!

মুসলমান পৌত্তলিকতা বিনাশের জন্যই জগতে আবির্ভূত। তাহারই বিনাশের জন্য যদি দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির ধ্বংশ করিয়া থাকেন—অন্যায় হয় নাই। জগতে অজ্ঞানতা বিনাশের জন্য সময় সময় এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়া থাকে। হিন্দুর নারায়ণাবতার রামচন্দ্র দুষ্কৃতের শাসন জন্যই ত সোণার লঙ্কা ছারখার করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড কে না জানে? তাহাও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য! গীতায় ত সেই জন্য কৃষ্ণের মুখে উক্ত হইয়াছে যে সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশেও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি। মুসলমান ধর্ম্ম কি শুদ্ধ শাসনের জন্য আসিয়াছিল? হিন্দুদিগকে কি কিছুই সদুপদেশ দেয় নাই?

মুসলমানগণ ব্রাহ্মণের শিখা কাটিয়া যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়াছিল। কয়জন ব্রাহ্মণকে? যদি সকল ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ কোথা হইতে আসিলেন? (পরশুরাম একবিংশ বার ধরিত্রী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তবুও ক্ষত্রিয় বংশ রক্ষা হইয়াছে। জৈন মতে ক্ষত্রিয়গণ একবিংশ বার নাকি ব্রাহ্মণ ধ্বংস করিয়াছিলেন কিন্তু তবুও ব্রাহ্মণ ছিল ও আছে। মুসলমানদিগের সময় সেরূপ ঘটনা কিছুই হয় নাই।) মুসলমানগণ যে ধর্ম্মে এরূপ বল প্রয়োগ করিয়াছে তাহা কখনই প্রমাণিত হইবে না। তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর নাম লোপ পাইত না কি? ব্রাহ্মণেরা কি স্বেচ্ছায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই? খৃষ্টানের আগমনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন,

স্বেচ্ছায় না বল প্রয়োগে? মুসলমানের সময় কি সেরূপ কারণ কিছু ঘটে নাই? একদল ব্রাহ্মণ আছে তাহারা নাকি মুসলমানের খাদ্য আঘ্রাণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া মুসলমান হইয়াছিল। আজিও তাহারা ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার বিফল আয়াসে অমনোযোগী নহে। কিন্তু তাহারা খুব অল্প সংখ্যক!! যদি কোন ব্রাহ্মণ না ব্রাহ্মণেতর হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের জন্য না অধর্ম্মের জন্য? ধর্ম্মলোভে না ধনলোভে? যে কারণেই হউক স্বেচ্ছাব্যতীত বল প্রয়োগে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আজি সে পুরাতন কাহিনীর প্রকৃত বিবরণ কোথায় পাইব? হিন্দু সেই পুরাতন কথা তুলিয়া আমাদিগকে আর কেন ব্যথা দেন? লেখক মহাশয় যে মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে মুসলমানকে দোষী করিয়া হিন্দু কি কিছুই বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে পারেন না? ইহাতে কি ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটেনা? এরূপ ভ্রাতৃদ্বেষ পরস্পর ত্যাগ করাই বিধেয় নহে কি? আর পুরাতন কথা (যাহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে) তুলিয়া আবশ্যক কি?

Let the dead past bury its dead,
Act, act in the living present.

উপসংহারে জিজ্ঞাস্য এই যে লেখক মহোদয় বলিতে চাহেন কি যে মুসলমানের নিজের উপযোগিতা কিছুই নাই বা ছিল না কেবল হিন্দুদিগের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য একদল ময়লার গাড়ি বাহির হইয়াছিল? অথবা বিশ্বামিত্রের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য বশিষ্ঠ মুনির তপোবনে নন্দিনীর মলমূত্র হইতে যে একদল যবন বাহির হইয়াছিল তাহাদিগের বংশধরেরা হিন্দুদিগের শাসনের জন্য অনাচার অত্যাচারের বোঝা মাথায় করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে আসিয়াছিল! অশিক্ষিতের পক্ষে এ ধারণা শোভা পায়! জিত জেতা সম্বন্ধে প্রথমে কিছু কিছু এইরূপ ধারণা জন্মে কিন্তু ইহা বেশী দিন থাকে না! লেখকের জনৈক আত্মীয় তাঁহার কোন শিক্ষক জনৈক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শুনিয়াছি মুসলমানের রাজত্ব যাইবে না কিন্তু তবে ইংরাজ আসিল কেন? উত্তরে মৌলভী সাহেব বলিয়াছিলেন যে মুসলমান সিংহের শাবক শৃগালবৃত্তি পরায়ণ হওয়াতে খোদাতালা বিলায়েৎ হইতে একদল বলবান সারমেয় পাঠাইয়াছেন। আজি কালি বোধ হয় কোন মৌলভী সাহেব আর এরূপ বলিবেন না। কিন্তু এতদিনেও কি তাহাকে ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ধার করিল না।

[হিন্দুর সদুপদেশের জন্য ইংরাজরাজত্ব। সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে অনেকের এই ধারণা যে জগৎটা তাহাদিগের জন্য, তাহারা কিছুরই জন্য নহে। লেখক মহাশয়ের ধারণা কি সেইরূপ নহে?

আফতাব উদ্দীন আহ্‌মদ।

প্রেম-ডোর।

"তার পানে চেয়ে আমি
সে যে মোর পানে নাহি চায়,
কাছে যাই ধরি ধরি
সে যে হায় ছুটিয়া পালায়।"

সংকীর্ণ পিঞ্জরে তারে
পুষিবারে মনের বাসনা,
সংকীর্ণ অপ্রিয় তার
মন মম বুঝেও বুঝেনা।

বুঝেনা বলিয়া এই
সংকীর্ণতা লয়ে চিরদিন,
বিপুল প্রকাণ্ডে চায়
করিবারে ইহার অধিন!

আকাশ-কুসুম সম
আশা লয়ে ভ্রান্তের সমান
মত্ত তুমি, তবু বল
সে তোমারে করে প্রত্যাখ্যান!

চাহিলে তাহারে মন
ভাব কিবা প্রিয় বস্তু তার,
সেইরূপ আচরণে
সে আসিবে নিকটে তোমার।

অন্য পরিশ্রম বৃথা,
প্রেম-ডোরে বাঁধহ তাহারে,
সে ডোর ছিঁড়িয়া যাবে
হেন বল সে তো নাহি ধরে।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

একখানি পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহিত হইলাম। ৫ সংখ্যা নবনূরও পাইয়াছি। এই সংখ্যাগুলি যত্নের সহিত পাঠ করিলাম।

আপনারা বঙ্গভাষার সেবা-দ্বারা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়। স্বর্গগত সৈয়দ আহ্‌মদের ভাষায় বলিতে গেলে, হিন্দুমুসলমান ভারতের দুইটি চক্ষু। এক চক্ষু মুদ্রিত থাকিলে কেবল অন্য চক্ষু-দ্বারা পূর্ণ দৃষ্টি অসম্ভব। অধঃপতিত ভারতকে পুনর্ব্বার উন্নতির পথে প্রতিস্থাপিত করিতে হইলে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলন একান্ত আবশ্যক। আপনারা সেই সম্মিলনের প্রয়াসী, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা বঙ্গভাষাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। সাহিত্যে বিদ্বেষ তাদৃশ মিলনের একটি প্রধান অন্তরায়। হিন্দুলেখকগণ অনেক সময় মুসলমানের অযথা নিন্দা করিয়া লেখনির অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আপনাদের একজন লেখক লিখিয়াছেন, "সাহিত্য-রাজ্যে ঘুষির বদলে ঘুষি যদি আমরাও দিতে পারিতাম তাহা হইলে ভারত-ইতিহাসে ইস্‌লাম-মস্তকের এমন শোচনীয় চর্ব্বণ কদাচ দেখিতে হইত না।" আপনারা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর প্রবন্ধের ফুটনোটে বলিয়াছেন যে, ঘুষি আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আপনাদের কতিপয় লেখক ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম হইতে ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিলে কি হইত, তাহা বলা যায় না; কিন্তু এখন ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিলে বিদ্বেষের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, আর আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত মিলন "পিছাইয়া" পড়িবে। এই যে চারিদিকে বিদ্বেষের আগুন আপনাদিগকে উত্তাপিত করিতেছে, ইহা প্রেমের বারি সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। আপনারা বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে মুসলমানজাতির নির্ম্মল মহত্ত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করুন, যে আদর্শের নিকট শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই স্বতঃই অবনত হইবেন। খলিফার ন্যায় পরায়ণতা এবং আরবীয় দর্শনালোচনার ন্যায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকুন, বঙ্গীয় হিন্দুপাঠক অবশ্যই মুসলমানের অনুরাগী হইবেন। "হিন্দুনারীর মুসলমানঘৃণা" নামক প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য কি? হিন্দুনারীর নিন্দা অথবা শ্যামাসুন্দরীর বাক্যের প্রতিবাদ? যদি প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা সফল হইয়াছে। যদি লেখক গুণবতী মুসলমান রমণীবৃন্দের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু পাঠক সে মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্যামাসুন্দরীর বাক্য যে অলীক তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন। হিন্দুর প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য মুসলমান-

সমাজের আর একটি কর্ত্তব্য আছে। হিন্দুর রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে তাহা সহানুভূতি সহকারে বলিতে হইবে। কিন্তু কেহ এ সহানুভূতি জোর করিয়া আনিতে পারিবেন না। প্রথমে হিন্দুর রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইবে। তাহা হইলে সহানুভূতি আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈধই আমাদের মধ্যে অসদ্ভাবের প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই কারণের নিরসন কি উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে, তাহা মুসলমানসমাজের নেতৃগণের ভাবিবার বিষয়। আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে অধিকারী নহি; তবে একটি কথা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা কালে অনেকে যথোচিত সংযত ভাব অবলম্বন করেন না। হিন্দুগণ আকবরের সহায়তাকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার আলমগীর বাদশাহের বিপক্ষতা করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইহার কারণ কি? সেকালের ইতিহাস অনুশীলন করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, এবং তারপর সে কারণ যদি বর্ত্তমান সময়ে অংশিক ভাবেও বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তবে তাহাও নির্ম্মূল করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বহু শিক্ষিত মুসলমান আছেন। তাঁহাদের অনেকেই হিন্দুসমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজনও বটেন, কিন্তু আবদুল জব্বার সাহেবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? অবশ্য হিন্দুগণ তাঁহার গুণেই মুগ্ধ হইয়াছে। প্রকৃত গুণের নিকট সকলকেই অবনত মস্তক হইতে হয়।

হিন্দুমুসলমানের সম্মিলন মুসলমানের পক্ষে যেরূপ প্রার্থনীয়, হিন্দুর পক্ষেও তদনুরূপ প্রার্থনীয়। এজন্য তাহাদেরও বহু কর্ত্তব্য আছে, এবং তৎসম্পাদনে তাহারা অবহেলা করিতেছে। এখানে নবনূরের সম্বন্ধে কথা হইতেছে বলিয়া সে সব বিষয়ের উল্লেখ করিলাম না।

নবনূরে একটি বিষয়ের আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করি। এক সময়ে মুসলমানজাতি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মুসলমানের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। এই অবনতির কারণ কি, তাহাই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কারণ রোগ নির্ণয় না হইলে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ অসম্ভব। সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় সময় অনেক লেখক এই কথাটি

দুর্ভাগ্যবশতঃ ভুলিয়া যান যে, প্রত্যেক সমাজেই আদর্শ ও বাস্তবে অনেক পার্থক্য; এ কারণ অনেক সময় বাস্তবের আলোচনা করিতে বসিয়া আদর্শকে টানিয়া আনা হয়।

আমার অধিক লেখা বাহুল্য। কারণ এখানে যে সব বিষয়ে কিছু কিছু বলা হইল, তৎসম্বন্ধে আপনারা অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অধিক চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুমুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহা আমার "জীবন স্বপ্ন"। এ জন্যই এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি, আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিয়া আমার কথা-গুলি সদ্ভাবে গ্রহণ করিবেন।

আপনারা আমার "মোহাম্মদ" পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদে আমি নিরতিশয় উৎসাহিত হইলাম। আমার পরিশ্রমের জন্য আমি অন্য পুরস্কার চাহি না। অন্ততঃ একজন মুসলমান পাঠকও যে আমার প্রবন্ধটি appreciate করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার।

পুনশ্চঃ, ভবদীয়

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

এই পত্র লেখার পর বৈশাখ সংখ্যার মাসিক সাহিত্য সমালোচনা পাঠ করিলাম। এরূপ সমালোচনায় কাজ হইবে বলিয়া আশা করি। আপনাদের সমালোচক ভূতনাথ বাবুর কথার (ব্যভিচার ইস্লাম ধর্ম্মানুমোদিত) অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন এবং ভূতনাথ বাবুর কথা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোরাণের পরবর্ত্তী শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কয়েকটি প্রমাণ দিলে প্রতিবাদ আরও সবল হইত। কোরাণের পরবর্ত্তী শাস্ত্র হইতেও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সমালোচনার শেষ অংশ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। মুসলমান কি কখনও ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ করে নাই? আমার মনে পড়িতেছে যে, তৈমুর স্বরচিত জীবনবৃত্তের একস্থানে বলিয়াছেন, "ইসলামধর্ম্মের শত্রু পৌত্তলিকগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে পরলোকে পুরস্কার লাভ করিব।" গাজি কাহাকে বলে? জেহাদই বা কি? গাজি ও জেহাদ কি মোহাম্মদের পরবর্ত্তী ইস্লামশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে? যদি অনুমোদিত না হয়, তবে আমরা মুসলমানসমাজে গাজি ও জেহাদের নাম শুনিতে পাই কেন? আমার এই

বিশ্বাস যে, মুসলমান কালক্রমে মোহাম্মদের উচ্চআদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা বিধর্ম্মীর রক্তপাত ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমার এই বিশ্বাস কতদূর প্রামাণমূলক, তাহা বলিতে পারি না। আমার ভ্রমও হইতে পারে। নবনূরের সমালোচক যদি এ সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে বিস্তৃত আলোচনা করেন, তবে ভাল হয়। এইরূপ আলোচনা দ্বারাই বঙ্গীয় হিন্দুপাঠকের ভ্রম নিরসন হইতে পারে। আমার আর একটি বক্তব্য আছে। মুসলমানেরা বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে তাঁহারা বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংসসাধনও করিয়াছিলেন? তৈমুরলঙ্গের হস্তে দামস্কসের কি দশা হইয়াছিল? এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে।

বিধবা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গম্ভীর নিশীথে।

সে দিন শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না বাহিরে হাসিতেছিল। অদূরে চিত্রা কূলে কূলে উছলিয়া উছলিয়া বহিয়া যাইতেছিল। রজনী হাস্যময়ী। শুভ্র মল্লিকা ফুলের ন্যায় পরিস্ফুট কৌমুদী নদীর ঢেউগুলির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেছিল—খেলিতেছিল—দুলিতেছিল। নদীর তীরে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার মুক্ত বাতায়নপাশে বসিয়া একটি রমণী। ধীর সমীরে মুক্ত কালোকেশগুচ্ছ দুলিতেছিল,—যেন কাল ভুজঙ্গিনী। সে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল, চাহিয়া কি দেখিতেছিল? দেখিতেছিল আকাশে তারা, চন্দ্র হাসিতেছে, নদীর জলে সে ছায়া বড় সুন্দর জ্বলিতেছে,—যেন শত শত হীরা, মণি। মাঝে মাঝে দাড়ের ঝুপ্‌ ঝাপ্‌ শব্দ করিতে করিতে গান গাহিতে গাহিতে মাঝিরা তরী বাহিয়া অনুকূল স্রোতে যাইতেছিল, জ্যোৎস্নালোকে ছোট ছোট তরঙ্গগুলি সোহাগে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল পড়িতেছিল,—কোনও সুরসিক প্রবাস-গামী নৌকা-যাত্রী বিরহ-সঙ্গীতে ভাবী বিরহ ঘনাইয়া তুলিতেছিল। দূরে,—নদীর পরপারস্থিত আধ আলো, আধ ম্লান, বনরাজি একখানি

ধূসর চিত্রিত চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রকৃতি নৈশ নীরব সুপ্ত। জন-কোলাহল কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝোপে ঝাপে ঝিম্ ঝিম্ সর্ সর্ শব্দ হইতেছে। নিকটস্থ বকুল-কুঞ্জের মধুর সৌরভে চারিদিক সুরভিত। সেফালিকা ফুলগুলি শিশির বিধৌত জ্যোৎস্নালোকিত পবিত্রতা মাখা অমল ধবল।

যুবতীর মুখের উপরে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছিল, নক্ষত্র বালিকাগুলি আকাশের গায় মৃদু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া চাঁদের লীলা দেখিতেছিল। চন্দ্ররশ্মি-প্রতিফলিত মুখখানি কেমন দেখাইতেছিল? যেন বিরহ-বিধুরা ম্রিয়মানা কমল সুন্দরী;—হাসি ফোটে না,—আপনার ভাবে আপনি বিভোর, বিরস ম্লান।

সুষমা ভাবিতেছে:—তিনি কোথায় গিয়াছেন? যে দেশে গিয়াছেন সে দেশেও কি এমনি করিয়া চাঁদের কিরণে চারিদিক হাসে? সে দেশেও কি এমনি করিয়া ফুল ফোটে? এমনি করিয়াই কি পাপিয়া কোকিল ঝঙ্কার দেয়? এমনি করিয়াই কি মর্ম্মরিত তানে পবন বহিয়া যায়? এখানে যেমন চাঁদ হাসে,—আমি যেমন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছি তিনিও কি এমনি করিয়া সে অজ্ঞাত দেশে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন? আমার মত তিনিও কি আমার কথা ভাবেন? চাঁদ! তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? তুমি কি বলিতে পার না আমার জীবনের জীবন, আমার প্রাণের প্রাণ,—চিরঈপ্সিত, চিরদয়িত তিনি কোথায়? আমায় যেমন দেখিতেছ, তাঁহাকেও কি তেমনি দেখিতে পাও না? হাঁ চাঁদ, তিনি কেমন আছেন? প্রাণনাথ আমার কেমন আছেন? বল চাঁদ, বল, বল, ওকি! তুমি হাসিতেছ কেন? হাসিও না—ও কলঙ্কী শশধর হাসিওনা—আমি বড় অভাগিনী তাই কি হাসিতেছ? এ জগতে—এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে তবে কি সত্য সত্যই—পরের ব্যথায়—পরের জ্বালায়—কাহারও হৃদয় গলে না? তবে কি সত্য সত্যই এ জগত নির্ম্মম নিঠুর?

চাঁদের কিরণ! তুমি কি সে দেশও এমনি করিয়া আলোকিত কর? যে দেশে আমার প্রাণেশ্বর আছেন?

ভাই মেঘ! তুমি কোথায় যাও? ... দাঁড়াও ছুটো কথা জিজ্ঞাসা করি? একি! কোথা যাও? ... কোথায় যাও? আহা! আমি যদি মেঘ হইতাম, ত... আলোকিত দেহে তাঁহার চরণ প্রান্তে উড়িয়া গিয়া লুটিয়া প...

সুষমার কথা মেঘ শুনিল না,—সে কোথায় ভাসিয়া গেল। সুষমার কথা চাঁদ শুনিল না,—সে হাসিয়া হাসিয়া কিরণ ঢালিতে লাগিল।

প্রিয়তম! এ জগতে তোমায় আমি পূজা করিতে পারি নাই, বড় সাধ যায় তোমার পূজা করিব।—ফুল,—না—না—এ সামান্য ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব না,—ফুল যে দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া যায়,—দেখিতে দেখিতে শুখাইয়া যায়,—আমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া অম্লান উজ্জ্বল অনন্ত সুন্দর প্রেম-ফুল দিয়া যে তোমায় দিবা নিশি পূজা করিতেছি, সে পূজা কি তুমি লইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়ে।

সুরপুরের দীননাথ বন্দোপাধ্যায়কে না চিনিত এমন লোক সে অঞ্চলে কেহ ছিল না। তাঁহার মহানুভবতা, দয়ার্দ্র হৃদয় ও সরল উদার ব্যবহার সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, পরের জন্য, পরের ব্যথায় তাঁহার হৃদয় যেমন কাঁদিয়া উঠিত এমন কাহারও হইত না। সুরপুরের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কত অনাথা, কত নিঃসহায় দীন দুঃখী যে তাঁহার করুণা-বারি-সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তিনি ধনী ছিলেন না,—অথচ অর্থের অভাবে কখনও পরোপকারের ব্যাঘাত ঘটিত না, কি জানি কোথা হইতে অর্থ জুটিয়া যাইত। আজ কাহারো খাইবার নাই, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত,—আশা আছে—বিশ্বাস আছে সেখানে গেলে মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার সস্নেহ কোমল ব্যবহারে শোকার্ত্ত শোক ভুলিত, রোগীর ম্লানমুখে হাসিরেখা প্রতিভাত হইয়া উঠিত। [illegible]পাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণীও আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন, তিনিও প্রত্যেক বি[illegible] সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যে কয়েক বিঘা ব্রহ্মো[illegible] তাহাই বৎসরের আহার চলিয়া গোলায় কিঞ্চিৎ মজুত থাকিত[illegible]ন্য মধ্যেও দুই চার পয়সা সুদ ছিল, পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চা[illegible] আসিত। তাঁহার সংস্থিতো

কোন প্রকার অশান্তি ছিলনা। সন্তান সন্ততির মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা নৃত্যকালী অমরনাথ ও যোগেনাথ অপেক্ষা প্রায় ১০ বৎসরের বড় ছিল। অমরনাথ ও যোগেনাথ যখন নিতান্ত শিশু, সে সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর সময়ে দেশ যুড়িয়া একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল,—সরল হৃদয় কৃষকগণের করুণ ক্রন্দনে ও দীন দুঃখীর আর্ত্তনাদে চারিদিকে শোকের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল,—বন্য কুসুমের মধুর সৌরভের ন্যায় তাঁহার পুণ্যময় জীবনের পুণ্য-সৌরভ কোন্ অদৃশ্য অজানিত শ্যামল বৃক্ষ-বল্লরী পরিশোভিত পল্লীগ্রামের বিজন অন্তরালে লুকাইয়া গেল, তাহা কেহ দেখিল না—তাহা কেহ জানিল না। পিতার জীবিতাবস্থায়ই নৃত্যের বিবাহ হইয়াছিল,—বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই নৃত্যের কপাল পুড়িয়াছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সময়ে জীবিত ছিলেন, বড় আদরের, বড় স্নেহের কন্যার অতি শৈশবে—কেবল মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষে—এরূপ অবস্থা হইল, ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইয়া পড়িলেন। নৃত্য পিতামাতার প্রথম সন্তান, কাজেই উভয়েরই বড় আদরের ছিল, সে যখন যে আব্দার করিত উভয়েই প্রাণপণে কন্যার তৃপ্তি সাধনের জন্য স্নেহান্ধ হৃদয়ে তাহা করিতেন,—ইহাতে নৃত্যের চরিত্র বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল,—তাহার যাহা অভিরুচি হইত সে তাহাই করিয়া বসিত—যদি তাহাতে কেহ নিষেধ বা বাধা দিত তাহা হইলে সে কোঁদল করিয়া মায়া-কান্না কাঁদিয়া সকলকে জ্বালাতন করিত ও নিজের অভীষ্ট সাধনের পন্থা করিয়া লইত।

বাল্যকালে বালক বালিকাগণকে যথোচিত শাসনে না রাখিলে পরে যে কিরূপ বিষময় ফল হইয়া দাঁড়ায় নৃত্য তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। অভাগিনী নৃত্যের কপাল পুড়িবার পর হইতে বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিরপ্রফুল্ল মুখে কেহ হাসি দেখে নাই। কন্যার ভবিষ্য-জীবনের শোচনীয় পরিণাম ভাবিতে ভাবিতেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শয্যাশায়ী হইয়া তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণীর সেবা শুশ্রূষা ও প্রতিবেশীগণের চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ করিয়া কালের করাল আহ্বানে সুরপুরের সকলকে কাঁদাইয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। অপোগণ্ড শিশু দুইটির এক মা ও ভগ্নী ভিন্ন এ জগতে আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। পিতৃহীন শিশু দু'টির ক্ষীণ কণ্ঠে 'বাবা'! 'বাবা'! রব, প্রাণ প্রিয়তমা পত্নীর

করুণ বিলাপ, কন্যার হাহাকার ও দীন দুঃখীর কাতরোক্তি আর কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—কোথায় চলিয়া গেলেন, কে জানে ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—০:০—

পূর্ব্ব কাহিনী ।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—শ্রাবণের বারিধারার পর শরতের প্রাণ বিমোহন হাসি যেমন লোকের মন মুগ্ধ করে,—তেমনি শোকার্ত্ত পরিবারের শোকান্ধকারের ভিতরে আশার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি ভবিষ্যতের একখানি শুভ্র সূর্য্যকরোজ্জ্বল আলেখ্য বুকে করিয়া পতি-বিয়োগ বিধুরা—বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণীকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দ্বিগুণ বলে উৎসাহিত করিলেন,—তিনি কত আশা, কত সুখ-স্বপ্ন বুকে করিয়া স্নেহের নীড়ে সন্তান দু'টিকে আগুলিয়া রাখিয়া শীত, জর্জ্জরিতা—ম্রিয়মাণা প্রকৃতি সতীর ন্যায় শুভ বসন্তের আশায় আশায় সহিষ্ণুতা সহকারে বিষাদের দিনগুলি কাটাইতেছিলেন । মানব এমনি আশামুগ্ধ !

কন্যা নৃত্যকালী বিধবা হইবার পরে একবার শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কাহারও সঙ্গেই ঐক্যতা না হওয়ায় পুনরায় পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া সেখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন এবং পাড়ায় প্রখ্যাতনামা ঝগড়াটিয়া রমণীগণকে সম্মুখ সমরে প্রকৃত বীরের ন্যায় পরাজিত করিয়া—অটুট গর্ব্বে স্বয়ং শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।

মধ্যে একবার তাহার দেবর তাহাকে নিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে সে বেচারী ভ্রাতৃজায়ার বিকট ভ্রূকুটি-ভঙ্গী ও তীব্র বচন-বাণে বিদ্ধ হইবার ভয়ে সেই রণরঙ্গিণীর 'রণংদেহি' রব শুনিতে না শুনিতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিয়াছিল এবং দৈহিক প্রাণ লইয়া নিরাপদে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে সক্ষম হওয়ায় কালীঘাটের মা কালীকে যোড়া পাঁঠা ও সহিষ মানিয়াছিল ।

কন্যার বাক্‌চাতুর্য্যে ও বীরত্ব-হুঙ্কারে সন্ত্রস্তহৃদয়া প্রাচীনা বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী ভীতা ও সঙ্কুচিতাবস্থায় দিন কাটাইতেন ।

* * * * * * * * * *

সময় কাহারো অপেক্ষা করে না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাল-সাগরে গড়াইতে লাগিল, সে আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া অমরনাথ ও যোগনাথ যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। অমরনাথ পঞ্চ-বিংশ বর্ষীয় যুবক ও যোগনাথ দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক। অমরনাথ ও যোগনাথ উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধা জননীর ম্লান-মুখে আবার বহুদিন পরে হাস্যরেখা দেখা দিয়াছে,—তিনি সন্ধ্যার সময়ে যখন গৃহস্থিত বারেন্দায় মালা জপিতে বসিতেন,—যখন চারিদিকে ক্ষীণ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, যখন ঘনপল্লবসমাচ্ছন্ন বিটপীশ্রেণীর ঘনবিন্যস্ত পত্রাবলীর ভিতর দিয়া সন্ধ্যার ধুসর ছায়া আসিয়া চিত্রাতটস্থ তাঁহাদের ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা খানি ঘিরিয়া ফেলিত,—যখন একে একে অসংখ্য তারা আকাশে ফুটিয়া উঠিত,—যখন চিত্রার কল্ কল্ ছল্ ছল্ রবের ভিতরে বাঁশীর রাগিণীর মত করুণরাগিণী বাজিয়া উঠিত—নীড়ে নীড়ে পাখীগুলি ফিরিয়া আসিত—দূরে নদীর পর পারস্থ কৃষক-পল্লীতে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিত,—ঠিক্ সেই সময়ে সন্ধ্যার সেই শুষ্ক ম্লান সৌন্দর্য্যের মধ্যে অলক্ষ্যে বর্ষীয়সী বিধবার নয়ন-কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিত;—নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দূর অতীতের একখানি আমোদ-কোলাহল পূর্ণ উজ্জ্বল আলোক বিস্ফুরিত মধুযামিনীর মধুকাহিনীর কথা মনে পড়িত,—সেই সে দিন যে দিন তিনি পট্টবস্ত্র পরিহিতা নববধূর বেশে সাদরে অভ্যর্থিতা হইয়াছিলেন,—সে প্রাঙ্গন তেমনি আছে,—সেই বকুল গাছ দুইটিও তেমনি আছে—কিন্তু সেই শুভ উৎসবের দিন আজ কোথায়?

তারপরে একদিন যৌবনের মধুময় পুণ্যপ্রভাতে,—সেদিন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আর কি এ জীবনে তাহা ফিরিয়া পাইবেন? বাহিরে চাঁদ হাসিতেছিল,—ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কোণে বসিয়া তাঁহারা দুইজনে,—কক্ষে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে,—মুক্ত বাতায়নপথে চিত্রা-শীতল-শীকর-সিক্ত নৈশবায়ু সন্ সন্ রবে ঘরে আসিতেছিল,—সে মৃদু বিকম্পনে ঘরের বাতি দুলিতেছিল—নাচিতেছিল,—তাহাদের সুখে হরষিত হইয়া যেন হাসিতেও ছিল। দুইজনে বসিয়া কত গল্প, কত হাসি, ভবিষ্যতের কত সুখ-স্বপ্ন কল্পনা করিতেছিলেন,—শিশু দু'টি শয্যায় শুইয়াছিল, যেন রবিকিরণোদ্ভাসিত অর্দ্ধ বিকশিত কমল-কোরক। আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল,—চাঁদের মধুর কিরণ নবনাত যৌগল

ঝরিয়া পড়িল। বৃদ্ধা জননীর হৃদয়ে শেল বিঁধিল,--তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। কে জানিত বৃদ্ধার মানস স্বপ্ন এ শোক-গাথায় পরিণত হইবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দুদিনের হিমালয় ভ্রমণ।

হিমালয়-প্রবাসী বন্ধুবরের নিরতিশয় আগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে একদিন মেঘমুক্ত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল অতি গ্রীষ্মপ্রপীড়িত শারদীয় অপরাহ্নে শান্তিবিহীন, উদ্বেগকলুষিত, কর্ম্মস্রোতবিক্ষুব্ধ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দার্জিলিং মেলে গিয়া উঠিলাম। হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্রাংশে ভ্রমণ করিয়া বহুদিনের পর্ব্বতদর্শনাভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইব ভাবিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত থাকিয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল।

ট্রেণে উঠিয়া একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি দিনাজপুর যাইতেছিলেন। বেশ হইল; ভাবিলাম, রেলপথের অবিশ্রাম তুমুল বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে নিদ্রাহীন রজনীটি অতিবাহিত করিতে আর ততখানি কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

মেল ছুটিল। জানালা দিয়া ক্রমাগত অনতিশীতল বাতাসের ঝাপটা, এঞ্জিনোৎক্ষিপ্ত অঙ্গার কণাগুলি বহিয়া আনিয়া আমাদের ঘর্ম্মের সহিত, উন্মীলিত নয়নে বাহ্যপ্রকৃতি-সৌন্দর্য্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষা অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরা দুই বন্ধুতে বসিয়া জীবনের নানাবিধ সুখদুঃখের কথার উপর দার্শনিক তর্কের অবতারণা করিয়া কোন ক্রমে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা হইল। আকাশ নির্ম্মল নীল; শুভ্র জ্যোৎস্না দিগন্ত ব্যাপিয়া শুধু বিমল হাস্য বিতরণ করিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে আমরা প্রকৃতির সেই অনন্ত শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। সুখ-শীতল নৈশ সমীরণ মধুর স্পর্শে আমাদের দেহ স্নিগ্ধ ও চিত্ত প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। গভীর শুক্লরাত্রে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সুপ্ত প্রকৃতিকে সচকিত করিয়া মেল ট্রেণ অবিরাম গতিতে সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া চলিল।

প্রহরেক রাত্রির পর আমরা দামুকদিয়া ঘাটে পৌঁছিলাম। এই স্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সমস্ত রাত্রিটির জন্য উদরাগ্নি প্রশান্ত করিয়া লইয়া, পদ্মা অতিক্রম করিবার জন্য তীরস্থ সুবৃহৎ Crocodile ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ষ্টীমার ছাড়িল। চন্দ্ররশ্মি প্রতিভাত সুবিশাল পদ্মাবক্ষের কম্পিত উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য বিদীর্ণ করিয়া ষ্টীমারখানি সগৌরবে পরপারে গিয়া উত্তীর্ণ হইল। আমরা ষ্টীমার ছাড়িয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিলাম।

এ অঞ্চলের ট্রেণগুলির আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। "প্রত্যেক বেঞ্চে ৪ জন মাত্র বসিবেক।" তাহার উপর সমগ্র ট্রেণটিতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি মাত্র একখানি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি গণিয়া দেখি নাই কতগুলি, কিন্তু তাহার অধিকারী সাহেবগণ, এবং সাহেবচ্ছবিধারী দেশীয় নেটীভ দুই একজন, বেশ প্রলম্বিত কলেবরে শয়নাদি সহকারে গৃহাধিক সুখে চলৎ-প্রবাস-রাত্রি যাপন করিলেন। মরণ যত এই হতভাগ্য নিরুপায় দরিদ্র দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা-আঘাত-অপঘাত-সহ নিগার বাঙ্গালী যাত্রিগণের ;—তাহা-দিগের বসিয়া বসিয়া রাত্রিটুকু কাটাইবারও স্থানাভাব। হায় ভাগ্য!

যাহা হউক, কিয়ৎকাল "নেটিভ নিগার" দিগের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা গভীর দুঃখের সহিত যৎকিঞ্চিৎ বিফল আলোচনা করিয়া, আমরা কোন ক্রমে বসিয়া বসিয়াই নিদ্রার আয়োজন করিয়া লইলাম। এইরূপে কখনো একটু ঘুমাইয়া, কখনো গল্প করিয়া কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে আমরা বহু ষ্টেশন ছাড়াইয়া প্রায় শেষ রাত্রে পার্ব্বতীপুর পৌঁছিলাম। আমার বন্ধুটি এইস্থানে নামিয়া গেলেন। আমাদের কামরা হইতে একজনকে নামিতে দেখিয়া, এবং দরজা খোলা পাইয়া হুড়্ হুড়্ শব্দে কতকগুলি যাত্রি এক নিঃশ্বাসে আমাদের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল! বেগতিক দেখিয়া আমি স্থান সুলভ অন্য একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া উঠিলাম। তথায় একটি মাত্র ভদ্রলোক, একখানি বেঞ্চ জুড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, উঠিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। শুনিলাম, তিনি দার্জ্জিলিং যাইবেন। ভাবিলাম, তবু ভাল ; অনেকটা পথ ইঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে সচ্ছন্দে যাওয়া যাইবে।

ভদ্রলোকটির সহিত অনেক গল্প হইল। আমি পাহাড় কখনো দেখি-নাই, এই প্রথম পাহাড় দেখিবার জন্য হিমাচলে চলিয়াছি, শুনিয়া তিনি-

পাহাড়ের গল্প তুলিলেন। কহিলেন, "আমি দার্জ্জিলিংএ আর কখনো যাই নাই বটে, কিন্তু সিমলা মিসৌরী প্রভৃতি স্থানে বহুবার গিয়াছি। সে সকল স্থান যে দার্জ্জিলিং অপেক্ষাও অধিক সুন্দর; তাহার কোন সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, দার্জ্জিলিং অঞ্চলে বৃষ্টিটা বড় বেশী হয়; কিন্তু ওদিকে বৃষ্টি খুব কম। আকাশ প্রায়ই পরিষ্কার থাকে, সুতরাং দার্জ্জিলিং অপেক্ষা পশ্চিম অঞ্চলের পাহাড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা যায়।" এইরূপ নানা কথায় তিনি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

যখন জলপাইগুড়িতে গিয়া মেল থামিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পথে রাত্রে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল। মেঘরাশির গলিতাবশেষে তখনো আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল। জলপাইগুড়িতে খিদ্‌মতগারগণ সাহেব প্রভুগণের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া চা পানাদি দ্বারা সুস্থ করিয়া দিয়া গেল।

জলপাইগুড়ি ছাড়িয়া মেল আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। এইবার সমতল ভূমির প্রায় শেষ সীমা শিলিগুড়ি ষ্টেশনে গিয়া মেল থামিবে। হিমাচলের অভ্রভেদী শৃঙ্গরাজি ত আর অধিক দূরে নাই; কিন্তু কই, সে উচ্চতার চিহ্ন মাত্রও ত এখনো লক্ষিত হইতেছে না! চতুর্দ্দিকে কেবলি সমতলভূমি; শস্য-শ্যামল, বর্ষাপ্লাবিত, সুশীতল-প্রভাত-সমীরণ-কম্পিত নয়নাভিরাম প্রাণা-রাম মোহন সৌন্দর্য্য। কই, পাহাড় কই?

ইতিমধ্যে আবার মেঘ উঠিল। ভাবিলাম, এ দুর্য্যোগে পথ কষ্টের আর সীমা থাকিবে না। কি কুক্ষণেই হিমালয়দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম! এখ-নই ষ্টেশনে নামিতে হইবে; অপরিচিত স্থান, কোথায় যাইব? শেষে কি পথে দাঁড়াইয়া অনাহারে সমস্ত দিন ভিজিতে হইবে?

তৎক্ষণাৎ মনে হইল, আমার হিমগিরিপ্রবাসী বন্ধুবর আমার জন্য শিলি-গুড়িতে বিশ্রামস্থানের বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন। শিলিগুড়ি হইতে ১৬ মাইল পথ আমাকে অশ্বারোহণে যাইতে হইবে। বন্ধুবরের উপর সমস্তই নির্ভর; ভয়ের আর কি কারণ আছে?

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই দার্জ্জিলিং যাত্রী বাবুটিকে কহিলাম, "মহাশয়, আজ বড়ই দুর্য্যোগ দেখিতেছি।"

বাবুটি এতক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধূমপানে মগ্ন ছিলেন। বিপরীত পথে দ্রুত ধাবমান শ্যামলা সজলা প্রকৃতির উপর শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আমার কথা শুনিয়া, হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক চুরটের ভস্ম ঝাড়িয়া কহিলেন—"এঁ্যা, কি

রকম দুর্য্যোগ, মশায় ?" আমি কহিলাম, "দেখুন না, এত মেঘ করেছে, আমাকে আবার শিলিগুড়ি থেকে অনেকটা পথ ঘোড়ায় যেতে হবে। পথে ভিজতে হবে, দেখ্‌ছি।"

"বটে, এতই মেঘ করেছে নাকি ?" বলিয়া বাবুটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সহসা ঈষৎ বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে আমার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ মেঘ নয় মশায়, ওই যে পাহাড় !"

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম ! এই কি পাহাড় ? তাই ত ! আহা, বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টি ! দূর হইতে দেখিতে কি অনন্ত অপার সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ ! অত্যন্ত গাঢ় নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। শ্যাম স্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা অপেক্ষাও গাঢ়তর নীলবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী—দিগন্ত ব্যাপিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়া, যেন পৃথিবীর পাহারায় অনন্তকাল ধরিয়া নিয়োজিত রহিয়াছে। অহো, বিধাতার কি গভীর রহস্যপূর্ণ বিচিত্রলীলাময় অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকুশলতা ! দেখিতে দেখিতে মুগ্ধপ্রাণ কি গভীর অপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে !

অননুভূতপূর্ব্ব অভিনব ভাবাবেশাভিভূত প্রাণে সুগভীর কল্পনাস্রোতে ভাসমান হইয়া অভাবনীয় স্বর্গসুখ অনুভব করিতে করিতে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কেহ আমাকে লইতে আসিয়াছে কিনা; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে সহরাভিমুখে চলিলাম। আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়াছে; এবং এক্ষণে সে অমূলক মেঘভীতিও আর নাই। তৎপরিবর্ত্তে বিস্ময়, কৌতূহল এবং আনন্দের সুধাসাগরে প্রাণ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কিয়দ্দূর যাইয়াই একটি ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনিয়া তিনি সাদরে তাঁহার গৃহে বিশ্রাম করিবার জন্য আমাকে লইয়া গেলেন; এবং কহিলেন—"আপনার বন্ধুর সহিত আমার পরিচয় আছে; তিনি নিশ্চয়ই আপনার জন্য ঘোড়া পাঠাইবেন; হয়ত কোন কারণে বিলম্ব হইতেছে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন; না হয় আমি আপনার যাইবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

ভদ্রলোকটির শিষ্টাচারে আপ্যায়িত হইয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু বেলা অধিক হইয়া গেল, তথাপি আমাকে কেহ লইতে আসিল না। আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া ভদ্রলোকটি আমার জন্য একটি গোশকট ভাড়া করিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন, অন্য কোন যান পাওয়া গেল না।

আমি বাসায় একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। নিকটেই শিলিগুড়ি Carrying Companyর একটি আড্ডা। তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে তত্রত্য একটি ভদ্রলোক আমাকে নূতন লোক দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মাত্র কহিলাম—“কালীঝোরায় আমার বন্ধু ওভারশিয়র, তাঁহারি নিকট যাইব।” শুনিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া বসাইলেন, এবং কহিলেন, “আমি আদ্য কালীঝোরা হইয়া রিয়াং যাইব। একত্রই যাওয়া যাইবে; আপনি স্নানাদি করিয়া লউন।” এই বলিয়া তিনি তৈল বস্ত্রাদি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। প্রবাসে অপরিচিত স্থানে আসিয়া এতাধিক শিষ্টাচার ও অমায়িক বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমি যেরূপ আন্তরিক আনন্দ উপভোগ করিলাম, সেরূপ জীবনে আর কখনো করি নাই! স্নান করিলাম; ভদ্রলোকটি আমাকে জলযোগ করাইলেন। পরিচয়াদি আদান প্রদানের পর অবগত হইলাম, তিনি আমারই স্বদেশীয়। দূরদেশে আসিয়া একজন স্বদেশীয় অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অকস্মাৎ পরিচয়—শুধু পরিচয় নহে, এত ঘনিষ্টতা, যে কতদূর প্রীতি-প্রদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

ইতিমধ্যে পূর্ব্ব-কথিত ভদ্রলোকটি আমার জন্য গো-যানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমার স্বদেশীয় সেই বাবুটি কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বারোহণে যাত্রা করিবেন, বলিলেন।

মৃদু মন্থর গজেন্দ্রগমনে আমার গো-শকটখানি হিমালয়াভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দূর হইতে হিমালয়ের নয়নাভিরাম গম্ভীর গাঢ় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে চলিলাম। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই গো-যানের উৎকট মোলায়েমত্বের আতিশয্যে আমি বিষম বিব্রত হইয়া উঠিলাম। গর্ব্বি শরীরের অবিশ্রাম ভীষণ উত্থান পতনে আমার দেহের কঙ্কালসন্ধি সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কি করি, উপায় হীন হইয়া ত্রিপলাচ্ছাদিত রাশীকৃত বিচালীর উপর শ্রান্ত দেহখানি প্রসারিত করিয়া গো-যানলাঞ্ছনার কিঞ্চিৎ উপশম অনুভব করিলাম।

ধীরে ধীরে অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়াছি, এমন সময়ে আমার সেই স্বদেশীয় বাবুটি দ্বিপ্রহরের নীরব প্রান্তর অশ্বক্ষুর-ধ্বনি-মুখরিত করিতে করিতে

আসিয়া আমার গো-রথ খানি ধরিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহাকে আমার রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে অনুরোধ করিলাম, এবং আমার নিকট কতকগুলি ভাল ভাল বই আছে বলিয়া লোভ দেখাইলাম, সুতরাং তিনি অশ্ব ছাড়িয়া রথে উঠিলেন, এবং গাড়ির পশ্চাতে অশ্ববল্গা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। আমি আমার বইগুলি বাহির করিয়া, উভয়ে পরমানন্দে সাহিত্য-রসাস্বাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগকে এই অপূর্ব্ব রথারোহণসুখ অধিকক্ষণ উপভোগ করিতে হইল না। দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়াছি, এমন সময়ে একটি পাহাড়ী বালক অশ্বারোহণে শিলিগুড়ি অভিমুখে যাইতেছে দেখা গেল। আমার সহযাত্রিটি দুর্ব্বোধ পাহাড়ী ভাষায় কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন, আমি নির্ব্বাক্ হইয়া উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে তিনি আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, সংযোটক এই "কেটা" (ব্যক্তি) আমার জন্য আমার বন্ধু কর্ত্তৃক প্রাতেই প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু আমাকে না পাইয়াই বুদ্ধিমান তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়াছিল! এক্ষণে আমার বন্ধুর নিকট তাড়না ভোজন করিয়া পুনরায় আমাকে আনিতে চলিয়াছে। ভাগ্যে সেই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে ছিলেন, নহিলে লোকটা এবারও আমার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছিল আর কি!

যাহা হউক, রক্ষা পাওয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে রথত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আশ্রয় লইলাম। ওঃ, এতক্ষণ শরীরটার উপর দিয়া কি তুমুল ঝঞ্ঝাই না বহিয়া যাইতেছিল!—এক্ষণে কি মুক্তি! এতক্ষণ গো-যানের সেই ক্ষুদ্র অন্ধ-কূপের মধ্যে বসিয়া দীর্ঘ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে করিতে "যাব-কি যাবনা" ভাবে অগ্রসর হইতেছিলাম, আর এক্ষণে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া, সুশ্যামল সুশীতল হিমাচলচূড়া-প্রবাহিত স্নিগ্ধ সমিরণ সেবন করিতে করিতে কখনো দ্রুতগতি অশ্বপদশব্দে দিক্ মুখরিত করিয়া চলিলাম।

পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, সজল, শ্যামল। কৃষকগণ কেহ তৃণগুচ্ছ সমূহ উৎপাটিত করিয়া শস্য ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতেছে, কেহ মৎস্য ধরিতেছে, কেহ গোমহিষ চরাইতেছে। ইহাদিগের পুরুষেরা সকলেই এক প্রকার উলঙ্গ। বস্ত্র-ব্যবহারের বালাই ইহাদিগের ভিতর নাই বলিলেও হয়। স্ত্রীলোকেরা বক্ষস্থলে মাত্র একখানি ক্ষুদ্রবস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে, তাহাতে কষ্টে-সৃষ্টে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত আবরিত হয়। ইহাদিগের ভাষা যেমন দুর্ব্বোধ

নহে। আমার গো-রথ চালকটিও এই জাতীয় ছিল, কিন্তু তাহাকে একটু খানি সভ্যতা-প্রপীড়িত দেখিলাম। ইহারা আর সে সভ্যতা-জঞ্জালের নিকট দিয়াও ঘেঁসে না। আমার সহযাত্রী বন্ধুটি ইহাদিগকে "বাহে" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলাপ করিতে করিতে চলিলেন। "কোন্ মাচটা পাইলেন বাহে"— ইত্যাদি বাহে-ভাষায় দুই একটি সহজ প্রশ্ন আমার এখনো মনে আছে।

হিমালয়ের উচ্চভূমি এখনো ৪ ক্রোশ দূরে। আমরা এতক্ষণ মুক্তাকাশ তলে দ্বিপ্রহর রৌদ্রের প্রদীপ্ত কিরণ মাথায় করিয়া ঘর্ম্মাপ্লুত কলেবরে পথ অতিবাহিত করিতে ছিলাম। এক্ষণে এক অতি বিস্তৃত গভীর শালবনে প্রবেশ করিয়া সুশীতল স্নিগ্ধচ্ছায়া প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য; পাহাড়ীরা কেহ বর্ষাসঞ্চিতবারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে বা ডোবাতে মৎস্য ধরিতেছে, কেহ একপাল পার্ব্বত্য গোমহিষ চরাইতেছে পালের প্রধান (গোদা) টির গলায় এক বৃহৎ ঘণ্টা থাকিয়া থাকিয়া গভীর শব্দে নিস্তব্ধ বনভূমি সচকিত করিয়া তুলিতেছে। এই সকল পাহাড়ীরা পূর্ব্ব-বর্ণিত বাহেদিগের অপেক্ষা বস্ত্রপরিধান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক সভ্য। ইহারা উষ্ণীষ পর্য্যন্ত ব্যবহার করে। প্রত্যেকের কটিদেশে এক একখানি বিকটাকার কোষবদ্ধ ছোরা রহিয়াছে। ইহাদের ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। বাহেরা ইহাদের প্রতিবেশী, কিন্তু উভয় জাতির ভাষার দারুণ পার্থক্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমার সহযাত্রিটি ইহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। অবশ্য তাঁহাকে ইহাদের ভাষা অনুবাদ করিয়া আমাকে বুঝাইতে হইতেছিল।

এইরূপে কখনো ধীরে কখনো দ্রুত চলিতে চলিতে বনান্তরাল হইতে দূরাস্থিত পর্ব্বতমালার ঈষৎ ছায়া দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ৪টার সময়ে ৬ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া "শিভোক" নামক এক পার্ব্বত্য পল্লীর প্রান্তভাগে আসিয়া উপনীত হইলাম। এইস্থানে কুলীদিগের জন্য একটি সরকারী ডাক্তারখানা আছে, একজন পশ্চিমদেশবাসী ডাক্তারও আছেন। আমরা ডাক্তার বাবুর বাসায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আমার পর্ব্বতপ্রবাসী বন্ধুটি এই স্থানে অনেকক্ষণ আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, শুনিলাম; এবং বিলম্ব দেখিয়া একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যোদ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

শিভোক প্রধানতঃ কুলীদিগেরই পল্লী। ইহারা Government কর্ত্তৃক

Teesta Valley Road প্রভৃতি রাস্তা সতত সর্ব্বদা সুসংস্কৃত রাখিবার জন্য নিয়োজিত। এখানে একটি বাজার আছে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা পথে বাহির হইলাম। এই স্থান হইতে Teesta Valley Road ধরিয়া এখনো ২ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। তিস্রোতা বা তীস্তা নদীর উপকূল দিয়া এই পথটি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার নাম Teesta Valley Road তিস্রোতার মূর্ত্তি এই স্থানে অতি ভীষণ। নদী যে খুব বৃহৎ, তাহা নহে; কিন্তু স্রোতের বেগ এমনি প্রচণ্ড যে, তৃণগাছ পড়িলেও তাহা পলক মধ্যে শতধা খণ্ডিত হইয়া যায়। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-চূড়া হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে নিম্নভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তিস্রোতার এই অংশের স্রোত অত ভয়ানক। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে আঘাতের উপর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জলস্রোত ভীষণ গর্জ্জনে কর্ণ বধির করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই স্থান হইতে আমাদিগকে ক্রমশ উচ্চভূমিতে উঠিতে হইতেছিল, কিন্তু সে উচ্চতা অতি সামান্য, এবং এত দূর-বিস্তৃত যে, চলিবার সময়ে কিছুই অনুভব করা যায় না। আমাদের দক্ষিণে করাল গর্জ্জনে বন পর্ব্বত কাঁপাইয়া ফেন-শুভ্র-শীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে তিস্রোতা বাহিয়া চলিয়াছে, বামে পথি-পার্শ্বে এবং নদীর পরপারে সহস্রবিধ উদ্ভিদ সঙ্কুল প্রায়ান্ধকার ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন অনতি উচ্চ গিরিশ্রেণী গাঢ়নীল মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এহেন ভয়াবহ স্থানের মধ্য দিয়া আমাদের পার্ব্বত্যঅশ্বগুলি অভ্যস্ত পদ-বিক্ষেপে অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আমার সেই হিমগিরি প্রবাসী বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ হইল; কার্য্যশেষে তিনি গৃহে প্রত্যা-গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। আলিঙ্গন-সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নাদির পর আমরা অগ্রসর হইলাম। অশ্বচতুষ্টয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। বলিতে ভুলিয়াছি, শিলোক হইতে সব্-ওভারশিয়র বাবু আমাদের সঙ্গেই আসিতেছিলেন।

ক্রমশঃ

ইমদাদুল হক।

অন্তলার দুর্গাধিকার।

(ঐতিহাসিক-গাথা।)

সাজিলেন জাহাঙ্গির (১)   সমরে তৃতীয় বার,
পাইলেন এ সংবাদ   মহারাণা মিবারার,
আহ্বানি' সামন্ত দলে   আহ্বানি' সর্দ্দারগণে,
আপনি অমর সিংহ (২)   সাজিতে লাগিলা রণে।
বাজিল সমর-ডঙ্কা   নাদিল জিঘাংসা ফণি,
কাঁপিল বসুধা-বক্ষ   পরমাদ মনে গণি,
বহিল উন্মত্ত রক্ত   বীরের হৃদয়ে বেগে,
করিতে চিতোর (৩) রক্ষা   নৃপেন্দ্র (৪) উঠিল জেগে!
এ সময় একি হায়?   একি হায় পরমাদ?—
চন্দ্রাবৎ (৫) শক্তাবতে (৬)   আবর্ত্তিল বিসম্বাদ!
দুই দল অতি শ্রেষ্ঠ   সর্দ্দারের শিরোমণি,
"হিরোল" (৭) করিতে রক্ষা   এবে দোঁহে হানাহানি;
এতকাল চন্দাবৎ   আপনার ভুজবলে,
"হিরোল" করিত রক্ষা   প্রতিরণে কুতূহলে,
প্রকাশি' আপন বীর্য্য   এবে চাহে শক্তাবৎ,
সে মহা সম্মান তাঁর   করিবারে আত্মসাৎ!
মহা সঙ্কটেতে রাণা   পড়িলেন এইবার,
"হিরোল" প্রদানি কারে   রাখিবেন মান কার?
সম্মুখ- সমর মাঝে   দোঁহার সাহায্য বিনে,
না হ'বে চিতোর রক্ষা   —রাণা ভাবিলেন মনে—
সুমীমাংসা নাহি হ'ল   বহু চিন্তা নৃপেশের,—
সুমীমাংসা নাহি হ'ল   বহু তর্কে মন্ত্রীদের,

---

(১) দিল্লী সম্রাট। (২) মিবারের মহারাণা। (৩) মিবারের রাজধানী। (৪) 'রাণা অমর সিংহ। (৫) ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ চণ্ডের বংশোদ্ভব গোত্র। (৬) মহাবীর শক্ত সিংহের বংশোদ্ভব গোত্র। (৭) সৈন্যের সম্মুখ ভাগ রক্ষার নাম "হিরোল"।

তাঁহারে নীরব হেরি মুক্ত করি তরবার,
মীমাংসা করিতে কেহ চাহে এই সমস্যার।
উচ্চৈঃস্বরে এ সময় —সদুপায় করি স্থির—
কহিলেন মহারাণা "শোন কেহ মহাবীর!
প্রবেশিবে অগ্রে যেবা অগ্নি-দুর্গ অন্তলার
অর্পিলাম তাঁর করে 'হিরোল' রক্ষার ভার।"
রাজধানী হ'তে পূর্ব্বে ন'ক্রোশে অন্তলাগড়
সংরচিত সমুন্নত কোন ভূমি শীর্ষ'পর
পাষাণ প্রাচীর তার চারিদিকে অতি উচ্চ
দাঁড়ায়ে সগর্ব্বে করি শত্রুর আক্রম তুচ্ছ।
তদুপরি মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড রক্ষকাগার;—
প্রক্ষালি' প্রাকার পদ বহে নদী অনিবার
দুর্গপতি-কক্ষরাজে মধ্যস্থলে অন্তলার,
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কেবল একটি দ্বার।
বিবাদী সামন্তদ্বয় সকল বিবাদ ত্যজি'
ধাইলেন মুহূর্ত্তেকে সসৈন্যে আরোহী বাজি!
এতদিন ছিলা যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রমের,
সামন্ত প্রধানতম যাঁরা হন মিবারের;—
যশোলিপ্সা প্রণোদিত হ'য়ে তাঁরা পরস্পর,
দেখাইতে সে বিক্রম ধাইলেন দ্রুততর!
অধিকৃত মোগলের রয়েছে অন্তলাগড়,
পশ্চাতে রণে তাঁ'দেরে যে বীরবর,
গৌরবের হেম-চূড়া শোভিবে তাঁহারি শিরে
'হিরোল' রক্ষার ভার রহিবে তাঁহারি করে,
এ জিগীষা এ উৎসাহ প্রচণ্ড প্রবল বেগে,
মিবারের পণ্য এক বাড়া'তে দ্বিগুণ রাগে
ভট্টকবি শুভগীতি গাইলা উদাত্ত স্বরে,
তা'রি সনে নারী-কণ্ঠ মিলিল আবেগ ভরে
উদিত তরুণ রবি রক্তাভ কিরণ রাশি,
গিরি শিরে তরু শিরে খেলিছে আঁধার নাশি'

সুখস্বরে উঠিতেছে   বিহগের কলস্বর,
স্নিগ্ধ বায়ু ধীরে ধীরে   বহিতেছে মধুতর!
এ সময় শক্তাবৎ   অম্বলা দুর্গের দ্বার,
অগ্রসরি ভীম বলে   আক্রমিলা দুর্নিবার;
বুঝিয়ে মোগলগণ   তাঁহাদের অভিপ্রায়,
সুসজ্জ প্রাচীরশীর্ষে   দাঁড়াইলা জিঘাংসায়
আরম্ভিল ঘোর রণ!   এ দিকেতে চন্দাবৎ
ঘোর জলা মাঝে পড়ি'   হারাইয়ে দুর্গ-পথ
বহুকষ্টে উত্তরিলা   —মেষ পালকের সঙ্গে (৮)
অম্বলা দুর্গের দ্বারে   ভীমনাদে কতক্ষণে
প্রাকারে সোপান রাখি'   বীর চন্দাবৎগণ,
চেষ্টিলেন দুর্গপরে   করিবারে আরোহণ।
আরোহিতে চাহিলেন   অগ্রে চন্দাবৎ পতি
পশ্চাতে সেনানীবৃন্দ   আসিতেছে ভীমগতি
—হায়রে তাঁহার ভালে   'হিরোল' চালন তার
নাহি বুঝি—নহে বুঝি   সেই ইচ্ছা বিধাতার!
মোগল-নিক্ষিপ্ত তাই   দারুণ গোলকাঘাতে
বিচেতন ভূমিতলে   পড়িলা সোপান হ'তে!
গর্জিল মোগলগণ   করি মহা আস্ফালন,
উঠিল সে ঘোর নাদ   করি অভ্র বিদারণ!
শক্তাবৎ-পতি হেথা   আরোহি' মাতঙ্গ 'পর'
ক্ষিপ্রবেগে দ্বারপানে   হইলেন অগ্রসর,
দারুণ অঙ্কুশাঘাতে   করিয়ে বৃংহননাদ,
ভীমবলে করীবর   করিলা দুয়ারে ঘাত!
তীক্ষ্ণ লৌহাঙ্কুশ রাজি   ছিল তথা সমুদ্যত,
মাতঙ্গের ভীম শক্তি   হোল তাই প্রতিহত!
কাতারে কাতারে সৈন্য   করি মহা ঘোর রণ,
প্রতিপলে উভপক্ষে   দিল মৃত্যু আলিঙ্গন;
ক্রমশঃ ভীষণ রণ   ভীষণ ভীষণতর,—

(৮) মেষপালক তাঁহাদের পথ প্রদর্শক।

তবু নহে ক্ষণ তরে নিরুৎসাহ পরস্পর।
বিদারিয়ে নভোদেশ এ সময়ে অকস্মাৎ
উঠিল বিজয়-ধ্বনি পক্ষ হ'তে চন্দাবৎ।
স্তম্ভিত মোগল সৈন্য! কাঁপিল সঘনে নদী!
প্রতিদ্বন্দী সর্দ্দারের কাঁপিল সহসা হৃদি॥
শক্তাবৎপতি আর না হেরি উপায়ান্তর,
অবতরি' করী হ'তে আরোহি' তুয়ার 'পর
কহিলা হস্তিপ প্রতি বিকট উন্মত্ত স্বরে
তাঁহারে বিরুদ্ধে গজ আনিতে তাড়না করে
নতুবা সে বীরসিংহ শাণিত অসির ঘায়,
নিমিষেতে পাঠাবেন শমন ভবনে তায়!
দারুণ অঙ্কুশাঘাতে ছুটে এসে করিবর,
আঘাতিল রুদ্ধ দ্বারে বজ্রবলে দৃঢ়তর।
চূর্ণ হ'ল দুর্গ-দ্বার মাতঙ্গের রুদ্র বলে,
তা'রি সঙ্গে শক্তাবৎ পড়িলেন ভূমিতলে!
হত প্রাণ দলপতি বিলুণ্ঠিত বীর-বপু;
লক্ষ্যহীন সৈন্য তাঁর চারিদিকে ঘোর রিপু,
হৃদয় স্তম্ভনকারী ঘোর সিংহনাদ করি
দলিয়ে তাঁহার দেহ উন্মুক্ত কৃপাণ ধরি—
বিনাশি' মোগলসৈন্য প্রবেশিল দুর্গ-পরে
প্রবাহিল রক্ত-নদী খরবেগে খরস্রোতে।
বিফল সকল চেষ্টা! বৃথা শক্তাবৎ-প্রাণ
আসিলেন দুর্গ-দ্বারে রক্ষিতে স্বদল-মান!
প্রবেশিতে তাঁরা অগ্রে চন্দাবৎপতি-দেহ
উন্নত দুর্গের শীর্ষে নিক্ষেপিয়া দিল কেহ।
তিনিও যে বীরশ্রেষ্ঠ চন্দাবৎ অগ্রতম,
'বান্দাঠাকুর' নাম সিংহ হেন পরাক্রম
প্রয়োজন হ'লে যিনি প্রচণ্ড শার্দ্দূল সনে,
রিক্তহস্তে মল্লযুদ্ধ প্রদানেন ফুল্ল মনে!
চন্দাবৎ সর্দ্দারের শবদেহ যবে হায়

সমুচ্চ সোপান হ'তে   ভূমিতলে পড়ে যায়
তেজস্বী বাপ্পাঠাকুর   তখন উত্তরী দিয়ে,
বাঁধি তাহা পৃষ্ঠে দৃঢ়   মহাভল্ল উত্তলিয়ে
দুর্গ-প্রাকারের 'পর   আরোহিয়ে রুদ্র বলে
বিনাশি' মোগল-সৈন্য   ভল্লাঘাতে দলে দলে
সর্দ্দারের মৃত-দেহ   নিক্ষেপিয়া দুর্গ-শিরে
'হিরোল' 'হিরোল' বলি'   চীৎকারিলা উচ্চৈঃস্বরে।
"হিরোল রক্ষার ভার   চন্দাবৎ বীরগণ
পাইলেন আর কেন   শক্তাবৎ কর রণ?"—
সে মহান জয়-ধ্বনি   অন্তলার তুঙ্গে তুঙ্গে
প্রতিধ্বনি করি ঊর্দ্ধে   মিশিল অনন্ত সঙ্গে
সমগ্র প্রকৃতি কাঁপি'   উঠিল আতঙ্ক ভরে
ইতিবৃত্ত-বক্ষে তাহা   ক্ষোদিল জ্বলদক্ষরে!
এই মহা জয়-নাদ   ইতিপূর্ব্বে অকস্মাৎ
স্তম্ভিত হইয়াছিল   শুনি শক্তাবৎ নাথ।
বাপ্পাঠাকুরের সেই   সুপ্রচণ্ড বাহু বলে,
অসংখ্য মোগলসেনা   নিপতিল ভূমিতলে।
কেহ বা জীবন ল'য়ে   পলাইল অতি দূরে,
মিবারের জয়-ধ্বজা   অচিরে অন্তলা-চূড়ে
উড়িল গৌরবে মহা   পবন হিল্লোলে ধীরে
শক্তাবৎ ম্লান মুখে   চলিলা মিবারে ফিরে
অক্ষুণ্ণ বীর্য্যের বলে   'হিরোল' রক্ষার ভার
চন্দাবৎ বীর করে   দীপ্ত হোল পুনর্ব্বার
বহুশত রাজপুত   মোগল ও বহুশত,
এই মহা সংঘর্ষণে   হোল চীর-নিদ্রা গত।
'হিরোল' রক্ষার তরে   যে দুইটি মহাপ্রাণ,
অন্তলা দুর্গের দ্বারে   দিলা আত্ম বলিদান,
অপূর্ব্ব সে জয়-গাথা   মিশাইয়ে সুর তান,
রাজপুত-বালাগণ   গেয়ে থাকে আজো গান।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিমলা।

১

বিমলার সঙ্গে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ, সে ত আজ দশ বছরের কথা। প্রথম যৌবনের সুখদুঃখের কাহিনী এখন কর্ম্মের কোলাহলে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। না, না, ভুল বলিলাম; সুখের তরঙ্গ গুলির মৃদু কম্পন এখনও হৃদয়ে বিশেষ ভাবে অনুভব করি।

আমি বিমলাকে ভালবাসিতাম, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম। কলিকাতায় তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। তখন সে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, অবিবাহিতা। তাহারা আর আমরা পাশাপাশি বাড়ীতেই বাস করিতাম। বাবা ডিপুটী ছিলেন, পেন্সন নিয়া কলিকাতাতেই থাকিতেন। আমি সেবার কলিকাতা মাদ্রাসায় এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম। ষোল বছরের যুবক আমি, প্রেমের বড় ধার ধারিতাম না। প্রেমের কল্পনা তখন পাঠ্যপুস্তকের তাড়া খাইয়া আত্মগোপন করিত। কেবল পড়া নিয়াই থাকিতাম; সকলে বলিতেন, মহুর এবার General scholar হইবে। আত্মপ্রশংসা শ্রবণে আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও শ্রমশীলতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইত, আমি আরও বেশী করিয়া খাটিতাম। কিন্তু এই সময়ে আমার ছোট বোন রাবিয়ার সহিত বিমলা সই সম্বন্ধ পাতাইল। বিমলা আর রাবিয়া সমবয়সী।

২

সকল দিন সমান যায় না। আমার পড়ার নেশা একটু কমিয়া আসিল। হৃদয়ের মাঝে কি জানি কি অনুভব করিলাম। কাহার কোমল, বীণার মত মধুর স্বর, কাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলপ্রদেশলক্ষ্যকারী চাহনীর জন্য যেন আমি একটু ব্যস্ত হইলাম। কি যেন আমি চাই, কি যেন আমি পাই না। কাহাকে কাছে পাইলে যেন প্রাণ শীতল হয়। কৈ সে? একদিন হৃদয়ের দিকে চাহিলাম। সেখানে একখানা বহুমূল্য সিংহাসন পাতা ছিল। দেখিলাম আমার অলক্ষিতে বিমলা সগৌরবে সেই সিংহাসনে রাণীর মত বসিয়া আছে। সেদিন নিজকে বুঝিতে পারিলাম। এমনি করিয়া বুঝি সিঁদেল চোরের মত মদন তাহার ফুলধনুটি বক্র করিয়া নবীন যুবকের হৃদয়ে প্রণয়ের প্রথম তীর নিক্ষেপ করে। ইহাই কি কবিবর্ণিত প্রেমের জাগরণ?

বিমলা কিছু লাজুক; প্রথম কয়দিন সে আমার কাছে বড় ঘেঁসিত না। তারপর একদিন রাবিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। সেই দিন হইতে দুইটি বছর কি সুখেই না গিয়াছিল। একটু একটু করিয়া নবীন বসন্তের ফুল-কলির মত যখন সে ফুটিতেছিল, শৈশব আর যৌবন দুয়ে মিলিয়া যখন তাহার কমকুসুমের মত দেহখানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার সহিত আমার পরিচয়। ইচ্ছা হইলে তোমরা প্রণয়ও বলিতে পার, কারণ আমি বিমলাকে ভালবাসিতাম। না, না, এখনও বাসি। যদি তোমরা বিশ্বাস কর, আমাদের ভালবাসায় কলুষতা ছিল না। আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের আদান প্রদান করিতাম। বাহিরে কেহ কি তাহা লক্ষ্য করিত? বুঝি করিত, সে আমার বোন্ রাবিয়া।

৩

একদিন স্কুল-ছুটির পর বাড়ী আসিয়া নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিতেই দেখি, বিমলা ব্রাস্ দিয়া আমার কাপড় চোপড় গুলি যত্নের সহিত পরিষ্কার করিতেছে আর যেখানে যেটি রাখিলে ঠিকমত রাখা হয়, সেখানেই সেইটি রাখিতেছে। টেবিলের দিকে চাহিয়া দেখি, আমার চারিদিকে ছড়ান বই গুলি সব শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত হইয়া আছে। বুঝিলাম এসব বিমলারই কাজ। আমি নিঃশব্দে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই কিশোরীকে অনিমিষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। বুঝি যুগযুগান্ত দেখিলেও সে দেখার তৃপ্তি হইত না! কিন্তু এমনি সময়ে অসাবধানতা বশতঃ আমার হাতের একখানা বহি মেঝেতে পড়িয়া গেল। বহির পতন শব্দেই চকিতা ত্রস্তা হরিণীর মত বিমলা সেদিকে চাহিল। চারিচক্ষুর মিলন হইল। সে মিলন কি মধুর! লজ্জায় তাহার গণ্ড লাল হইয়া গেল! সে যেন এতটুকু হইয়া গেল। হায়, সে ত আজ ধরা পড়িল। যে প্রেম গোপনচারী ছিল, আজ যে তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। বিমলা ভাবিল, "ছি, ছি, কেন আজ এখানে আসিলাম? ছাই মন বাঁধিতে পারিলে ত আজ এ লজ্জা পাইতাম না।

রাবিয়া দূর হইতে হয়ত এসব দেখিতেছিল, সে তখন তাহার সইয়ের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিল। বিমলা যেন আকাশ হইতে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, অকূলে কূল পাইল। তাহার সেই লজ্জারুণ দীপ্ত কোমলকান্ত মুখখানি বহুদিন আমার মনে থাকিবে। না, না, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না,—সে মুখ ভুলিবার নহে।

৪

এতদিন বিমলা ও আমার মাঝখানে লাজের একটা ভ্রূণ পর্দা পড়া ছিল। ধীরে ধীরে তাহা উঠিয়া গেল। দুইজনই দুইজনকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম, চিনিলাম, বুঝিলাম।

হায় সমাজবন্ধন। তুমি যদি তোমার কঠোর বাহুবেষ্টন করিয়া বিমলা ও আমার পরিণয়ে বাধা না দিতে, আজ আমাদের জীবন, অন্ততঃ আমার জীবন, কত সুখের হইত!

বিমলা, বিমলা! যেমনি নাম, তেমনি স্বভাব। তার তুলনা আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না জানিনা। সম্ভবতঃ সে তুলনারহিত।

একদিন আমি অতি সাহসে ভর করিয়া তাহার কাছে আমার প্রণয়ের কথা পাড়িলাম। সে অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিল। তারপর ধীরে বীণা বিনিন্দিতস্বরে বলিল, "আমার দেবতা, তোমাকে আমি কি বলিব? জীবনে কখনও আমাদের স্বপ্ন সফল হইবে না। তবু তুমি আমার সমস্ত হৃদয়ের অধীশ্বর। তোমাকেই প্রথমে ভালবাসিয়াছি, সারাজীবন তোমাকেই হৃদয়ের অন্তস্তলে গোপনে ভালবাসিব। বিধাতা একদিন আমাদের এ প্রণয়ের পুরস্কার দিবেন, সেই স্বর্গরাজ্যে তুমি আমারই হইবে। সেখানে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ নাই। জগতের চক্ষে, সমাজের চক্ষে হয়ত তুমি আমাকে হীন করিতে চাহ না।" তাহার কথা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, বিমলার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই করিব।

৫

আমার আত্মীয় স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের আশা কতকটা সফল হইয়াছিল। আমি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সপ্তমস্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা জলপানি পাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্, এ, পড়িতেছিলাম, তথায় একটি ছেলের সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব জন্মিল, তাহার নাম সুরেন্দুভূষণ রায়। সুরেন্দু আমাদের ক্লাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, সে-ই এন্ট্রান্সে প্রথম হইয়াছিল। তাহাকে আমি অবসর মত একদিন বিমলার নানা গুণের কথা বলিলাম। বুঝিলাম, আমারই মত সুরেন্দু গুণের পক্ষপাতী। বিমলার রূপ ও অতুলনীয় ছিল।

তৎপর বহুচেষ্টায় সুরেন্দুর অভিভাবকদিগকে সম্মত করাইয়া তাহার সহিতই বিমলার বিবাহ ঠিক করিলাম। বিমলার পিতা তজ্জন্য আমাকে

আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "আমি আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত কোন কাজ করি নাই, কেবল কর্ত্তব্যই সাধন করিয়াছি। বিমলা রাবিয়ার সই, বিমলা ত আমার পর নহে।"

পূজার পূর্ব্বে আশ্বিনের প্রথম ভাগে সানাইয়ের মধুর আলাপ, স্ত্রীরম-সমাজের মঙ্গল শঙ্খনিনাদ ও হুলুধ্বনির মধ্যে সুখেন্দু-বিমলার বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ লইয়া বরযাত্র সকলে গৃহে ফিরিল। সকলেই বিমলার রূপের প্রশংসা করিয়াছিল। শুনিয়াছি সে নিজগুণে শ্বশুর বাড়ীর সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে সকলে 'গৃহ-লক্ষ্মী' বলিয়া সম্ভাষণ করে।

বিমলার বিবাহের পরই তাহার পিতা সহরের বাসা উঠাইয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন।

৬

সময়-স্রোতে আরও কয়েকটি বছর ভাসিয়া গিয়াছে। সুখেন্দু ও আমি উভয়েই প্রশংসার সহিত বি, এ, পাশ করিয়া এখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি। সে ডিপুটী সাজিয়া শাসন-তাড়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আমি বি, এল, পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে একটু একটু করিয়া পশার জমাইতেছি। অনেকেই আশা করেন, আমি কালে মৌলভী মোহাম্মদ ইউসফ খান্ বাহাদুরের মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীব হইব। ভবিতব্য জানে তাহা ঠিক কিনা।

এখনও আমি অবিবাহিত। হয় ত অধিক দিন আর এমন থাকিতে পারিব না। মা-বাপের আদেশ আর কতদিন লঙ্ঘন করিব?

জীবনটা ভার বোধ হইলেই আমি মাঝে মাঝে জু-গার্ডেনে যাইতাম। দিগ্‌দেশান্তর হইতে আনিত নানাবিধ পশুপক্ষী দেখিতে আমার বড় আমোদ বোধ হইত।

একদিন মুঠা মুঠা ঘাস তুলিয়া একটি হরিণকে খাওয়াইতেছিলাম। সে অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ঘাসগুলি উদরস্থাৎ করিতেছিল। এমন সময়ে কে আমার পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, "এই যে, অহুর দেখছি।" স্বর পরিচিত। ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম সুখেন্দু একটি বালকের হাত ধরিয়া আমারই দিকে আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে একটি অবগুণ্ঠিতা রমণী ও একজন পরিচারিকা। রমণীটি আমাকে দেখিয়াই যেন তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিয়াছিল। কিন্তু শতবসনে আবৃত করিলেও সে মূর্ত্তি অচেনা

হইবার নহে। হৃদয়ে যে ছবি অঙ্কিত হইয়া গেছে, তাহা কে মুছিতে পারে?

ছেলেটিকে কোলে নিয়া বার বার মুখচুম্বন করিলাম। পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। সে যেন তার মাতারই প্রতিকৃতি।

বহুদিনের পর সাক্ষাৎ, সুখেন্দুর সহিত অনেকক্ষণ আলাপ হইল। যখন সে শুনিল আমি তখনও অবিবাহিত, তখন সে আমাকে তজ্জন্য বড়ই ধরিয়া পড়িল। অন্যমনস্ক ভাবে একবার বিমলার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম বিমলার চক্ষে তীব্র তিরস্কার দৃষ্টি।

সেইদিনই বিবাহ করিব বলিয়া স্থির করিলাম। একটি মাস না যাইতেই আমার শূন্য শয্যার সাথী জুটিল। বিমলা আমার বিবাহের সময় আমাদের বাড়ী আসিয়া নববধূকে একছড়া হার দিয়া মুখ দেখিয়া গেল।

বিমলার বিবাহের কিছু পরেই রাবিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্বামী পোষ্ট-অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বহুদিন পরে দুই সইয়ে সাক্ষাৎ, অনেকক্ষণ নানা কথা হইল। বাল্যপ্রণয় কি মধুময়!

আমি সংসারী হইলাম। কিন্তু যৌবন-উষার সেই প্রথম প্রণয়ের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি?—তা যদি ভুলিতে পারি, তবে কি যে মনে রাখিব জানিনা। আমার বিশ্বাস, মজনু যদি লায়লীকে পায়, আমিও পরজগতে বিমলাকে পাইব। সে ত আমারই।

আলি পাশা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তেজস্বিনী খাম্‌কো যে অস্বাভাবিক উচ্চাভিলাষ, অযৌক্তিক প্রশংসা এবং আশাতিরিক্ত কার্য্যে উত্তেজনা দ্বারা তাঁহার পুত্রের চরিত্র গঠিত করিয়াছিলেন, আলির জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার ফল খর্ব্ব হয় নাই। ফলে তাহাই তাঁহার উন্নতির প্রসূতি স্বরূপ হইয়াছিল। সেই জন্য আলি মাতার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে অতীব আনন্দানুভব করিতেন। তিনি ফরাসী রাজ-প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছিলেন, " আমি মাতার নিকটে সর্ব্ব বিষয়ে ঋণী; পিতা মৃত্যুকালে সামান্য বাস-গৃহ এবং কয়েক খণ্ড ভূমি দিয়া যান মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে আমার এই যে সুখ-সৌভাগ্য, এই যে ঐশ্বর্য্য ও প্রাধান্য, এ সমস্ত জননীর যুক্তি প্রভাবেই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। জননী আমাকে মানুষ করিয়া-

ছেন, আমাকে গৌরবান্বিত উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি তাঁহারই যুক্তিবলে সতত উচ্চাভিলাষ ও উন্নতির চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং অতঃপর করিব।" ফলতঃ প্রিয় পাঠক! আলি মাতার যতই গুণ-কীর্ত্তন করুন, কোমল-হৃদয়া ললিতা ললনার স্বার্থবশে দয়া, ধর্ম্ম, লজ্জা, সম্ভ্রমের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হওয়া কি তজ্জাতির সীমা-বহির্ভূত কার্য্য নহে? বলুন দেখি খাম্‌কোর সপত্নি-পুত্রদিগের নিধনার্থ আলিকে উত্তেজিত করা কি শেক্‌সপীয়রের ম্যাকবেথ গ্রন্থের ছায়ামূর্ত্তি মুখ-বিনির্গত "Be bloody bold and resolute" এই ভীষণ বাক্যের তুল্য নহে? যাহাই হউক, নিষ্ঠুরা খাম্‌কো, আলির উক্ত ভয়াবহ কার্য্য-সম্পাদনের বিলম্ব দেখিয়া আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না স্বয়ং বিষ-প্রয়োগে জ্যেষ্ঠদ্বয়ের প্রাণসংহার করিলেন।

ফলতঃ খাম্‌কোর প্রকৃত চরিত্র তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি স্বীয় উগ্রমূর্ত্তি প্রদর্শন করিল। সেই অমিত সাহস-সম্পন্না কামিনী অবস্থার হীনতার প্রতি অণুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, দুর্ভাগ্য স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বিষম ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া স্বামীর বিগত ঐশ্বর্য্য-প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নারীজাতি-সুলভ অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল, বীরপুরুষের ন্যায় বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্বামীর অবশিষ্ট অনুচরগণের অধিনায়িকা হইয়া ক্রমশঃ কৌশলে আপন দল পুষ্ট করিতে লাগিলেন। পরিশেষে খাম্‌কোর উত্তেজনায় তাহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে খাম্‌কো অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আলি জননীর সঙ্গে থাকিতেন। তিনি পুত্রকে লুণ্ঠনকার্য্যে আগ্রহান্বিত করিবার জন্য উত্তেজনা করিতে এক মুহূর্ত্তও বিরত হন নাই।

আলি-জননীর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিকটস্থ কয়েকটি জাতি মহাশঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি অচিরে এই বীরত্ব-স্ফীতা উচ্চাভিলাষিনী রমণীর গতিরোধ করা না হয়, যদি সকলে সতর্কতা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তাঁহাদের এই

অনুমান আলি জননীর জানিতে বাকি রহিল না। চতুরা তাঁহাদিগকে সাবধানতা অবলম্বনের অনুমাত্রও অবসর না দিয়া অকস্মাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী এবার তাঁহার প্রতিকূলতা সাধন করিল। তিনি গুপ্ত অনুচর কর্ত্তৃক পুত্র ও কন্যা সাইনিৎসার সহিত ধৃতা ও বন্দিনী হইয়া কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহারা যৎপরোনাস্তি নির্যাতন ভোগ করেন। বিশেষতঃ খাম্‌কো ও তাঁহার দুহিতা সাইনিৎসাকে এরূপ ভীষণ পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনা করিতে গেলে শোকে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোমুখ ও ম্রিয়মান হইতে হয়। যাহা হউক কিয়দ্দিবস পরে একজন দয়ালু হৃদয় গ্রীক বণিকের অনুগ্রহে তাঁহারা সেই ভীষণ যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। বণিকপ্রবর প্রায় ৪০০০ সহস্র পাউণ্ড প্রদানে তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করেন।

দয়াময় বণিক কর্ত্তৃক কারামুক্ত হইয়া খাম্‌কো ক্ষুণ্ণমনে পুত্র ও কন্যার সহিত আপনাদের লীলা-নিকেতন টিপলেনীতে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু স্বয়ং আর কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন না। পরন্তু যাহাতে অবস্থার পুনরুন্নতি সাধিত হইতে পারে, যাহাতে পূর্ব্ব সুখ ধন-জন পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিতে পারেন, এবং যদ্দারা অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিশোধ লইতে পারেন, বীর-নারী প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া পুত্র আলিকে অবিরত তদনুযায়িনী শিক্ষা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। আলির প্রকৃতি বড় মধুর ছিল। তাঁহার বাক্‌পটুতার ত তুলনাই ছিল না। অধিকন্তু সাহস ও বিক্রমও অপরিমেয় ছিল। এই সমস্ত সদ্‌গুণ থাকাতে তিনি অচিরে সৈন্যগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। তিনি এইরূপে লোকবলে বলীয়ান হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া পূর্ব্ব পুরুষগণের সামরিক কৌশল ও ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং শত্রুগণের গতিবিধি, বল-বিক্রম, চরিত্র-চাতুর্য্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তদ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আলির দেহ যেমন সুদৃঢ় ও বলশালী ছিল, তাঁহার যুদ্ধবৃত্তিও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ ও সাহস বীরজনসুলভ অসীম ছিল। সুতরাং তিনি পরিণামে যে সমরকার্য্যে বিশিষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আ'র বিচিত্রতা কি আছে? তিনি প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল বল ও সাহস থাকিলে কি

হয় ? অর্থ না থাকিলে জগতে কোন সঙ্কল্পই সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য তিনি প্রথমতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহার অর্থ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া লুণ্ঠন বৃত্তির দ্বারা স্বীয় অভাব পূর্ণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে আলি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রমকালে কতকগুলি সঙ্গী লইয়া নিকটবর্ত্তী জনপদে যাইয়া ছাগ মেষাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই কার্য্যে এতদূর কৃতকার্য্য হইলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু এবংবিধ গুপ্তভাবে সামান্য লুণ্ঠন কার্য্যের দ্বারা তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া সুদূরপরাহত অথবা অসম্ভব দেখিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত প্রশস্তক্ষেত্রে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া জননীর নিকট সমুদয় ব্যক্ত করিলেন। আলি মনস্থ করিলেন যে, শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিবেন এবং বিভিন্ন দল সমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ ও পরাস্ত করিবেন। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করা আলির বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছিল, কেননা পার্শ্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে তখন বেশ সদ্ভাব ছিল; এক জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে অপরে আসিয়া প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিতেন। শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে এইরূপ সদ্ভাব বিদ্যমান থাকায় আলির ঈপ্সিত বিষয় সফল হওয়ার পক্ষে ঘোর প্রতিবন্ধক ঘটিল। কিন্তু তাহাতেও আলি হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইলেন না; তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; এবং কৌশলে কিছু অর্থ সংগ্রহ এবং তদ্দ্বারা অনেক লোকজন হস্তগত করিয়া বীর যুবক যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিলেন। তাঁহার এই যুদ্ধ প্রতিহিংসার উত্তেজনা-প্রসূত। যে সকল বর্ব্বর লোক তাঁহাকে এবং তাঁহার জননী-ভগিনীকে বন্দী করিয়া অকথ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত ও অপমানিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার এই সমরসজ্জার কারণ।

প্রতিহিংসা প্রণোদিত তেজস্বী আলি বিপুল সাহসে ক্ষীপ্রগতিতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুবিধাজনক ফললাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। একে অল্পবয়স্ক, তাহাতে আবার ভীষণ সমরস্থলে এই প্রথম প্রবেশ। তিনি সমর-কৌশল কিছুই অবগত ছিলেন না; সুতরাং যুদ্ধের ভাবগতিক দেখিয়া তিনি ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পলায়ন পূর্ব্বক টিপলেনীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আলির ভীরুতা ও পলায়নের

সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার জননী মর্ম্মাহত হইলেন। সেই তেজস্বিনী মহিলা আলিকে দর্শন করিবা মাত্র ক্রোধে অধীরা হইয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি হস্তস্থিত সূত্র কাটার "টেকো" আলির দিকে দ্রুত ধরিয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে কহিলেন "যাও ভীরু! যাও, অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণের সহিত সূত্র কাটিতে থাক, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার অপেক্ষা এই কার্য্যই তোমার প্রকৃতির উপযোগী হইবে!"

মাতার তীব্র কটূক্তিতে আলির অন্তঃকরণে বিজাতীয় ঘৃণা ও লজ্জার সহিত অমিত উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাঁহার বলবিক্রম যেন নব ভাবে শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইল। তখন আপনার বীর চরিত্রের পরিচয় প্রদান জন্য সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিকে সুযোগানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যখন কোন বিষয়ে উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তখন মনুষ্য কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না; উত্তেজনা প্রভাবে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বিষম সঙ্কট-সমুদ্রেও ঝাঁপ দিয়া বসে। এই সময়ে আলিও এই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তকালের বিশ্রামও তাঁহার পক্ষে ঘোরতর মর্ম্মযন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। অগত্যা জেতার চরিত্রে না হউক, কিন্তু দস্যু চরিত্রে তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন, কখন বা বিমুখ হইতে লাগিলেন। অবশেষে টিপলেনীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত সুবিধালাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে পিত্ত-সেব পর্ব্বতমালার দিকে স্বীয় গতি পরিচালনা করিলেন। কিন্তু এখানে ভাগ্য তাঁহার প্রতিকূলতা সাধন করিল। তিনি আর্ত্তনিনার রণবিশারদ সুযোগ্য উজীর কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। এই উজীর অতীব দূরদর্শী বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই বলদৃপ্ত নবযুবকের বিনাশ সাধন করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। আলিও অবনত মস্তকে চিরদিন তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিবেন বলিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আলি, উজীরের নিকট গুরুতররূপে পরাভব স্বীকার করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। তিনি আবার জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অদৃষ্টের অনিবার্য্য গতি কে রোধ করিতে পারে? তিনি এবারও এরূপ শোচনীয় রূপে পরাজিত হইলেন যে, তাঁহার অনুচরবর্গের অধিকাংশই নিধন প্রাপ্ত হইল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারাও ছত্রভঙ্গ দিয়া

সে সেখান [illegible] পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। আমি একাকী অব-স্থায় ঘোড়াটী [illegible] আসর হইতে [illegible] এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, [illegible] ঘোড়াটির দানার জন্য তাঁহাকে আপন তরবারি খানি বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

মোজাম্মেল হক্।

রুচি-বিকৃতি।

——ঃ ০ ঃ——

বিগত শ্রাবণ মাসের "নবনূরে" মৌলভী ওসমান আলী বি, এল, সাহে-বের "ঘুড়ি" শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইতে পারিলাম না। সুধীলেখক প্রবন্ধের প্রারম্ভে যেরূপ মহৎ আদর্শ অবলম্বন করিয়া সামান্য ঘুড়ির শক্তি এবং উপকারিতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি নিতান্ত জঘন্য বিকৃতরুচির বশবর্ত্তী হইয়া, ঘুড়ি-সাহায্যে কোন চরিত্রহীন যুবকের সহিত এক সধবা রমণীর নিরাপদ গুপ্ত প্রণয়ের অপকৃষ্ট ঘৃণিত লজ্জাজনক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ক্ষুদ্র ঘুড়ির "উপকারিতা" প্রদর্শন করিয়াছেন। "ঘুড়ি"-লেখকের ন্যায় এক-জন উচ্চশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির লেখনী হইতে এহেন দুর্নীতি-প্রবণ দৃষ্টান্ত প্রসূত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা স্বপ্নেও আমাদের মনে উদয় হয় নাই। তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, কিন্তু তথাপি ভবিষ্যতে "নবনূরের" জন্য প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে যেন তিনি আর একটু অধিক বিবেচনার সহিত লেখনীচালনা করেন, এবং তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত লেখকগণ যে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবেন তাহা সমগ্র সমাজেরই অনুকরনীয় একথা যেন স্মরণ রাখেন, এই মাত্র বিনীত অনুরোধ।

ইমদাদুল হক্।

কবিতা-গুচ্ছ।

কল্পনার প্রতি

কে তুমি হৃদয়কুঞ্জে বসি নিশিদিন
করে লয়ে হেমতুলি, সৌন্দর্য্যের রাগে
রঞ্জিত করিছ সব? আদি অন্ত হীন
তোমার অঙ্কিত দৃশ্য! কবে কোন্ যাগে
লভিয়া জনম তুমি, পল্লবে পল্লবে
এঁকে দিলে সুষমার অনন্ত ভাণ্ডার
অন্ধ নয়নের কাছে! যৌবন-উষায়,
সকলি পাইল প্রাণ তোমার প্রভায়,—
হৃদয়ের মরু-মাঠ কানন-কান্তার
আলোকে পুলকে যেন উজলিল সবে।
সেই দিন, অতীতের সে নবপ্রভাতে,
কত না যতনে তোমা প্রথম সাধিয়া
লভিনু যে ফল, আজি তাহারি পশ্চাতে
কত আশা আকাঙ্ক্ষায় চলেছি ছুটিয়া।

—:০:—

নিদ্রিতা

ঘুমায়েছে; তবু মৃদু
হাসে অধর দু'টি;
অঞ্চলে অলকে মিশি
আছে বাহুযুগ লুটি।
যেন সবে ঝরা ফুলগুচ্ছ,
যবে আঁকা ছবি অল অল,
চরণে পরাণ আছে
এখনো কপোলে মল।
কমলার প্রতিমাটি,
কোথায় অমরাবতী
সেথাকার উর্ব্বশী সে,
সেথাকার প্রজাপতি।
স্বপনের দেখা বুঝি
মিলাতে গিয়াছে ভুলি,
রতির সে সহচরী
ঘুমে পড়িয়াছে ঢলি।
নিদ্রিতা রূপসী রমা
মর্ত্ত্যের শচীরাণী,
বঙ্গের মাধবী বালা
জীবন্ত কবিতা আমি।

শ্রীবাণীপ্রকাশ ঘোষ।

—:০:—

দীক্ষা।

হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিলাস-কুটীরে
অলস শয়নোপরি আছিল ঘুমায়ে
নীরব প্রাণের গীতি। সহসা আজিরে
কোন্ দেবতার তাহে দিল জাগাইয়ে
অঙ্গুলি সঞ্চালি। উঠিল ঝঙ্কারি আজি
অপূর্ব কনক-বীণা সুমধুর তানে;
শত সুধাবীথি মরি সুষমায় সাজি
উঠিল বিকাশি সুখ প্রণয় কাননে।
হৃদয়ের অপূর্ণ বাসনা সাধনা
হিমানী-কুহেলি ঘোরে ছিল মৃতপ্রায়,
কোন্ দেব আশীর্বাদে পাইয়া চেতনা
নবীন উৎসাহে আজি আকাশপানে ধায়।
ঘুমঘোর ভাঙি মন লভিল চেতন
আজি এ প্রাণের দীক্ষা হ'ল সমাপন॥

মোহাম্মদ আর্জা খান।

:০:

শান্তি

নীরব গোধূলি রাগে ছড়ায়ে আঁচল
ডুবে গেল অন্ধকারে, দিবা অচঞ্চল
পুলকে উঠিল ফুটি তারকা নিচয়
সুনীল গগনকোলে, দৃশ্য মধুময়।
মলয় বহিয়া আনে প্রণয়ের গান
দূর দূরান্তর হ'তে ভরে গেল প্রাণ।
সুশুভ্র রজতজ্যোতি চাঁদিমা ছড়ায়,
ঢেউ খেলে নদী'পরে শূন্যের ছায়ায়।
মুগ্ধজীব, মুগ্ধপৃথ্বী বক্ষে বক্ষ দিয়া
অনাদি অনন্ত স্রোতে চলিছে ভাসিয়া।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

—:০:—

আমরা কি ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
কোট প্যাণ্টালুন গায়,
চ'খে ঠুলি, বুট পায়,
টেড়ি কাটা, শিরে হ্যাট্ পা'লে পাই সুখ।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
উপরে চন্দন-লিপ্ত,
ভিতরেতে মল মূত্র,
হিংসা, দ্বেষ—কৃমি কীট করে থুক থুক ।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
নাই প্রেম, নাই সখ্য,
নাই শক্তি, নাই ঐক্য,
শুধু দুষ্ট অভিমান, গলভরা বক।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
অন্ধকার, অজ্ঞের পুরী
রেখেছি হৃদয়ে পুরি,
উপরে কেবল মাত্র ঝাল টুক টুক।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
দাসত্ব জীবিকা ধরি,
অনায়াসে সহ্য করি
প্রভুর পদাঘাত, কোমরে চাবুক।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
পরকে সাজা'তে যাই,
নিজে কিন্তু সাজি নাই,
এ বড় মোদের মনে অদ্ভুত চুক।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
বাবুটি সাজিয়ে খে'তে
বিবিটি-সকাশে যেতে
জুতো ঢুকে ঝাঁটা খেতে বাহবা কি সুখ !
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
যাহা দেখি করি তাই
পরিণাম বোধ নাই,
লোকে কিন্তু আমাদের বলে অহম্মুক।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
সাক্ষাতে নিমাই দাদা
অগোচরে নিমে গাধা
সখ্যতা মানুষে আর থাকে কতটুক ?
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
লিখিতে, বলিতে চাই,
শুধু কথা—কার্য্য নাই,
"ওপাড়ারা" বলে কিন্তু "দূর পোড়ামুখ"
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
তীব্র বক্তৃতার চোটে
মুখে যেন খই ফুটে,
দুর্ব্বল হৃদয় কিন্তু ভয়ে ধুক ধুক।
কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?

কি আমরা, মোরা কি তা' ভাবি একটুক ?
এক বৃন্তে দুই ফুল
হিন্দু মুসলমান কুল,
তাতেই আমাদেরে বিধাতা বিমুখ।
তা' সহিলে সহি কেন মোরা এত দুঃখ ?

কি আমরা শুনিবারে চায় যে শুনুক ।
এক মা'র দু'সন্তান
হিন্দু আর মুসলমান,
দু'য়ে মিলে মিশে থাকা কি অতুল সুখ ।
কি আমরা, শুনিবারে চায় যে শুনুক ॥

কি আমরা শুনিবারে চায় যে শুনুক।
পরস্পরে সাধি বাদ,
ঘটাইয়া পরমাদ,
মোদের সংসার হায় করি প্রেতলোক।
কি আমরা শুনিবারে চায় যে শুনুক ॥

কি আমরা শুনিবারে চায় যে শুধুক।
পরস্পর পরস্পরে
শুধু দ্বেষা দ্বেষি করে
আপনি বাড়াই মোরা আপনার দুঃখ।
কি আমরা শুনিবারে চায় যে শুধুক ॥

কি আমরা শুনিবারে চায় যে শুধুক ॥
একের অন্যের প্রতি
থাকে যদি সম প্রীতি,
অপরের দুঃখে যদি নিজে পাই দুঃখ।
নর-জগতের সার সুখ সেইটুক ॥

নর-জগতের সার সুখ সেইটুক ॥
হিন্দু আর মুসলমান
হয়ে উভে এক প্রাণ,
একতার পাশে পরা কি অতুল সুখ।
নর জগতের সার সুখ সেইটুক ॥

নর জগতের সার সুখ সেইটুক ॥
এক সূত্রে হয়ে গাঁথা
সৌহৃদে মিলে মিশে থাকা
ভাবিতে আনন্দে, গর্ব্বে পূর্ণ হয় বুক।
নর জগতের সার সুখ সেইটুক ॥

নর জগতের সার সুখ সেইটুক ॥
একতার মহামন্ত্র
কিবা শত্রু কিবা মিত্র
অভেদ উভয় জানে কি অতুল সুখ।
এ কথা বোঝেনা যেবা, সে আত্মঘাতুক।
ভাই হিন্দু, মুসলমান, বুঝ এইটুক ॥

কে, এ, সিদ্দিকী

—:•:—

মাসিক সাহিত্য।

—:০:—

বঙ্গভাষা—শ্রাবণ ও ভাদ্র। 'বঙ্গভাষা' ক্রমশঃই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিচয়ে পরিশোভিত হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিতেছে, কাহারও কাহারও মত নবীন বলিয়া আমাদিগকে উপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নাই। এবার সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামচন্দ্র' স্থান পাইয়াছে। অমর কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রে যে আদর্শ লোকচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা তাহারই পরিচয়ে পূর্ণ। এই প্রবন্ধ পাঠে যাহারা মূল রামায়ণ পড়েন নাই তাঁহারা প্রকৃত রামের পরিচয় পাইবেন। 'বাল্মীকি অঙ্কিত রামচন্দ্র এক অতি বিশাল চিত্র, তুলসী দাস ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের শ্যামসুন্দর পল্লবস্নিগ্ধ শ্রীরূপ কল্পনা করিয়া, তাঁহার বীরত্ব ও বৈরাগ্যের মহিমা বর্জ্জন করিয়াছেন। কৌশল্যা রামের বনবাসোপলক্ষে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—রামচন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রধ্বজ ও পরিঘতুল্য কঠিন বাহু উপাধান করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বাহু পরিঘতুল্য কঠিন বলিতে কৌশল্যা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, ভরত শৃঙ্গবের পুরীতে রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইঙ্গুদী মূলে কঠিন স্থণ্ডিল ভূমি রামের বাহু নিষ্পীড়নে মর্দ্দিত আছে, আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।" সুতরাং রামচন্দ্রের 'নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল' কিম্বা 'ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে' প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বারা যাঁহারা তাঁহাকে অবতাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্রের সঙ্গে মহর্ষি অঙ্কিত রামের রেখায় মিল পড়ে না। রামের বিশাল বক্ষ ও স্কন্ধদ্বয়ের সন্ধিস্থল মাংসল, তাঁহার মহাবাহু বৃত্তায়িত, তাহা ঊনষোড়শ বর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ করিবার সামর্থ রাখিত।' তিনি যেমন মহামূর্ত্তি, তেমনই মহাগুণশালী ছিলেন।' প্রত্যেক সমাজেরই স্বীয় স্বীয় জাতীয় আদর্শ

চরিত্রগুলি সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করা একান্ত দরকার। ইহাতে জাতীয় ভাব অধিক স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। আমাদের আশা আছে, মুসলমানসমাজ হইতেও সেইরূপ চেষ্টা আরব্ধ হইবে। 'জড়ে উত্তেজনশীলতা' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম, এ, মহাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রচিত উক্ত নামধেয় পুস্তকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাপক বসু গত তিন বৎসর জড়ে উত্তেজনশীলতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে সব প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহাই 'আবশ্যক স্থলে বিশদব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া' পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভেই ঋগ্বেদের একটি বচন মূলসূত্ররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—'সত্য যাহা তাহা এক, জ্ঞানীব্যক্তি তাহাকে বিভিন্ন আখ্যা প্রদান করেন মাত্র।" তাহার পরেই উৎসর্গ পত্র। অতি সংক্ষিপ্ত আড়ম্বর হীন দুই কথায় সরল উৎসর্গ পত্র—'আমার স্বদেশবাসিগণকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।" এ গ্রন্থের উৎসর্গ বোধহয় জগতের সর্ব্ব প্রধান বৈজ্ঞানিক বা সম্রাট আনন্দ ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিতেন, সেই অমূল্যরত্ন বিশালহৃদয় অধ্যাপক আপনার দরিদ্র দীনহীন অজ্ঞান কিন্তু তথাপি পরম স্নেহাস্পদ স্বদেশবাসী ভিন্ন আর কাহাকেও দিতে পারিলেন না।' অধ্যাপক মহাপুরুষ, ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। আমরা স্থানাভাব বশতঃ 'জড়ে উত্তেজনশীলতা' প্রবন্ধ অধ্যাপকের মত কাব্যানন্দ মহাশয়ের ভাষায় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 'ভাষায় জাতীয় অধঃপাতের প্রতিবিম্ব" চিন্তাশীল প্রবন্ধ। এক একটি শব্দ যে জাতীয় জীবনের এক এক অংশের অভ্রান্ত ইতিহাস স্বরূপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতীয় উন্নতি ও অধঃপতনের সহিত ভাষার ও পরিচ্ছদের অতি নিকট সম্পর্ক। প্রত্যেক জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস লেখক এইরূপ শব্দের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা-ভাষা হইতে বহুশব্দ উপস্থিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বঙ্গভাষার একটি শব্দ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 'প্রাচীন ভাষায় রাজা অর্থ King, কিন্তু King এর প্রতিশব্দ বাঙ্গলা ভাষায় বোধহয় এখন নাই। এখন জমিদারও রাজা, বণিকও রাজা, পণ্ডিতও রাজা, উকিল ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই রাজা। ফলতঃ এখন রাজা অর্থে ধনীলোক। আজ যদি বাঙ্গলা হইতে ইংরেজ চলিয়া যান, এবং এদেশীয় কেহ এদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন তবে তাঁহাকে King এর একটা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি দুই চারি শত টাকা ব্যয় করিয়া অট্টালিকাখানা একটু শ্রীসম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রতিবেশীগণ বলে "অমুকের বাড়ী রাজার বাড়ী।" আমরা কতদূর ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছি; রাজোচিত ঐশ্বর্য্যের ঈদৃশ ধারণা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়।' এইরূপ সদাগর, ভাণ্ডারী, বৈরাগী, সাধু, মহাজন, কবিরাজ বা কবি-ওয়ালা প্রভৃতি শব্দও 'বাঙ্গালীর অধঃপতন ও ভাবসমূহ জ্ঞাপনের পরিচয় দিতেছে।' "কাব্য-সমালোচনায়" লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় দেখাইয়াছেন, 'লেখা মাত্রেই কাব্য নামে সমাদর লাভ করিতে পারে না। কোন্ লেখা কাব্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তাহা নির্ণয় করিতে হইলে কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ না করিলে চলে না। সেরূপ লক্ষণের অভাবে বঙ্গভাষার সকল গ্রন্থ কাব্য নাম গ্রহণ করিয়া লোক-সমাজে উপনীত হইতেছে। কবির সংখ্যাও দিন দিন যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অথচ উল্লেখযোগ্য কাব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। চিত্রকরের পক্ষে বর্ণ এবং কবির পক্ষে বাক্য একশ্রেণীর পদার্থ। বর্ণ চিত্র নহে; বাক্য ও কাব্য নহে। বর্ণসমাবেশকৌশলে চিত্রকর যে ভাবোদ্দীপন করেন, তাহাই চিত্র;—বাক্য সমাবেশ কৌশলে কবি যে ভাবোদ্দীপন করেন, তাহাই কাব্য। চিত্রের রেখা ও বর্ণসমাবেশ ভাবোদ্দীপনের উপায়মাত্র, কাব্যের ছন্দ ও বাক্যসমাবেশও ভাবোদ্দীপনের উপায় মাত্র। সর্ব্বপ্রকার বর্ণসমাবেশ চিত্র নামে অভিহিত হয়না। সর্ব্বপ্রকার বাক্যসমাবেশও কাব্য নামে অভিহিত হয়না। ভাবব্যঞ্জক বর্ণসমাবেশ চিত্র নামে পরিচিত, ভাবব্যঞ্জক বাক্যসমাবেশ কাব্য নামে সমাদৃত। সুতরাং রসাত্মক কাব্যসমাবেশই কাব্য নামের সার্থকতা সাধন করিতে পারে। বর্ণবিন্যাসের ন্যায় রসবিন্যাসেও কতকগুলি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলে সুসংযত। সে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, চিত্র বা কাব্য মনোজ্ঞ ও বোধগম্য হয়না। সংযম,

স্বীকার না করিলে রচনা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আপন উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দেয়, সরল হয়না, মধুর হয়না, বোধগম্য হয়না; কেবল অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাহা রচনা-জঞ্জাল মাত্র। রচনা সংযত করিবার প্রধান উপায় সমালোচনা। সমালোচনার অভাবে রচনা অসংযত থাকিয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কিরূপে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রে সমালোচনা নিতান্ত একদেশদর্শী, অধিকাংশ স্থলে তাহা বিজ্ঞাপনের অভিনব কৌশল মাত্র। বিজ্ঞাপনের আয় সংবাদ পত্রের প্রধান আয়। সুতরাং দোকানদারিতে সমালোচনার উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সমালোচকগণ বঙ্গভাষার খাতির অপেক্ষা বঙ্গকবির সৌহার্দ্দ্যের খাতিরকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহার প্রতিভা আছে, বন্ধু বান্ধব নাই, তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা নাই। কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলিয়া মানিয়া লইলে, কাব্যসমালোচনায় বা কাব্যপ্রণয়নে মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার থাকা মানিয়া লওয়া যায়না। রসশাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে কবি বা কাব্যসমালোচক হওয়া অসম্ভব। বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য, তাই ঘরে ঘরে কবি আর পথে ঘাটে সমালোচক।' তাঁহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা আজও জিনিস হইতে অনেক বাজে মার্কারই বেশী সমাদর দেখিতেছি বটতলার উপযুক্ত অনেক বহি স্থায়ীসাহিত্যের সহিত আসনলাভ করিয়া সাহিত্যের পুতঃমন্দিরকে অপবিত্র করিয়া দিতেছে। ইহা হইতে ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? বঙ্গভাষায় এখন Johnson বা Jeffreyর মত সমালোচকের আবির্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের মত শক্তিশালী সাহিত্য সম্রাটদের কশাঘাত না খাইলে আর কাহারও চেতনা লাভ হইবে না আজকাল আমাদের দেশের সমালোচকগণ একরূপ দায়িত্বশূণ্য। তাঁহাদিগকে একটু বেশী করিয়া সংযমী হওয়া দরকার। সমালোচকগণ সাহিত্য-রাজ্যের সেনাপতি। তাঁহারা যদি মিষ্ট কথায় বা প্রলোভনে ভুলিয়া আত্মমর্য্যাদা হীন হন, এবং রাজ্য-মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত করেন তবে আর আশা কোথায়? "চিত্ত বিকাশ" কবিবর হেমচন্দ্র প্রণীত 'চিত্তবিকাশের' সমালোচনা। সমালোচক মহাশয়ের মতে এই গ্রন্থে 'কবি প্রতিভার সেই যাদুকরী শক্তি নাই। স্থানে স্থানে কবিবরের উপদেশ ও বর্ণনাগুলি Copy Book maxims এর ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত নীরস ও নিষ্ফল। সমগ্র পুস্তক খানিতেই কবির একটি প্রধানগুণ মৌলিকতার অভাব লক্ষিত হয়।' কেবল 'হেমচন্দ্রের জীবনী লেখকের নিকট "চিত্ত-বিকাশ" বড় বহুমূল্য সামগ্রী হইয়াছে। কারণ পুস্তক খানিতে প্রকৃতই কবির চিত্ত বিকশিত হইয়াছে, ইহাতে কবি স্বয়ং তাঁহার জীবনের অনেক অজ্ঞাত অন্ধকারময় প্রদেশে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ মণ্ডলীর সম্মুখে জীবনের অনেকগুলি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিষাদ ও নিরাশার কাতরোক্তি পরিপূর্ণ। কবির জীবনচরিত লেখক তাঁহার জীবনের শেষ বিকাশ দেখাইতে গিয়া 'চিত্ত বিকাশ' হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন সন্দেহ নাই। মিল্টনের জীবন ও কবিত্বের ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে Samson Agonistes যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, হেমচন্দ্রের জীবন ও কবিত্ব আলোচনা পক্ষেও 'চিত্ত-বিকাশ' সেইরূপ মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইবে।' "ভুলের উপর ভুল" একটি ক্ষুদ্র গল্প, একরূপ প্রাণহীন। ইহাকে এক অত্যদ্ভুত হাস্যরসের রচনা বলিলেও চলে। লেখকের রুচি প্রশংসনীয় নহে। একবার 'সাবিত্রী'তে তিনি যে রুচির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পরিহার করিয়া আবার সে পথে চলিলেন কেন? উচ্চশিক্ষিত লেখকদের মধ্যে সংযম ও শ্লীলতা একান্ত প্রার্থনীয়।
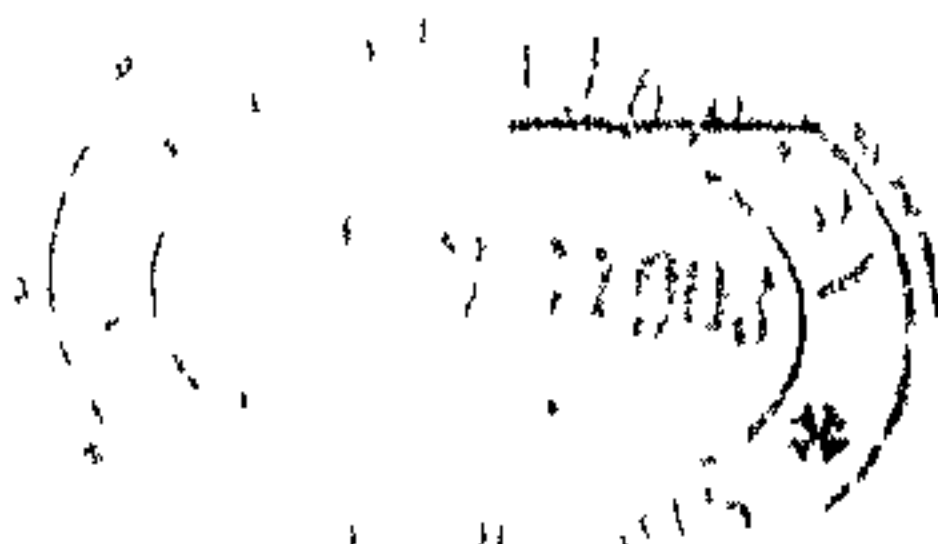
দুদিনের হিমালয় ভ্রমণ।

(২)

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা কালীঝোরার ক্ষুদ্র গিরিপিণ্ডের উপর উপনীত হইলাম। সমুদ্রবক্ষ হইতে এই স্থানের উচ্চতা কিঞ্চিদধিক ৫৫০ ফীট। শৃঙ্গটির পাদমূলে একটি নাতিপ্রশস্ত ঝরণা, উচ্চতর ভূমি হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিস্রোতার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জল কৃষ্ণাভ বলিয়া ইহার নাম কালীঝোরা, এবং ঝরণাটির নামানুসারে স্থানটির নামও কালীঝোরা হইয়া গিয়াছে।

কালীঝোরা ও ত্রিস্রোতার সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে একটি অন্তরীপ সদৃশ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর কালীঝোরার বাঙ্গলাটি অবস্থিত। হিমালয় রাজ্যের স্থানে স্থানে এইরূপ অনেকগুলি বাঙ্গলা আছে। Public Works Deparment এর প্রভুরা কার্য্যপরিদর্শনে বাহির হইয়া এই সকল বাঙ্গলায় অবস্থিতি করেন। বাঙ্গলার পার্শ্বে সবওভারশীয়রের কুটীর, তৎপার্শ্বে আমার বন্ধুবরের কুটীরখানি অবস্থিত। ঢালু পর্ব্বত গাত্রের কিয়দংশ কাটিয়া সমতল করিয়া, তদুপরি এই কয়খানি কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে, যে গুলিতে পাহাড়ী শ্রমজীবীরা বাস করে। মোটের উপর ১০।১২ খানি কুটীর ও একটি সাহেবী বাঙ্গলা লইয়া কালীঝোরার ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লীটির পশ্চাদ্ভাগে ঈষদুন্নত পর্ব্বত, চতুর্দ্দিকে গহনবনসঙ্কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গশ্রেণী, সম্মুখে উদ্ভিদবিহীন, বালুকা-প্রস্তর-সমাকুল মরুভূমি সদৃশ মলিন শুষ্ক শ্বেতবর্ণ কঠোরদর্শন বিস্তৃত উপত্যকা,—ইহার একপার্শ্ব দিয়া নিরন্তর কলশব্দে সঙ্কীর্ণ-স্রোত কালীঝোরা বহিয়া যাইতেছে; বামে ঘোররোলশালিনী ত্রিস্রোতা অবিরাম তুমুল শব্দে বনভূমিটি যেন সচকিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গলাটির সম্মুখ দিয়া ত্রিস্রোতার বিকট সৌন্দর্য্য সুচারুরূপে নয়নগোচর হয়। বামপার্শ্বস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তরাল হইতে নির্গত হইয়া, বাঙ্গলাটির সম্মুখে ঘুরিয়া সেই ভীষণ জলস্রোতটি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, পরে আবার দক্ষিণে ঘুরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে যখন আমরা বাঙ্গলার অলিন্দ হইতে ত্রিস্রোতার এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তখন বোধ হইতে-

প্রান্তরে সুকোমল সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, এমত নহে। পর্ব্বত গাত্রজড়িত অপরিমিতবর্দ্ধিত ঘনগুল্মগুচ্ছের স্থানে স্থানে নানা বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া ভীষণতার রাজ্যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে, যেন পাষাণের পাষাণবক্ষের ক্ষীণ স্নেহটুকু পুষ্পরূপে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও বা সঙ্কীর্ণ নির্ঝরিণী গুলি কঠোর পর্ব্বতগাত্রের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আপনার রজতশুভ্র ক্ষীণ বক্ষটুকু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে— যেন কঠিন পাষাণের বক্ষবিদারণ পূর্ব্বক সুকোমল প্রেম অতি মৃদু ঝর্ ঝর্ রবে বহিয়া বহিয়া কঠোরতার মধুরতার অবতারণা করিতেছে! একস্থানে একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জলপ্রপাত অতিবন্ধুর বৃহৎ বৃহৎ কঙ্করসমাকুল পথে বহিয়া আসিতে আসিতে অবিরত সুশুভ্র ফেনপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইয়া একটি অতি অপূর্ব্ব সুন্দর দুগ্ধশ্বেত নির্ঝরিণীতে * পরিণত হইয়াছে। আহা, প্রকৃতির কি পরিপূর্ণ কঠোরমধুর সৌন্দর্য্যপ্লাবনে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অনন্তকাল মগ্ন রহিয়াছে!

আমরা এযাবত সেই Teesta Valley Road ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছি। রাস্তায় স্থানে স্থানে কুলীরা কাজ করিতেছে। বর্ষার সময়ে এই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়া উঠে। হয় ত কোনদিন একস্থানের কতকটা পথ সহসা বসিয়া গিয়া নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গেল; হয় ত বা কোনদিন পর্ব্বতশীর্ষ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষলতা সমূলে উৎপাটিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতসম প্রস্তরখণ্ডসহ জলস্রোতে ধুইয়া আসিয়া পথের একাংশ বন্ধ করিয়া দিল, না হয় পথটি শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নদীগর্ভে গিয়া পড়িল! এ অঞ্চলের জলস্রোতের অসাধ্য কর্ম্মই নাই। এই সকল কারণে overseer গণকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, কুলীরাও কর্ম্ম হইতে অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ এই সময়ে, এই পথেই ব্রিটিশসিংহের সৈন্যবল তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশে গমনাগমন করিবে, তজ্জন্য পথটি বিশেষ যত্ন সহকারে সর্ব্বদা সুসংস্কৃত রাখা হইতেছে। কত স্থানে স্থানে পথিপার্শ্বস্থ পর্ব্বতগাত্রের দৃশ্য এরূপ ভয়াবহ যে, দেখিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। হয় ত পর্ব্বতগাত্রের নিম্ন হইতে প্রস্তরখণ্ড গুলি খসিয়া গিয়াছে, ঊর্দ্ধে, প্রায় অবলম্বন-বিহীন বিশাল বিশাল প্রস্তর গুলি ঠিক্ পথেরই উপর দিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।—কেহ যেন একটি বৃহৎ থিলানের অর্দ্ধাংশ চূর্ণ করিয়াদিয়াছে, অপরাংশ আপাততঃ ঝুলিতেছে,—কখন পড়ে,

* এই নির্ঝরিণীটিকে "খেতীঝোরা" কহে।

কখন পড়ে! সে দুঃখের কথা মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

এইরূপে কোথাও প্রকৃতির ভীষণ লোমহর্ষণদৃশ্য, কোথাও নয়ন-মন-তৃপ্তিকর মোহন সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া কখনো ভয়, কখনো বিস্ময়, কখনো আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে বৈকালে আমরা রিয়াংএ উপস্থিত হইলাম। রিয়াং কালীঝোরা অপেক্ষা একটি বৃহত্তর পল্লী, ত্রিস্রোতার সহিত রিয়াং নদীর সঙ্গমস্থানের সন্নিধানে অবস্থিত। রিয়াং একটি ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু স্রোতের ভয়ঙ্করতায় বিশ্বগ্রাসিনী পদ্মাও ইহার নিকট নগণ্য। নদীর পরপারে উচ্চভূমির উপর মহাপ্রভুদিগের বাঙ্গলা; এপারে স-কুলী ওভার-শিয়র সবওভারশিয়র প্রভৃতির বাসস্থান। ওভারশিয়র একজন পাঞ্জাবী, তাঁহারই গৃহে আমরা সেই রাত্রির জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

বিশ্রামের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা পল্লীপর্য্যবেক্ষণার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলাম। রিয়াংএ দেখিবার জিনিস কিছুই নাই;—তবে কালীঝোরা অপেক্ষা এস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য একটু অধিক পল্লীগ্রামসুলভ, তেমন বিরলমনুষ্য বিকট গম্ভীর জলগর্জ্জন-মুখরিত আতঙ্কপূর্ণ ভীষণ আরণ্যদৃশ্য দেখিয়া এ স্থানে শিহরিয়া উঠিতে হয় না। অদূরস্থ নদীর তীরে বৃহৎ একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া ক্ষুদ্র জলস্রোতটির মত্তমাতঙ্গ সদৃশ ভীষণ আস্ফালন দেখিতে দেখিতে সারাটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা কালিম্পং যাইবার জন্য আবার পথে বাহির হইলাম। কালিম্পং রিয়াং হইতে ১২ মাইল। রিয়াং নদীর তীর বাহিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আমরা একটি Hanging Bridge প্রাপ্ত হইলাম। এইস্থানে রিয়াং পার হইতে হইবে। এক একজন করিয়া হাঁটিয়া পার হইতে হইবে, সুতরাং আমরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলাম, এবং অশ্বরশ্মি হস্তে ধরিয়া একে একে সাঁকোটি পার হইলাম। মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে সাঁকোটি কিন্তু প্রতি-পদবিক্ষেপে দুলিতেছিল, এবং সেই সঙ্গে চিত্তও সংশয়-দোলায় দোলায়মান হইতেছিল—যদি ছিঁড়িয়া পড়ে!

পরপার বাহিয়া আমরা সেই রিয়াং-ত্রিস্রোতা-সঙ্গম-স্থলের দিকে চলিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে রিয়াং পল্লীর পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, এইস্থানে একটি সুন্দর উপায়ে রিয়াং হইতে মাল পরাপার করা হয়। নদীর উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া উচ্চ কাষ্ঠমঞ্চ আছে, এবং প্রত্যেক-টির শীর্ষদেশ হইতে পরপারস্থ মঞ্চের মূল পর্য্যন্ত একটি করিয়া লৌহ-তার

সংযুক্ত রহিয়াছে। একটি কপিকলে ঝুলান কাঠাধারে মাল রাখিয়া কাষ্ঠমঞ্চের উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে, সুড় সুড় করিয়া অবলীলাক্রমে পরপারের মঞ্চমূলে গিয়া উপনীত হয়।

আবার আমরা Teesta Valley Road ধরিয়া চলিলাম। অদ্যও পূর্ব্বদিবসের ন্যায় স্থানে স্থানে বিস্তৃত-পুষ্প ঘনলতাগুল্ম ও সুন্দর সুন্দর নির্ঝরিণী খচিত ভীষণ পার্ব্বত্য দৃশ্যে পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আমরা কখনো ধীরে কখনো দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তীস্তাব্রীজে পঁহুছিলাম। অত্রত্য পল্লীটি বেশ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হইল। ত্রিস্রোতার তীরে একটি ডাকঘর ও শ্রেণীবদ্ধ কয়েকখানি দোকান রহিয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ শৃঙ্গশীর্ষে বাঙ্গলা, বাজার, ডাক্তার খানা, ওভারশিয়রের বাসস্থান প্রভৃতি আছে। ত্রিস্রোতার এই পার হইতে দার্জ্জিলিং যাওয়া যায়। দার্জ্জিলিং এখান হইতে ২২ মাইল। আমরা কালিম্পং যাইব, আমাদিগকে নদী পার হইতে হইবে। কালিম্পং পরপারস্থ উন্নত শৈলমালার শীর্ষদেশে, সমুদ্রবক্ষ হইতে চারি সহস্র ফীট উচ্চে অবস্থিত। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা তিস্তাব্রীজ পার হইলাম। এটি রিয়াং ব্রীজের ন্যায় দোলায়মান নহে, সুতরাং আমরা কতকটা সচ্ছন্দচিত্তে ত্রিস্রোতা উত্তীর্ণ হইলাম।

শিলিগুড়ি হইতে প্রায় ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি, কিন্তু এতক্ষণে আমরা উঠিয়াছি মাত্র ৬০০ ফীট। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে পর্ব্বতারোহণ আমরা এখনো করি নাই বলিলেও হয়। এইবারে আমাদিগকে সত্য সত্যই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে হইবে। এইস্থান হইতে কালিম্পং যাইবার তিনটি রাস্তা আছে। প্রথমটা "কার্টরোড" অর্থাৎ গোশকট যাইবার পথ, ইহার দৈর্ঘ ১০ মাইল। পর্ব্বতগাত্রের বহুদূর জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অল্পে অল্পে উচ্চে উঠিয়াছে। দ্বিতীয়টি "পনিরোড", অর্থাৎ অশ্বারোহণে যাইবার পথ। এটি ৬ মাইল। কার্টরোড অপেক্ষা ইহার চড়াই অনেকটা বেশী। এইপথে আমাদিগকে একাদিক্রমে সার্দ্ধ তিন সহস্র ফীট উঠিতে হইবে। তৃতীয়টি "ফুটরোড" অর্থাৎ হাঁটিয়া যাইবার রাস্তা, এটি ৪ মাইল মাত্র। পাহাড়ীরা এই পথেই চলে। ইহার চড়াই অত্যন্ত অধিক, এ পথে চলা বিষম কষ্ট-সাধ্য। আমাদের মালপত্র লইয়া কুলীরা এইপথ ধরিয়াই পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। আমরা পনিরোড ধরিয়া মন্থর গমনে চলিতে লাগিলাম।

আমরা ক্রমশ উর্দ্ধেই উঠিতেছি। পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে উঠিতে লাগিলাম। কেবল চড়াই, ক্রমাগত চড়াই। একতিল ভূমিও সমতল পাইবার যো নাই। আমরা কিয়দ্দূর উঠিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, নিম্নে ত্রিস্রোতা বহিতেছে, তাহার গভীর গর্জ্জন এক্ষণে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তীস্তাব্রীজের বাঙ্গলা ও কুটীরগুলি দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখা যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সেগুলি বনান্তরালে লুকাইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে গহন বন, স্নিগ্ধছায়াময়, মৃদুপবনতাড়নে তরুরাজির মর্ম্মর নাদ ও পার্ব্বত্য ঝিল্লীর তীব্র কর্কশ শব্দে মুখরিত। কিয়ৎক্ষণ চলিয়াই অশ্বগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহাদের ঘন কষ্টশ্বাস ক্রমেই দ্রুততর হইয়া আসিল। আমরা তরুচ্ছায়াময় অথচ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটি স্থান দেখিয়া বিশ্রামার্থ অশ্বগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম, এবং আপনারাও তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। স্থানটি পরম রমণীয়, প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ। চারিদিক দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। বহির্জ্জগৎ এস্থানটুকু হইতে যেন সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বিবেচনা হয়। ত্রিস্রোতার ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে আর কর্ণ বধির হয় না; পর্ব্বতের তেমন ঘন-বনান্ধকার দেখিয়া প্রাণ আর আতঙ্কে কম্পিত হয় না। এস্থানে প্রকৃতির মনোরম স্থির সৌন্দর্য্যে এবং সুমধুর মৃদুশীতল সমীরণে দেহ-মন পুলকিত ও প্রসন্ন হইয়া উঠে। আমরা অন্যূন একঘণ্টা কাল এই অনুপম সুন্দর স্থানে বসিয়া পরম শান্তি-সুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

ক্রমশঃ—

ইমদাদুল হক্।

মুসলমানের শিক্ষা।

সম্প্রতি ভারতীয় মুসলমানগণ নিজেদের শিক্ষোন্নতিকল্পে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন। স্বর্গীয় সার সৈয়দ আহ্মদ আলীগড়-কলেজ স্থাপনদ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য মুসলমানসমাজে আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলকর, প্রতিবেশী হিন্দুদের পক্ষেও আনন্দের কথা, কারণ-মুসলমানগণ আমাদের সঙ্গে না চলিলে আমরাও আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিনা।

কিন্তু শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের এই আন্দোলনের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ আশঙ্কার কারণ দেখিতেছি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মঙ্গলের জন্যই তাহার আলোচনা নিতান্ত আবশ্যকীয় বোধ হইতেছে।

মুসলমানগণ স্বসমাজে শুধু শিক্ষাবিস্তার করিতে যত্নপর নহেন; পরন্তু 'মুসলমানী শিক্ষা' বিস্তারের জন্যই যেন উৎসুক। 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন ও কলেজ বিশেষকে মুসলমানগণের শিক্ষার কেন্দ্রীভূত করার প্রস্তাবই তাহার প্রমাণ। আমাদের বিশ্বাস, এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মুসলমানগণ শিক্ষা সম্বন্ধে সহজে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনও কঠিনতর হইবে।

আমাদের নিকট এতদ্দেশে 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন কোন মতেই যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যাহা বিশ্ববিদ্যালয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালোচনারই স্থান হইবে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। উদাহরণ স্বরূপ আমরা স্পেনের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহা ত সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত ছিল। স্পানীয় মূরগণ সার্ব্বজনীন ভাবে জ্ঞান-বিতরণ করিতেন বলিয়াই আজ ইউরোপ উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন। মূরজাতির নানা কারণে পতন হইলেও তাঁহারা যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ পৃথিবীর এক বিশাল জনপদ বিদ্যাবৈভবে সভ্যতার আদি জননী ভারত; মিসর, চিন প্রভৃতিকে বহু পশ্চাতে ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। মূরেরা নিজে হতবল ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আফ্রিকা মহাদেশের অতি ক্ষুদ্র এক রাজ্যে মরণাপন্ন অবস্থায় দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতে থাকিলেও প্রাচীন জগতের পশ্চিমার্দ্ধকে বর্ত্তমান সভ্যতায় উন্নীত করার গৌরব একা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। প্রকৃত প্রস্তাবেই জ্ঞানের প্রকৃতি জাতিবর্ণ-নিরপেক্ষ, তাহাতে জাতীয় বিশেষত্বের রং ফলাইবার চেষ্টা অন্যত্র হইলেও এই বহুজাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষের জন্য শুভকর নহে। জ্ঞানকে উদার সার্ব্বজনীন ভাবে গ্রহণ না করিয়া যিনি তাহাতে নিজ গণ্ডীর ছাপ লাগাইতে চাহেন, তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন না, পরন্তু জ্ঞানের আত্মসংস্কার-প্রতিবিম্ব-ম্লান অবস্থা মাত্র আশা করিতে পারেন।

শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়াও অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু উপযুক্তরূপ অগ্রসর হইতে পারেনা। প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই যাজকদের হস্তে শিক্ষাভার ন্যস্ত ছিল, এবং তাহাতেও প্রাচীন সভ্য জাতিদের মধ্যে

শিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানযুগ শিক্ষার উন্নততর আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার অতীত হওয়া আবশ্যক। এই উদারতার দিনেও যে সমাজ জাতীয় শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক করিয়া রাখিবে, তাহার সমুচিত উন্নতি সুদূর পরাহত।

ফলতঃ 'মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অথবা যুক্তিবত্তা আমরা কিছুই দেখিতে পাইনা। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও পারসী ভাষায় মুসলমান-সাহিত্যাদির মাত্র আলোচনা হইবে প্রস্তাবকগণ কখনও এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন না। কারণ তাহা হইলে উহাকে বিশ্ববিদ্যালয় নাম না দিয়া মাদ্রাসা বলাই সঙ্গত হয়, এবং তদ্বৎ নূতন কোন বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া পুরাতন মাদ্রাসার সাহায্যেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা প্রাচীন মুসলমানসমাজ যে জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়াছিল, সুধু সেই জ্ঞান ছাত্রদিগকে দান করাও প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইতে পারেনা। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে আধুনিক বিজ্ঞানাদি তাহার চর্চ্চার বিষয়ীভূত করিতেই হইবে। তবে আর মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা কি?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির যে সকল ত্রুটি আছে, তাহা সংশোধন করিয়া উচ্চতর আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যদি আবশ্যক হইয়া থাকে, তথাপি এদেশে ভিন্নভাবে মুসলমান-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়না। সেজন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মিলিত ভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এবং তবেই সিদ্ধিলাভের সমধিক সম্ভাবনা। তাদৃশ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

মুসলমানগণ হয়ত মনে করেন যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির সঙ্গে বিশেষভাবে মুসলমান-সাহিত্য ও ইতিহাসাদি শিক্ষাদানই মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে তাহাতে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি প্রভৃতি অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করিতেই হইবে; তদুপরি পারসী ও আরবীতে মুসলমানী-সাহিত্যাদি এবং সংস্কৃতে হিন্দু-সাহিত্যাদি শিক্ষাদানের আয়োজনও অপরিহার্য্য। অন্যথা আমাদের শিক্ষা সময়ের অনুপযোগী ও অসম্পূর্ণ থাকিবেই; অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নামও বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। আর ঈদৃশ বিশ্ববিদ্যালয়ের "মুসলমান" আখ্যা কিরূপে সঙ্গত

হইতে পারে ? কম কারণে ইহাকে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা যায়, প্রবলতর কারণে খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোনও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিনা। কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন মুসলমান ছাত্র ইচ্ছা করিলে আরবীতে অনার ও এম, এ, পাস করিতে পারেন ; কেহ কেহ 'গবেষণাবৃত্তির' সাহায্যে তারপরও মুসলমানসাহিত্যাদির চর্চায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন ; ইচ্ছা করিলে মুসলমানগণ তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার জন্য বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেই আরো বৃত্তিদান করিতে পারেন। * কলিকাতা

---

* আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনার জন্য বহু গবেষণাবৃত্তি ও সাধারণশিক্ষা সমাজের দুঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য করিবার জন্য অন্যান্য বৃত্তি স্থাপন করার একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে কি না জানিনা, কিন্তু যদি তাহা হয় তবে শিক্ষা যাহাতে কেবল ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে তাহার বিধান করিতে হইবে। আলীগড় কলেজ আমাদিগকে শ্রেষ্ঠশিক্ষার আদর্শ প্রদান করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষার সুফলের কথা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় নাই, এখন তাহা করা উচিত। সমাজের উচ্চস্তর শিক্ষিত হইলেই সমগ্র সমাজ শিক্ষিত হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিনা। সমাজের যাহারা প্রকৃত অস্থিমজ্জা সেই সাধারণ লোকদের শিক্ষার উপরেই সমাজের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। প্রাতঃস্মরণীয় সার সৈয়দ শিক্ষাকে যে সাম্প্রদায়িক করিতে চাহিতেন না এবং কখনও তাহা করেন নাই, তাঁহার অতি যত্নের আলীগড় কলেজই তাহার প্রমাণ। উক্ত কলেজে তিনি হিন্দুছাত্রেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মূলেও তাঁহার ঋষিজনোচিত দূরদর্শিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতের অপর প্রধান অধিবাসীর সহিত অবিরত প্রতিযোগিতা না করিয়া চলিলে মুসলমানসমাজে যথেষ্টরূপে শিক্ষার বিস্তার হইবে না, মুসলমানসমাজের জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হইবে না, তাই এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের জীবন অনন্ত সময়ের তুলনায় অতি ক্ষণস্থায়ী নতুবা তাঁহার নিকট হইতে আমরা সাধারণ শিক্ষারও একটা আদর্শ লাভ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে হয়ত আমাদিগকে এই শিক্ষা-সঙ্কটে পড়িতে হইত না। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু দরিদ্র মুসলমানছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়াছে বলিয়া গৌরব করিতে পারে। এই গৌরবের মূল কারণ মহাত্মা হাজী মোহসেন প্রদত্ত বৃত্তি। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া স্বজাতি-হিতৈষী ধনী মুসলমানগণ যদি এইরূপে উচ্চশিক্ষার প্রসারতা লাভের জন্য বহু বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং মুসলমান বালকদিগকে যদি হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিক্ষিত হইতে অবসর প্রদান করেন, তাহা হইলেও আশানুরূপ ফললাভ হইতে পারে এতৎ সম্পর্কে তাঁহারা আর একটি কাজ করিতে পারেন। আলীগড় কলেজকে আদর্শ করিয়া দেশের নানাস্থানে উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন, এবং সেই বিদ্যামন্দির গুলি হিন্দু-বালকের জন্যও অবারিত রাখিতে পারেন ; তবে তাহাতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য সাধারণ অধ্যাপনার পরেও একটু বিশেষ যত্ন লিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বিগত জুলাই মাসে আলীগড় কলেজের ইংলণ্ডপ্রবাসী পুরাতন ছাত্রবর্গ লণ্ডনে একটি সান্ধ্য-সমিতি আহ্বান করেন। মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ আমির আলী সাহেব তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সভাতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে

বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় শাস্ত্র-পারদর্শী প্রখ্যাতকীর্ত্তি পণ্ডিতগণ বাহির হইয়াছেন। ইঁহাদের পরেও অনেক হিন্দুযুবক হিন্দুসাহিত্যাদিতে বিলক্ষণ অধিকার লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছেন। মেধাবী মুসলমানছাত্রও তথায় নিজ সাহিত্যে তাদৃশ অধিকার কেন লাভ করিবেন না বুঝি না। ফলতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রয়াস মুসলমান-সমাজের নিরর্থক শক্তিব্যয়। ইহাতে বিশেষ উপকার কিছুই হইবে না, কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা প্রভূত। ক্রমে তাহার আলোচনা করিতেছি।

মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় নামের কোনও সার্থকতা রক্ষিত হইলে নবযুগো-চিত পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্কীর্ণভাব সংঘটন অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহা হইলে মুসলমানসমাজের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সুপ্রাচীন সভ্যতা-বিশিষ্ট স্বাধীন জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়েও পাশ্চাত্যবিদ্যার অতি প্রাবল্য, এবং তাহাই জাপানের উন্নতির সোপান। হিন্দুদিগের আধুনিক যে উন্নতি মুসলমানসমাজের বিশেষ লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফল নহে। ইদানীং যাহাকে ধর্ম্মহীন শিক্ষা বলিয়া উপহাস করিবার রীতি প্রচলিত দেখা যায়, ইংরেজী বিদ্যালয়ে সেই শিক্ষালাভ করিয়াই হিন্দু-দিগের এই উন্নতিটুকু হইয়াছে। যাঁহারা বৃত্তির আশায় বা ১২৲ টাকা বেতন

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করিয়া মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। বস্তুতঃই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানের নিকট ইহা নানা কারণে Alma mater রূপে পরিচিত হইতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে শৈশবে যেসব পুস্তক মুসলমান বালকগণ সাধারণতঃ অধ্যয়ন করিয়া থাকে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের আদর্শ লইয়া লিখিত; হিন্দু বালকের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী সত্য, কিন্তু মুসলমান বালকের হৃদয়ে তাহা বিষময়ফল উৎপন্ন করে। সেই সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের সমাজের বহু বালকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়, তাহারা নিজের ধর্ম্মের, নিজের জাতির কোনও বিষয় অবগত না হওয়া মনে করে যে তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই। এরূপ শিক্ষা মুসলমানসমাজের পক্ষে বড়ই অহিতকর। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে মুসলমানের শিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তকের পরি-বর্ত্তন আবশ্যক। যেসব পুস্তকে কেবল হিন্দুরই কথা থাকিবে, মুসলমানের কথা থাকিবে না, এমন সব পুস্তক পাঠ্য-তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে। হিন্দুমুসলমান উভয় জাতির বিষয় যেসব পাঠ্য পুস্তকে থাকিবে কেবল তাহাই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র মুসলমানসমাজ হইতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি হিন্দুমুসলমানে সম্মিলন একান্ত প্রার্থনীয় হয়, তবে দেশের মুখের দিকে চাহিয়া সাম্প্র-দায়িক স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, সহৃদয় হিন্দুদেরও এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত। হয়ত হতভাগ্য দেশের মুখ ইহাতে একটু প্রসন্ন হইতে পারে। এই উপলক্ষে, হিন্দুভ্রাতাদের আর একটা কথা জানিয়া রাখা উচিত যে হিন্দুমুসলমানে সম্মিলন প্রয়াসী,

এড়াইবার জন্য অথবা কদাচিৎ অল্প বয়সে ভর্ত্তি হওয়ার দরুন পরিণামেও সংস্কৃত কলেজে নাম রাখেন, কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে হিন্দুসমাজের অগ্রণীগণ টোল অথবা সংস্কৃত কলেজে গঠিত হন নাই। এস্থলে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতি সাধারণ নিয়ম প্রযুজ্য নহে; তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যালয়ের সাহায্যও তত আবশ্যক নয়। যাহা হউক, বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতকলেজ মাত্র একটি; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি নানা স্থানে অনেক মাদ্রাসা আছে। এই সকল ন্যূনাধিক সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে স্ব স্ব সন্তানদিগকে প্রেরণ করিয়া মুসলমানগণ তাঁহাদের মধ্যে আধুনিক আদর্শ ও চিন্তাস্রোত প্রবেশের প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন। ইহার উপর যদি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টাই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, তবে মুসলমানগণ আরো পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবেন সন্দেহ নাই।

মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে একটা সহস্রবার পুনরুক্ত অতি পুরাতন কথা আছে। অধুনা এদেশের শিক্ষা প্রণালী ধর্ম্ম হইতে বিয়োজিত। গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত রীত্যনুসারে তাহার অন্যথা করাও সাধ্য নাই। এই অভাব দূরীকরণাভিপ্রায়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষাদানার্থ মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অত্যাবশ্যক।

হইলেও মুসলমানগণ তাহাদের "মুসলমানত্ব" বিসর্জ্জন দিয়া কখনই তাহা করিবে না। যদি এসব বিষয়ে একটা কূল কিনারা না হয় তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই মুসলমানদিগকে হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং সেই অবস্থায় 'মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন একরূপ অনিবার্য্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার আর একটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে হিন্দুরই একাধিপত্য। Faculty গুলিতেও হিন্দুরই রাজত্ব। যেই দিন হইতে State Scholarship বিতরণের ভার হিন্দুর হাতে পড়িয়াছে, সেইদিন হইতেই মেধাবী মুসলমানছাত্র তাহা লাভে বঞ্চিত। এসব বিষয়েও অনেক সময়ে সুপারিশের জোরে একজন ভাল ছাত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহা হইতে নিকৃষ্ট ছাত্রকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। আমরা জানি একবার জনৈক প্রতিভাশালী মুসলমানছাত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অপরকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছিল। সে আজ বড় বেশীদিনের কথা নয়। এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইলে সেই মুসলমান যুবকটির সিবিলসার্ব্বিস পাশ করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। মধ্যে মধ্যে মেধাবী মুসলমানছাত্রদিগকেও এই বৃত্তি দান করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা কি উচিত নহে? বিশেষতঃ, ইহা সম্প্রদায় বিশেষের বৃত্তি নহে, ইহা গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত বৃত্তি, ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার। ইহাকে সাম্প্রদায়িক করিয়া লইলে আর ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল কই? এই সমুদয় এবং এবম্বিধ অন্যান্য কারণেই মুসলমানগণ ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তখন গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই রাজকীয় বৃত্তিগুলি বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। নঃ সঃ।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা বড় চিত্তাকর্ষক কথা; কিন্তু ইহার অর্থ নির্ণয় অতি কঠিন। ধর্ম্মশিক্ষা অর্থ ঈশ্বরে ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা প্রভৃতির শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গণিত, ভূগোল প্রভৃতির ন্যায় এই সকল অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না—প্রত্যেক ব্যক্তিকে কঠোর সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। কাজেই বিদ্যালয়ে তাদৃশ ধর্ম্মশিক্ষার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু সুকুমারমতি বালকদিগকে এই সকল বিষয়ের বড় বড় কথা শুনাইয়া ইঁচড়ে পাকা জ্যাঠা মহাশয়গণে পরিণত করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে লঘু হৃদয়, প্রফুল্ল বালক রাখাই সঙ্গত।

ধর্ম্মশিক্ষার আর এক অর্থ সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা চারিত্রিক গুণের শিক্ষা হইতে পারে। বর্ত্তমানে অধীয়মান গ্রন্থ সমূহে এই সকল বিষয়ে উপদেশ যথেষ্ট আছে। শিক্ষকদিগকে তৎপ্রতি অধিকতর মনোযোগী করাই এ সম্বন্ধে একমাত্র সুপন্থা। সেজন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও ছাত্রদিগের চরিত্রের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ ভিন্ন আর কি বন্দোবস্ত দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে? অধিকন্তু এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও মুসলমান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থিত হইতে পারেনা। সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা প্রভৃতি হিন্দুর এক, মুসলমানের আর নয়।

বোধহয় ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষপাতিগণের উদ্দেশ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন; তাই ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক বটে। কিন্তু বিচার শক্তিহীন বালকদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীর বিষয় সমূহ শিক্ষা দিলে সমাজের উন্নতি অপেক্ষা অবনতির সম্ভাবনাই অধিক।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর যুক্তি তর্ক চলেনা, বিশ্বাস সহকারে তাহা গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষা অঙ্কুরেই যুক্তিশক্তিকে বিনাশ করিবার অমোঘ অস্ত্রবিশেষ।

পৃথিবীতে বোধ হয় এমন ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই, যাহার অন্ততঃ কিছু কুসংস্কার, কিছু গোঁড়ামি বা ধর্ম্মান্ধতা না আছে। বস্তুতঃ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ব্যতীত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষায় কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় হইয়া থাকে। পরিণত বয়সে স্বাভাবিক শান্তভাব সুপরিস্ফুট বিচারশক্তি ও বহুদর্শিতা বশতঃ তাহাতে বিশেষ ক্ষতি না হইতে

পারে, কিন্তু বালকদিগের মস্তিষ্কে ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে ঘোর অনর্থপাতের সম্ভাবনা। *

ধর্ম্মান্ধতার ফল কোথাও শুভকর দেখিনা। ধর্ম্মান্ধতায় স্পানিয়ার্ডগণ আপনাদের উচ্চপদবীভ্রষ্ট ; ধর্ম্মান্ধতায় মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের আরম্ভ। অতএব ইদানীং বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্মান্ধতার একটা আলোচনা শুনিতেছি, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাহার অনুমোদন করা হিন্দুমুসলমান কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ফলাফলে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই বর্ত্তমান। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা অর্থাৎ বাইবেলের অধ্যাপনা হয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব বাইবেলের অতি উচ্চশিক্ষা। কিন্তু কোন্ ইংরেজ শ্বেতাঙ্গ ও নেটিভের ভ্রাতৃত্ব বা সমতা স্বীকার করেন? বৈরাগ্যও খ্রীষ্টধর্ম্মের একটি শিক্ষা বটে। কিন্তু ইয়োরোপের ত্রিসীমানায়ও বৈরাগ্যের লেশ মাত্র আছে বলিয়া ভাবিবার অবসর আমরা পাই না। মহর্ষি ঈষা শান্তি সংস্থাপকগণকে অভয়বাণী শুনাইতেছেন। কিন্তু সেই সুসমাচারের প্রচারক-গণ নিরন্তর পরধর্ম্মের তীব্রনিন্দা দ্বারা অশান্তি সংঘটন এবং পিতা মাতার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়া দুই একটা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বালক বালি-কাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করি-তেছেন। যখন দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পাদ্রী সাহেবেরা বাইবেলের দোহাই দিয়া সেই ঘোর নিষ্ঠুরতার সমর্থন করিতেন। আশৈশব বাইবেল পাঠের ফল যদি তাঁহার উপদেশের প্রতি ঈদৃশ অনুরাগ হয়, তবে আর এদেশে ধর্ম্মশিক্ষার বিড়ম্বনা কেন?

---

* আমাদের মতে ধর্ম্মহীন শিক্ষা কিছুই নয়। ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে দেশে দিন দিন আত্মহত্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধি পরীক্ষায় উচ্চস্থান প্রাপ্ত যুবককে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া আমরা বিশেষ ম্রিয়মান হই, তখনই ইহার বিষময় ফল অনুভব করিতে পারি। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কিছু ধর্ম্মশিক্ষা যুক্ত থাকিলে শিক্ষা আরও পূর্ণাঙ্গ হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে শিশুকে শিশু-প্রযোজিত শিক্ষাই দিতে হইবে। ধর্ম্মান্ধতা দোষাবহ, কিন্তু ধর্ম্মের উদার মতগুলি অল্প অল্প করিয়া সমাজের ভবিষ্যত আশাস্থল বালক-বৃন্দকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহা হইতে বহু মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি বক্তব্য আছে। আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে যদি আমরা সময়োচিত স্বধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা প্রদান করিয়া একটু উন্নত করিয়া লইতে পারি, তবে তাঁহাদের হস্তেই শিশুদের প্রথম ধর্ম্মশিক্ষার ভার ন্যস্ত করা যায়, এবং তদ্দ্বারাই অধিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ভরসা করি, আমাদের সমাজহিতৈষীগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইবেন। নঃ সঃ।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার সমধিক অনুপযোগিতা আছে। পারস্যের ন্যায় যে দেশের সমুদয় অধিবাসী এক ধর্ম্মাবলম্বী, তথায় সাম্প্রদায়িক শিক্ষা তত অনিষ্টকর না হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মের মিলনভূমি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ঘোর বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে। সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে আমরা ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িক হিংসাদ্বেষাদি বিস্মৃত হইতেছি ভারতহিতচিকীর্ষু ব্যক্তি কদাপি তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিবেন না। করিলে, হিন্দুমুসলমানের মিলন আশা অঙ্কুরেই চিরবিনষ্ট হইবে।

মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুতেই শক্তিলাভ করিতে পারিবনা, একথা আমাদের বুঝিতে বাকী নাই। মুসলমানগণও চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে আমাদের সাহচর্য্য ব্যতীত তাঁহাদের ও ভদ্রস্থতা নাই। অন্ততঃ যতকাল হিন্দু ও মুসলমানদিগের বর্ত্তমান সংখ্যার অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন না হয়,—যদি হিন্দুজাতি লুপ্তপ্রায় এবং মুসলমানজাতিই মোটের উপর ভারতের একমাত্র অধিবাসী না হন, অথবা যদি মুসলমানজাতি লুপ্তপ্রায় এবং হিন্দুগণই ভারতের একমাত্র অধিবাসী না হন,—তবে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলন ব্যতীত কোন সম্প্রদায়েরই প্রকৃত মঙ্গল ও উপযুক্ত বল সঞ্চয় হইতে পারেনা। অতএব সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দ্বারা হিন্দুমুসলমানের মিলনের প্রতিবন্ধকতা জন্মান কাহারও কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু তাহা আত্মহত্যাবৎ।

বিদ্যালয়ে গঠিত বন্ধুতা পরবর্ত্তী জীবনেও কার্য্যকরী হয়। ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রেও নাকি তাদৃশ বন্ধুতার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি এই বন্ধুতা সংগঠন সম্ভাবনা কাহারও কাহারও মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি প্রধান উপকার। * হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ একই

* ইংলণ্ড আর আমাদের দেশ এক নয়। তথায় ছাত্রগণ সাধারণতঃ বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া থাকে। একত্র আহার বিহার ও একত্র অধ্যয়ন এবং একই ধর্ম্মমত পোষণের ফলে তাহাদের মধ্যে জীবনব্যাপী বন্ধুতা সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ হওয়া একান্ত অসম্ভব। একই বিদ্যামন্দিরের, এমন কি একই শ্রেণীর হিন্দুছাত্রগণ অনেক সময়ে মুসলমানছাত্রদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে। গৃহের শিক্ষার প্রভাব তাহারা কোন রকমেই এড়াইতে পারেনা। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও অনেক সময়ে হিন্দুমুসলমান ছাত্রে সখ্যতা স্থাপিত হয় এবং তাহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অটুট থাকে। ইহার কারণ আমরা সহজাত প্রবৃত্তি ধরিয়া লইতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দু পিতামাতাগণ যদি মুসলমানজাতির প্রতি একটু উদারমত পোষণ করেন, তাহা হইলেই হিন্দুমুসলমানছাত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব জীবনব্যাপী হইতে পারে। এবং তদ্দ্বারা দেশেরও বহু সুমঙ্গল সাধিত হওয়ার কথা। নঃ সঃ।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অবসর পায়। এইরূপে কালক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের একটা সহজ সুপন্থা প্রস্তুত হইতে পারে। তাই সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় স্থাপন-দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান বালকদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অশুভকর মনে করি।

এই সকল কারণে আমরা মুসলমানভ্রাতাদিগকে মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। আশা করি তাঁহারা আমাদের কথা একটুক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উপসংহারে আমরা আর দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শিক্ষা বিস্তার কল্পে মুসলমানগণ এখন যে সভাসমিতি করিতেছেন, তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু রিজলিউশনে শিক্ষা বিস্তার হয়না। সম্পন্ন হিন্দুগণ দুঃস্থ আত্মীয় এবং (অনেক স্থলে) অনাত্মীয়দিগের শিক্ষাকল্পে যেরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করেন, মুসলমানগণও সেইরূপ না করিলে কখনও শিক্ষা সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ অগ্রসর হইতে পারিবেন না।* এজন্য মুসলমানদিগকে অনেক অনাবশ্যক ব্যয় ও দাসদাসীর সংখ্যা কমাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহদত্ত দুই চারিটা ডেপুটী বা সবডেপুটীগিরি, সবরেজিষ্টারী বা সবইন্‌স্পেক্টরীতে ১২ কোটী মুসলমানের কিছুই আসিয়া যায়না। আত্মাবলম্বন ব্যতীত তমসাচ্ছন্ন এই বিপুল জন সঙ্ঘের উন্নতির দ্বিতীয় পন্থা নাই। †

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* আমাদের সমাজে আত্মীয় বাৎসল্যের বড়ই অভাব। দরিদ্র আত্মীয়কে সাহায্য করা শাস্ত্রের বিধি; কিন্তু তাহা কয়জন সম্পন্ন মুসলমান মানিয়া চলেন? অন্য কোন বিষয়ে না হউক শিক্ষা বিষয়ে দরিদ্র আত্মীয় বালকদিগকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। দু এক জন যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহারা বহু দরিদ্রের দারিদ্র ক্লেশ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্যাদর্শ মতে চলা কি অপরেরও কর্ত্তব্য নহে? সঃ সঃ।

† আমরা এই প্রবন্ধের লিখিত বিষয়ের গভীর আলোচনার জন্য আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে আহ্বান করিতেছি। আমাদের সমাজের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বন প্রশস্ত, কোন পথ বিপদসঙ্কুল, তাহা স্থির করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এই স্বর্ণ-সুযোগ কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আজকাল আমাদের সমাজের চারিদিক হইতেই শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব সূচনাতেই আমাদিগকে যথেষ্ট বিচার বিতর্ক দ্বারা প্রকৃত পথ স্থির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতেই সমাজের অধিক মঙ্গল সাধিত হইবে। সঃ সঃ।

সম্রাট আওরঙ্গজেব।

(পূর্ব্বাভাষ)

মোসলেম-কুলতিলক মহামতি ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রম বিশ্বাস আছে। সত্য কথা বলিতে গেলে হিন্দুরা তাঁহাকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে নরপিচাশের আসনে আসীন করিতেও কুণ্ঠিত হন না এবং তাঁহার স্বভাবের 'উজ্জ্বল দিকটার' কথায় হিন্দুরা অনেকেই কানে তুলা দিয়া থাকেন। সংসারে প্রত্যেক লোকেরই স্বভাবের দুইটি দিক আছে। একটি উজ্জ্বল; অপরটি মলিন (Bright and Dark sides) অর্থাৎ দোষ এবং গুণ। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার চরিত্রের মলিন দিকটাই ইচ্ছা পূর্ব্বক বেশী করিয়া দেখিয়া থাকেন। আওরঙ্গজেবের প্রতি ঘৃণা তাঁহাদের মধ্যে সচরাচর এরূপ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা অনেকেই সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মার চরিত্র সম্বন্ধে আগাগোড়া কিছু না জানিয়াও ভ্রম পূর্ণ ধারণা হৃদয়ে স্থান দেন। অধিকন্তু তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞান সামান্য। জগতে চন্দ্রও কলঙ্ক হীন নহে। আমরাও সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত দোষ ছিলনা বলিয়া অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু সেই দোষগুলি তাঁহার গুণের অনুপাতে অতি বিরল এবং বলিতে গেলে একজন সম্রাটের পক্ষে তাহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। যদি কোন সহৃদয়, নিরপেক্ষপাতী হিন্দু পাঠক তাঁহার গুণের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন তাহা হইলে তিনি আওরঙ্গজেবকে নিশ্চয়ই 'দেবতা' নামে আখ্যাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেক দেবতারও যে সকল গুণ ছিলনা আওরঙ্গজেবের চরিত্রে তৎসমুদয়ের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এবং অনেক দেবতার চরিত্রে যে সকল দোষ বিদ্যমান আওরঙ্গজেবের চরিত্রে তাহা অতি কম পরিমাণে ছিল। এতগুলি শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী হইয়াও আওরঙ্গজেব কেন 'দেবতা' পদ লাভে বঞ্চিত? উত্তর স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, যদি তিনি হিন্দুদের পরামর্শানুসারে চলিতেন এবং হিন্দুদের হাতে ক্রীড়াপুত্তল হইয়া থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি 'দেবতা' নামে অভিহিত হইতেন। যে হিন্দুরা আকবরকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিতেন সেই হিন্দুরাই আও-

রঙ্গজেবকে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চাসনে অবস্থিত করিতেন সন্দেহ নাই। আওরঙ্গজেবের দোষ তিনি হিন্দুদের ক· ·গুলি আব্দার রক্ষা করেন নাই। আকবর,জাঁহাগীর,শাহ্‌জাহান ইঁহারা সেগুলি রক্ষা করিয়া "জগদীশ্বর" হইয়াগিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই হিন্দুরমণীর (রাজপুত) পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় শ্যালকদিগকে অনেক উচ্চপদে অভিষিক্ত করেন। শ্যালক পক্ষের ক্ষমতা অতিশয় প্রবল। কথায়ও বলিয়া থাকে "নিজের ভাই ফিরে বাড়ী; স্ত্রীর ভাই চড়ে গাড়ী।" আকবর হইতে শাজাহাঁর রাজত্ব পর্য্যন্ত বলিতে গেলে হিন্দুরাই প্রকৃত সম্রাট ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিয়া বেড়াইতে পারিতেন; তাহার আর প্রতিকার ছিলনা। কেননা তাঁহাদিগের প্রায় অনেকেই সম্রাটের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী; বিশেষতঃ সম্রাটের শ্যালক, শ্যালকপুত্র বা শ্যালকদের আশ্রিত ব্যক্তি। সম্রাটদের কাছে তাঁহাদের সাত খুন মাফ ছিল। ধর্ম্মপরায়ণ আওরঙ্গজেব কিন্তু হিন্দুদের এ সব অবৈধ আব্দার রক্ষা করেন নাই। হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের সুন্দরী ভগ্নীদিগকে সম্রাট আলমগীরের কাছে বিবাহ দিয়া ভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই। এবং সেই সময়ে রাজভাণ্ডার লুণ্ঠনেরও কোন সুবিধা ছিলনা, কারণ আওরঙ্গজেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট সকলেই ধরা পড়িত। তাই হিন্দুভ্রাতারা আওরঙ্গজেবকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যে হিন্দুরা এখন জাতীয় অহঙ্কারে এবং ঘৃণায় মুসলমানের ছোঁয়া জলের হুকায় তামাক পর্য্যন্ত খান না সেই হিন্দুরাই কি প্রকারে আবার "বিধর্ম্মী যবন"কে সুন্দরী ভগ্নীদানে আপ্যায়িত করিতেন বুঝা যায় না। যাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে নিজ ভগ্নীদিগকে "ঘৃণিত ম্লেচ্ছের" পায়ে উপহার দিতেন তাঁহারা পিশাচ, না তাঁহাদের ঘৃণিত প্রস্তাবের অসমর্থনকারী পরমধার্ম্মিক আওরঙ্গজেব পিশাচ? মোগল এবং পাঠান বংশের মধ্যে (হিন্দুরাও বাদ যাইতে পারেন না) আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ দোষী অনেকেই আছেন। এই সকল সম্রাটদিগকে "নরপিশাচ" না বলিয়া সুধু আওরঙ্গজেবকে কেন "নরপিশাচ" বলা হয় ইহার উত্তর কোন শিক্ষিত হিন্দুভ্রাতা দিতে পারেন কি?

হিতোপদেশের একটি শ্লোক আছে, "লোকের দোষ ছাড়িয়া গুণ গুলি দেখা মহতের কার্য্য।" তবে যাঁহারা আওরঙ্গজে[illegible]
দোষগুলি দেখেন তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর উপযুক্ত
গুণ দেখিয়া থাকেন ঐ সকল তাঁহাদের অনে

চাহেনা। কেননা আলমগীরের নিকট তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ (অন্যায়ের জন্য) যে প্রকারে অপমানিত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার দোষ ভিন্ন গুণ হিন্দু তাহাদের হাতে না উঠিবারই কথা। সত্য সর্ব্বদাই অপ্রিয়। হিন্দুরা যে প্রকারে যুক্তিহীন, প্রমাণবিহীন মিথ্যা কথা দ্বারা আমাদিগকে লাঞ্ছনা দিয়া থাকেন আমরা যদি সত্য দ্বারাও তাহার শতাংশের একাংশ করি তবে তাঁহারা চারিবেদের দোহাই দিয়া গলায় অঙ্গুলি প্রদান করতঃ চীৎকার করিতে থাকেন। তাঁহাদের মুখের দিকেও চাওয়া যায় না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনী বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে যে প্রকারে অনেক সংকীর্ণ-মনা, পক্ষপাতী এবং অজ্ঞ 'ঐতিহাসিকের' (?) হস্তে মহাত্মা আলমগীর 'নর-পিশাচ' রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন তাহারই প্রতিবাদ করা এবং সাধারণের সম্মুখে তাঁহার স্বভাবের প্রকৃত ছবি ধরিয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবল আবশ্যক স্থলে আমরা তাঁহার জীবনের অংশ বিশেষের মাত্র বর্ণনা প্রদান করিব।

বিবাদ।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ সম্রাট শাহ্জাহানের মৃত্যু-সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এই সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শুজা বাঙ্গালায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে ছিলেন। সম্রাট জ্যেষ্ঠ দারাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। এইজন্য তাঁহাকে মলতান ও কাবুলের নাম মাত্র শাসনকর্ত্তা করতঃ তথায় তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের নিকটেই রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই দারাতে সম্রাটের অসীম পক্ষপাতী স্নেহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কান্দাহারের শেষ যুদ্ধের পর তিনি দারাকে "শাহ্বোলন্দ ইক্‌বাল" উপাধি প্রদান করেন এবং তৎসঙ্গে ৫০০০০৲ টাকা মূল্যের একগাছি হীরার হার ও ৩৩০০০৲ টাকা মূল্যের সাজ সজ্জা উপহার দেন। রাজকীয় সিংহাসনের সম্মুখে বহুমূল্য হীরক মণ্ডিত একখানি আসন দারার জন্য সম্রাট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং দারা ভিন্ন সম্রাট পরিবারের অন্য কেহই সম্রাট-সম্মুখে বসিতে পাইতেন না। শাহ্জাহান যে দারাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ইহা অপেক্ষা তাহার আর কোন স্পষ্টতর প্রমাণ আবশ্যক করেনা। * এইরূপে সম্রাটের প্রশ্রয় পাইয়া দারার যথেচ্ছাচার চরমে উঠিয়াছিল এবং যখন শাহ্-

* Lanepooles' Aurangazeb, P. 39.

জাহান বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন তখন উহা আরও প্রবল হয়। সুতরাং তখন দারা যাহা করিতেন তাহাতে সম্রাট আর দ্বিরুক্তি না। তাহাতেই সুবিধা বুঝিয়া দারা সম্রাটের মৃত্যু এবং নিজেকে সম্রাট করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যের কাগজ পত্র পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ সম্রাটের মৃত্যুর জনরব একেবারেই অলীক। তিনি সামান্য রকম পীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়াও অনেকে স্বীকার করেন না। তবেই ইহা যে সম্রাট এবং দারার অভিষ্ট ষড়যন্ত্র ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শৈশব হইতেই আওরঙ্গজেবের অবিচলিত ঈশ্বরভক্তি এবং ধর্ম্মভাব যে কালে যথেচ্ছাচারী অবিশ্বাসী দারার সিংহাসনের পথে কণ্টক হইবে সুচতুর শাহ্‌জাহান তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি আলমগীরকে দূরে—অতি দূরে—দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়া কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত ছিলেন। যখন দেখিলেন শুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ তিন জনেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন তখন সম্রাট উক্ত অভিষ্ট ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করেন। তিনি অনেক দিন যাবত দরবারে আসিলেন না। ইহাতেই সকলে মৃত্যু প্রকৃত বলিয়া বুঝিলেন।

এদিকে সম্রাটের মৃত্যু রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হইল। শুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ তিন জনেই অবিলম্বে স্ব স্ব রাজ্য হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা দারাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এখানে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করা একান্ত দরকার। এই সময়ে (১৭৫৭ খৃঃ) দারার বয়স ৪২, শুজার ৪১, আওরঙ্গজেবের ৩৯ এবং মুরাদের ৩৪ ছিল। বার্ণিয়ার বলেন (Bernier) বলেন, দারা অতিশয় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু তিনি খুব তোষামদপ্রিয় ও অহঙ্কারী ছিলেন। তিনি কাহারও উপদেশে প্রায়ই কর্ণপাত করিতেন না; সর্ব্বদাই যথেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি বাহিরে কেবল নাম মাত্র মুসলমান ছিলেন কিন্তু প্রকারান্তরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা বলিত তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাই স্বীকার করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ মত ছিলনা। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের নিকট দার্শনিক মত শিক্ষা করেন এবং কতক যীশুখ্রীষ্টের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি আরও বলিতেন যে, "হিন্দুয়ানী (কাফেরী) এবং ইস্লাম জমকভগ্নী স্বরূপ।" ইহার জন্যই সত্য কথা বলিতে গেলে তিনি পরম ধার্ম্মিক আলমগীরের চক্ষের কণ্টক হইয়াছিলেন।—মোটের উপর বার্ণিয়ারের

দারা একজন অদ্বিতীয় কবি বা দার্শনিক হইতে পারিতেন কিন্তু
...ীর সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ভারতের রাজদণ্ড পরিচালনা করিবার
...াক ছিলেন না। ভারতের অতীব দায়ীত্বপূর্ণ সিংহাসন লাভ করিয়া
...াট হইতে পারেন এরূপ কোন গুণই দারাতে ছিল না। বস্তুতঃই তিনি
অতিশয় দুর্ব্বলমনা লোক ছিলেন।

শুজার চরিত্র দারাপেক্ষাও খারাপ ছিল বলিয়া দেখা যায়। অন্দর মহল তাঁহার কারাগার স্বরূপ ছিল। তিনি অনবরত হেরমস্থ কামিনীকুল-বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন এবং রাত্র দিন কেবল নাচগানে রঙ্গমহলে আমোদ প্রমোদ করিতেন, দরবারে মাত্রও বসিতেন না। এজন্য তাঁহার বাঙ্গলাস্থ প্রজাগণও তাঁহার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কি প্রকারে হিন্দুদিগকে ঘুষ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয় তাহা তিনি বেশ ভালমতে অবগত ছিলেন। * শুজাও একজন দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতএব বার্ণিয়ারের (Bernier) মতে তিনিও সম্রাট হইবার উপযুক্ত ছিলেন না।

সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরাদ শুজাপেক্ষাও নীচ প্রকৃতির ছিলেন। তিনি বীর-কেশরী ছিলেন বটে কিন্তু রাজকার্য্য বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। মদ তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বস্তু ছিল। তাঁহার মত মদ্যপায়ী দ্বিতীয় ছিলনা। † তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তা থাকিতে মুসলমানধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। উপপত্নী রক্ষাও তাঁহার আর একটি প্রধান দোষ ছিল। এই অবস্থায় মুরাদও যে ভারত-সিংহাসনের উপযুক্ত ছিলেন না ইহা সকলকেই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র মোসলেম-কুল-রবি মহাত্মা আওরঙ্গজেব (আবুল মোজাফ্ফের মহীউদ্দীন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব-ই-আলমগীর) ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর আলওয়ার প্রান্তস্থিত ধুদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে সাধারণ মুসলমান বালকদের ন্যায় মাত্র কোরাণ শরিফ এবং আরবী ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। তখন রাজাদের ছেলেদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বড় মনোযোগ দেওয়া হইত না। সুতরাং আওরঙ্গজেবও কোন প্রকারে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম যেন কে কোথা হইতে তাঁহার অন্তরে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি কায়মনে সদা সর্ব্বদা

---

* Bernier's Travels, (Arch. Constable and Co.) pp. 7, 8.

† Rulers of India Servis, Aurangzeb. p. 25.

ঈশ্বরের পূজা করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর তখন তিনি দাক্ষিনাত্যের গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার তত মনোযোগ ছিলনা। তিনি জীবনকে এক অতি গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে করিতেন, তাই ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী বেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করেন। (Docter Fryer তাঁহাকে তথায় দেখিয়াছিলেন) ইহাতে সম্রাট শাহ্জাহান তাঁহার প্রতি অতিশয় কুপিত হন। তিনি তাঁহার বেতন বন্ধ করিয়া শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ হইতে অপসারিত করেন। এইরূপে ধার্ম্মিক ফকীরের মত জীবন যাপন করা শাহ্জাহানের অনুমোদিত না হওয়ার অনেক কারণ আছে। কেননা তিনি তাঁহার মত পুত্রদিগকেও হিন্দুর হাতের ক্রীড়াপুতুল করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ত একটা কিছুই নহে। কেবল রাজপুত বিবাহ করিয়া বিধর্ম্মী, অত্যাচারী, স্বার্থপর, মতলবী হিন্দুদিগকে লইয়াই আমোদ প্রমোদ করিতে পারিলেই হইল। এই অবস্থায় দারাও আওরঙ্গজেবকে "ফকীর" বলিয়া অনেক প্রকার ঠাট্টা করেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি দারার বিদ্বেষ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক সম্রাটের এই সকল ভয়প্রদর্শন স্বত্বেও আলমগীর তাঁহার নির্জ্জন বাস হইতে বাহির হইলেন না। তিনি বলিতেন, "সংসারে, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কিছুই অন্তিমে কার্য্যকরী হইবার নহে। একমাত্র ঈশ্বরই যখন সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় সকল জীবের সহায় তখন ঈশ্বরের পূজাই সকলের করা বাঞ্ছনীয়। পিতা আমার বেতন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ঈশ্বরই আমার পরিবারের জীবন রক্ষা করিবেন। যদি সংসারে আমার কিঞ্চিৎমাত্রও আকাঙ্খা থাকিত তবে আমি স্বুবর্ণপর্য্যাঙ্ক ছাড়িয়া একমাত্র ব্যাঘ্রচর্ম্মকে আমার শয়নস্থান মনোনীত করিতাম না। যে পর্য্যন্ত সময় না হয় সে পর্য্যন্ত আমি এই নির্জ্জন স্থান হইতে বাহির হইবনা।" এ অবস্থায় কয়েক বৎসর পশ্চিমঘাটে থাকার পর হঠাৎ একদিন তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। শাহ্জাহান সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা করিলেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুকুশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বলখ্ এবং বদখ্শানের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে উন্নীত হন এবং মনসব্দার উপাধী পান। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উজবেগ এবং পার্সীদিগের সহিত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি অসীম ধার্ম্মিকতার এবং সাহসের পরিচয় দেন। এই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অধিনস্থ সৈন্যাধক্ষেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ছিলেন না। এখন তাহারা

বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের যুবরাজ একজন নিতান্ত শান্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক; তাঁহার সমকক্ষ ভারতে আর একটিও নাই। যখন তাহারা আলমগীরকে উজবেগদিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে পরমেশ্বরে অতীব বিশ্বাস করিতে এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও তাঁহার নিয়মিত নমাজ ত্যাগ না করিতে দেখিয়াছিল তখন তাহারা তাঁহাকে খুব ভাল মতে চিনিয়াছিল। তাঁহার অবিচলিত ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া তাহারা মনস্থ করিল যে, যে সময়ে যে অবস্থাতেই হউক তাহারা এ প্রকার ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ন এবং দয়ালু যুবরাজের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। এই সময় হইতেই আলমগীর একজন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)

এস্, এম্, এ, আহাদ।

বিচারক বিচারাধিনে।

("বান্ধব" ও সমালোচনা)

বলা বাহুল্য, রায় বাহাদুর বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের লেখক-শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রাণে একদিকে যেমন ভাবলহরী খেলে, তাঁহার তুলিতে অন্য দিকে তেমনি তাহা সুচিত্রিত হয়। তিনি একজন সিদ্ধহস্ত সৌভাগ্যবান লেখক বলিয়া সকলেই তাঁহার যথাসাধ্য অনুকরণ এবং সাহিত্য সমালোচনায় তাঁহাকে সুবিচারক বলিয়া শ্রদ্ধা করে। বাস্তবিক তৎকৃত সমালোচনা নিতান্ত মূল্যবান বলিয়া আমরা অতীব মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিয়া থাকি। পুনঃপ্রচারিত বান্ধবের ২য় খণ্ডের ৪র্থ, ৫ম সংখ্যায় যে কয়েক খানি সাময়িক পত্রের সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা পাঠান্তে বান্ধবের প্রবন্ধ গুলিও একবার সমালোচকের চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা হয়। আমরা বান্ধবের সমালোচক একথা আদৌ অশোভনীয় হইলেও, বঙ্গভাষা গঠনে বান্ধবের যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা মনে করিয়া, বান্ধব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা ভরসা করি অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবেনা।

বান্ধব আদর্শ,—আদর্শের দোষগুণ অনুকারীগণের লেখাতে অবশ্যই প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব; তজ্জন্য বান্ধব সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত কথাগুলি পড়িয়া উক্ত আদর্শে সংশোধনীয় কিছু আছে কিনা রায় বাহাদুর নিজেই সরল ভাবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা এবং এই প্রবন্ধটি লিখিবার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা সাধারণভাবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিব। রায় বাহাদুর সত্যই বলিয়াছেন,"এদেশে প্রতি বৎসরই দুই একখানি পুরাতন পত্রিকা কালস্রোতের প্রবল ভাটায় ভাসিয়া যায়।" আমাদের মতে সাধারণের উৎসাহও সহানুভূতির অভাব অথবা পত্রিকা সম্পাদনে অমনোযোগ ও অযোগ্যতা এরূপ ঘটিবার প্রধানতম কারণ। আমরা জানি কালস্রোতের বিষম ঘূর্ণনে একদিন বান্ধবেরও এই দশা ঘটিয়াছিল। শুধু ভীতিপূর্ণ প্রশংসাবাদ না করিয়া বান্ধবের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা হইতে যে উপদেশকণা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, রায় বাহাদুর যদি নবীন সহযোগীদিগকে তাহা বিতরণ করিয়া দিতেন তবে হয়ত তাঁহারা অধিকতর উপকৃত হইতেন। "ইদানীং অনেক সাহিত্য পত্রেরই সম্পাদকেরা শুধু প্রকাশকের কার্য্য করিয়া পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, ইহা সঙ্গত কিনা একথা লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না"—বিচার করিলে এক্ষেত্রে বান্ধব সম্পাদক নির্দ্দোষী সাব্যস্থ হইবেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিনা। "ধূমকেতুর" সমালোচনায় ব্যক্তিগত ভাবের এত ছড়াছড়ি না করিলে কি কোন গুরুতর ক্ষতির কারণ ছিল? ইহা হইতে কি "ছুঁইওনা", "আমার নামে বিকাইও না" ভাবটা ফুটিয়া বাহির হয় নাই? ধূমকেতুর প্রকৃত সম্পাদক কে তাহা প্রকাশ না করায় তাঁহার আত্মসংগোপন সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সম্পাদকীয় যশোকীরিটে তাঁহার লোভ না হইলে, বল পূর্ব্বক তাঁহাকে টানিয়া বাহির ও তাঁহার মাথায় সে কীরিট প্রক্ষিপ্ত করিবার এত চেষ্টাই বা কেন? নবনূরের সম্পাদকও লেখক সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সমালোচক বলিয়াছেন,"মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলি এবং মৌলবী আবদুল করিম প্রভৃতি ব্যক্তিরা বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে কিরূপ শিক্ষিত তাহা আমরা এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই"। কেন, তাঁহাদের সংস্কৃত বা বাঙ্গলা জ্ঞান নবনূরের লেখা হইতে অনুমিত হয় নাকি, যে তৎসম্বন্ধে তদতিরিক্ত কোন নিদর্শন পত্র দেখাইতে হইবে? সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে যদি তদ্রূপ নিদর্শন পত্র দেখাইয়া স্ব স্ব জ্ঞানবত্তা বুঝাইতে হয়,

তবে রায় বাহাদুরও বোধ করি তাহা বড় সুবিধাজনক মনে করিবেন না, কারণ তিনি সুপণ্ডিত হইলেও তাহা প্রকাশার্থ তাঁহার কোনও টাইটেল নাই।

তৎপর উল্লিখিত সাময়িক পত্রগুলির সমালোচনায় রায় বাহাদুর বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ ও ভাষাগত যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য রায় বাহাদুর অবশ্যই ধন্যবাদার্হ ; কিন্তু বান্ধবে যে সমস্ত বর্ণবিন্যাস ও ব্যাকরণ এবং ভাষাগত ভ্রম ঘটিয়াছে তাহা দেখাইলে রায় বাহাদুর যদি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

রায় বাহাদুর নবনূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে অনেকেই বোধ হয় তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিবেন না। চিত্তাকর্ষক হইলে ক্ষুদ্র কবিতাও সমাদৃত হয়। বান্ধবে প্রকাশিত "চঞ্চলা-প্রকৃতি" শীর্ষক কবিতাটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বান্ধবে যে কয়টি অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস দৃষ্ট হইল * তাহা শুধু লেখক বা সম্পাদকের অসাবধানতা জনিত বলিয়া বোধ হয় না। কতকগুলি দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দ বিনা কারণে হ্রস্ব ইকারান্ত করা হইয়াছে। "কএকটী" এই শব্দটি আমরা সকলকেই "কয়েকটী" এইরূপ লিখিতে দেখি। রায় বাহাদুর যদি তাহা অশুদ্ধ প্রতিপাদন করিতে পারেন তবে আমরাও তাঁহার অনুকরণে "কয়টী" না লিখিয়া "কএটী", "কয়েকটী" না লিখিয়া "কএকটী" লিখিব। ক বর্গের শেষাক্ষরে স্বরবর্ণ যোগে "আঙুল", "ঘুঙুর" ইত্যাদি শব্দ বিশুদ্ধ রূপে লেখা যায় কি না রায় বাহাদুর তাহা অভিধান খুঁজিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিলে বাধিত হইব। সন্ধি বা সন্ধি-বিয়োগ দ্বারা 'অহরহঃ" লিখিত হইয়াছে কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "শ্রেণি" শব্দটি যে লিঙ্গে এস্থলে ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে উহা হ্রস্ব ইকারান্ত হইতে পারে না।

---

* বান্ধব (পুনঃপ্রচারিত, ২য় খণ্ড , ৮ম, ৭ম সংখ্যা)

পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ
১৫৩	অভ্রভেদি	২০২	ঘুঙুর
১৬০	কারিয়া	২০৫	অহরহঃ
১৬১	উপযোগি	২১৩	স্বপ্নদর্শি সময়ে
১৬৪	কএকটী	ঐ	ফুটএয়
১৮৭	শ্রেণি	২১৬	মৃদু হাসিয়া
ঐ	অন্তর্দাহি	২১৫	পঁচচিল
১৮৮	আঙুল	২৩২	স্থায়ি
১৮৯	সুচিরস্থায়ি		

কতকগুলি শব্দ * এরূপ ভাবে ব্যবহার হইয়াছে যাহা ব্যাকরণ মতে বিশুদ্ধ বোধ হইল না। "হস্তের দ্বারা" বাক্যাংশে সম্বন্ধ ও করণ কারকের বিভক্তি সংযোজিত হইয়াছে। তাহা কি সংগত ? "অঙ্কুর-উদ্গম"—এস্থলে সন্ধি করিয়া "অঙ্কুরোদ্গম" লিখিতে কি কোন বাধা আছে ? "ক্লেশিত" ও "আবেশিত" শব্দগুলি কেন যে যথাক্রমে "ক্লিষ্ট" ও "আবিষ্ট" হইবে না তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

সরযূকে "ভাই" সম্বোধন করিলে কেমন শুনায় ? স্ত্রী পুরুষে পার্থক্য নাই বলিয়াই কি একদিন লর্ড মেকলে এদেশের স্থলকে জল, পুরুষকে স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন ? "মেরিয়া……প্রিয়দর্শনা—(তাহার) নয়নতারা হৃদয়-হারিণী—(যে) বালিকা……গৃহকার্য্য নিপুনা" বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গ সম্বন্ধে যেখানে এত মনোযোগ তথায় "মেরিয়া……গম্ভীর হইল", "তিনিই (ভগিনী) ……একমাত্র স্নেহের আশ্রয়", "অবোধ ও অৰ্দ্ধশিক্ষিত কুল-কুমারী" এরূপ লেখা কি সঙ্গত হইয়াছে ?

কতকগুলি শব্দ † বঙ্গভাষায় প্রচলিত ব্যবহার মতে শ্রুতিকটু ও অপপ্রযুক্ত

* বান্ধবের কথিত সংখ্যার।

পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ
১৫৩	সে……দীর্ঘশ্বাস ফেলাইয়াছে	১৯৭	অবোধ ও অৰ্দ্ধশিক্ষিত কুল-কুমারী
১৫৫	হস্তের দ্বারা		
ঐ	অঙ্কুর উদ্গম	১৯৮	আবেশিত
ঐ	অভিবাদনের দ্বারা	২২৮	মেরিয়া…… গম্ভীর হইল
১৫৬	ক্লেশিত	ঐ	আশ্রয়
১৮৩	ভাই (সরযূ।)		

† পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ
১৫৩	প্রতিদানে প্রত্যুপকার	২০৮	চিন্তাক্ষম
১৫৫	প্রাণকে স্মরণ	১৬০	সদর্থ-ব্যাখ্যাতা
ঐ	জয়োল্লাস বিঘোষিত	১৬৩	দেবাভাষা }
২০৯	অমনই	ঐ	দেব ভাষা }
২১৫	পঁহুচিল	১৭২	মক্কার পীর
২৩৪	শপথকারের	১৮৮	গুণ-পুরুষ
২৩৮	প্রকাশকতার	২০৮	স্ফূর্ত্তি-জনন-কথায়
১৭২	বলিতে পাইবে না	২১০	গ্রাম-নিবাস
১৯৭	কিবা স্বপ্নে কিবা সহজ জ্ঞানে	২১১	গ্রাম-গৃহ
ঐ	ধীর স্থির	২১৩	আপনার এই অপরিজ্ঞাত সোজা পথে
১৫৬	মঙ্গল্যজ্ঞানে		
১৯১	ধর্ম্মদানে	২১৭	করাশ্লেষ
২০০	শিয়রি দুর্জ্জনের	২২১	পরিবর্ত্ত

হইয়াছে। "জীবন ধারণ", "পাঠ গ্রহণের" ন্যায় "প্রাণ স্মরণ" বিশুদ্ধ বাঙ্গলা হইবেনা কেন? যাঁহার ভাষাতে "ধার-ধার-নাই" "যৎপরোনাস্তির" স্থান দখল করিয়াছে, তাঁহার পক্ষে এতগুলি সহজ পদ-বিন্যাসের মধ্যে "জয়োল্লাস বিঘোষিত", "মঙ্গল্যজ্ঞানে", "করাশ্লেষ", "ধর্ম্মদানে", "গুণ-পুরুষ" ইত্যাদি কঠিন শব্দ প্রয়োগ কি আপত্তিজনক নহে? "শপথকার", "প্রকাশকর্ত্তা" যেন নিতান্তই অপপ্রয়োগ বলিয়া বোধ হয়। "বিপত্তি-ভর্জ্জন", "চিন্তাক্ষম", "অস্পষ্টার্থক", "দেবাভাষা" ও "দেব-ভাষা" ইহার কোন্‌টি শুদ্ধ? "মক্কার পীর" কে মুসলমানেরা ত তাহা জানে না,—এরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ না করাই ভাল। "বলিতে পারিবে না", "কি স্বপ্নে কি সহজ জ্ঞানে", "পঁহুছিল", "স্থির ধীর", "ফূর্ত্তিজনক কথা", "গ্রাম্য-নিবাস" ইহাই প্রচলিত সাধুভাষা বলিয়া জানিতাম। "আপনার এই অপরিজ্ঞাত সোজা পথে" এই বাক্যটিতে অর্থনাশ ঘটিয়াছে। ক্লীবলিঙ্গে "পরিবর্ত্ত"র পরিবর্ত্তে "পরিবর্ত্তন" ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কতকগুলি শব্দ * পদ্যে ভিন্ন ব্যবহৃত হইতে পারে না।

দাঁড়ী, কমা ইত্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধে রায় বাহাদুর যে প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ব্যাকরণ সঙ্গত কিনা তৎপক্ষে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ, দাঁড়ী কমা ইত্যাদি চিহ্নের অসংযত অপরিমিত উপদ্রবে হোঁচট খাইয়া পাঠককে নিতান্তই বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এইস্থানে একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—"কেননা, পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একটি বালুকণাও যদি, জড় জগতের অপরিজ্ঞাত শক্তি ভিন্ন, কোন একটি অজ্ঞাত শক্তির অভিনব-প্রয়োগে, অবনীর পৃষ্ঠ হইতে একটুকু ঊর্দ্ধে নীত, অথবা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে চালিত, হইতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,……"। বাহারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্তই এইরূপ লক্ষিত হইবে।†

* পদ্যে (১৭৩ পৃষ্ঠা), পরশিয়া (১৯৬ পৃষ্ঠা), অমিয়ী (১১৮ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি।

বঙ্গভাষার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তৎসহ উহা লাওয়ারিশী মাল বা বেবন্দোবস্তী মহাল বলিয়া কাহারও খামখেয়ালীর আড্ডা না হয়, ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ যাঁহারা উহার গঠনকারী, যাঁহাদের লেখা সর্ব্বসাধারণের অনুকরণীয় তাঁহাদের যে প্রত্যেক শব্দ-বিন্যাসে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হয় ইহা বলা বাহুল্য।

কোন 'বান্ধব'-ভক্ত।

ধর্ম্মযুদ্ধ, গাজী ও জেহাদ।

বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা "নবনূরে" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। তাঁহার মূল্যবান পত্রখানিতে হিন্দুমুসলমান সম্বন্ধে যে উদার মত প্রকটিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নাই,—আমরা গভীর সহানুভূতি সহকারে তাঁহার প্রত্যেক কথার সমর্থন করিতেছি। উক্ত পত্রের শেষভাগে যে কয়টি প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে তাহারই উত্তরচ্ছলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

প্রশ্ন কয়টি এইরূপ, যথা :—

১। মুসলমান কি কখনও ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ করে নাই? আমার মনে পড়িতেছে যে, তৈমুর স্বরচিত জীবনবৃত্তের একস্থানে বলিয়াছেন, "ইস্লাম-ধর্ম্মের শত্রু পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে পরলোকে পুরস্কার লাভ করিব।"

২। গাজি কাহাকে বলে? জেহাদই বা কি? গাজি ও জেহাদ কি মোহা-

৩। মুসলমানেরা বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে তাঁহারা বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংসসাধনও করিয়াছিলেন? তৈমুরলঙ্গের হস্তে দামস্কসের কি দশা হইয়াছিল?

উত্তর :—

১। মুসলমানেরা ধর্মের নামে কখনই যুদ্ধ করে নাই।* খৃষ্টানগণ ধর্মের নামে যেমন নয় নয়বার ক্রুসেড করিয়াছিল, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ ধর্মযুদ্ধ মুসলমানদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কখনই এমন প্রমাণ পাওয়া যাইবেনা। যদ্যপি কোন মুসলমান ধর্মের নামে যুদ্ধ করিয়া থাকে তবে সে মুসলমানধর্মের যে কিছুই জানিত না একথা নিঃসন্দেহ। তৈমুর "মালফুজাতে" ধর্মযুদ্ধের উপকারিতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন এবং পরকালে উহার জন্য যে পুরস্কৃত হইবেন, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল সত্য, কিন্তু কোন জ্ঞানী মুসলমান তাঁহার একথাগুলি কখনই সমর্থন করিবেন না। মুসলমানেরা চেঙ্গেজ খাঁকে "জাঁহাশোজ" অর্থাৎ পৃথিবী প্রজ্জ্বলিতকারী নামে অভিহিত করিত। তাঁহারই বংশধর—যাঁহার দ্বারা মুসলমানসমাজের প্রকৃত অধঃপতন হইয়াছে—যদি ধর্মের দোহাই দিয়া পৃথিবীধ্বংস করেন তবে সেজন্য মুসলমানসমাজ বা ইস্লাম দায়ী নহে। শিবজীর আফজল-হত্যা বা নেপোলিয়নের যোসেফাইন ত্যাগ রাজনৈতিকের নিকট সমর্থিত হইতে পারে কিন্তু ধর্মের নিকট তাঁহারা যে সমাক্ অপরাধী তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইরূপ তৈমুর যে সকল অপকার্য্য করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য ইস্লামের নিকট তিনি বিশেষ অপরাধী। তৈমুর ইস্লামের কোন ধার ধারিতেন কিনা জানিনা কিন্তু একথা সত্য যে মুসলমানসমাজ তাঁহাকে ধর্ম্মনেতা বলিয়া কখনই অভিহিত করে নাই।

পৃথিবীতে ইস্লাম কত বড় উদার ধর্ম তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যক্ রূপে অভিব্যক্ত করা অসম্ভব। তবে আমরা আভাষ স্বরূপ কোরাণের কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে বিধর্মীর প্রতি ইস্লাম কিরূপ উদার মত প্রকাশ করিয়াছে এবং ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ করিতে ইস্লামধর্মে কিরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে।

* পৃথিবীতে কি প্রকারে ইস্লাম প্রচার হইয়াছিল যিনি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে আমরা T. W. Arnold কৃত "The Preaching of Islám" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

"ধর্ম্মের জন্য বল প্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে।"

(কোরাণ, ২য় অধ্যায় ; ২৫৬ শ্লোক।)

"অনন্তর যদি তাহারা (হে মোহাম্মদ) তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তুমি বলিও আমি ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করিয়াছি ; এবং যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে। (তাহারা উৎসর্গ করিয়াছে) যাহারা গ্রন্থপ্রাপ্ত তাহাদিগকে ও অশিক্ষিতদিগকে বল, তোমরা কি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ ? অবশেষে তাহারা যদি ধর্ম্মানুগত হয় তবে নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, এবং যদি বিমুখ হয় তবে সংবাদ প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছুই নহে, পরমেশ্বর দাস-দিগের প্রতি দৃষ্টিকারী।" (ঐ,৩য় অঃ ; ২০ শ্লোক।)

"নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে ও সংবাদ বাহকদিগকে অযথা বধ করে, এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা ন্যায়ত আদেশ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ করে, তুমি তাহাদিগকে দুঃখ-কর শাস্তির সংবাদ দান কর।" (ঐ, ঐ ; ২১ শ্লোক।)

তৈমুরলঙ্গ পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করাকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু তাহা দূরে থাক, সেই পৌত্তলিকদিগকে কুবাক্য বলাও যে পাপ তাহা মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ শরিফে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে—

"যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য দেবতাকে) আহ্বান করে তাহাদিগকে (হে মুসলমানগণ) কুবাক্য বলিও না, যেহেতু তাহারা অজ্ঞনতা বশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে।" (ঐ, ৬ষ্ঠ অঃ ; ১০৯ শ্লোক।)

"তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে আহ্বান করে সে (ইস্লাম) তাহাদের লাভ ও ক্ষতি করেনা।" (ঐ, ২২ অঃ ; ১২ শ্লোক।)

ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভিন্নধর্ম্মী সম্বন্ধে ইস্লামের মত।

"নিশ্চয় যাহারা মুসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী এবং সাবি তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকার্য্য করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রতি-পালকের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।"

(ঐ, ২ অঃ ; ৬২ শ্লোক।)

"যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যান, তাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত

হয়, তথায় স্বর্ণময় ও মৌক্তিক কঙ্কণ (তাহাদিগকে) পরান হইবে, এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় বস্ত্র হইবে।" (ঐ, ২২ অঃ ; ২৩ শ্লোক)।

"যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছে নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যাইবেন, তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন করিয়া থাকেন।" (ঐ, ঐ ; ১৪ শ্লোক)।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোককয়টি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইস্‌লাম কখনই ধর্ম্মযুদ্ধের সমর্থক নহে। ইস্‌লামের প্রকৃত অর্থ শান্তি। ইস্‌লামের উদ্দেশ্যও জগতে শান্তি স্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে ইস্‌লামই বর্ত্তমান জগতে শান্তিযুগের প্রবর্ত্তক। আজ যে আমরা এই মানবসমাজে পবিত্র ভ্রাতৃত্বের ছুচ্ছেদ্য বন্ধন নিরীক্ষণ করিতেছি তাহা ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই পুণ্যময় ফল। বর্ত্তমান জগতের এই পবিত্র ভ্রাতৃভাব হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম বা খৃষ্টধর্ম্মের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই ইস্‌লামই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য একথা সকল ব্যক্তিই স্বীকার করেন, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম বা খৃষ্টধর্ম্ম জগতে এক সময়ে কল্যাণযুগের অবতারণা করিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান জগতে ইস্‌লামেরই অপ্রতিহত প্রভাব রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে।

২। "গাজী" অর্থ "যুদ্ধ-বিজয়ী"। ইংরাজিতে Field-Marshal যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আরবী ভাষায় গাজী শব্দটিও তদনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাজী কথাটি Political, ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিচার চলে না। যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ আছে যে, শত্রু যদি তোমার একগালে চড় মারে, তুমি অপর গাল ফিরাইয়া দিও। তবে কেন খৃষ্টানদিগের মধ্যে Field-Marshal উপাধির সৃষ্টি হইল? প্রকৃত পক্ষে গাজী কথাটি ধর্ম্মের বহির্ভূত ; ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

৩। "জেহাদ" অর্থ "প্রাণপণ চেষ্টা করা"। ইহার আর দ্বিতীয় অর্থ নাই। কোরাণে যুদ্ধের অর্থে "কেতাল" এবং "হার্ব" এই দুইটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জেহাদ শব্দটি যুদ্ধের অর্থে কখনই ব্যবহৃত হয় নাই। পাদরী রড্‌ওয়েল, জেরী, পামর, শেল, থেল, সেলগুল এবং গিরীশচন্দ্র সেন মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ "জেহাদ"কে ধর্ম্মযুদ্ধ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। এ বিষয়ে মুসলমানধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান শত্রু সার উইলিয়ম মিউরকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে জেহাদের অর্থ কখনই

ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের পয়গম্বর জেহাদের দুইটি নাম দিয়াছিলেন,—"জেহাদে আকবর" ও "জেহাদে আসগর"। "জেহাদে আকবর" অর্থাৎ বড় জেহাদ যেমন বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রাণান্ত পরিশ্রম। "জেহাদে আসগর" অর্থাৎ ছোট জেহাদ যেমন শত্রুর হস্ত হইতে নিজ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের কোন হদিস গ্রন্থেও এ বিষয়ে অন্য কোনও বিরুদ্ধ-মত পরিদৃষ্ট হয় না। আমাদের শাস্ত্র যে ধর্ম্মযুদ্ধের সমর্থক নহে তাহা কোরাণের শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি।

আধুনিক সময়ে সাধারণ মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকেই জেহাদ অর্থে ধর্ম্মযুদ্ধ বুঝিয়া থাকে। ইহার একটি কারণ আছে। তুরস্কের সুলতান বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানসমাজের একজন নেতা স্বরূপ। খৃষ্টানগণ সেই তুরস্ককে ইউরোপ হইতে উৎখাত করিবার জন্য যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং নানা রূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারা তুরস্ককে যে প্রকার অসম্ভাবিত রূপে প্রপীড়িত করিতেছে তাহাতে কোন্ মুসলমানের হৃদয়ে না আঘাত লাগে? মুসলমান মাত্রেই কামনা করে যে, ইউরোপে তাহাদের মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকুক। কিন্তু হায়! যখন খৃষ্টান সপ্তরথীবৃন্দ কর্ত্তৃক তুরস্ক পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃখে ক্ষোভে চীৎকার করিতে থাকে—সেই চীৎকারধ্বনি যখন প্রত্যেক মুসলমান-হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সমগ্র মুসলমানসমাজ যে কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জলমগ্ন ব্যক্তি যন্ত্রনায় যেমন অস্থির হইয়া কূল পাইবার জন্য হস্তপদ সঞ্চালন করিতে থাকে মুসলমানগণও উপায়হীন অবস্থায় সেইরূপ হৃদয়-যন্ত্রনা উপশম হেতু ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে থাকে;—হঠাৎ তাহাদের প্রাণে আরবী শব্দ "প্রাণপণ চেষ্টার" একটা আশা উদয় হয় এবং "জেহাদ" "জেহাদ" করিয়া প্রাণে কতকটা শান্তি অনুভব করে। ইহাই বোধ হয় উল্লিখিত মুসলমানদিগের জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ।

৪। মুসলমানদিগের দ্বারা অনেক নগর ধ্বংস হইয়াছে একথা অবশ্য স্বীকার করা যায়; কিন্তু তাহাদের দ্বারা যত সমৃদ্ধিশালী দেশ নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার তুলনায় ইহা তুচ্ছ। মুসলমানদিগের দ্বারা যে সকল দেশ নগর ধ্বংস হইয়াছে তাহা তাহাদের স্ব ইচ্ছায় ধ্বংসিকৃত হয় নাই। যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিলে সকল স্থানেই এরূপ ধ্বংস অনিবার্য্য। খৃষ্টানেরা যেমন ইচ্ছাক্রমে মহাসমারোহ সহকারে ধ্বংসকার্য্যগুলি সুসম্পাদিত

করিয়াছিল, * মুসলমানদিগের দ্বারা এরূপ নৃশংস কার্য্য কখনই অনুষ্ঠিত হয় নাই। তবে তৈমুরের কথা স্বতন্ত্র, সে মুসলমান নহে—মুসলমান-কলঙ্ক।

নবনূরের সমালোচক লিখিয়াছেন যে, "ইসলাম কখনও সমৃদ্ধিশালী দেশ নগর ছারখার করে নাই" একথা গুলির মধ্যে বিন্দু মাত্রও অসত্য নাই। মুসলমানের দ্বারা দেশ নগর ছারখার হইতে পারে কিন্তু ইসলাম যে কোন রাজ্য ছারখার করিয়াছে, কেহই এমন প্রমাণ দিতে পারিবে না।

বিধবা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চারিদিক দগ্ধীভূত করিতেছেন। রৌদ্র-দগ্ধ বসুন্ধরা নীরব ও নিষ্পন্দ। কৃষাণেরা কেহ কেহ কর্ম্মক্লান্ত ঘর্ম্মসিক্ত দেহে অদূরস্থ বৃক্ষছায়ায় বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবনে পরিশ্রম দূর করিতেছে,—কেহ কেহ টকী কিম্বা গামছা মাথায় দিয়া ক্ষেতে কাজ করিতেছে, কৃষাণের ছেলেরা গল্প করিতেছে—ঢিল ছুড়িতেছে—দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। গাভীগুলি এদিকে ওদিকে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঝোপের আশে পাশে অৰ্দ্ধশায়িতাবস্থায় রোমন্থন করিতেছে, মাঝে মাঝে পুচ্ছ আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে। আকাশ মেঘ শূন্য। অনন্ত নীল গগনে বাজ পাখী পাখা মেলিয়া মেলিয়া ঊৰ্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ছেলে কাঁখে ও কলসী কাঁখে লইয়া কৃষকের বৌ-ঝিরা স্নান করিতে যাইতেছে,—ঘরে ফিরিতেছে—পরিধানে মলিন বস্ত্র—অঙ্গ মসী বিনিন্দিত। বিরল-পল্লব গাছের শাখায় বসিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা দয়েল গাহিয়া গাহিয়া থামিয়া যাইতেছে।

নিদাঘের সেই রৌদ্র-দগ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় সুরপুরের একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার ক্ষুদ্র কক্ষে ম্লান শয্যায় শুইয়া শুইয়া একটি বৃদ্ধা রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির

* অদ্যাবধি আফ্রিকার মরুপ্রান্তরগুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ খৃষ্টানদিগের মতে উহা তুরুক-সুলতানের রাজ্যশাসন অনুপযুক্ততার ফল। খৃষ্টানদিগের দ্বারা ক্রুসেড যুদ্ধের সময় কিরূপ নৃশংসভাবে ধ্বংস কার্য্যগুলি সুসম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

হইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন, স্ফুট ক্রন্দনে ও অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সে ব্যথা সে যাতনা আপনা হইতেই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। এতক্ষণ সুষমা পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বাতাস করিতেছিল,—গায়ে হাত বুলাইতেছিল ও মাছি তাড়াইতেছিল, সে এই মাত্র শাশুড়ীর বার বার অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও স্নান আহার করিতে গমন করিয়াছে। মেজের উপরে রুগ্নার শয্যার অপর পার্শ্বে মাদুরের উপরে কেশ এলাইয়া নৃত্য কৃত্তিম নিদ্রায় অভিভূত।

বৃদ্ধা রোগযন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। একে রৌদ্রের উত্তাপ, তাহাতে আবার জ্বরের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসার যাতনা; তদুপরি নানাবিধ মানসিক যন্ত্রণায় পুত্র শোকাতুরা বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণী মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

প্রাণের প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে পুরুষের শোক কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকে, কিছুদিন পর্য্যন্ত সে শোকানল অমিত তেজে জ্বলে, কিন্তু সময়ের চিকিৎসায় ও ধৈর্য্য বলে পুরুষ তাহা দমন করে,—সে শোক-ব্যথা তাহাদের হাড়ে-হাড়ে মিশিয়া যায়, অন্তসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় নীরবে গুপ্ত ভাবে তাহা প্রবাহিত হইতে থাকে সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। কোমল হৃদয়া রমণী তাহা পারে না; প্রিয়জন-বিরহ, পতি পুত্রের বিয়োগ-শোক-ক্লেশ,তাহাদের বড় বাজে,সে যাতনা,—সে বেদনা—আপনা হইতেই তাহাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে, আপনা হইতেই বিকশিত হয়। সারা দিবসের কার্য্যশেষে সায়াহ্নের স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে অতীত স্মৃতি তাহাদের হৃদয়-মন্দিরে উত্থিত হইয়া ব্যাকুলিত করিয়া দেয়, নয়ন-জল শাসন মানেনা,—নীরব নিশীথে বিশ্রাম-সুখ-লালসায় যখন শয্যায় শয়ন করে, তখন উপাধানে মুখ লুকাইয়া রমণী কাঁদে, বসন্ত-বর্ষায় আমোদ প্রমোদের দিনে অলক্ষ্যে তাহাদের চোখের জল পড়ে, প্রভাতে বাঁশীর রাগিণীর মত উচ্চ তানে পাখীর মত গলা ছাড়িয়া ছাড়িয়া যখন ব্যথিতা রমণী কাঁদে, সে কাঁদা বড় করুণ। বড় মর্ম্মস্পর্শী! সে শোক-সঙ্গীতে বুঝি পাষাণও গলে।

হায় রমণী! তুমি কি কেবল কাঁদিতে, কেবল কি সংসারের যন্ত্রণা সহ্য করিতেই জগতে সৃষ্ট হইয়াছ?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে ডাকিলেন "নৃত্য"।

নৃত্য নাসিকা গর্জ্জনে প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বীয় নিদ্রার গভীরত্ব

প্রকাশ করিতেছিল। জননীর রোগযন্ত্রণা ক্লিষ্ট কম্পিত কণ্ঠের ক্ষীণ রব তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ না করিতে পারিয়া অনন্ত প্রবাহিত, তরঙ্গিত বায়ুস্রোতে মিশিয়া গেল।

জননী আবার বলিলেন 'নৃত্য আমায় একটু জল দাও মা! বড় পিপাসা! বড় জ্বালা! বাবা অমর কোথায় গেলি বাবা!" একথা গুলি উচ্চারণ করিতে করিতে বৃদ্ধার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সে ক্ষীণ রবে নৃত্যের সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিল না। সে দ্বিগুণ উৎসাহে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

একি করিলে নৃত্য!! যে স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-বারি সিঞ্চনে, যাঁহার স্তন্য-দুগ্ধ পানে আজ তুমি এত বড় হইয়াছ, যাঁহার এক বিন্দু স্নেহ-ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই,—জগতে কাহারও নাই,—সে জননীর হৃদয়ে আজ তুমি কি কষ্ট দিলে! আহা! পতিপুত্র হারা অভাগিনী জননী,—পিপাসাতুরা রোগ শয্যায় শায়িতা জননী, আজ তোমার নিকট একটু জল চাহিল, তুমি তাহা শুনিলে না। এতই কি তোমার পরিশ্রম হইয়াছে? এতই কি তুমি দুর্ব্বলা? এই জননীই না বাল্যকালে তোমাকে কত আদর, কত যত্ন করিয়াছেন, কত তাড়না সহ্য করিয়াছেন, তোমার মনস্তুষ্টির জন্য কতই না করিয়াছেন! হায়! হায়! এই কি তাহার প্রতিশোধ! এই কি তোমার মাতৃস্নেহের পুরস্কার?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন দেয়াল ধরিয়া বিছানায় ভর করিয়া পড়িতে পড়িতে উঠিলেন,—একবার উঠিতে পড়িয়া গেলেন—আবার উঠিলেন—উঠিয়া পার্শ্বস্থিত কলস হইতে জল ঢালিয়া—জলপাত্র মুখের নিকট নিতে যাইবেন,—সে জল আর মুখে উঠিলনা। আর পিপাসা দূর হইল না। শীর্ণ হাত কাঁপিতে লাগিল—কাঁপিতে কাঁপিতে হস্ত হইতে জলপাত্র পড়িয়া চারি-দিকে জল ছড়াইয়া গেল—মাথা ঘুরিয়া—চারিদিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে দারুণ-যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বৃদ্ধা জ্ঞানশূন্যা অবস্থায় শয্যায় পতিতা হইলেন।

সে চীৎকার—যেখানে সুষমা স্নান করিয়া সবে মাত্র দুইটি ভাত লইয়া বসিয়াছিল,—সেখানে প্রবেশ করিল,—সুষমা তাড়াতাড়ি ভাত ফেলিয়া হস্ত-প্রক্ষালন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল, পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া নিদ্রিতা ঠাকুর-ঝিকে জাগরিতা করা যুক্তি সঙ্গত বোধে 'ঠাকুর ঝি! ঠাকুর ঝি!' রবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল।

কবিতা-গুচ্ছ।

হীরামণ। *

১

কে হ'রে নিলরে মোর হীরামণ পাখী!
কলেজা ছিঁড়িয়া দিল,
জোর ক'রে কেড়ে নিল,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ মোর হ'ল দুটি আঁখি!
কে হ'রে নিলরে মোর হীরামণ পাখী!

২

প্রাণের ভিতরে আমি রেখেছিনু যারে,
কত না মধুর বোলে
ডাকিত সে "বাবা" ব'লে
"বদন" বলিয়া আমি ডাকিতাম তারে!

৩

কোথায় আমার সেই পাখী হীরামণ!
আজি সে আমায় ছে'ড়ে,
কোথায় গিয়াছে উ'ড়ে,
কোথায় আমার সেই স্নেহের "বদন"!

৪

এমন সিঁধেল চোর কোন্ থানে ছিল!
এমন সোনার পাখী,
দেখিলে জুড়া'ত আঁখি
অনমের মত তারে হ'রে নিয়ে গেল!

৫

আজিরে কেমনে হায় তার কথা ভুলি?
শয়নে স্বপনে ধ্যানে,
সদা হায় পড়ে মনে
সেই মুখ, সেই চোক, সেই "বাবা" বুলি!

৬

কোথায় আমার সেই হীরামণ পাখী!
তারে দেখিবার আশে,
মুগ্ধ প্রাণে আছি ব'সে
সজল নয়নে আমি দিন রাত ডাকি!

৭

কোথায় আমার সেই পারিজাত-হার!
খুঁজিয়ে এ ধরা পরে,
আর কি পাইব তারে,
কে বলিয়া দিবে কোথা 'বদন' আমার?

৮

একটি কণ্টক আহা ফুটিলে সে পায়
কতনা বিলাপ ক'রে,
কাঁদিত সে গলা ধরে
আজি সে কেমনে আছে সমাধি-শয্যায়!

৯

অতি উর্দ্ধে থাক শশি আকাশের গায়
ধরার সকলি হের
তুমি কি বলিতে পার
আমার "বদন" আজি গিয়াছে কোথায়?

১০

কোথা সেই হীরামণ পাখিটি আমার
সে কি তবে চির তরে,
ভুলিয়া গিয়াছে মোরে,
অথবা কি "বাবা" ব'লে মনে নাহি তার?

১১

তুমি তরু, তুমি পত্র ব'লে দেও মোরে
আমার সে তোতা শ্যাম,
"বদন" যাহার নাম,
কোথা সে লুকা'য়ে আছে কোন্ বন-ঝোড়ে?

১২

তোমরা কি জান হায় ওরে পশু পাখি!
কোথা সে লুকায়ে আছে,
কিম্বা কোথা চ'লে গেছে,
"বদন" বলিয়া আমি যারে সদা ডাকি!

---

* এই কবিতাটি কবিবর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বদিয়ল আলমকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন। শিশু বদিয়ল আলম এখন স্বর্গে; জানিনা তাহার পিতার এই আকুল ক্রন্দন তাহার কর্ণে পঁহুছিবে কিনা। তবুও আমরা শোকাতুর কবিকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে ইহা প্রকাশ করিলাম। করুণাময় তাঁহার প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করুন। নঃ সঃ।

১৩

তুমি কি বলিতে পার ওহে দিনমণি!
অতি সুশ্রী—মনোরম,
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম,
কোথায় আমার সেই কোহিনুর মণি?

১৪

কোথায় আমার সেই পাখী হীরামণ
আজি সে আমায় ছেড়ে,
কোথায় গিয়াছে উ'ড়ে,
কোথায় আমার সেই স্নেহের "বদন"।

কায়কোবাদ।

—:•:—

শরতে কামনা।

আজি শরত আকাশে শারদ চন্দ্রমা
মধুর মধুর রাজে,
আজি মনের মাঝারে কি মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বাজে।
হেরি সোনালি বরণ তরল সলিলে
শতেক চাঁদের খেলা,
আজি হৃদয় আগারে উথলি উঠিছে
কত আনন্দের মেলা।
আজি মৃদুল মৃদুল বহিছে পবন
দুলিছে গাছের পাতা
আরা ঈষৎ হেলিয়ে ঈষৎ দুলিয়ে
কহিছে প্রেমের কথা।
কিবা এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িছে
অবশ শিথিল অঙ্গ,
যেন কোমলতা বিনে কিছু নাহি জানে
কোমল তাদের অঙ্গ।
কিবা প্রকৃতি ধরেছে মোহন মূরতি
মোহন রূপের ছায়,
আজি তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রলেখা গুলি
নেচে নেচে ভেসে যায়।
আমি এরূপ করিয়ে শারদ নিশীথে
শারদ চাঁদিমা তলে,
ধীরে গাব সুখ-গান উন্মত্ত পরাণ
জাগিবে প্রেম সলিলে।
আমি জাহ্নবীর জলে জোছনা মাখিয়ে
তুলিব তরঙ্গ রাশি
আর চারিদিক হতে দিগঙ্গনাগণ
বাজাবে মধুর বাঁশী।
আমি সে বাঁশীর তানে আপনা ভুলিব
ভুলিব জগতে সবে—
মোর 'মায়ার বাঁধন' টুটিয়া যাইবে
রহিব প্রেমেতে ডুবে।

—:•:—

দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
জানিনাত দেবতা কেমন
শুনি নাই দেবতার ভাষা
কে জানে তা' আশা কি নিরাশা
হেরি নাই দেবতা-আনন,
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
তব কোমল সঙ্গীত সুধা
হেথা প্রণয় সুযুপ্তি সুখে
ঢালে শান্তি, নাহি মানে বাধা
বহে তব্ তব্ শত মুখে
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
তুমি মোর শান্তি-প্রস্রবণ
সদা সম্পদে সুখে বিভবে;
ক্লান্ত হই যখনি এ ভবে—
তুমি দাও স্নেহ-আলিঙ্গন
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
সুধা হাসি পূরিত মু'খানি
স্মিত মুখে প্রীতি সম্ভাষণ
তুলে প্রাণে শত প্রতিধ্বনি
আরো কত আশার স্বপন,
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
তুমি যেন প্রেম-অবতার
পর হিতে জীবন তোমার
'ত্যাগ' মন্ত্রে দীক্ষিত হৃদয়
যাহা ছিল দিলে সমুদয়,
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
কোথা ছিলে জানি না কোথায়,
দেখা ছিল যৌবন-উষায়,
দু'য়ে কাঁদি সুদূরে বসিয়া
বেঁচে থাকি কল্পনা রচিয়া
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
মাতা পিতা ভূতলে ঈশ্বর
সৌম্যমূর্ত্তি, কত মনোহর!
ভক্তিপূজা করিছ যতনে
দীন বেশে সজল নয়নে,
দেবতা আমার।

তুমি দেবতা আমার,—
দূরে থাকি সংসার হইতে
হেরি দুঃখী দুঃখ অবনীতে
ঘুচাইতে তাপ পৃথিবীর
সাধ কর্ম্ম ওহে কর্ম্মবীর;
দেবতা আমার।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—:০:—

উপেক্ষিতা।

যা ছিল ভরসা মম গিয়েছে চলিয়া
বিষদগ্ধ ক্লান্তদেহ রয়েছে পড়িয়া;
আর কিবা আছে বল
আছে শুধু অশ্রু জল
মরু সম দগ্ধ প্রাণে দিতে গো সান্ত্বনা
সে ব্যথা বুঝাতে অন্যে নাহিক বাসনা।
আপনার ভাবি যারে
সে মোরে উপেক্ষা করে
বাসেনা বুঝিগো ভাল; তীব্র যাতনার
আগুন অদৃষ্ট ভাবি বসি নিরালায়।
শান্ত স্নিগ্ধ ফুল্লহাসি
চিরতরে গেছে মিশি,
পড়ে আছি একেলাটি ত্যক্ত গৃহ কোণে
মর্ম্মে মর্ম্মে বাজে ব্যথা কঠিন বচনে।

দারুণ যাতনা ভরে
ডাকি সদা যুক্ত করে
কোথা প্রভু প্রেমময় দাও দরশন
এ ভবে নাহিক বন্ধু তোমার মতন।।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

—:০:—

স্বাধীন বাসর।

উন্মুক্ত পবন ধীরে ধীরে বহি
প্রভাতে ফুলেরে প্রেম গাথা কহি
হাসির লহর তুলি' ফিরে চায়
নাহি সেথা কেহ লাজ দিবে তায়।
প্রাণ ভরি' শুধু—নীরব বীণায়
মধুর সুতানে প্রেম-গীতি গায়।
সুমন্দ প্রবাহে সে তান লহরী—
ফুল-হৃদে মিশি উঠিছে শিহরি।
প্রেমে মাতোয়ারা ফুল-রাণী তায়
হাসিতে ভরিয়া আপনা হারায়।
স্বাধীন বাসরে বর বধূ দোঁহে
দোঁহে দোঁহা মাঝে মিলিবারে চাহে।

আফ্তাব উদ্দীন আহ্‌মদ।

—:০:—

নবীন জীবন।

গঠিতে হইবে এক নবীন জীবন তোর,
শুধু কবিতার গানে হবেনা থাকিলে ভোর।
উগারিয়া হৃদি হতে পূত তেজোময়ী ভাষা,
মিটাইতে হবে তোর জীবনের শত তৃষা।
দূরে ঠেলি দিতে হবে দুঃখ-স্বপনের মোহ,
সাগরে বিসর্জ্জিয়া পূত-স্নাত কর দেহ।
অবগাহী চিরস্নিগ্ধ পবিত্র জাহ্নবী নীরে,
যাও চলি সাধি' ব্রত একই স্থির লক্ষ্য পানে।

—ব্রজসুন্দর—

—:০:—

মাসিক সাহিত্য।

ভারতী,—আশ্বিন। "রাজসেবায় হিন্দু ও মুসলমান" শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে সাময়িক আলোচনা। মুসলমানসমাজের দিক হইতে এই সংখ্যার ভারতীতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আলোচ্য প্রবন্ধ। গত শ্রাবণ সংখ্যায় পরেশ বাবু 'বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে এক তরফা বিচার দ্বারা সমুদয় দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইয়া উপসংহারে লিখিয়াছিলেন যে 'মুসলমানসমাজেরও অনেক গুণ আছে, বারান্তরে তিনি তাহার আলোচনা করিবেন।' সেই গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার উত্তর প্রবন্ধের আলোচনা করিব আশায় আমরা এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে সে বিষয়ে নিরাশ করিয়াছেন। 'ভারতী' প্রাপ্তি মাত্রই তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মুসলমানসমাজ বুঝিতে পারিয়াছে, United Indiaর সুখস্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই রহিয়া যাইবে। মাননীয়া সরলা দেবী তাঁহার রমণীজনসুলভ কোমলতা ও মমতার বশবর্ত্তিনী হইয়া মুসলমানসমাজকে যে মধুর কথায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, পরেশ বাবুর অনৃতবাণে জর্জ্জরিত হইয়া তাহা কোথায় কোন শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে। বঙ্গে কি ভারতে স্ত্রীসমাজ দ্বারা যদি পুরুষসমাজ পরিচালিত হইতেন তবে সরলা দেবীর আশার কথা সত্যই আশার কথা ছিল। কিন্তু তাহা নয় বলিয়াই পরেশ বাবুর কথাকেই আমরা প্রকৃত হিন্দুসমাজের কথা ধরিয়া লইব। এখন হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যাঁহাদের নিকট আমরা অবজ্ঞাত, তাঁহাদের কাছে কোন কিছু ভাল আশা করা আর আকাশকুসুম রচনা করা আমাদের পক্ষে একই কথা। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক মুসলমানগণ যে অনেক রাজকর্ম্ম বা চাকরী হইতে বঞ্চিত আছেন কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান ইহা কড়ায় গণ্ডায় অনুভব করিয়া থাকেন। যেখানে শিক্ষিত মুসলমানের সম্মিলন হয়, সেখানেই এ বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। যে সমুদয় আলোচনায় যাহা মীমাংসিত হয় তাহা হত-ভাগ্য দেশের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে। আমরা মূল প্রবন্ধ-বর্ণিত-ভাবের ন্যায় তর্কশক্তির অভাব হেতু কখনই স্বীকার করিতে বাধ্য নহি যে 'হিন্দুর তুল্য শিক্ষিত মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন না এবং তদবস্থায় মুসলমান নিযুক্ত না করাই ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে।' আজকাল বহু কার্য্যেই হিন্দুর সমান শিক্ষিত মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু এমন বিষয়ে লক্ষ্মী হিন্দুর প্রতিই প্রসন্না। Red tapism এর প্রভাব যথায় অক্ষুণ্ণ আছে, সেরূপ স্থলে সাধারণতঃ কর্ম্মপ্রার্থী হইলেও মুসলমানের দাবী শূন্যে পর্য্যবসিত হয়। আর হিন্দু যথায় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, সে স্থানের কথা উল্লেখ না করিলেও চলে। আমরা এমনও অবগত আছি যে কোনও হিন্দু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার শাসন সময়ে কেবল হিন্দু Apprenticeই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এমন কি Apprenticeদের সমগ্র লিষ্টের মধ্যে একটিও মুসলমান ছিল না। এস্থলে পরেশ বাবু কি বলিতে চান? তিনি কি বলিবেন একটি জেলার মধ্যে Apprentice হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষিত একটিও মুসলমান ছিল না? বাস্তবিক বঙ্গের মুসলমানসমাজে যে সামান্য শিক্ষারও এমন অভাব ঘটিয়াছে তাহাত আমরা জানিতাম না। একটি জেলার শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াই যখন এতদূর, সমগ্র বঙ্গের শাসনভার যদি হিন্দুর হাতে ন্যস্ত করা যায় তবে না জানি আরও কত কি হয়। মুসলমানসমাজ সাধে কি কংগ্রেসে যোগ দেন না? যে শিক্ষিত মুসলমানের সহিত কংগ্রেস সম্বন্ধে পরেশ বাবুর আলাপ হইয়াছিল তিনি যদি উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিতেন তবে হয়ত পরেশ বাবুকে নিরুত্তর হইয়া থাকিতে হইত। আমরা ইহা একশো বার জোর করিয়া বলিতে পারি যে আত্মীয়-বাৎসল্যরূপ পক্ষপাতটা হিন্দু রাজ-পুরুষগণই বেশী করিয়া থাকেন, পরেশ বাবু নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা আবশ্যক হইলে হিন্দুর মুসলমান-অপ্রীতি সম্বন্ধে এমন সব বিষয় সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিতে

পারিব, যাহা পাঠে উদার-হৃদয় শিক্ষিত সমাজ নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত হইবেন। কোন মুসলমান রাজপুরুষ নিশ্চয়ই এতটা অন্যায় করিতে সাহসী হইতেন না। তবে কথা এই, মুসলমানের সামান্য ত্রুটীও ঢক্কা নিনাদে জগময় ঘোষিত হয়, আর হিন্দুর অনেক বড় বড় পাপের কথা ঢাকা থাকে। ইহা অবশ্য ঐক্যবন্ধন-চেষ্টারই শুভ ফল। 'নিজের শক্তি সামর্থ অনুসারে নিজ হিত সাধন করিবার অধিকার এ জগতে সকলেরই আছে', কিন্তু তাই বলিয়া অন্যায় করিবার অধিকার কাহারও নাই। যে সমুদয় মুসলমান আপনাদের আলস্য বা অন্যান্য কারণে দারিদ্র ভোগ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা উক্ত গণ্ডীর বাহিরে, লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে কি বলিতে চান? উকিল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যে সমাজের বল স্বরূপ, মুসলমানসমাজ তাহা বেশ বুঝিয়াছেন, তাই ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য একদিনে বা দুই দিনে কিছু করিয়া উঠা যায় না। সুধী লেখকের কেবল 'মৌলবী মোহিরুদ্দিন ও আকবর খাঁ ব্যতীত কোন মুসলমান ডাক্তারের নাম কর্ণগোচর' হয় নাই। আমরা তাঁহাকে একবার কেলেণ্ডার খানা তালাস করিয়া দেখিতে বলি। ডাক্তার তমিজদ্দীন খাঁর তৈলচিত্র Campbell Medical School এর গেলারীর শোভা বর্দ্ধন করার পরও আমরা তাঁহার কথা ভুলিতে পারিব না। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও দেশীয় ডাক্তার ততদূর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন কিনা জানিনা। খান্ বাহাদুর আগদর আলী খাঁর চিকিৎসা-নৈপুন্য পাটনা বিভাগে বিশেষ বিখ্যাত। ইহার পর গত কয়েক বৎসরেও মুসলমান ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা যেরূপ জানি, যাঁহারা কলিকাতা Medical Collegeএ পড়িতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কৃতকার্য্য হইয়া মুসলমানসমাজে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জমীদারদের কর্ম্মচারীর অধিকাংশই হিন্দু বলিয়া পরেশ বাবু যথেষ্ট বড়াই করিয়াছেন। যে কথা আমরা আর বলিব না ভাবিয়া ছিলাম আজ বাধ্য হইয়া তাহাই বলিতে হইল। মুসলমান-শাসন সময়ে ভদ্র মুসলমান সেনা বিভাগে প্রবেশলাভ করিয়া গৌরব অর্জ্জন করাই বেশী সম্মান জনক মনে করিতেন। তাই রাজস্ব আদায়ের ভার অনেক স্থলে হিন্দুর হাতেই পড়িত। ইহারই ফলে মীরজাফরকে সহায় করিয়া হিন্দু রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ কিরূপে চক্রজাল বিস্তার দ্বারা হতভাগ্য সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মুসলমান রাজত্বের অবসান করিয়াছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সে কাহিনী এখনও মুছিয়া যায় নাই। তারপর পূর্ব্ববঙ্গের অনেক হিন্দু জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ যে মুসলমান জমিদারের বাড়ীতে কার্য্য করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে তাহারই জমিদারী হস্তগত করতঃ জমিদার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। আমরা নাম করিতে চাহিনা, লেখক নিজেই হয়ত এইরূপ অনেক ঘটনা অবগত আছেন। মুসলমান জমিদার সরকারে মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা অল্প হওয়ারও কারণ আছে। পূর্ব্বে মুসলমানগণ জমিদারী কার্য্যে প্রবেশ করিতে আগ্রহ করিত না, কিন্তু এখন কোন মুসলমান জমিদার মুসলমান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলে সে দক্ষতায় কোন হিন্দু কর্ম্মচারী হইতে হীন নহে, ইহা পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। তবে হিন্দু কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে তাহার প্রথম প্রথম তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে। তাহাদের monopoly ছিন্ন হইতে দেখিয়া হিন্দুগণ দ্বিগুণ উৎসাহে হতভাগ্য মুসলমান কর্ম্মচারীকে বোকা বানাইতে যত্নপর হয়। ইহাও জমিদার সরকারে মুসলমান কর্ম্মচারীর অভাবের অন্যতম কারণ। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি কোনও সুশিক্ষিত মুসলমান জমিদার একজন মুসলমান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার হিন্দু কর্ম্মচারীগণ মুসলমান কর্ম্মচারীটিকে তাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল মুসলমান জমিদারের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষিত মুসলমানদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, তাহার ফলও আশাজনক হইতেছে। বঙ্গের সমুদয় মুসলমান জমিদার যদি এই পথ অবলম্বন করেন তবে মুসলমানসমাজে শিক্ষা বিস্তারের খুব সাহায্য হয়। মুসলমান-রাজত্বের অবসানের পর মুসলমানসমাজের সমগ্র দেহ অবসাদগ্রস্ত হওয়াতেই এখন তাহারা এত পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা অনুপাতানুসারে মুসলমান কখনও

হিন্দুর পিছনে পড়িয়া থাকিতেন না। আমরা মায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বলিতে বাধ্য গবর্ণমেণ্ট যদি সরকারী ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহে নিঃস্ব, মেধাবী মুসলমান ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়িবার একটা ব্যবস্থা না করিয়া দিতেন তবে মুসলমান ছাত্রের পক্ষে ফ্রীষ্টুডেণ্টশীপ লাভ করা অনেক স্থলে (অবশ্য সর্ব্বস্থলে নয়) দুষ্কর হইত। পবিত্র শিক্ষা মন্দিরের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনেক হিন্দুশিক্ষক মুসলমান ছাত্রদিগকে অনেক অপমান্য কথা বলেন, আমরা নিজেরা বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহা শুনিবার লক্ষ্য করিয়াছি। এমন কি কোন নিকৃষ্ট জাতির উদাহরণ দিতে হইলেই তাঁহারা মুসলমানজাতির নাম করেন। এই সমুদয় সঙ্কীর্ণমনা শিক্ষকগণ আর কিছু না করুন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের আশাকে যে শত বৎসর পিছনে ফেলিয়া দেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। লেখকের একটি উক্তি পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তিনি বলেন, 'গবর্ণমেণ্ট যেন প্রাণপণে বঙ্গীয়হিন্দুর প্রতি বৈমুখ্য ও মুসলমানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে তৎপর।' কই, আমরা মুসলমানেরা তো তেমন কোন কিছু ভাব একেবারেই ঠাহর করিতে পারি নাই? যদি মুসলমানকে গবর্ণমেণ্ট কিছু অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা দুর্ব্বল ছেলের প্রতি মায়ের একটু বাহ্যিক বেশী টান বই আর কিছুই নহে। তজ্জন্য হিন্দুসমাজের শীতল মস্তিষ্ক উষ্ণ করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। শত শত হিন্দুর মধ্যে দু'একজন মুসলমান কাজ পাইলেই যদি হিন্দুভ্রাতাগণ এত কষ্ট অনুভব করেন, তবে আর ঐক্যবন্ধনের বৃথা প্রয়াস কেন? লেখককে আমরা অভয় দিতেছি, সবরেজেষ্টারী কাজটা মুসলমানের আর একচেটিয়া নাই। তিনি একটু কষ্ট করিয়া নূতন Civil List টা দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। "আর না হয়, এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিতে পারিলেই হয়, তবেই একটা সবরেজেষ্টারী জুটিবে" বর্ত্তমান সময়ে কোন মুসলমান বালক এরূপ ভাব নিশ্চয়ই পোষণ করে না। কারণ এখন বহু বি, এ, পাশ মুসলমান ৩০।৩৫ টাকার চাকরী করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। সবরেজেষ্টারী পাইলে তাঁহারা আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করেন। জীবন-যুদ্ধে মুসলমান এখন আর চেষ্টাহীন নহে। লেখক বোধহয় জানেন না, মুসলমানদের মধ্যে ভদ্র দরিদ্র সন্তানগণই বেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিবার উপযুক্ত এখনও মুসলমান হয় নাই, তজ্জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। আশা করা যায়, একদিন মুসলমানও হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিবে। মুসলমানসমাজ যেসব ত্রুটীর জন্য উন্নত হইতে পারিতেছেনা, সময়ের আঘাতে জীর্ণ, ম্লান বস্ত্রসম তাহা আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে। লেখক যে বাদীপ্রথার দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই হ্রাস পাইতেছে, তজ্জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার আবশ্যক নাই। দুঃখের বিষয় লেখকের ভাষা সর্ব্বত্রই অবজ্ঞার ভাবপূর্ণ। মুসলমানকে অবজ্ঞা করিলে তাহার সহিত হিন্দুর মিলন কিরূপে সম্ভবে? তিনি নিজেদের উচ্চবংশের পরিচয় প্রদানে ব্যস্ত হইয়া বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে 'ভদ্র' সংজ্ঞা হইতে একরূপ বাদ দিয়াছেন। ইহা শুধু সত্যের অপলাপ নহে, লেখকের সঙ্কীর্ণতারও পরিচায়ক।

স্থানাভাব বশতঃ এবার আরও অনেক আলোচ্য বিষয় রহিয়া গেল।

নবনূর

ঈদ।
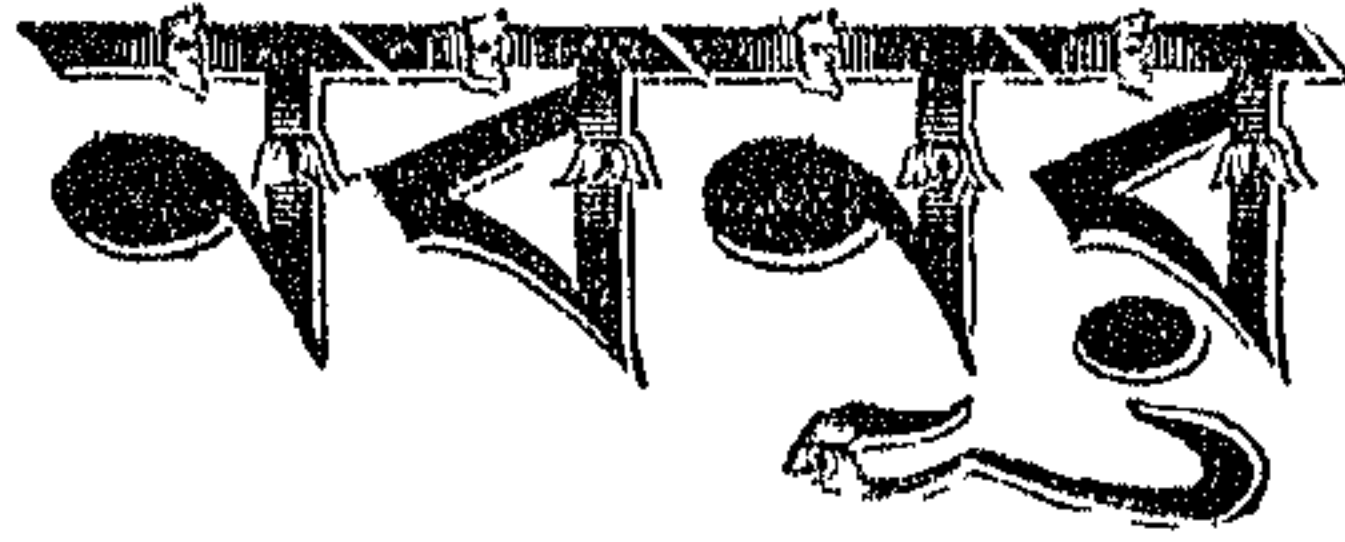
কুহেলি তিমির সরায়ে দূরে
তরুণ অরুণ উঠিছে ধীরে
রাঙ্গিয়া প্রত্যেক তরু-শিরে
আজি কি হর্ষ-ভরে!

আজি প্রভাতের মৃদুল বায়
রঙ্গে নাচিয়া যেন ক'য়ে যায়,—
"মোস্লেম-জগত আজি একতায়
দেখ কত বল ধরে।

হের আজি সবে শুভ লগ্নে মিলি'
দ্বেষ-হিংসা সব দূরে ঠেলি ফেলি
ভাই ভাই বলি করে কোলাকোলি;
সে দৃশ্য কি মধুময়!

আজিকে যেমরে আসিছে ভাসি
নন্দন-কুসুম-গন্ধ রাশি,
আমারি পরাণে জাগায়ে হাসি,—
আশার লহরী চয়!

আমি প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়,
নিশাশেষে থাক' জনম হায়,
যুগ যুগ ধরি বিপুল ধরায়,
উত্থান-পতন হেরি,

কত সখ্য-ঐক্য-প্রীতির কথা,
কতনা কবির হৃদয়ের ব্যথা,
কত বীরেন্দ্রের তেজোময়ী গাথা,
শুনিয়ু শ্রবণে ভরি'।

কিন্তু গো সকলি মানে পরাজয়
সে দুঃখের কাছে, যে দুঃখ নিচয়
হেরে'ছি মোস্লেম-অদৃষ্টময়,
আজি পুণ্যের পুলকে!

সব গেছে তবু সে ধর্মবিধান
আজিও অটুট রয়েছে তেমন,
তেমনি করিয়া মোস্লেম-জীবন
ভাসে আশার আলোকে!"

কত নিদ্রিত হায় জাগি' ভবে,
নেচে ছুটে যায় জীবন-আহবে;
মোস্লেম শুধুই পড়িয়া রহিবে
অনন্ত আঁধার ঘোরে?

সে কি জাগিবেনা, সে কি হাসিবেনা?—
দিনেকের এই অক্ষম চেতনা
সক্ষম করিয়া, উন্নতির পথে
যাবেনা সে বেগ-ভরে?

—:০:—

আরবীয় দর্শনালোচনা।

(৩)

ভ্রাতঃ, ত্বরান্বিত হও। আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতামহ নুহ আলায়হেচ্ছালাম (Noah) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মুক্তি-তরণীতে আমাদের সহিত আরোহণ করিয়া দ্রুতযাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে ও আমাদিগকে পরমেশ্বর তাঁহার মহা শক্তিতে অনুপ্রাণিত করুন। তাহা হইলে, আকাশে স্পষ্ট ধূম্র বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই তুমি তোমার রিপুনিচয়ের পরিপ্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে এবং কারণ সমুদ্রের (Sea of Matter) তরঙ্গনিচয় তোমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না,—তুমি নিমজ্জিতগণের একজন হইবে না। যে পর্য্যন্ত তুমি বিশ্বাসিদের একজন না হও, এবং মহাপুরুষ ইব্রাহিম (Abraham) ঘনান্ধকারময়ী রজনীতে যে স্বর্গরাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন তাহা না দেখ সেই পর্য্যন্ত আমাদেরই মত তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষা তোমাদের মনে সদা জাগ্রত থাকুক। ভ্রাতঃ, যে উপত্যকায় 'হে মুসা' ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হও। তাহা হইলে তোমার কার্য্য সমাধা হইবে, এবং যাঁহারা প্রভুর মহিমা সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন, তুমিও তাঁহাদের একজন হইবে। ভ্রাতঃ, জনবর্গ তোমাতে শক্তি-স্রোত ঢালিয়া দিবার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন, তুমি তাহা করিতে আকাঙ্ক্ষিত হও এবং যে ঈশা পরমেশ্বরের সিংহাসন-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তুমি সেই সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে অবলোকন করিতে তোমার নিজকে ভর্ৎসনা শূন্য কর, এবং নিজে তাঁহার চারিদিকের দর্শকমণ্ডলীর একজন হও।

আফ্‌রিহ্‌'র * বিস্তৃত প্রান্তরে ইয়াজদান (Yazda'n) কর্ত্তৃক বিচ্ছুরিত আলোক প্রপাত দর্শন না করা পর্য্যন্ত তুমি আহ্‌রেমনের (Ahriman)†

---

* সম্ভবতঃ মুদ্রাকর দোষে আর্ফ্‌রিজিউ'র পরিবর্ত্তে আফ্‌রিহ্‌' লিখিত হইয়াছে। আর্ফ্‌রিজিউ', আফ্রিজিউ' শব্দের বিপরিতার্থ বোধক। গ্রীক ভাষায় ইহাকে apogee বলে। পৃথিবী হইতে বহুদূরস্থিত কোন গ্রহ বা সূর্য্যের কক্ষের কোন স্থান বিশেষের নামই apogee. (Lib Mafa'-i-h' Al-Olu'm,—ed. Vloten—page 221).

† জোরোষ্টার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতানুসারে "আহ্‌রেমন" সমুদয় দুষ্কর্ম্ম ও অন্ধকারের এবং "ওরমোজ্‌দ" (Ormuzd—Yazda'n) আলোক ও সৎকর্ম্মের এবং পদার্থনিচয়ের স্রষ্টা।

অন্ধকার হইতে নিজকে বহির্গত করিতে তৎপর হও। প্লেটোবর্ণিত আফ্লাক* (Spheres) দর্শন না করা পর্যন্ত আজিমুনের (Adimoon) * বেদীমূলে প্রবেশলাভ করিতে উৎসুক হও। সত্যই এই কক্ষসমূহ আধ্যাত্মিক, ইহা জ্যোতির্বিদ-প্রদর্শিত গ্রহপুঞ্জ নহে। যে সমুদয় ধারণাতীত উপাদানীয় বিষয়ের সমবায়ে বোধশক্তি (Intellect) গঠিত তাহা ঈশ্বরের জ্ঞানের বিশাল গণ্ডিরই অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মার (Soul) উপাদান নিচয় (Forms) আবার এই Intellectএর বেষ্টনিভুক্ত। আত্মা কায়েনাত (being) পূর্ণ প্রকৃতিকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং প্রকৃতি স্থূলপদার্থের উপাদান মৌলিক অণুকে (Matter) বেষ্টন করিয়া আছে। অবলোকন কর, কিরূপ ভাবে আধ্যাত্মজগত একে অপরকে বেষ্টন করিয়া আছে। লায়লাতুল কদরের (The Night of Power and excellence) পোনতে বিনিদ্র থাকিয়া নিশা-শেষে স্বর্গারোহণ দর্শনাভিলাষী হও, তুমি সুসমাচার প্রদাতা আহমদ(দঃ)কে 'গৌরবান্বিত আসনে'। অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে এবং পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভকারিগণের মধ্যে তুমিও একজন হইবে।

হে ধর্মপ্রাণ সহৃদয় ভ্রাতা, জগদীশ্বর তোমাকে এবং আমাদের সমগ্র ভ্রাতৃ-মণ্ডলীকে এই সমুদয় গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি প্রদান করুন,--তোমার হৃদয় মুক্ত, বক্ষঃ ভীতিশূন্য, আত্মা নির্মল এবং বোধশক্তি প্রজ্ঞানত করুন, যেন তুমি এই সমুদয় গূঢ়তত্ত্বের যথার্থ প্রকৃতি তোমার মনশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে পার। কখনও দেহের মৃত্যুতে ভীত হইও না, তুমিত তাহা পরিত্যাগই করিয়াছ। এই দেহ হইতে আত্মার মুক্তিলাভই আত্মার জীবন। পরমেশ্বরের যে বন্ধুগণ মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা করে তুমি তাহাদেরই একজন হইবে। ঈশ্বর বলিয়াছেন,

* কথিত আছে যে আজিমুন (Adimoon) এবং হারমিসই (Hermes) সেথ (Seth) এবং ইদ্রিস (আঃ)। দার্শনিকগণ বলেন যে আজিমুন বলিয়াছেন,—পরমেশ্বর, জ্ঞান বা অনুভূতি (Intelligence), আত্মা, স্থল (Space) ও মহাশূন্য এই পাঁচটিই প্রধান, তৎপর অন্যান্য যৌগিক বা মিশ্র পদার্থ। আজিমুন শব্দ গ্রীক Agatho demon শব্দের অপভ্রংশ। Agatho demon মিসর দেশীয় দেবতা বিশেষ। কাহারও কাহারও মতে মিসর দেশীয় দেবতা ছেৎনাফ্ই (Chetnuph) Agatho demon. তদ্বারা অনুষ্ঠিত বহু কার্যের একটি বিবরণ ফেব্রিসিয়াস তাঁহার Bibliotheca Græca গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। (Dabistan, Shea and Troyer's transl. Vol. III. p. 105, n. 1.)

† কোরাণ, ১৭ অধ্যায়। হজরত আবু হোরেরার মতে, 'গৌরবান্বিত আসন' অন্যের জন্য যিনি মধ্যস্থতা করিবেন তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু সুফী মতানুসারে ইহা 'পরমেশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলনের অবস্থা'। Kashf o Istilahat-ul Funoon,' p. 657.

রাজা বলিলেন, "স্বীয় আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।" জ্ঞানীপুরুষ বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য মন্ত্রণাসভা খালি করিয়া দিন।" আল্ খারশোয়ান তাহাই করিলেন। তৎপর মন্ত্রী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, আপনি আপনার সমুদয় ধনরত্ন একত্রিত করিয়া শত্রুর অনধিগম্য, দুর্ভেদ্য কোনও স্থানে গমন করেন। আপনার সৈন্যসামন্তগণও আপনার অনুসরণ করিবে। যাত্রার পূর্ব্বে আপনি আমার হস্তপদ কর্ত্তন ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আপনি আমার প্রতি এরূপ ভাব দেখাইবেন যেন আপনি আমার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তখন দ্বারস্থ সকলকে বলিয়া দিবেন যে আপনি আমার প্রতারণা ও কুমতলব যথেষ্ট অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্যই আমার প্রতি এই শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন। তৎপর শত্রুর আগমনের আভাস পাইলেই আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবেন।" আল্ খারশোয়ান বলিলেন, "তুমি যাহা দান করিতেছ, মানুষের সেই সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য ধন জীবন, আর কেহত কখনও এমন করিয়া দান করিতে পারে নাই"। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "আমার পূর্ব্বে জনৈক শঠ কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঠিক এইরূপ করিয়া ছিলেন।" রাজা সেই ঘটনা বিবৃত করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "কথিত আছে, একদল ডুবুরি কোনও দ্বীপে মুক্তা সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল। তাহাদের সংগৃহীত কিছু কিছু মুক্তা অপহরণ মানসে একটি শঠও তাহাদের অনুগামী হইয়াছিল। কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা না পাওয়ায় শেষোক্ত ব্যক্তি, প্রথমোক্তদের প্রদত্ত কতিপয় ক্ষুদ্র মুক্তা ভিন্ন আর কিছুই আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলনা। তৎপর তাহারা একযোগে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে একদল দস্যু দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইল। দস্যুদিগকে দর্শন মাত্রই ডুবুরিগণ সকলে স্বীয় স্বীয় সংগৃহীত বহুমূল্য মুক্তানিচয় উদরস্থ করিয়া ফেলিল। কিন্তু শঠ ব্যক্তিটির সঙ্গে এমন কিছুই মূল্যবান ছিলনা হারাইবার ভয়ে যাহা সে গলাধঃকরণ করিতে পারে, তাই সে তাহার সহচরদের পন্থা অবলম্বন করিলনা। দস্যুগণ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অন্বেষণ করিল, কিন্তু গুটীকয়েক ক্ষুদ্র মুক্তা ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হইলনা। তখন তাহারা বলিল, "বড় মুক্তাগুলি তোমরা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ?" ডুবুরিগণ উত্তর করিল, "যাহা কিছু দেখিতেছ, ইহাই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব সম্পত্তি।" কিন্তু দস্যুদের তাহা বিশ্বাস হইলনা। তাহারা বলিল, "নিশ্চয়ই

তোমরা সেগুলি উদরস্যাৎ করিয়াছ। আমরা তোমাদের উদর বিদীর্ণ করিয়া তাহা বাহির করিব।" ডুবুরিদিগকে রাত্রির জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং পরামর্শ হইল, প্রাতঃকালে তাহাদের উদর বিদীর্ণ করিয়া মুক্তা বাহির করা যাইবে। ডুবুরিগণ সারারাত্রি ভাবনা চিন্তায় কর্ত্তন করিল। সেই শঠ ব্যক্তিও নিশ্চেষ্ট ছিলনা। সেও মনে মনে নানা সংকল্প স্থির করিতে লাগিল। অবশেষে সে সকলকে একপার্শ্বে ডাকিয়া নিয়া বলিল, "দেখ, আমি তোমাদের মুক্তার কিছু অংশ অপহরণ মানসেই তোমাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার আশা সফল হয় নাই। আমি ছাড়া তোমরা আর সকলেই মুক্তা উদরস্থ করিয়াছ, তোমাদের যে কাহারও উদর বিদীর্ণ করিলেই তাহা নিশ্চয় বাহির হইয়া পড়িবে, তদবস্থায় সকলের মৃত্যু অনিবার্য্য। আমার ইচ্ছা, আমি আমার নিজের জীবন দিয়া তোমাদের সকলের জীবন রক্ষা করি। আমি দস্যুদিগকে বলিব, "তোমরা যদি মনস্থ করিয়া থাক যে নিশ্চয়ই আমাদের উদর বিদীর্ণ করিবে, তাহা হইলে আমাদের যে কাহারও উদর চিরিয়া দেখিতে পার। তাহাতে যদি মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমরা অবলীলাক্রমে সকলের প্রতি সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিও। কিন্তু যদি প্রথম ব্যক্তির উদরাভ্যন্তরে মুক্তা প্রাপ্ত না হও, তবে মনে করিও, আমরা সত্যবাদী। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির উদর বিদীর্ণ করিতে হইবে ভাগ্য-পরীক্ষাদ্বারা তাহাকে নির্ণীত করিবার অধিকার প্রদান কর।" যদি তাহারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করে, আমি এরূপ উপায় অবলম্বন করিব যাহাতে আমারই নাম ভাগ্য-পরীক্ষায় উত্থিত হয়। যদি এতদ্বারা আমার জীবন নষ্ট হয়, আর তোমরা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হও, আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমার সন্তানদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিও এবং তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিও।" প্রতিদিনের মত উষা স্বীয় শান্ত করুণ হাসি নিয়া জগতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দস্যুগণের নিকট তাহাদের প্রস্তাব করিলে পর তদনুসারে কার্য্য করা হইল এবং ডুবুরিরা সকলেই রক্ষা পাইল।

আবদুল্লা আল্-মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী।

সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা ;
বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা ?"

নিধুবাবু।

বাঙ্গালা আমাদের জাতীয় ভাষা না হইলেও মাতৃভাষা বটে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের এই মাতৃভাষা অচিরকাল মধ্যেই জাতীয় ভাষার স্থানাধিকার করিবে, বোধ হইতেছে। মাতৃভাষা জাতীয় ভাষায় পরিণত না হইলে কোন জাতির জাতিত্ব-সংগঠন সম্ভব হইতে পারে না; আর জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কোন জাতি বড় হইতে পারে না। আমাদের যদি কিছু করিবার থাকে, তাহা জাতীয় ভাষার সাহায্যেই করিতে পারিব; অন্য উপায়ে আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, আমাদের সেই চেষ্টা পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনবৎ ব্যর্থই হইবে। দুরাশা কাহার কখন সফল হইয়া থাকে ?

আমাদের হিন্দুভ্রাতৃগণ উক্ত সত্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তদনুযায়িনী সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে, বঙ্গের বিশাল মুসলমানসমাজ আজও ইহার আবশ্যকতা সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের বঙ্গভাষা-বিরাগই এ বিষয়ের সর্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে। তাঁহারা যদি আজ বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সেই দৃষ্টান্ত শীঘ্রই দেশমধ্যে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষণের জন্য ও সাহিত্য-চর্চা বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বিনীত ভাবে আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিতেছি, বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের, সমাজের ও জাতীয় ধর্মের উন্নতি-বিধানে সকলে সচেষ্ট হউন।

যেকালে বাঙ্গালা ভাষা সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইতেছিল, যখন পারস্য প্রভৃতি ভাষা রাজদরবারের প্রচলিত ভাষা ছিল, সেই সুদূর অতীতে মসলমান-গণের বঙ্গভাষা-প্রীতির আধিক্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালার

প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার হইতে আজও বহু বিলম্ব আছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই শতসংখ্যক প্রাচীন মুসলমান কবির কীর্ত্তিরাজি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গবেষণা অব্যাহত থাকিলে কালে আরো কত কবিকীর্ত্তির আবিষ্কার হইবে, কে বলিবে? দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান-বঙ্গসাহিত্যের কোথায় কি আছে, আজও মুসলমানজাতির পক্ষ হইতে সেই বিষয়ের কোনই অনুসন্ধান হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গের সকল স্থানেই প্রাচীন কবির কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান থাকিয়া ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমাদের জিনিষ যদি আমরা রক্ষা না করি, তবে কে করিবে? হিন্দুগণ তাঁহাদের প্রাচীন সাহিত্য রক্ষার জন্য কি করিতেছেন, দেখিতেছেন না কি? আর মোহ-নিদ্রার সময় নাই। এখনো সকলে চেষ্টিত হইলে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা আছে।

আমাদের মধ্যে প্রাচীন কালে এমন কতকগুলি কাব্যের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা লইয়া আমরা অসঙ্কোচে হিন্দু কবির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। সেই কাব্যগুলি নিরক্ষর মুসলমানগণের হস্তে পতিত হইয়া বিলক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আসিতেছে। তৎসমস্তের উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হওয়া আমাদের সকলেরই উচিত। অতঃপর আমরা ক্রমে সেই সমস্ত কাব্যেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব, মানস করিয়াছি। অদ্য এই প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত কাব্য-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 'নবনূরের' পাঠকগণকে শুনাইতেছি।

এই কাব্যের প্রকৃতনাম 'সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রানী' কিন্তু ইহা সাধারণতঃ 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রানী' নামেই পরিচিত আছে। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইজন কবি ইহার রচয়িতা। সেই কবিদ্বয়ের নাম দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। প্রাচীন সাহিত্যে একই গ্রন্থ যুগল-কবি-কর্ত্তৃক রচিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এই প্রথম নহে, তবে সেরূপ গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম বটে। সর্ব্বাগ্রে আমরা কবিদ্বয়ের যথা-সংগৃহীত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

বলা অনাবশ্যক যে, প্রাচীন কালের কোন কবির বিষয়ই অধুনা সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা বড়ই দুঃখের কথা, সন্দেহ নাই। আলাওল ও দৌলত কাজীর মত লোকের আবির্ভাবে পৃথিবীর যে কোন সমাজ নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিতেন, কিন্তু আত্ম-গরিমা-জ্ঞান-শূন্য বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ ইঁহাদের কোন খবরই রাখেন নাই। তাঁহারা যদি হিন্দুকুলে

আবির্ভূত হইতেন, আজ তাঁহাদের জন্মমৃত্যুস্থান 'পীঠস্থান' বলিয়া পরিগণিত হইত, সন্দেহ কি? গুণীই গুণীর মর্ম্ম বুঝে; অন্যের পক্ষে মণ্ডূকের মধু চৌকি দেওয়ার মত কেবল বিড়ম্বনাই সার। তাঁহারা আমাদিগকে শাশ্বত কালের জন্য যে মধু আহরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্য আমরা তাহার রস-গ্রহণে অক্ষম! আমাদেরই ভোগ্য বস্তু আজ পর জাতীয় লোকের নিকট সমাদৃত হইতেছে; আর আমরা ভেবাচেকা হইয়া দূর হইতে চাহিয়া আছি! আমাদের এই কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই কোথায়? বুঝিতে পারিলাম, বুঝি আমাদের সমাজ-শরীরে প্রাণ নাই, অথবা যাহা আছে, তাহাতে অনুভব-শক্তির লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। তাহা যদি থাকিবে, এত ঘায়েও আমাদের সাড়া নাই কেন? আমাদের এ নিস্পন্দ ও জড় ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে না কেন? কিন্তু সে কথা আজ থাকুক।

বলিতেছিলাম, অন্যূন তিনশত বৎসর হইল, কবি দৌলত কাজী চট্টগ্রামের কোন গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে গ্রামের নাম কি, আমরা জানি না। তাঁহার পিতা মাতার নামও আমাদের জ্ঞানগোচর নহে। তাঁহার মর্ত্ত্য-লীলা সম্বন্ধে শুধু এই জানি যে, এই মিছা সংসারে আমাদেরই মত তিনিও একজন মানুষ ছিলেন,—এই সুখ দুঃখ, এই আধি ব্যাধি, এই হাসি কান্না, সকলই তাঁহাতে ছিল! জরা কখনো তাঁহার সীমায় পঁহুছিতে পারিয়াছিল কিনা, ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু এই সংসার প্রপঞ্চের দুর্জ্ঞেয় রহস্য 'মৃত্যু' যে অবশেষে তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিল, তাহা শতবার শপথ করিয়া বলিতে পারি। মৃত্যু জগৎপাতার সৃষ্ট জীবগণের শেষ শান্তিস্থল; আমরা কবিবর দৌলত কাজীকে এই শান্তিকুঞ্জে উপস্থিত করিয়াছি। অতঃপরও যদি কেহ আমাদের নিকট তদীয় জীবনী শুনিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদনে অসামর্থ্য পরিজ্ঞাপন ভিন্ন এ গরীব লেখকের আর গত্যন্তর নাই। কারণ দৌলত কাজী আজ এমন অজানিত দেশে অবস্থিত, যাহার সীমায় পঁহুছিলে আর কেহই তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। *

তদানীন্তন রোসাঙ্গের রাজসভার প্রীতিচ্ছায়ায় থাকিয়া দৌলত কাজী সমালোচ্য কাব্যখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জানা যাইতেছে, রোসাঙ্গ-রাজ-

* "That undiscovered country from whose bourne
No traveller returns." *Shakespeare.*

দরবার তখন কয়েকজন পরম গুণী, গুণগ্রাহী ও কাব্যামোদী মুসলমান অমাত্য-বর্গের দ্বারা মণ্ডিত ছিল। 'পদ্মাবতী'র আদেষ্টা মাগন ঠাকুর, 'সয়ফল মুল্লুকের' আদেষ্টা সৈয়দ মুছা, 'সেকান্দর নামা'র আদেষ্টা মজ্‌লিস নবরাজ, 'সপ্ত পয়-করের' আদেষ্টা মোহাম্মদ খান, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গের রাজদরবারের উচ্চ উচ্চ পদে (অমাত্য পদে) অধিষ্ঠিত ছিলেন। দৌলত কাজীর আমলে রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মা রোসাঙ্গের অধিপতি এবং আশরফ খান রোসাঙ্গের লস্কর উজীর (সামরিক বিভাগের মন্ত্রী) ছিলেন। আশরফ খান সাধারণতঃ 'লস্কর উজীর' উপাধিতেই পরিচিত আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ জলাশয়—"লস্কর উজীরের দীঘি" আজও চট্টগ্রাম—কদলপুর গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অতীত কীর্ত্তি-কথা জগতে বিঘোষিত করিতেছে। দৌলত কাজী ইঁহারই আদেশে তাঁহার "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কাব্যের প্রারম্ভে আশরফ খান ও উক্ত রোসাঙ্গ রাজের কীর্ত্তি-কথা লইয়া কৃতজ্ঞচিত্ত কবি একটি বিস্তৃত অধ্যায় লিখিয়াছেন। তাহা কেবল উক্ত দুই মহাত্মার পদে ভক্তি-উপহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইতে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক তথ্যাবিষ্কার করা যায়না।

তাহার কিয়দংশ এখানে তুলিয়া দিলাম :—

কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমবুদ্ধি ছার (?)।
নাম রুস্তধর্ম্ম রাজা ধর্ম্ম-অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥

*　　*　　*

ধন্য২ শব্দ হৈল দেবের সভাত।
সুধর্ম্মের কীর্ত্তিযশ পূর্ণ সন্নিপাত॥
নৃপতির যশকীর্ত্তি যেই নরে গাএ।
জন্ম সুখী হএ নর দারিদ্র্য পলাএ॥

ধর্ম্মরাজ পাএ শ্রী আসরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান॥

* * *

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।
ডিঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর॥
নৃপতি বল্লভ সেই আসরফ খান।
নানা দেশে গেল তান প্রতিষ্ঠা বাখান॥
সৈদ সেখজাদা আর আলিম ফকির।
পালেন্ত যে সব লোক প্রাণের অধিক॥

* * *

উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আজি কুচি পাটান (?) যে আদি যত দেশ॥
হেন রাজা যার প্রতি মহা দয়া করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে॥
বিবিধ প্রকারে দিলা বসন ভূষণ।
বিবিধ প্রকারে কৈলা রাজ্যের পালন।
ছত্র সমে দিলা রাজা স্বর্ণ পতাক।
রত্নময় টুপি দিলা অপূর্ব্ব সে টোপ॥
দশহস্তী প্রধান যে দিলা বড়া বড়া।
দাস দাসী সঙ্গে দিলা নেতের কাপড়া॥
আসরফ খান যদি হইলা সেনাপতি।
নৃপতির সাক্ষাতে থাকন্ত নিতি নিতি॥*

---

* অতঃপর উক্ত মহারাজের এক বিপিন-বিহারের কাহিনী প্রদত্ত আছে। তাহার সঙ্গে সমস্ত সৈন্য ও মন্ত্রিগণও উপস্থিত ছিলেন,—আসরফ খান ত ছিলেনই। তাহাতে লিখিত আছে :—

বনপাশে নগর এক ধারাবতী নাম।
কুম্ভের নাসিকা যেন অতি অনুপাম॥
সৈন্য সমন্বিত রাজা আনেট করিআ।
চারি মাস রহে তথা বন বিহারিআ॥

এই বন শব্দে বোধ হয় চট্টগ্রামের পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী শৈলমালাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই নগর রোসাঙ্গ সহরের অনতিদূরেই হওয়া সম্ভব। 'রোসাঙ্গ' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন 'আরাকান' নামে পরিবর্ত্তিত। চট্টগ্রামও একদা রোসাঙ্গ প্রদেশের এলাকাভুক্ত ছিল, জানা যায়। আরাকান এখন চট্টগ্রামের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত অচলরাজির অপর পারে অবস্থিত। চট্টলের

গ্রন্থের উৎপত্তি-বর্ণনা-স্থলে কবি লিখিয়াছেন:—

(বন-বিহার হইতে প্রত্যাগমনান্তর)
"নানা জাতি সৈন্য সবে ধরিল যোগান।
সভাতে বসিলা পাত্র আসরফ খান॥

*　　*　　*

হেন মতে সভা করি বসি থাকে নিতে (নিতি)
কহন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে॥
আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুণিগণ গোআরি ও থোটা বহুতর। (?)
সহজে মোহন্ত সভা লোক বহুতর॥ *
শেষে পুনি কহিলেক কৌতুকে মহামতি।
শুনিতে সতীর কথা রাজার আরতি॥
ঠেঠা ছোপাইয়া দোহ কহিলা সদনে। (?)
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ সানন্দে॥"
তবে কাজি দৌলতে সে বুঝিয়া আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥

থোটা, থেট বা ঠেঠা, ছোপাইয়া এবং গোহারী ভাষা কোন্ দেশের ভাষা? এই শেষোক্ত ভাষাতেই নাকি আলোচ্যমান কাব্যের উপাখ্যানটি উপন্যস্ত ছিল। বলা উচিত, ইহা একটি হিন্দু উপাখ্যান,—সম্ভবতঃ কোন পুরাণান্তর্গত হইবে।

আশরফ খাঁর আদেশ-কুসুম শিরোধার্য্য করিয়া কবি দৌলত কাজী এই কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কালান্তক কাল কবির এই কার্য্য শেষ না হইতেই তাঁহাকে কবলিত করিয়াছিলেন। কাব্যখানি দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে লোররাজ ও চন্দ্রানীর

প্রান্তসীমায় এখনও 'পাথরী কিল্লা' নামক স্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত এক কেল্লার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান।

* 'গুজার্তি গোহারী থেট ভাষা বহুতর।
সহজে মহত সভা আনন্দ নিয়র॥' পাঠান্তর।

বৃত্তান্ত, এবং ২য় ভাগে ছাতন ও ময়নামতী রাণীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া ২য় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর কবির জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হয়; এবং তৎ সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার আরব্ধ কাব্যখানিও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। হায়! কালপ্রভাব খণ্ডন করে দুর্ব্বল মানুষের কি সাধ্য?

এইরূপে "খণ্ড থাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন," (কত দিন, নিশ্চয় বলা যায় না।) এবং—

* * *

এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল॥
তবে পুনি রাজ্যের হৈল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপ মহাশয়॥
শুভ ক্ষণে হৈল আসি রোসাঙ্গে অধিপতি।
দুঃখী সুখী হইল দুর্জ্জয় অধিপতি॥

দৌলত কাজীর কীর্ত্তি ও রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মা (সংক্ষেপতঃ সুধর্ম্মা) রাজার মৃত্যুর পর আরো তিনজন ভূপতি ক্রমাগয়ে রোসাঙ্গের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দীর্ঘকালের পর শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে কবিবর আলাওল সাহেব এই অসম্পূর্ণ কাব্যের সমাপ্তি বিধানের জন্য অগ্রসর হন। পূজ্য জনের প্রতি তখনকার কবিগণের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দৌলত কাজীর মত আলাওলও তাঁহার অনুগ্রাহক রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার বিস্তর স্তুতি-গীতি গাহিয়াছেন। বস্তুতঃ "শ্রেয়ো হি প্রতিবগ্নাতি পূজ্য পূজা ব্যতিক্রমঃ" ইহার সারমর্ম্ম তাঁহারাই বেশ বুঝিতেন।

উক্ত শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার মহাপাত্র শ্রীমন্ত ছোলেমানের আগ্রহাতিশয্যে ও আদেশে কবি আলাওল লোর চন্দ্রানীর অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দেন।

স্থানান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে * আলাওলের জন্মকাল ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখা যাইতেছে যে,দৌলত কাজীর অনুগ্রাহক রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মা রাজার পর ৪র্থ রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা রোসাঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট। গৌড়ের ফতেয়াবাদ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে

* আলো—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় 'কবিবর আলাওল' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আলাওল সাহেব রোসাঙ্গে আগমন করেন। * এই সময়েই শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা † রোসাঙ্গের অধীশ্বর। সমালোচ্য কাব্য হইতে জানা যায় যে, এই রাজা তথন প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হন নাই, নিশ্চয়ই। ১৬৫০ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সিংহাসনারোহণ-কাল অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। মনে রাখিতে হইবে, এই ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনজন মহীপতির রাজত্ব হইয়া গিয়াছে। এই তিনজন রাজার রাজত্ব-কাল কত? অবশ্য জানি যে, রাজনৈতিক ঘটনা-চক্রে এক শতাব্দ হইতে এক বৎসর মধ্যেও তিনজন রাজার ক্রমান্বয়ে রাজত্ব সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তিনজনই ক্ষীণায়ুঃ ছিলেন, এরূপ অনুমানের যুক্তি সঙ্গত কারণ কোথায়? তবে গড়ে প্রত্যেক রাজার ১০ বৎসর রাজত্বকাল ধরিয়া মোটে ৩০ বৎসর কাল ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৬২০ খৃষ্টাদের পূর্ব্বে রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মা রাজা ও কবি দৌলত কাজী বিদ্যমান ছিলেন, বলিতে হয়। গ্রন্থরচনা কালে কবির বয়স অন্যূন ৪০ বৎসর ধরিলে দৌলত কাজীর জন্মকাল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এতদ্বারা দৌলত কাজী কবি আলাওল হইতে প্রায় সার্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের লোক হইতেছেন।

আলাওল তাঁহার পদ্মাবতী কাব্যের মুখবন্ধে লোর চন্দ্রানীর উল্লেথ করিয়াছেন। 'পদ্মাবতীর' আদেষ্টা মাগন ঠাকুর ও 'লোর চন্দ্রানীর' শেষাংশের আদেষ্টা শ্রীমন্ত ছোলেমান সমসাময়িক ব্যক্তি। তবে সম্ভবতঃ মাগন ঠাকুর বয়োজ্যেষ্ঠ ও আগেই গতায়ু হইয়াছিলেন। 'লোর চন্দ্রানী' রচনার সময়ে মাগন জীবিত থাকিলে, আলাওল তাঁহার নাম অবশ্যই উল্লেথ করিতেন। সম্ভবতঃ 'পদ্মাবতীর' পর হয় 'লোর চন্দ্রানীর', শেষাংশ, না হয় 'সয়ফল মুল্লুক' রচিত হয়। 'লোর চন্দ্রানী' রচনা কালে শাহ্ শুজা রোসাঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, বোধ হয় না। তাই এই গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেথও হয় নাই।

---

* 'সেকান্দর নামা' মতে সুলতান শাহ্ শুজার সহিত (অর্থাৎ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) এবং 'সয়ফল মুল্লুক' মতে তাঁহার পূর্ব্বে আলাওল রোসাঙ্গে আগমন করেন। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য বিধান ঐতিহাসিকের কার্য্য হইলেও এ ক্ষেত্রে তাহা সহজ ও সুলভ নহে। নবনূরের' পাঠকগণের মধ্যে কেহ ইহার মীমাংসা করিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব।

† ইঁহারই নিষ্ঠুর হস্তে বোধ হয় শাহ্ শুজা সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন।

আলাওল 'সোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত করিয়া যে কাল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ঃ—

মুছলমানী শক সংখ্যা শুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপনে দুই দিগে।
শুক্ত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥
মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥ *

উদ্ধৃতাংশ হইতে যে দুইটি সন পাওয়া যায়, তাহা এই ঃ—১০৭০ হিজরী ও ১০২০ মঘী সন। তাহা হইলে বলিতে হয়, হিজরী সন হিসাবে ২৫১ বৎসর পূর্বে ও মঘী সন হিসাবে ২৪৫ বৎসর পূর্বে আলাওল 'সোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত করেন। ইহাতে উক্ত সন দুইটির মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে। আলাওলের মত লোক না জানিয়া না শুনিয়া এরূপ ভ্রম করিয়া গিয়াছেন, আমরা সে কথা বলিতে সাহস করি না। তবে এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি তাহাও আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের মুসলমানসমাজে যুগে যুগে এমন কতকগুলি 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাঁহাদের সাহিত্য-বিষয়ক জ্ঞানের দৌড় বিবেচনা করিলে, তাঁহাদের অসাধ্য কিছুই আছে বলিয়া বোধ হয় না। যেসকল কাব্যাদি লইয়া আমরা একদিন সকলের নিকট গৌরব করিতে পারি, সেই কাব্যগুলির যে দুর্দশা তাঁহাদের হস্তে হইয়াছে, তাহা বলিতে হইলে বহু আয়াস ও সময়ের প্রয়োজন। কি করিব, আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ এইরূপ গৌরবজনক বিষয়ে যে আদৌ মনঃসংযোগ করিতে চাহেন না। যাহা হউক, এখন সে কাঁদুনি রাখিয়া দিয়া উক্ত সন দুইটির মধ্যে একতর সনকে আমরা ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে,

---

* "সিন্ধু শূন্য দেখিয়া দুই দিগে।
শুক্ল কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥
মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে দুর্গাঙ্কন॥"
(ছাপা পুঁথির পাঠ।)

মুসলমান পাণ্ডিত্যের অদ্ভুত নিদর্শন। দুঃখের বিষয়, আমাদের সমস্ত কাব্যগুলি এমনি ভাবেই সুসম্পাদিত হইয়া রহিয়াছে॥

আলাওল ২৪৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে 'লোর চন্দ্রানীর' পরিসমাপ্তি বিধান করেন। আর দৌলত কাজী ১৬২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। আমাদের এই মতের সমীচীনতার বিচার-ভার অভিজ্ঞ সুধীগণের উপর ন্যস্ত রহিল। এরূপ জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা একা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমালোচ্য কাব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে এবার কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না।

আবদুল করিম।

বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান।

১৩১০ সালের শ্রাবণ সংখ্যার "ভারতী"তে শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। মুসলমানদিগের আর্ত্তনাদে, যে সকল কৃতী হিন্দুই বধির নহেন ইহাই সুখের বিষয়! তিনি সরল বিশ্বাসে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা কৌতূহল পূর্ণ হৃদয়ে পাঠ করিয়াছি। আমাদের নিকট যাহা অসঙ্গত আরোপ বলিয়া বোধ হইল সরলভাবে তাহারই সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি—বাদ প্রতিবাদের প্রত্যাশায় নহে।

বঙ্গীয় মুসলমানগণ আজি কালি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি মনোযোগী হইতেছেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে এবং বাঙ্গালী হিন্দুদিগের অনুকরণে মুসলমানগণ বঙ্গীয় নাটক নভেলের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই মুসলমানগণ হিন্দু লেখকের, লেখার মধ্যে যেটুকু দ্বেষমূলক বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন সংবাদ পত্রে প্রকাশ্য আলোচনা দ্বারা তাহারই সামান্য আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ভ্রাতাগণ তাহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে উভয় সমাজের পক্ষেই তাহা কল্যাণ জনক হইবে। আমরা পরস্পর যদি সংকল্প স্থির রাখিয়া এইরূপ আলোচনা ও তৎপ্রতিবিধানে মনোযোগী হই তাহা হইলে United India অন্ততঃ পক্ষে United Bengal আর স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইবে না এবং হিন্দু ভ্রাতাগণও তাঁহাদের অভিযোগ জ্ঞাপন ও আমাদের অভিযোগ শ্রবণ করিতে

অমনোযোগী হইবেন না। প্রার্থনা এই যে, যে অবজ্ঞার ভাব এখন মস্তক বাহির করিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে, তাহা যেন প্রকৃত সখ্যে পরিণত হয়, কারণ যেস্থানে দুই জাতির একের মধ্যে অন্যের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বিদ্যমান, তথায় উভয়ের মধ্যে মিলনের আশা করা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র।

"গোমাংস ভোজনে হিন্দুদিগের বিরক্তি জন্মিলেও তাহাতে ঐক্যের অন্তরায় জন্মিতে পারে না" একথা সত্য হইলেও আজি কালি হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের অনেক খুঁটিনাটি ইহাই লইয়া। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই হিন্দু। তাঁহারা অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ কামনায় প্রায়ই স্বীয় প্রভু-শক্তি প্রয়োগে অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকেন। উদার প্রকৃতির অবস্থাভিজ্ঞ হিন্দুজমিদার যে একেবারে নাই একথা আমরা বলিনা। কিন্তু হিন্দু জমিদারের সহিত মুসলমান প্রজার মনোমালিন্যের প্রধানতম কারণই এই। এ বিষয়ে যশোহরের গোয়ালা জমিদারদিগের দৃষ্টান্ত খুব টাট্‌কা। যাহা হউক হিন্দু ডেপুটী তাহার সুবিচার করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কোন হিন্দু জমিদারের হিন্দু নায়েব তদধীনস্থ কোন মাতব্বর মুসলমান প্রজাকে গোহত্যার অজুহাতে তহশীলদারী কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিতেছেন বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা কি ন্যায় সঙ্গত? এইরূপ ব্যবহারই কি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য সংঘটনের বহুকারণের মধ্যে একটি নহে? আমরা যদি দৃষ্টান্ত সংগ্রহে নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে বিস্তর প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি। হিন্দু আমাদিগকে উপদেশ দিউন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করা (যে ভাবেই হউক) কি উচিত? হিন্দুসমাজ সংখ্যায় ও শক্তিতে প্রবল কিন্তু মুসলমানসমাজ নেতৃবিহীন—ধর্ম্মকর্ম্ম বিহীন হওয়াতে ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। দরিদ্র শক্তিহীন মুসলমান প্রজা প্রবল জমিদারের সহিত অকারণ বিবাদ হইতে নিরস্ত থাকাতেই এবং বঙ্গীয় মুসলমানসমাজে (স্থানে স্থানে) হিন্দুপ্রভাব প্রবেশ করাতেই মুসলমানদিগের মধ্যে গোমাংস ভোজন কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কই তাহাতেও ত গোবংশ রক্ষা হইতেছে না। হিন্দু জমিদারবর্গ গোধন পালন ও রক্ষার কি উপায় করিয়াছেন? গোবংশ যে ক্রমশঃ নির্জীব ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় কর বৃদ্ধির লোভে গোচারণের মাঠেরও তাঁহারা কর লইতেছেন। গোচারণ ভূমির অভাবইকি গোবংশ ধ্বংসের প্রধান করণ নয়?

লেখক মহাশয়ের সহিত আমরাও একবাক্যে বলি "যে হিন্দু-মুসলমানের

মধ্যে নিতান্ত বিরক্তিকর এমন কি আছে যাহাতে তাহাদের ঐক্যের অন্তরায় সংঘটন করিবে ?" সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি ছিল। হিন্দু মুসলমানকে 'চাচা' 'মামু' 'ভাই' 'দাদা' ইত্যাদি সম্বোধনে এবং মুসলমান হিন্দুকে 'জ্যাঠা' 'খুড়া' 'মামা' 'দাদা' ইত্যাদি সম্বোধনে পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। এক গোহত্যার হুজুকে পড়িয়া এ সম্প্রীতি অনেক স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে। ঘরে ঘরে পাঁচ ও একশত ভাই কিন্তু পরের নিকট একশত পাঁচ ভাই হওয়ার ভাবটা খুব ভাল ; কিন্তু অকারণ ভেদই যে কুরুক্ষেত্রের কারণ। আমাদের সেই অকারণ ভেদটাকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে মঙ্গলের আশা কই ?

হিন্দুগণ ঘৃণাই করুন আর অবজ্ঞাই করুন তাহাতে মুসলমানের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে। তাহাতে প্রতিযোগিতা জাগে না প্রতিহিংসা জাগে। ঘৃণা বা অবজ্ঞার প্রতিদান কি ?

জগতে প্রত্যেক লোকই আপনাকে বড় দেখিতে চায়। অনেকে অজ্ঞানতার মধ্যে থাকিয়াই আপনাকে বড় বলিয়া জানে। আত্মমর্য্যাদা ব্যতীত গুরুত্ব কোথায় ? কিন্তু তাহার মধ্যের ভ্রমটুকু বাদ দেওয়া চাই। জাপানী ও ইংরাজে বন্ধুতা নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার কিছু কিছু পরিহার করিয়া নহে কি ? হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সাধনে সেইরূপ কিছু কিছু বাদ দেওয়া চাই। মুসলমানও হিন্দুর অপ্রীতিকর অনেক ধারণা পোষণ করেন সত্য কিন্তু তাহার পরিব্যক্তির সুযোগ দেখি না। হিন্দু, মুসলমানের (যতই সম্ভ্রান্ত মুসলমান হউন না) বাটী যাইলে, মুসলমান কোন রূপ সংকোচ বোধ করেন না। কিন্তু মুসলমান, হিন্দুর (যত সামান্য হউক না) বাটী যাইলে গঙ্গাজলের খরচ বাড়িয়া যায়—স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় !

বঙ্গীয় মুসলমানগণ অধিকাংশ অশিক্ষিত সত্য এবং অনেকেই নিম্ন শ্রেণীর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সকলেই জানেন অশিক্ষিত লোক সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে অবজ্ঞাত। কিন্তু হিন্দুগণ প্রায়শঃ মুড়ি মিছরির একদর করিয়া থাকেন। অনেক হিন্দুর, মুসলমান নাম শ্রবণ মাত্রেই বিবমিষা জন্মে। মুসলমান স্বাধীন প্রকৃতির উদ্দাম উত্তেজনায় ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দুদিগের অনেক পরে মনোযোগী হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতায় তাহারা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা একেবারে অবজ্ঞার পাত্র নহে। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্বাধীন ব্যবসা মুসল-

মানদিগের দ্বারা চলিতেছে। নচেৎ হিন্দুর কল্পিত উন্নততর সভ্যতা এতদিনে আরও পরমুখ-সাপেক্ষ হইয়া পড়িত। হিন্দু, ব্যক্তি বিশেষকে সম্মান দেখাইয়া থাকেন সত্য। জগতে যাঁহারা নাম প্রতিষ্ঠিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সম্মান না করিয়া কে পারে? কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি যথার্থ অনুগ্রহ ত দেখা যায় না। হিন্দু জানেন, মুসলমান অশিক্ষিত—সেজন্য অবজ্ঞাও করেন সুতরাং উপেক্ষাও করেন। কিন্তু তবে গভর্ণমেণ্ট মুসলমানের প্রতি একটু অনুগ্রহ দেখাইলে হিন্দু বিশেষ আড়ম্বরের সহিত হৈ চৈ করেন কেন? প্রতিযোগিতার কথা তুলিয়া নিরপেক্ষ বিচারপ্রার্থী হয়েন কেন? দুর্ব্বলে ও সবলে প্রতিযোগিতা কি সম্ভবে? দুর্ব্বল পুত্রের কি পিতৃ-ধনে বঞ্চিত হওয়া উচিত? হিন্দুগণ তবে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সমান ব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যস্ত কেন? আসাম ও বাঙ্গালার ব্যবস্থা কি কোন কোন অংশে ভিন্ন নহে? এ ভিন্নতা কি শিক্ষার তারতম্য বশতঃ নহে? মুসলমান যদি অকর্ম্মণ্যই হয় তাই বলিয়া কি গ্রীক ব্যবস্থাপক Lycurgus এর নীতি অনুসরণ করিতে হইবে? যখন মুসলমান উড়িয়া আসিয়া বিল জুড়িয়া বসিয়াছে, তখন তাহার প্রতি অবস্থানুযায়ী একটু ভিন্ন ব্যবস্থাই আবশ্যক।

মুসলমানদিগের বান্দি রাখার নিয়ম একটি গুরুতর দোষ বলিয়া হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন। অন্ততঃ লেখক মহাশয়ের অভিমত এই। হিন্দুদিগের দাসী নাই কি? কলিকাতায় ঝির ছড়াছড়ি দেখিয়াছি। পল্লীগ্রামে বিধবা রমণীরা অনেক সংসারে থাকে—মুসলমানসমাজে বিধবার বাজার তেমন সুলভ নহে। সুতরাং বান্দি রাখা আবশ্যক। বান্দি বিবি হইলে একটু গোলযোগ কিন্তু হিন্দুর অবজ্ঞা আকর্ষণের কারণ কি? লেখক মহাশয় দেশকাল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বান্দি রাখাটা তত বিরক্তিকর মনে করিবেন না। *

---

* পরেশ বাবু বান্দিজনার যেরূপ বৃহদাকৃতি ধরিয়া লইয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা তাহা নহে। এ প্রথা বর্ত্তমান সভ্যতানুমোদিত শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর দাসীকুল হইতে মুসলমানের বান্দিকুলের নৈতিকজীবন অনেকাংশে ভাল। আমাদের সামাজিক বিধান অনুসারে আমাদের রাতারাতি সাহেব হইবার উপায় নাই এবং আবশ্যকও নাই। প্রত্যেক ভদ্র পরিবারেই দু'একজন বান্দির একান্ত দরকার। এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা মুসলমান ভদ্র মহিলাগণ করিতে পারেন না, বান্দিগণই সে সব কাজ করিয়া থাকে। ভদ্রতার আদর্শ সব সমাজের এক নয়। যদি মুসলমান হিন্দুর আদর্শে পরিচালিত হন, তবে মুসলমানেরা মুসলমানত্বই থাকে না, মুসলমানকে হিন্দু সাজিতে হয়। সুতরাং এ বিষয় লইয়া লেখকের বাড়াবাড়ি করা যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। মুসলমান তাহার নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কখনই হিন্দুর সহিত যোগ দিতে পারেন না। যদি হিন্দু-মুসলমানের

মুসলমানের বিলাসিতা আর একটি কলঙ্ক। এ কলঙ্ক একেবারে অপ্রকৃত নয়। কিন্তু তাহা স্বল্প সংখ্যক ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্য মুসলমান সাধারণ অবজ্ঞাত কেন? বিলাসিতা দ্বারা মুসলমান-অভিজাত সম্প্রদায় সাবেক স্বাধীনতার স্মৃতি রক্ষার বিফল প্রয়াস করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মুসলমানগণ বর্ত্তমান শিক্ষাকে উচ্চাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তবে চাকরীর দায়ে এখন অনেকে আপনাপন সন্তানদিগকে ইংরাজী শিখাইতেছেন। সময়ের স্রোত ফিরিতেছে এবং সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই বর্ত্তমান শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এ বিষয়ে জমিদার শ্রেণীও নিতান্ত অমনোযোগী নহেন। এতদিন শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ মুসলমান বালকদিগের মধ্যে অনেকে অভিভাবক হীন অবস্থায় কুসঙ্গে পড়িয়া যে অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছিল মুসলমান সম্প্রদায় ইহা এখন বুঝিয়াছেন কিন্তু বড় বিলম্বে।

যতদূর জানি সমাবস্থার হিন্দু, মুসলমান অপেক্ষা অধিক গহনা ব্যবহার করেন। মুসলমান তালুকদার-রমণী পায়ে সোনার গহনা পরেন বলিয়া শুনা যায় না। পায়ে সোনা পরিতে নাই এ ধারণাও মসলমানের মধ্যে রহিয়াছে। মুসলমান-রমণী গৃহকর্ম্মে কুণ্ঠিতা নহেন তবে নারী-মর্য্যাদার খাতিরে নিম্নশ্রেণীর গৃহকর্ম্মে তাঁহারা উদাসীন। মুসলমান ভোজন ও পোষাকে হিন্দু অপেক্ষা যে খুব অমিতব্যয়ী তাহা বোধ হয় না। তাঁহারা বেশী দামের পোষাক পরিলেও তাহা বহুদিন ব্যবহার করিয়া থাকেন। সামাজিক ভাব রক্ষার জন্যও ত অনেক দরিদ্র হিন্দু কুল-ক্রিয়ায় যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া থাকেন।

মুসলমানগণ হিন্দু অপেক্ষা নোংরা কে বলিল? আমরাও ত হিন্দুগৃহ দেখিয়াছি! কলিকাতার সাধারণ হিন্দু ভদ্রলোকের বাটীতে অনেক সময় উপস্থিত হইলে তাহার ব্যতিক্রম বিশেষ রূপে বুঝা যায়। দেশের হিন্দুগৃহেও আমরা উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি। হিন্দু এঁটোর বিচার না দেখিয়া মুসলমান সম্বন্ধে একটি কাল্পনিক সংস্কার গড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা আমাদের হিন্দু বন্ধুবান্ধবদিগকেও কখনো প্রস্রাব করিয়া জল গ্রহণ করিতে দেখিনা, অথচ মুসলমান বালকবর্গও এ বিষয়ে সাবধান।

মধ্যে সম্প্রীতি সাধনই সকলের উদ্দেশ্য হয় তবে ভিন্ন ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। পরেশ বাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া মুসলমান-সমাজ হিন্দুর প্রতি নিতশ্রদ্ধ ও বিশ্বাসহীন হইবেন সন্দেহ নাই। নঃ সঃ।

তুলসী বাই।

(১)

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাটকুলতিলক আকবর শাহের বিপুল বাহিনী যখন গুর্জ্জর প্রদেশ জয় করিবার জন্য রাজপুতানার সীমান্ত দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন পথিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোগল-রাজপুত-পাঠান কেল্লাদারগণ স্ব স্ব সৈন্যদল সহ শাখা প্রশাখার ন্যায় আসিয়া তাহাতে যোগদান করিতেছিল। সরদার আব্বাস খাঁ তাঁহাদিগেরই অন্যতম।

দুর্গসীমা অতিক্রম করিয়া আব্বাস খাঁর সৈন্যগণ যখন রোহিনীর তীরে উপনীত হইল, তখন সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। পশ্চিম গগনে লঘুমেঘরাশি লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে, এবং রোহিনীর ক্ষীণ স্রোতটি যেন সেই দিক হইতে তরল স্বর্ণ বহিয়া আনিতেছে। দিবালোকের শেষ রশ্মিগুলি সৈন্যগণের সত্যপরিহিত উজ্জল কবচ সমূহের উপর বিদ্যুজ্জালার অভিনয় করিয়া চতুর্দ্দিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছিল। আনন্দে উৎসাহে দেদীপ্যমান মুখে সৈন্যেরা তাহাদের পরাক্রান্ত অধিনায়ক তরুণ যোদ্ধা আব্বাস খাঁর অনুসরণ করিতেছিল, এবং তাহাদের বীর-পদভরে রোহিনীর নিস্তব্ধ উপকূলটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

(২)

রোহিনীর তীর হইতে কিয়দ্দূরে জনৈক রাজপুত সরদারের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। কয়েকজনমাত্র রক্ষি-সমভিব্যাহারে একখানি বস্ত্রাবৃত শিবিকা এই সময়ে রোহিনীর তীরবর্ত্তী পথে সেই দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন একটু গাঢ় হইয়া আসিল, তখন সহসা একদল দস্যু ভীষণবেগে শিবিকা আক্রমণ করিল। রক্ষিগণ সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল, তাই তাহারা দস্যুগণের কিছুই করিতে পারিলনা। বরং তাহাদের সহিত যুঝিতে যাইয়া অনেকেই হত হইল, এবং অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারাও প্রাণভয়ে শিবিকা ফেলিয়া পলায়ন করিল। বাহকগণ ত দস্যু দেখিয়াই বাষ্পের ন্যায় চকিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

নির্বিঘ্ন হইয়া দস্যুগণ শিবিকার আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং তদধিকারিণী যুবতীকে টানিয়া বাহির করিল। তুলসী বাই ভয়ে অর্দ্ধ-

মৃতাবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় বীভৎসাকার দস্যুগণের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই কোমলাঙ্গী সুন্দরীর প্রতি তাহারা রূঢ় কণ্ঠে কটূক্তি সহকারে অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। তুলসীর বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল; সুতরাং আদেশ পালিত হইল না দেখিয়া পাপাত্মারা যুবতীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময়ে আব্বাস খাঁ সসৈন্য বজ্রের ন্যায় দস্যুদের উপর পতিত হইলেন। তাহারা নিমেষমধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

তুলসীর সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথায় নির্দ্দয় দস্যুগণের কঠোর হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ও মৃত্যুভয়, আর কোথায় এক অপূর্ব্ব উপায়ে সহসা পূর্ণ পরিত্রাণ।

আব্বাস ধীরে ধীরে সেই ভয়ব্যাকুলিতা, বিস্ময়াভিভূতা, হর্ষবিকসিতনয়না, লজ্জারুণরাগরঞ্জিতবদনা যুবতীর নিকট অগ্রসর হইলেন। তুলসীর মনে হইতে লাগিল, এই নিদারুণ অসময়ে, এ ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে এ হতভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্যই বিধাতা ওই সুকুমার সৌম্যমূর্ত্তি বীরযুবাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন।

আব্বাস খাঁ অনিমেষ লোচনে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বীরত্বগর্ব্বিত বিশাল বক্ষ মুহু আবেগে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এমন সৌন্দর্য্য বুঝি তিনি ইহলোকে আর কখনো দেখেন নাই। স্বর্গের কোন্ নন্দন কানন হইতে এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত অপূর্ব্ব কুসুমটি খসিয়া পড়িয়া আজ এই নির্জ্জন রোহিনীকূলে দুরন্ত দস্যুপদতলে দলিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

তুলসীর নয়নপল্লব মুদ্রিত হইয়া আসিল; সুন্দর মুখখানি আনত হইল,— বোধ হইল যেন লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কুচিত-দল অর্দ্ধস্ফুট মল্লিকার স্তূপটি একরাশি সৌন্দর্য্য আব্বাস খাঁর সম্মুখে ছড়াইয়া দিল।

আব্বাস অভয়দান করিয়া কহিলেন—"দস্যুগণ পলায়ন করিয়াছে। আপনি কোথায় যাইবেন জানিতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে আপনাকে তথায় রাখিয়া আসিতে পারি।"

এইবার তুলসী বাই বড় বিপদে পড়িলেন। কি করিয়া তাঁহার পরিত্রাতার সহিত কথা কহিবেন? কি কহিবেন? কি বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন? তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

ইতিমধ্যে তুলসীর পলায়িত রক্ষিগণ আর বিপদ নাই বুঝিয়া একে একে সকলে আসিয়া পড়িল। আব্বাস খাঁ তাহাদিগের নিকট তুলসীর পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তুলসী শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলেন। কিয়দ্দূরে তাঁহার শ্বশুরের দুর্গ। রক্ষিগণ পুনরায় তুলসীকে শিবিকায় তুলিয়া লইয়া দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। আব্বাস সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া আব্বাস খাঁর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া তুলসীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সেই ঘনকৃষ্ণ-তারকাবিশিষ্ট আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলের স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্থির দৃষ্টি তাঁহার সারাটি হৃদয় জুড়িয়া যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ক্রমে তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

ক্রমে যখন দুর্গশীর্ষ দূর হইতে নয়নগোচর হইল, তখন আব্বাস খাঁ শিবিকার সন্নিহিত হইয়া তুলসীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তুলসী বাই নিমেষে শিবিকার আবরণ অপসৃত করিয়া ফেলিলেন, এবং স্বীয় চম্পকাঙ্গুলি হইতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া আব্বাসের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। একটি মুহূর্ত্তমাত্র উভয়ে উভয়ের পানে চাহিলেন। সে বিদায়ের শেষ দৃষ্টি কি গভীর অতৃপ্তি, কি গভীর বেদনা, কি গভীর মর্ম্মকাতরতায় অনুপ্রাণিত!

শিবিকা দুর্গসীমায় প্রবেশ করিল। আব্বাস খাঁ হৃদয়ের ভার হৃদয়ে চাপিয়া স্বীয় সৈন্যদলে ফিরিয়া আসিলেন।

(৩)

উক্ত ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে একদিন আব্বাস খাঁ পুনরায় অশ্বারোহনে একাকী রোহিনীর নির্জ্জন উপকূল বাহিয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর যোদ্ধৃবেশে আচ্ছাদিত, কিন্তু সে বেশ সর্ব্বথা পরিপাট্যবিহীন,অস্ত্রাঘাত ও রক্তচিহ্নে বিমলিন। সারাটি বৎসর সম্রাট আকবর শাহের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া গুর্জ্জর প্রদেশে যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি ও সম্রাটের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া আজ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

একটি বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা করিবার সময়ে ঠিক এইস্থানে রোহিনীর উপকূলে আব্বাস যে সুন্দর মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আজ থাকিয়া

থাকিয়া সেই মধুর স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর অস্ত্রঝঞ্ঝনা ও লোমহর্ষণ নরকপালের মধ্যে যখন তিনি বিপুল বিক্রমের সহিত শত্রুসংহারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখনও তুলসীর সেই অপরূপ লাবণ্যচ্ছটা ও করুণা মিশ্রিত স্নিগ্ধ কটাক্ষ ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার হৃদয়াকাশে বিদ্যুতের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। তাই আজ নির্জ্জনে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি ভাবিতেছিলেন; কি ভাবিতেছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। বুঝি ভাবিতেছিলেন, তেমনি একখানি সুন্দর মুখ, আর বাসন্তী পূর্ণিমারাত্রি শুভ্র রজনী, আর নবকিসলয়সজ্জিত প্রফুল্ল কুসুম-সুশোভিত কুঞ্জবন, আর নির্ঝরিণীকণ-ভারাক্রান্ত সুশীতল মৃদু সমীরণ, —— —হায়!

লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে রোহিণীতটের শান্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে আব্বাস খাঁ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। এমন সময়ে পথিমধ্যে শ্মশান-ভূমির জনতা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বহু পরিজনবেষ্টিত একটি শবদেহ সজ্জিত চিতার উপর রক্ষিত রহিয়াছে, এবং আড়ম্বর সহকারে তাহার সৎকারের আয়োজন হইতেছে। দেখিয়া বোধ হইল, মৃত ব্যক্তি কোন দুর্গস্বামী অথবা অন্য কোন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র হইবেন।

আব্বাস খাঁ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইঁহাদের কার্য্যকলাপ দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা একটি রমণী সলজ্জ চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মানা, তিনিই যে মৃতের স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই; লোকাচারানুসারে চিতায় স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন।

সম্রাট আকবর এই নিদারুণ সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন; বিশেষতঃ অনিচ্ছাসত্বেও কোন বিধবা যাহাতে জীবন্ত দগ্ধ না হয়, তাহার জন্য তিনি কঠোর অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহাতে মহামহিম সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হয়, তাহার উপায়বিধান করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া আব্বাস খাঁ শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কি অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিস্ময়ে আব্বাস খাঁ বজ্রাহত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, যখন তিনি দেখিলেন যে, চিতারোহণসজ্জা আসন্নমরণা বিধবা যুবতী আর কেহ নহে, তাঁহারি সেই মানসীপ্রতিমা তুলসী বাই! একটি চিররুগ্ন যুবকের সহিত হতভাগিনী ষোড়শীর বিবাহ হইয়াছিল, সে আজ তাহার যুবতী স্ত্রীর

সম্বৎসরব্যাপী ঐকান্তিক শুশ্রূষা ব্যর্থ করিয়া দিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছে।

অভাগিনী তুলসী কি অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার তীব্র বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আমরণকাল কঠোর বৈধব্যব্রত করিতে করিতে তাঁহার দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিবেন? দুইদণ্ড প্রজ্জলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা যে তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। তাই তিনি আজ জনমের শেষ অসংখ্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সধবার বেশে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে, নিষ্প্রকম্প হৃদয়ে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ অচঞ্চল দেহে দণ্ডায়মানা।

কিন্তু আব্বাস খাঁ যখন বীরবেশে সৌম্যমূর্ত্তিখানি লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তুলসীর চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি যে জীবনে আর কখনো তাঁহার সেই পরিত্রাতা যুবককে দেখিতে পাইবেন, স্বপ্নেও যে কখনো সেকথা মনে স্থান দিতে তাঁহার ভরসা হয় নাই।—সেই আরাধ্য যাঁকে মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আবার সশরীরে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া হতভাগিনীর বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হইল! অনলরাশির করাল শিখা আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে তুলসীর হৃদয়ে তখন তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিল।

আব্বাস খাঁ গম্ভীর স্বরে পুরোহিতবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতীদাহ করা সম্রাটের কঠোর আদেশে নিষিদ্ধ, এ কথা অবশ্য আপনারা অবগত আছেন।"

প্রধান পুরোহিত কহিলেন,—"উহাঁকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উনি সেচ্ছায় চিতারোহণ করিতেছেন কিনা"

শুনিয়া আব্বাস তুলসীর প্রতি জিজ্ঞাসু নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তুলসীর প্রাণটুকু তখন জ্বলন্ত অগ্নির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কাতর হইয়া উঠিয়াছে। সহসা উভয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তুলসী বাই বলিয়া উঠিলেন—

"একবার আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছিলেন, আর একবার করুন।— না, না, ইহারা আমাকে বাঁচিতে দিবে না,—আপনি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করুন নতুবা আপনাকেও মারিয়া ফেলিবে—"

তুলসীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভণ্ড পুরোহিতেরা মনে করিল, বুঝি তাহাদের শিকার পালাইয়া যায়;—সালঙ্কারা সতীর ভস্মরাশি হইতে স্বর্ণকণাপহরণ

বুঝি এবারে তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। পিশাচেরা এই ভয়ে চিতা হইতে লগুড়াহরণ করিয়া একযোগে আব্বাস খাঁকে সহসা আক্রমণ করিয়া বসিল।

আব্বাস খাঁ তৎক্ষণাৎ অসিহস্তে আক্রমণকারিগণকে তাড়না করিতে করিতে তুলসীর সন্নিহিত হইলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি বীরবালাও চকিতে আব্বাসের প্রসারিত ভীমবাহু ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া পড়িলেন।

অশ্ব তীরবেগে ছুটিল। হতবুদ্ধি পুরোহিতেরা লগুড়হস্তে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নিমেষমধ্যে আরোহীদ্বয় সহ অশ্ব অদৃশ্য হইয়া গেল।

(৪)

দুইজন রাজপুত যোদ্ধৃপুরুষ শ্মশানাভিমুখে আসিতেছিলেন। একজন মুসলমান, বিধবা হিন্দুসতীকে চিতা হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন।

তুলসী-সহ পলায়মান আব্বাস পথিমধ্যে এই দুইজন রাজপুত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন।

দুইখানি তীক্ষ্ণধার তরবারির দারুণ আঘাত আব্বাসের মস্তকের উপর ভীষণবেগে পতিত হইল। কিন্তু সে কঠিন শিরস্ত্রাণ ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত করিয়া সে আঘাত ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভয়চকিতা তুলসী কম্পিত হৃদয়ে বিস্ফারিত নয়নে আব্বাসের কটিদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া রহিলেন।

আব্বাসের ভীমকায় আরবীয় অশ্ব ঝড়বেগে একজন রাজপুতের উপর পতিত হইয়া অশ্বসহ তাহাকে ভূবিলুণ্ঠিত করিয়া দিল। দ্বিতীয় রাজপুত আব্বাসের ক্ষিপ্রসঞ্চালিত তরবারির নিদারুণ আঘাতে রক্তাপ্লুত কলেবরে অশ্বচ্যুত ও মৃতকল্প হইয়া সহযোগীর গাত্রের উপর উন্মূলিত শালতরুর ন্যায় নিপতিত হইল।

আসন্নমৃত্যুরক্ষিতা রাজপুতবালাকে লইয়া অনতিবিলম্বে আব্বাস খাঁ বিজয়গর্ব্বে দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

অনন্যোপায় হইয়া তুলসীর পিতা আব্বাস খাঁর সহিত বিধবা কন্যার বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

বীরাগ্রগণ্য আব্বাস খাঁ গুর্জ্জর প্রদেশে যুদ্ধকালে সম্রাট আকবর শাহের

কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে একটি উপায়হীনা বিধবা যুবতীকে নৃশংস অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিয়া সম্রাটের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইলেন।

অতুল সমারোহে বিজয়ানন্দোৎফুল্লচিত্ত আব্বাস খাঁর সহিত রাজপুতবালা তুলসী বাই পরিণীতা হইলেন। গুর্জ্জর প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রোহিনী-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে আব্বাসের কল্পনা-প্রবণ প্রেমাপ্লুত চিত্ত যে অপূর্ব্ব সুখস্বপ্ন-মোহে অভিভূত হইয়াছিল, আজ তাহা সফল হইল। *

ইম্‌দাদুল্ হক্।

মিলন।

কাননের প্রান্তভাগে
পবিত্র নির্ঝর-পাশে
পান্থ দুইজন,
একদা প্রভাত কালে
হ'ল আসি সম্মিলিত
—বিধির লিখন।
কেহ কারে নাহি চেনে
নাহি জানে নাম ধাম
জাতি ব্যবসায়,
তবু তারা নিত্য আসে
পবিত্র নির্ঝর পাশে
সকালে সন্ধ্যায়।
দিনে দিনে মাস যায়,
মাসে মাসে বর্ষ যুগ,
—পান্থ দুইজন
পরস্পর পরস্পরে
পবিত্র প্রণয়-পাশে
করিল বন্ধন।

যথা দুই দিক হতে
দু'টি নদী ছুটে আসি
হয়ে একত্রিত
মহান সাগরোদ্দেশে
প্রবাহ ঢালিয়ে যায়
চির সম্মিলিত ;
সেইরূপ দুই জনে
একই উপাস্যদেবে
করে উপাসনা,
দু'জনার দু'টিপ্রাণ
বাজিছে একই তানে—
একই কল্পনা।
একদিন গোধূলির
ঈষৎ ছায়ায় ঢাকা
প্রকৃতির মাঝে
উপাস্য দেবতা আসে
উজ্জ্বল গম্ভীর মূর্ত্তি
সন্ন্যাসীর সাজে।

---

* ইংরাজী হইতে সংগৃহীত।

দেশাচার সম্বন্ধে যে সকল কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত আছে তাহা প্রকৃতই সুখপাঠ্য। আমি এস্থলে তাহার ভাবানুবাদ প্রকাশ করিলাম, ভরসা করি পাঠকগণের রসভঙ্গ হইবে না।

১। খন্দদিগের বাসস্থান ও নিষ্ঠুর প্রথার ব্যাপ্তি।—মহানদীর উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় গোদাবরীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত দেশ সমূহে ১৮৩৬ সালে খন্দগণ বাস করিত। যে সকল স্থানে এই নিষ্ঠুর নরবলি বা 'টৌকি পূজা' এবং বালিকা হত্যা অনুষ্ঠিত হইত তাহা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—

(১) গুমসার (Gumsur), বোড (Boad) এবং দশপোলা (Duspulla) জমীদারীর অন্তর্গত ২৫০০ বর্গমাইল ব্যাপী পার্ব্বতীয় দেশ সমূহ। ইহার অধিবাসী খন্দগণ 'টৌকি' পূজা করিত কিন্তু বালিকা হত্যা করিত না।

(২) কোরাদহ (Coradah) এবং সুরাদহ (Suradah) জমীদারীর সংলগ্ন ৪০০ বর্গমাইল দেশ। এখানে খন্দগণের বসতি থাকিলেও উক্ত দুই প্রথার কোনটিই অনুষ্ঠিত হইত না।

(৩) কোরাদহ, সুরাদহ, বোদাগোদা (Bodagoda) এবং চুমিয়া কিনেদি (Chumia Kinedi) মহালের অন্তর্গত ২০০ বর্গমাইল স্থানে কেবল বালিকা-হত্যা প্রচলিত ছিল।

(৪) বোদাগোদা মহালের ৪০০ বর্গমাইল বিস্তৃত একটি অংশে এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল না।

(৫) গুমসারের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে—প্রায় ২০০০ বর্গমাইল স্থানে কেবল নরবলি আচরিত হইত।

২। যে সকল খন্দ নরবলি প্রদান করিত তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—কাপ্তেন Macpherson খন্দদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথমটি বেলিয়া অপরটি মালিয়া। বেলিয়া অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন। মিঃ রাসেল খন্দদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—"অন্যান্য শ্রেণীর লোক হইতে তাহাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং নিম্নদেশবাসীদিগের নিকট কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য। যে দুই একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমার ধারণা হয় যে তাহারা সবল। পুরুষগণ মানানসহি লম্বা ও কার্য্যক্ষম; তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও দেখিতে বিশ্রী নহে। তাহারা একখানি মাত্র কাপড় ব্যবহার করে,তাহা এরূপ ভাবে কোমরের সঙ্গে জড়ান যে ধুতির শেষা-

অগ্রভাগ বাঙ্গালিদিগের কোঁচার ন্যায় হাঁটুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। তাহারা কেশ চূড়াকারে মস্তকোপরি কিঞ্চিৎ বাঁধিয়া রাখে ও ভ্রমণে বহির্গত হইলে ঐ চূড়া লোহিত ও পশমী বস্ত্রদ্বারা মণ্ডিত করে। যদি লোহিত পশমী বস্ত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণের বস্ত্র এবং তাহাও না পাইলে কাগজ দ্বারা সুশোভিত করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সঙ্গে একখানি করিয়া কুড়াল (লৌহাস্ত্র) রাখে, কেহ কেহবা তীর ধনুকের পক্ষপাতী। কেবল প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক পাড়ায় একজন করিয়া সর্দার আছে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বংশ বা শ্রেণী হইতে সর্দার নির্ব্বাচিত হয় না, যাহারা ভাল যোদ্ধা বা ভাল বক্তা তাহারাই ঐ পদ প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিবাদ বিসম্বাদ এবং প্রতিবেশির বিপক্ষে সময় যোগদান হইয়া থাকে। তাহারা সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ। 'অবগাঁ গঞ্জা' এবং তামাক তাহাদের বড় প্রিয়। 'ইপা' (Ippa) নামক বৃক্ষের ফল হইতে একরূপ তীব্র নির্য্যাস এবং এদেশীয় হইতে ভিন্ন রকমের তালবৃক্ষ হইতে তাড়ি সংগ্রহ করে, ইহাই তাহাদের সুরা। টাট্‌কা সময়ে উহা সুখসেব্য হইলেও কিয়ৎক্ষণ পরে অতি শোচনীয় রকমে অজ্ঞান করিয়া রাখে।"

মালিয়া খন্দদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। নরহত্যা নিবারণের এজেণ্ট কাপ্তেন ম্যাক্‌ফিয়ারসন বলেন,—"তাহারা স্বজাতির ও স্ববংশের বাহিরে বিবাহ করিলেও নিজ বংশমর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হয় না। তাহারা হিন্দু পোষাক পরিধান করে এবং উড়িয়া (ooria) ভাষায় কথা কহে। তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য ও চাষ আবাদ করিতে সম্ভবতঃ নিরীহ। তাহারা নিজে নিজে শস্য মাড়ায় না, পশ্বাদিদ্বারা মাড়াইয়া লয়। দুগ্ধ এবং ঘৃতের স্বাদ হইতে তাহারা বঞ্চিত এবং নরসুন্দরের কার্য্য করে না। নৃত্য তাহাদের অতি প্রিয়।"

মান্দ্রাজ গভর্ণর লর্ড এল্‌ফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—"আদিম নিবাসীদের ন্যায় বৈদিক দেবতায় তাহারা আস্থাবান। মালিয়া খন্দরা বলে যে, অনন্ত অক্ষয় অব্যয় এক মহাপুরুষ আছেন, তিনি সর্ব্বমঙ্গলের আধার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যান্য দেবতার ও মনুষ্যের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। এই মহাপুরুষের নাম—বুরেপেন্নু (Boore Pennu)—আলোক-অধীশ্বর, কেহ কেহ সূর্য্যদেবতা (Sun-God)ও বলে। ইনি নিজের জন্য তারি পেন্নু (Tari Pennu)—পৃথিবীশ্বরী—নাম্নী একটি ভার্য্যা সৃজন করেন। এই ভার্য্যা সর্ব্ব অশিবের নিদান।

ইঁহারই প্রসন্নতালাভের নিমিত্ত তাহারা নরবলি প্রদান করিয়া থাকে। অপর বেনিয়া খন্দরা বলে, সূর্য্যদেবতা এবং পৃথিবীশ্বরী এক,—তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাঁহাদের দেবতা অশিব নহে এবং নরবলিতে সুখানুভব করেন না। এমতে তাহারা এই অমানুষিক নৃশংসতা ঘৃণা করে। এই শ্রেণীর খন্দরা অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় ডাইনী ও যাদু মন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে।"

মিঃ, রাসেল বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক গ্রামের প্রধান বা সর্দ্দার অন্যান্য প্রজার ন্যায় যে জমীদারের এলাকায় বাস করে সেই জমীদারের অধীনতা স্বীকার করে। জমীদারের কার্য্যে তাহারা সাহায্য করে এবং জমীদারগণ প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে। খন্দগণ অবশ্য মহিষবলি দেয়। দশহরার দিবস তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া হিন্দুমন্দিরে উৎসর্গীকৃত মহিষমাংস আহার করে। জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রায় তাহারা রথের রজ্জু ধরিয়া টানে।"

৩। বলির উৎপত্তি ও কারণ।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অমঙ্গল-কারিণী পৃথিবীশ্বরীর প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত তাহারা নরবলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১৮৪২ সালের ২৪ এপ্রিল তারিখে কাপ্তেন ম্যাক্‌ফিয়ারসন গভর্ণমেণ্টকে লিখেন যে, তিনি খন্দদিগের নিকট হইতে অবগত হইলেন, নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য নরবলি তাহাদের অবশ্য অনুষ্ঠেয়। প্রথম কারণ, ইহা অতি পুরাকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে, দ্বিতীয় কারণ, ইহা তাহাদের রাজা কর্ত্তৃক অনুমোদিত; তৃতীয় কারণ, সুস্থদেহ এবং উন্নতিলাভের জন্য ইহা অবশ্য করণীয়; চতুর্থ কারণ, যাহার আশ্রয়ে তাহারা বাস করে সেই প্রকৃতির জনন-শক্তির জন্য ইহা আবশ্যক; পঞ্চম কারণ, দেবগণের আহারের নিমিত্ত ইহার প্রয়োজন এবং সকলের মূলকারণ—দেবগণ ইহা আচরণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

খন্দদিগের মধ্যে কন্যাহত্যার প্রথা বর্ত্তমানের কারণ,—বিবাহের সময় পক্ষীয়গণের মধ্যে অতিশয় পণাধিক্য এবং তাহাদের সাধারণ দারিদ্রতা। পুত্রকন্যাদিগের আহার্য্য তাহারা সকল সময়ে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না।

বিবাহের সময় খন্দগণ; কন্যার পিতাকে 'সেদ্দি' (Seddee)—কঠোর পণ দিয়া থাকে। যদি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে, তবে স্বামী স্ত্রীর পিতার নিকট

হইতে বিবাহকালীন সেই পণ ফিরিয়া পাইবার অধিকারী হয়। বিবাহবন্ধনের সহিত অতিশয় ব্যভিচারের সংস্রব আছে। স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীপরিত্যাগ করিতে পারে এবং পরে সে যে কোন অবিবাহিত ব্যক্তির কুটিরে প্রবেশ করিয়া সমাদর লাভে সক্ষম হয়। কন্যা বড় হইয়া বিবাহের পর যদি স্বামী ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় তাহারা জন্মের অব্যবহিত পরেই গিরি নদীতে নিক্ষেপ করিয়া কন্যার জীবন শেষ করে।

৪। নরবলি-অনুষ্ঠান প্রণালী। বধ্যব্যক্তি যে কোন জাতি ও বয়সের কিম্বা যে কোন লিঙ্গই হউক না কেন তাহাতে ভাগবৎ অশুদ্ধ হয় না; কিন্তু পূর্ণ যৌবন বিশিষ্ট পুরুষই সমধিক প্রশস্ত এবং তাহার মূল্যও অধিক। ছোটছোট বালক বালিকা ক্রয় করিয়া কয়েক বৎসর লালন পালনের পর পূর্ণবয়স্ক হইলে পালনকর্ত্তা তাহাদিগকে বলি দিয়া থাকে। বধ্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয় এবং বধের পূর্ব্বে স্বেচ্ছামত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পায়, কেবল বধের দুই একদিন পূর্ব্বে চোকে চোকে রাখে।

সাধারণতঃ খন্দ বা পাওনা (ডম্বনাম) জাতির মধ্য হইতে বধ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাদের জনকজননী এই কার্য্যের নিমিত্ত অপত্য বিক্রয় করে এবং সুযোগ পাইলে পাওনারাও ছোট ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া যাইয়া 'মুটাহে' বিক্রয় করে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বেলের রিপোর্টে প্রকাশ যে, একটি বধ্যের মূল্য ৫ হইতে ৪০ গুটি পর্য্যন্ত হয়। একটি মহিষ, একটি বলদ, একটি শূকর, একটি ছাগল ও একটি কাংশপাত্র প্রত্যেকে একটি করিয়া গুটি হয়। একটি মানুষের দাম ২৫ গুটি হইলে, পাঁচটি করিয়া পূর্ব্বোক্ত পশু সমূহ ও একটি কাংশপাত্র দিতে হয়। এই সকলের মূল্য খুব কম হইলেও ৬২॥০ টাকা।

মিঃ মাগেন বলেন যে, "এই উৎসব মুটাহদিগের ব্যয়ে ও যত্নে নিষ্পন্ন হয়। বারোয়ারি ও সাময়িক উৎসব ভিন্ন প্রত্যেক মুটাহ ও পুরুষ দৈব দুর্বিপাকের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় স্বতন্ত্রভাবের ন্যায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিয়া থাকে। উৎসব রবিবারে সম্পন্ন হয়।"

একটি গ্রামে বার বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র নরবলি হইয়া থাকে এবং এককালীন একটির বেশি হয়না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলির প্রথা বিভিন্ন প্রকারের। ভিজাগাপত্তমের অ্যাক্টিং কালেক্টর মিঃ Arbuthnot ১৮৩৭ সালে গভর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ,—যাহাকে বলি দেওয়া হয় তাহাকে দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কতকগুলি তণ্ডুল

তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মন্ত্রপূত সেই তণ্ডুলকণার প্রভাবে বধ্য ব্যক্তি মুক্ত হইলেও পলায়ন করিতে সক্ষম হয়না। ধৃত হইতে বধ পর্য্যন্ত বধ্যকে মত্ত করিয়া রাখা হয়। সে পাড়ার মধ্যে বেড়াইতে, অভিলষিত খাদ্য আহার করিতে, নয়নাভিরাম দ্রব্য ব্যবহার করিতে পায় এমনকি কোন স্ত্রীলোকের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা করিলেও তাহার সে বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বধের দিবস প্রাতঃকালে সে দেবতার সম্মুখে আনীত হইলে, জ্যানি বা জুন্না (পুরোহিত) তাহার উদরে একটি গর্ত্ত করে, এবং তথা হইতে যে রুধির নির্গত হয় তদ্দ্বারা প্রতিমাকে স্নাত করান হয়। তৎপর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপনীত হয় এবং বধ্যকে বহুখণ্ডে কর্ত্তিত করে। কেবলমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ মাংসের একখণ্ড লইয়া যাইয়া নিজ গ্রামের দেবতাকে উপহার দিতে পারে।

মিঃ রাসেল এই নিষ্ঠুর প্রথা গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন এবং উহা দমনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ চেষ্টিত হইতে উপদেশ দিলেও তিনি বলিয়াছিলেন যে, এতদিনের আচরিত প্রথা একদিনে নিবারণ করা যাইবেনা। গভর্ণমেণ্ট তদনুসারে কোন অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেন। (১) বন্য-ভূমির মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত; (২) পার্ব্বতীয় এবং নিম্নদেশবাসীদিগের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্থানে স্থানে হাট ও মেলা স্থাপন; (৩) খন্দদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন; (৪) যাহারা বধ্য ক্রয় করিয়া রাখিত তাহাদের পরিবারের স্ত্রীলোকের সহিত বধ্যের বিবাহ সংঘটন; (৫) গ্রাম্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। পরে ১৮৪৫ সালে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে গভর্ণর জেনারেল নরবলি দমন ও খন্দদিগের শাসনের নিমিত্ত একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করেন।

গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ ১৮৪৬—১৮৫৩ সালের মধ্যে ১২৬১টি মনুষ্যের প্রাণরক্ষা হয়। এতন্মধ্যে ২৪৭টির বিবাহ দেওয়া হয়, ২০০টি বারহামপুর ও বালেশ্বরের মিশনারী স্কুলে প্রেরিত হয়, ১৬৭টি ভাললোককে পোষ্যপুত্র রূপে প্রদত্ত হয়, ৩০৬টি প্রজাস্বরূপ বাস করে, ৮৩টি রাজসরকার কর্ত্তৃক প্রতিপালিত এবং ১২টি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়। অবশিষ্টের মধ্যে ১৪৮টির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, ৭৭টি অন্যত্র গমণ করে এবং ২১টি পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে নিযুক্ত হয়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

স্থিত নির্ঝরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না সেইরূপ বঙ্গীয় মুসলমানসমাজে বঙ্গভাষার প্রচলন রোধ করাও একান্ত অসম্ভব। তবে এই বঙ্গভাষারূপ নূতন দুর্গের মধ্যে আমরা নিরাপদে আমাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে পারি, এবং তাহা করাই এখন আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা হিন্দু-ভাব ও হিন্দু-আদর্শপূর্ণ সাহিত্য-পাঠে মুসলমানসমাজ ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়া এক অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। এ ক্ষেত্রে আমরা বোম্বের পার্শী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অনুকরণ করিতে পারি। তাঁহারা যেরূপ ভাবে গুজরাটীভাষাকে নিজেদের জাতীয় জীবনের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন আমরাও সেইরূপ করিতে পারি। ইহাতে মুসলমান-সমাজ-প্রচলিত বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে; কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষার বা বঙ্গদেশের কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং বল সঞ্চয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ সমাজ বিশেষের ছাপ বক্ষে ধারণ করিলেও বঙ্গভাষা, বঙ্গভাষাই রহিয়া যাইবে।

দীনেশ বাবুর 'প্রকাশ্য-পত্রের' আলোচনার মুখবন্ধ স্বরূপই আমরা উপরের কথাগুলি বলিলাম। এখন প্রকৃত বিষয়ে উপস্থিত হওয়া যাক্।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"হিন্দুর যে ঈশ্বর, মুসলমানের যে ঈশ্বর, তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির অভাব নাই, অনুচরগণের মধ্যে তাহার অভাব হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে"। ঠিক্ কথা। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীর একটা অতি বড় দোষ এই যে আমরা কথায় যাহা বলি কাজে তাহা করি না। আমরা মুখে বলি, আমাদের মধ্যে প্রীতির অভাব বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই প্রীতির ভাবকে সবলে সংহার করিয়া ফেলি। যখন দায়ে ঠেকি, অথবা কোন কার্য্যোদ্ধারের সময় আসে, তখনি আমরা সানুনাসিক সুরে মিলনের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রতিপক্ষকে স্বপক্ষে আনিতে যত্নপর হই। ইহাতে ফল এই দাঁড়ায় যে আমরা মাতৃভাষারূপ এক মহাতীর্থের যাত্রীগণ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া বিভিন্ন পথে বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করি, আমাদের আর সম্মিলনের আশা থাকে না।

নিজের দেহে সামান্য আঘাত না পাওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কখনই স্বীকার করিতে বাধ্য নয় যে অপরের দেহে গুরুতর আঘাতেও কোন ব্যথা উৎপন্ন হইতে পারে। দীনেশ বাবুই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। তিনি বঙ্গমঞ্চে ইতি-হাস বিখ্যাত প্রতাপান্বিতা সাম্রাজ্ঞী রিজিয়াকে হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতে দেখিয়া মর্ম্মে মাত্র গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! কিন্তু সেই আঘাতের অভিব্যক্তি স্বরূপ নিরুপায় মুসলমানসমাজের পক্ষ হইয়া একটি কথা বলাও সঙ্গত মনে করেন নাই, কারণ যে হিন্দু মুসলমানের জাতীয় আদর্শ খর্ব্ব করে, সেত হিন্দুসমাজেরই মহত্ববৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়! আমরা দীনেশ বাবুকে প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলন প্রয়াসী বলিয়া মনে করিতাম, যদি তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সেবকের দ্বারা প্রকাশ্য-ভাবে এইরূপ রুচি ও অন্যায়পূর্ণ নাটকের তীব্র প্রতিবাদ হইত। হয়ত

নবনূরে 'বিমলা' গল্প প্রকাশিত না হইলে সিরাজের অভিনয় দর্শনে তাঁহার মর্ম্ম-কাতরতা কেহ জানিতেও পারিতেন না,—বঙ্গভাষার Taine এর মনের ব্যথা মনেই লীন হইত! আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সহিতই এ কথাগুলি বলিলাম। দীনেশ বাবু চিরদিন আমাদের পূজ্য, কারণ তিনি অতীতের অন্ধগহ্বর হইতে খ্যাতনামা মুসলমানকবি আলাওলকে আলোকে টানিয়া আনিয়াছেন, এবং তাঁহারই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মৌলভী আবদুল করিমের ন্যায় একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবী স্বীয় গবেষণা দ্বারা আজ মুসলমানসমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। এই হিসাবে আমরা দীনেশ বাবুর নিকট চিরঋণী। ইচ্ছা করিলে এই ঋণের মাত্রা তিনি আরও বাড়াইতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার অমর লেখনী সেপথ অবলম্বনে কৃপণভাব প্রদর্শন করিয়াছে। কেবল এক 'সিরাজ' নাটক কেন, আজকাল নাট্যমঞ্চে অভিনীত বহুনাটকের মধ্যেই মুসলমানের প্রতি অজস্র বিদ্রূপবাক্য বর্ষিত হইতে দেখা যায়। মুসলমানের ধর্ম্ম, মুসলমানের আচার-ব্যবহারকে এইরূপ জঘন্যভাবে এসব নাটকে চিত্রিত করা হয় যে তাহা দর্শন করিয়া কোন শিক্ষিত মুসলমানই হিন্দুর প্রতি প্রীতিভাব পরিপোষণ করিতে পারে না। যে সমুদয় হিন্দুলেখক হিন্দু-মুসলমানে মিলন প্রয়াসী তাঁহারা কি কখনও এসব বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন? মনে হয় না, কখনও সেরূপ প্রতিবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখের বিষয় এই যে এই সমুদয় নাটকের রচয়িতা অধিকাংশ স্থলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীগণ। পল্লীগ্রামের শান্ত-শিষ্ট হিন্দুগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাঁহারা এখনও মুসলমানের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। [যে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ কংগ্রেস করেন, কনফারেন্স, এবং সভামঞ্চে মুসলমানকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আবার গৃহে আসিয়া শান্ত, সমাহিত চিত্তে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহাদের প্রতি মুসলমানসমাজ কোন্ সাহসে বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

বঙ্কিম বাবু সর্ব্বপ্রথম মুসলমানসমাজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহা সত্য। কিন্তু এখন তিনি নিন্দা-প্রশংসার বাহিরে। মৃতের প্রতি আমরা কিছুই বলিতে চাহিনা। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান-চরিত্র বিকৃত ভাবে চিত্রিত করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে কতকটা ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এখন যাঁহারা সেই পথে চলিতেছেন তাঁহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য? বাঙ্গালার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে বাদ পড়েননা। অনেক কংগ্রেসভক্ত লেখককে যখন আমরা মুসলমানসমাজের আদর্শ খর্ব্ব করিয়া গল্প ও গাথা রচনা করিতে দেখি তখন কি আমাদের মুসলমানীয় গর্ব্বে একটুও আঘাত অনুভব করিনা? বিগত কার্ত্তিক মাসের "বঙ্গভাষায়" শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'মিলন' নামক যে একটি গল্প প্রকাশিত

হইয়াছে, এবং সঞ্জীবনীর সমালোচনায় যাহা 'কৌতুহলোদ্দীপক সুখপাঠ্য' রচনা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; উদাহরণ স্বরূপ আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। হিন্দু লেখকগণ নিজেরা সংযত ভাব ধারণ করেননা, কিন্তু মুসলমান-লেখকগণ যদি দু একটা 'মিলন'-বিরোধি কথা বলেন, তবে তাঁহাদিগকে সংযত হইবার জন্য বিশেষভাবে শাসন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাকি ন্যায়ানুমোদিত? কাহারও কাহারও মতে এবং আমাদেরও মতে, "হিন্দুর জল জমিয়াও বরফ হয়, মুসলমানের জল জমিয়াও বরফ হয়; এবং দুইয়ে দুইয়ে মুসলমানের পক্ষেও চা'র এবং হিন্দুর পক্ষেও চা'র" হইলেও, সাহিত্যে হিন্দু যদি মুসলমানকে বরাবর কশাঘাত করিতে থাকেন, তাহাতে মুসলমানের ব্যথিত হইবার কোনই কারণ নাই, যেহেতু তাহা সম্মিলন সাধনের জন্যই লিখিত। কিন্তু মুসলমানের হস্ত হইতে যেন তেমন কিছু বাহির না হয়!

হিন্দুসমাজ বরাবর মুসলমানকে লাঞ্ছিত করুন, ঈশার অমূল্য উপদেশের অনুসরণ করিয়া, অম্লান বদনে হে মুসলমান তুমি তাহা সহ্য করিও, কিন্তু কখনও তাহার প্রতিবাদ করিওনা, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের আশা যে সুদূর পরাহত হইয়া পড়িবে! আর তুমি হে মুসলমান-সাহিত্যসেবী, তুমি কখনও কলালক্ষ্মীর অর্চ্চনায় অগ্রসর হইয়া তোমার চিত্রে হিন্দুর চরিত্র অঙ্কিত করিওনা, কিন্তু নির্ব্বিবাদে হিন্দুকে তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে দিও। তাহা যদি না কর, তবে মাতৃভাষা নিশ্চয়ই মর্ম্মাহতা, ব্যথিতা, ভূলুণ্ঠিতা হইবেন!

দীনেশ বাবু বলিয়াছেন, "হিন্দুর রচিত ইতিহাসে মুসলমান সম্পর্কে অনেক কটূক্তি আছে, তাহা বিদ্বেষ প্রণোদিত নহে,—বিদেশীয় ইতিহাসের অনুকৃতিই এজন্য দায়ী ও অপরাধী।" আমরা সেকথা স্বীকার করি। কিন্তু গত শ্রাবণ মাসে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অন্যতম খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়কে যখন সর্ব্ব সমক্ষে আওরঙ্গজেবকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমানসমাজের প্রতি তীক্ষ্ণবাক্যবাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়াছিলাম তখনই বুঝিয়াছিলাম, হিন্দুলেখক অবসর ও সুবিধা পাইলে মুসলমানের প্রতি কটূক্তি করিতে দ্বিধা বোধ করেননা! সেই সময়ে তাঁহাদের ঐতিহাসিক গবেষণা জিঘাংসার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সভয়ে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয়! আমাদের দোষই এই, আমরা যাহা বলি বা লিখি অনেক সময়েই তাহার প্রতিকূলাচরণ করি। নিখিল বাবুর পুস্তক পড়িয়া তাঁহার প্রতি অনেক মুসলমানের যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাহা কি জীর্ণ হইয়া যায় নাই? একা নিখিলবাবু এ দোষে দোষী নন্। অনেক বড় বড় রথী মহারথীই এ গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত। হয়ত দীনেশ বাবু নিজে সেরূপ না হইতে পারেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে। আর একটি বিষয় এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যই 'জাতীয় আচার ব্যবহারের পার্থক্য কখনও বিদ্বেষ উদ্রেক করিতে

পারেনা।' পল্লীগ্রামে আমরা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইখানে হিন্দুসমাজ জাতীয় আচার ব্যবহারে অত্যন্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন, কিন্তু তথাপি তাহাদের সহিত মুসলমানের প্রগাঢ় প্রণয়ের ভাব দর্শন করিয়া বিস্ময় মুগ্ধ হইতে হয়। সেখানে মুসলমান হিন্দুর দুঃখের দুঃখী, সুখে সুখী, হিন্দুও তদনুরূপ। কিন্তু একবার পল্লী ছাড়িয়া সহরে আইস, নিষ্ঠার রাজ্য ছাড়িয়া অনিষ্ঠার রাজ্যে আইস, ভিন্ন ভাব দেখিতে পাইবে। যে শিক্ষিত হিন্দু গোপনে মুসলমানের বাড়ী নানা সুখাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া নিজ সমাজকে পদদলিত করে, সেই হিন্দুই প্রকাশ্য ভাবে মুসলমানের সহিত সখ্যে বিমুক্ত হইয়া মুসলমানের হৃদয়ে অম্লান বদনে শেলাঘাত করে। অর্থাৎ যাঁহারা গম্ভীর হুঙ্কারে দিগ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলনের জন্য বক্তৃতা করেন, তাঁহারাই মিলনের আশাকে ছিন্ন করিয়া দেন। পারস্য-কবি সাদী বলিয়াছেন, "আয় তবলে বলন্দ বাঙ্গ, দর্ বাতেন হেচ্‌,—হে উচ্চ-শব্দকারী তবল তোমার ভিতরে কিছুই নাই!"

আমাদের এত কথা বলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। কিন্তু দীনেশ বাবু আমাদিগকে আমাদের মন্তব্য মাতৃভাষা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়া মনো-মালিন্য দূর করিবার পথ প্রশস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাই আমরা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের মনে হয়, প্রসঙ্গক্রমে "ভারতীর" লেখক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদিগকে একদিন এইরূপ অনুরোধই করিয়া ছিলেন,—তিনি আমাদিগকে আমাদের মনের কথা ও ব্যথা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন।

দীনেশবাবু আমাদিগকে প্রকৃত হিতৈষীরূপে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বড়ই মূল্যবান। কে অস্বীকার করিবে যে "পল্লীতে পল্লীতে পারসী কিম্বা আরবী অক্ষরে লিখিত প্রস্তর ফলকযুক্ত এরূপ অসংখ্য মসজিদ এবং অপরাপর মুসলমান-কীর্ত্তি ধ্বংসের মুখে যাইতে উদ্যত হইয়া আছে, যাহা বর্ত্তমান মুসলমান-গণের পূর্ব্বপুরুষগণ কত যত্নে ও কত আশায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনন্তকালের বক্ষপটে একটা অক্ষয় কথা লিখিয়া রাখিতে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু সেই কথাগুলি কালসাগরে চিরনিমজ্জিত হইতে চলিতেছে। মুসলমানগণ এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় ইতিহাস রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে উপহার দিন—বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে তাঁহাদের নাম নিশ্চয়ই প্রচার হইবে। তাঁহা-দের ঐতিহাসিক অপূর্ব্বকীর্ত্তি সকল, আরব ও পারস্যদেশের অসংখ্য ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরগণের অনন্ত উদাহরণ, তাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান, নতুবা তাঁহাদের স্বজাতির উন্নতি হইবে কিসে? বাঙ্গালা ভাষায় যদি তাঁহারা গ্রন্থ প্রচার না করেন তবে তাঁহাদের জাতীয় দুর্গতির চূড়ান্ত হইবে।" কথাগুলি মুসলমানসমাজের পক্ষে বিশেষ করিয়া ভাবিবার ও অনুসরণ করিবার নহে কি? আমরা এরূপ আলস্যপরায়ণ জাতি যে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি সকল ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করিতেছিনা। এক সময়ে যে মুসলমান-

জাতি ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা জগতের কত লুপ্তরত্নের উদ্ধার করিয়াছিল, আজ সেই জাতিই নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ও অমনোযোগী, ইহা হইতে অধিকতর কলঙ্কের ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

হে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ, একবার নিজেদের প্রমোদ আগার ও বিলাস-শয়ন পরিত্যাগ করিয়া বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখ, তোমরা কোথায় দাঁড়াইয়া আছ। তারপর নিজেদের জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চয়ার্থ বদ্ধপরিকর হও। তোমরা যদি নিশ্চেষ্ট থাক, তবে কাহারা এ পতিত সমাজের উদ্ধার-কল্পে ব্রতী হইবে ? এস, আমরা এই বঙ্গদেশকে 'মাতৃভূমি বলিয়া বরণ করিয়া' লই। আমাদের সমাজে, "মাতৃভাষা প্রখর ময়ূখমালা-সম্ভূত হইয়া যখন উদিত হইবেন, তখন আমরা দেখিতে পাইব—এই বরেণ্য মাতৃভূমি আমাদের কীর্ত্তি, আমাদের ধর্ম্মে একদা সমুজ্জ্বল হইয়া উদ্ভাষিত ছিল! আমাদের সেই মহা-কীর্ত্তিময়ী ইতিহাস গাথা যখন বঙ্গের দ্বারে দ্বারে ধ্বনিত হইবে, তখন জাতীয় আদর্শের পুণ্যপ্রতিষ্ঠালোকে আমাদের সমাজ নবশক্তি সম্পন্ন হইয়া পুনশ্চ জগতে বরণীয় স্থান অধিকার করিতে পারিবে। মাতৃভাষায় বিমূঢ় হইলে সে স্বপ্ন চিরকালই সুদূরপরাহত থাকিবে।"

হে বঙ্গের হিন্দুলেখকগণ, হিন্দুদলপতিগণ, হিন্দুভ্রাতাগণ,—মুসলমানের প্রতিবেশী ভাইগণ, একবার হতভাগিনী বঙ্গমাতার মুখের দিকে চাহিয়া আপনারা মুসলমানকে ভাই বলিয়া প্রকৃত স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করুন,—চিরদিনের জন্য কপটভাব ত্যাগ করুন। কেবল বাক্য নহে কার্য্যদ্বারা প্রমাণ করুন আপনারা মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনারা মুসলমানের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে অকুণ্ঠিতচিত্ত। দেখিতে পাইবেন, এই দুই জাতির মধ্যে মিলনের অন্তরায় যাহা ছিল তাহা দূর হইয়া গিয়াছে, এবং এই দুই জাতি একই মায়ের কোলে বসিয়া নির্ব্বিবাদে তাঁহার বক্ষঃস্তনস্রুত ক্ষীরধারা পান করিতেছে। যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে কংগ্রেস ও কনফারেন্স সবই বৃথা, সবই বালকের ক্রীড়া মাত্র—তাহা দেশের দুই বিভিন্নজাতির পুরাতন সখ্যভাব সংহার করিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি করিবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র।

মাসিক সাহিত্য।

প্রবাসী,—কার্ত্তিক। 'গোস্বামী তুলসীদাস' প্রবন্ধে হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা তুলসী দাসের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। বেশ চিত্তাকর্ষক। 'র‍্যাফেএল ও ম্যাডোনা চিত্রে' লেখক র‍্যাফেএল অঙ্কিত মাতৃ-মূর্ত্তির পরিচয়ের সহিত সেই অমর শিল্পীর প্রতিভার ক্রমবিকাশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'ত্রিগর্ত্তদেশ বা বর্ত্তমান কাংড়া জেলা' প্রবন্ধ অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। 'মাধব রাওয়ের মৃত্যু'—ঐতিহাসিক রচনা। ইহাতে পেশওয়ে মাধব রাওয়ের

শেষ-জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র শক্তি কি কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রবন্ধ পাঠে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'হায়দর আলী' কোন্ ব্যাকরণ মতে 'হায়দর আলি' হইল বুঝিতে পারিলাম না। মুসলমানী নামে এরূপ কাটছাঁট পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নয়। "রামায়ণ"—রামায়ণের উৎপত্তি ও সময়নির্ণয় সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা। বিজয় বাবুর কঠিন বিষয়কে সহজ করিয়া লিখিবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার প্রবন্ধ পাদ-টীকা-কণ্টকিত নহে, অতএব ইহা দর্শন মাত্রেই সাধারণ পাঠকদের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দূরে সরিয়া পড়িবার মোটেই আবশ্যক নাই। 'অগ্নিস্নান' একটি কবিতা, পড়িয়া পাঠকদের দেহে এবং 'অঙ্গুলিশিখে রোমাঞ্চ উঠিবে'। কবির ছন্দে বলিতে গেলে আমাদিগকেও বলিতে হয়,—

গাহিছে কবি উচ্চরোলে অগ্নিস্নান গাহিয়া
বঙ্গদেশের অধিতে ঘৃণা, গঞ্জনা ;
বৃটীশবীর পথ আগলি দাঁড়ায়ে চোখ্ রাঙিয়া,
সেইত শুধু ভাবনা-ভয়-যাতনা।

"পুরুষত্ব ও রমণীত্ব" প্রবন্ধে লেখিকা শ্রীমতী সরলা দেবী গত আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত অনেক জাপানী চিত্রকর অঙ্কিত কালী মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবন্ধের উপ-সংহার ভাগের ভাষা সংস্কৃতের মাত্রা হইতে অধিকতর সংযোগে সমা উচিত কিনা জানিনা। ঢাকা, শ্যামপুর হইতে অপ্রকাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "মীহারকৃকের" যথেষ্ট কাটতি দেখিলে সুখী হইব। 'আমাদের আর্য্যগণের প্রাচীন নিবাস' শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক রচিত "The Artic Home in the Vedas" গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। একটু সহিষ্ণুতা স্বীকার করিয়া প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারিলে জ্ঞানসঞ্চয়ের সহিত একটু আমোদ উপভোগ করা যায়। প্রবাসী এখন চিত্র ও প্রবন্ধ-গৌরবে বঙ্গভাষার একমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্র।

আরতি,—কার্ত্তিক। 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এইরূপ প্রবন্ধ প্রচারেই 'আরতির' গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। 'আরতির' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় এবার নবনূরের প্রতি কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা হইয়াছে। ময়মনসিংহ আক্রমণে ইস্লামিয়ার সভ্য বিশেষের মস্তকে কেমন করিয়া সমালোচক মহাশয় আক্রমণের মত বলিয়া গ্রহণ করিলেন বুঝিতে পারি না। আক্রমণ হইতে কি তিনি এই মর্ম্মে কোনও পত্র পাইয়াছেন? ময়মনসিংহের আক্রমণ যে ছেলেখেলার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সমালোচকের ভাষা অত্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। তাঁহাকে আমরা বলিতেছি, তাঁহার চোখ্-রাঙানিতে আমরা বাক্যবাগীশ হইবার পাত্র নই। তিনি 'নবনূরে' প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষের প্রতিবাদ আবশ্যক হইলে পত্রস্থ করিতে পারেন, তজ্জন্য এত আস্ফালনের প্রয়োজন কি? সাহিত্যের রাজ্য কি মেছোহাটায় পরিণত হইয়াছে?

অতিথি,—ভাদ্র ও আশ্বিন। 'অতিথি' বেশ চলিতেছিল, কিন্তু এই যুগ্ম সংখ্যায় দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করিয়া প্রকাশক নানা বৈষয়িক অসুবিধা বশতঃ ইহার প্রচার বন্ধ করিলেন। "মুকুল" ও "অতিথি" এই দুইখানা শিশু-সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছিলেন, আজ একখানি কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।
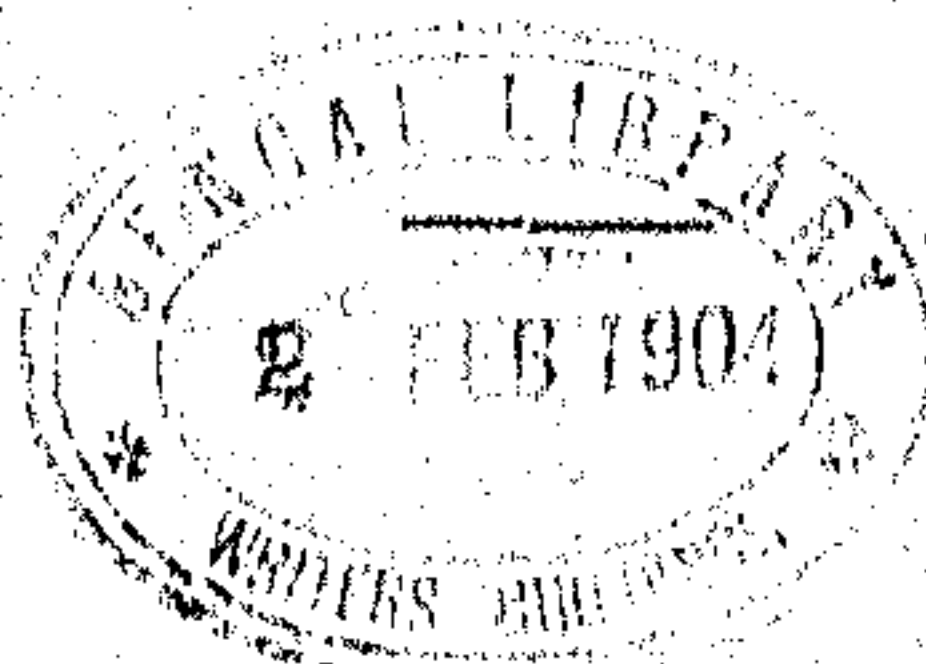
কবি আলাওলের প্রতি।

হায় আলাওল, কবিকুল রবি,
কি বলিব হায় বিদরে হৃদয়!
দারিদ্র্য-পীড়িত চট্টল প্রদেশে
না লভিল কেহ তব পরিচয়!
পার্ব্বতী মাতার সুসন্তান তুমি।
বসিয়া মায়ের শান্তিময় পদে,
ছড়ায়েছ সদা মধুর কাকলী
মাতিয়া ভাবের সম্মোহন মদে।
শতেক বৎসর তব কুহুরব
মোহিয়াছে সদা কৃষক সুজনে,
পার্ব্বতী মাতার শৈল শৈলান্তর
হয়েছে ঝঙ্কৃত মধুর কুজনে।
সুজলা সুফলা সোনার চট্টল,—
স্বভাবের শোভা-ধনে ধনবতী,—
তোমারে আদরে ধরিয়ে জঠরে
শিখাইলা কত মধুময় গীতি।
স্বভাবের শিশু, কবিকুল রবি,
করিয়াছ যত পিযূষ প্রদান,
অনন্ত কালেতে নাহি তার ক্ষয়,
গৌড়জন সুখে করিবে তা' পান।
পদ্মিনীর রূপে জগত মোহিয়া,
শিখালে মানবে পবিত্র প্রণয়,
ভেলুয়ার দুঃখে জগত কাঁদা'য়ে,
দেখাইলে প্রেম কত শক্তিময়।

একটি ক্ষুদ্র-চক্ষু মনুষ্যমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। ইহার শেষসীমায় একটি ঝরণা। ত্রিস্রোতার উপকূল পরিত্যাগ করিয়া অবধি আর আমরা ঝরণা দেখিতে পাই নাই। ঝরণাটি বহু উচ্চে পর্ব্বতগাত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া আমাদের পথের উপর পড়িয়াছে, এবং পথটি ধৌত করিয়া নিম্নাভিমুখে ঘনবৃক্ষলতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমাদের অশ্বগুলি এই ঝরণা হইতে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়া লইল।

আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এতক্ষণ ধরিয়া আমরা গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া আসিতেছি। চতুর্দ্দিকে কেবল অপরিমিত দীর্ঘ শালতরুর ঘন সন্নিবেশ, তাহার ভিতর দিয়া বহির্জগতের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না, এমনি নিবিড়। সমগ্র বনভূমিটি গভীর নিস্তব্ধতায় নিমজ্জিত, কেবল সময়ে সময়ে ঝিল্লীর কর্কশ শব্দে সে নিস্তব্ধতা যেন করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ভয়ে বিস্ময়ে, কৌতূহলে যুগপৎ অভিভূত হইয়া আমরা ধীরে ধীরে বনপথ অতিক্রম, করিয়া চলিলাম।

কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অরণ্যের নিবিড়তা ততই যেন অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ক্রমে তরুরাজি বিরল হইয়া আসিল, স্থানে স্থানে পরিষ্কার ভূখণ্ড সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল। আরো কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিলে চতুর্দ্দিক সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া গেল। পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে কেবল স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী নিম্নস্থিত বনরাজির গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া উন্মুক্ত আকাশে মাথা তুলিয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে, এইরূপ মনে হইল। আমাদের গন্তব্য ক্ষুদ্র পথটি সম্মুখস্থ গিরিপিণ্ডের উপরিভাগে উঠিয়া গিয়াছে, মনে হইতে লাগিল, উহার পশ্চাতে কি আছে আরো একটু ঊর্দ্ধে উঠিলে দেখিতে পাইব। কিন্তু একটি পিণ্ড অতিক্রম করিলে সম্মুখে ঠিক্ তেমনি আর একটি, সেটি অতিক্রম করিলে তাহার পর আর একটি, এইরূপে পিণ্ডের উপর পিণ্ড অতিক্রম করিয়া চলিতে হইল। চাহিয়া দেখিলাম, নিম্নে অন্ধকারময় গভীর অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন গিরিপাদদেশ তাহার ভীষণতা বক্ষে লইয়া নীরবে পড়িয়া আছে, আর ঊর্দ্ধে চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিশালদেহ পর্ব্বতগুলি পরিষ্কার, রৌদ্রদীপ্ত, কুজ্ঝটিকাবৃতশীর্ষ, গাঢ়শ্যামল তৃণসমাচ্ছাদিত, গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ উচ্চশৃঙ্গ আকাশে বিলীন করিয়া দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিলাম, কেবল এইরূপ গিরিচূড়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ন্যায় গ্রথিত। শৃঙ্গগুলি তত অধিক উচ্চ নহে, ৩।৪ হাজার ফীটের মধ্যে। দূরস্থিত কোনটিতে চায়ের

আবাদ, কোনটিতে শাকসবজী ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। আমরা যে শৃঙ্গের উপর উঠিতেছি, তাহারো স্থানে স্থানে, পথের দুই পার্শ্বে ধান, যব, ভুট্টা প্রভৃতির অনেকগুলি ক্ষেত্র আছে। কোথাও ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে কৃষকদিগের ক্ষুদ্র কুটীরগুলি যেন পর্ব্বতগাত্রে সারি সারি বসান করিয়া রাখিয়াছে। শস্যক্ষেত্রগুলি স্তরে স্তরে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখে, যেন সুক্ষমা প্রকৃতির বিস্তীর্ণ প্রাসাদের সোপানাবলীর ন্যায় সুসজ্জিত।

একাদিক্রমে অনেকদূর অনবরত চড়াই অতিক্রম করিয়া যখন ক্লান্ত অশ্বগুলি অতিকষ্টে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, তখন আমরা একটি শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বদেশে বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। কৃষকেরা তৃণগুচ্ছ উৎপাটিত করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতেছিল, আমাদের ভৃত্যটি তাহাদের নিকট হইতে কতকটা তৃণ চাহিয়া আনিয়া অশ্বগণকে উপহার দিল। পরিশ্রান্ত বুভুক্ষু প্রাণিগুলি মনের আনন্দে চিবান করিতে লাগিল, আমরা তখন অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোহর পার্ব্বত্যদৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা আবার পথে উঠিলাম। যতই ঊর্দ্ধে উঠি, ততই দূর হইতে দূরতরস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাদের চিত্ত অভিনব আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে। বেলা যখন পড়িয়া আসিল তখন দেখা গেল পথটি অপেক্ষাকৃত সমতল হইয়া আসিয়াছে। বন্ধুবর কহিলেন, আর আমাদিগকে অধিক চড়াইয়ে উঠিতে হইবে না। কালিম্পংও আর অধিক দূর নহে। সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র শিখর, সেইটি উত্তীর্ণ হইলেই সহরের পশ্চাদ্ভাগ দৃষ্ট হইবে।

যখন সেই শিখরটি অতিক্রম করিলাম, তখন সহসা যেন যবনিকা উত্তোলিত হইয়া গেল, এক বিচিত্র দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল। নিম্নে, বহুনিম্নে পর্ব্বতের তলদেশে বনাচ্ছাদিত উপত্যকা, ঊর্দ্ধে, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ শস্যক্ষেত্র খচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের প্রাচীর, স্তব্ধ, আকাশতলে বহুদূর বিস্তীর্ণ। আমরা এতক্ষণ ইহার দক্ষিণ প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগ বহিয়া উপরে উঠিতেছিলাম। পূর্ব্বদিকে, বনরাজিপরিশোভিত প্রাচীরের শীর্ষদেশে কালিম্পং নগরের পশ্চাদ্ভাগ, দূর হইতে দেখিয়া মনে হইল যেন শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকাগুলি একটি বৃহৎ পুষ্পমাল্যের ন্যায় মাথায় পরিয়া পর্ব্বতটি বসিয়া আছে।

দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া বেলা প্রায় চারিটার সময়ে আমরা কালিম্পং

পঁহুছিলাম। পঁহুছিয়া যাহা দেখিলাম, তেমন সুন্দর দৃশ্য বুঝি আর কখনো দেখি নাই। চারিদিকে চারিটি পাহাড়, বহুদূর বিস্তৃত, অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মিজালে মৃদুদাপ্ত,সুশ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বিশাল চতুর্ভুজাকারে অবস্থিত, আর নিম্নে, বহুনিম্নে অন্ধকার অরণ্যময় অপ্রশস্ত উপত্যকা। পশ্চিমসীমার পর্ব্বতটির শীর্ষদেশে, চতুর্ভুজের এক বাহুর উপর কালিম্পং নগর চিত্রিতদেহ বৃহৎ অজগরের ন্যায় পড়িয়া আছে।

সহরটি ক্ষুদ্র, দৈর্ঘ্যে ১ মাইলও হইবে কিনা সন্দেহ। সমুদ্রবক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৪০০০ ফীট।

আমার হিমাচল প্রবাসী বন্ধুবরের পরিচিত জনৈক সরকারী কর্ম্মচারীর গৃহে সে রাত্রে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন, তন্মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান। ইনি Forest department এ কর্ম্ম করেন।

সে রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী ছিল; কিন্তু ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া দূরস্থিত পর্ব্বতমালার মৃদুজ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত মনোহর দৃশ্য আর নয়নগোচর হইল না; তাহা যেন সৌন্দর্য্য-পিপাসু হৃদয়ের মধ্যে স্বপ্নের মত এক রহস্যময় অতৃপ্ত আকাঙ্খা জাগাইয়া তুলিয়া বেদনা দিয়া গেল।

পরদিবস আমরা নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েকদিনের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটি গুছাইয়া পাতিয়া লইলাম। গৃহটি মোটের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত, বাহ্যস্থ প্রাচীরগুলি শুধু ইষ্টকের;—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, Well-furnished, এবং অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকের গবাক্ষ খুলিয়া দিলে বহুদূর পর্য্যন্ত মুক্ত প্রকৃতির বিশাল গম্ভীর দৃশ্য সুচারুরূপে নয়ন গোচর হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমলালেবুর বৃক্ষে গৃহটি বেষ্টিত; বৃক্ষগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ পীতবর্ণ ফলভরে ঈষৎ অবনত; তেমন উচ্চ নহে, তাই গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

সহরটি দৈর্ঘ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত, প্রস্থে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, উচ্চ হইতে নিম্নাভিমুখে সোপানাবলীর ন্যায় অবনমিত। শ্বেত প্রভুদিগের বাসস্থান সর্ব্বোচ্চ শিখরে, প্রথম সোপানে; সারি সারি অট্টালিকা, নিরন্তর মাজাঘসায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন তক্ তক্ করিতেছে, সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধি সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একপার্শ্বে একটি গির্জ্জা; দার্জিলিংএর স্থান বিশেষ হইতে দূরবীণ যোগে নাকি ইহার উচ্চ

চূড়াটি দৃষ্টি গোচর হয়। তেমন অসমতল বন্ধুর পর্ব্বতশৃঙ্গেও সাহেবদিগের সুন্দর সুন্দর Tennis ground আছে। তন্নিম্নে, দ্বিতীয় সোপানে প্রশস্ত কার্টরোড, তীস্তাব্রীজ হইতে এই রাস্তা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। কার্ট-রোডের পার্শ দিয়া স্থানীয় পার্ব্বত্যজাতির কুটীরশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী কর্ম্মচারীবৃন্দের বাসস্থান। তন্নিম্ন সোপানে, একপার্শে একটি বৃহৎ বাজার; প্রতি বুধ ও শনিবারে (?) তথায় হাট বসে। হাটের দিন যত পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষেরা রঙ্গ বিরঙ্গের সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া হাট করিতে আসে। হিমাচলের এই দূর প্রবাসেও মাড়ওয়ারি সওদাগর দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারের মধ্যে ইহারাই সমৃদ্ধিশালী দোকানদার। ইহাদের নিকট হইতে উদ্‌ভিদ-প্রকৃতি বাঙ্গালী মুসলমানের শিখিবার বিষয় অনেক আছে।

আমাদের ক্ষুদ্র বাসস্থানটি কার্টরোডের ঠিক নিম্ন সোপানে, অর্থাৎ তৃতীয় সোপানে অবস্থিত ছিল। ইহার নিম্নে আর বড় গৃহাদি নাই। কেবল ঢালু পর্ব্বত নামিয়া নামিয়া অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর ঘনকৃষ্ণ অরণ্য, তাহার পর আবার চড়াই, উঠিয়া উঠিয়া অনেকদূর উঠিয়া গিয়াছে, সেইটিই পূর্ব্বসীমার পর্ব্বতপ্রাচীর। কালিম্পং হইতে তাহার শীর্ষ ৬।৭ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের শৃঙ্গদ্বয় ও ঠিক তদ্রূপ। একদিক হইতে নামিয়া অন্যদিকে ৫।৬ মাইল তফাতে গিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তর সীমার পর্ব্বতটি প্রায় ৮০০০ ফীট উচ্চ। ইহার নাম "খাড়িডাঁড়া"। ২০।২৫ মাইলের মধ্যে আর এত উচ্চ শৃঙ্গ নাই। আমরা একদিন বৈকালে সেই শৃঙ্গে বেড়াইতে গেলাম। সঙ্গে আরো দুটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক জুটাইয়া লইয়াছিলাম। কয়দিনে তাহাদের সহিত দূরবিদেশে একত্র বাস করিয়া খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। শৃঙ্গটি সহর হইতে ৩ মাইল দূরে, এবং ২০০০ ফীট উচ্চ। আমি কিয়দ্দূর যাইয়া, পরে হাঁটিয়া যাইব বলিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুবরের দাতাটিও অশ্ব ত্যাগ করিলেন। দুইজনে হাটিয়া চলিলাম, অবশিষ্ট তিনজনে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন।

ওঃ, পাহাড়ে হাঁটিয়া উঠা কি দুরূহ ব্যাপার। এখনো আমাদিগকে প্রায় সাত আটশত ফীট চড়াই পার হইতে হইবে; কিন্তু দশ পা চলিয়াই প্রাণ-পণে শ্বাস টানিতে আরম্ভ করিলাম। পদদ্বয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

আমরা বসিয়া পড়িলাম। এইরূপে বসিতে বসিতে একপা দুপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর কি করি! হাঁটিবার জন্য আমরা স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়াছি পারিবনা বলিলে Prestige থাকেনা, কাজেই প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া হউক, হাঁটিয়া আজ শৃঙ্গে উঠিবই।

চলিলাম। খানিক দূর গিয়া ফের বসিয়া পড়িলাম। উভয়ের অবস্থা দেখিয়া উভয়েরই হাসি পায়, কিন্তু উপায় নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই চাই।

বলিতে ভুলিয়াছি, আমরা যেস্থানে অশ্ব ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহার আশে পাশে, উর্দ্ধে নিম্নে, অনেকগুলি Colonial Homes আছে। এই সকল Homes দোআঁশলা জাতীয় সাহেব সন্তানগণের Boarding School. এখানে Technical, Theoretical, সকল প্রকার শিক্ষাই প্রদান করা হয়। Homes গুলি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। কালিম্পং হইতে Homes, এবং Homes হইতে কালিম্পং, দূরত্ব নিবন্ধন আরো সুন্দর দেখায়।

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম, ২।৩টি পাহাড়ী যুবতী পথপার্শ্বে বসিয়া গান গাহিতেছে, আর অদূরে একটি ক্ষুদ্র পিণ্ডের আড়ালে বসিয়া একটি যুবক তাহার উত্তর গাহিতেছে। ইহাদের প্রণয়লীলা বড় কবিত্বপূর্ণ। যুবতীকে উত্তর গাহিয়া যে পরাস্ত করিতে পারে, সেই তাহাকে বিবাহ করিতে পায়। প্রকৃতি এই পর্ব্বত শিখরে যেরূপ অসংযত মুক্তহস্তে রাশি রাশি সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহার এই অসভ্য সন্তানগণের হৃদয়ে যে এতটুকু কবিত্ব বিরাজ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। ইহাদের গানে স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে, আবার নিতান্ত হাস্যকর nonsenseও আছে। যেমন একটি গানে যুবক প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে— (উহাদের ভাষা মনে নাই) "ভ্রমর যেমন রসের অর্থাৎ মধুর লোভে ফুলের পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমিও তেমনি মায়া, অর্থাৎ প্রেমের আশায় তোমার পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" আবার অন্যত্র যুবক তাহার প্রিয়ার কথা গল্প করিতেছে, "প্রিয়াকে লইয়া বেড়াইতে গেলাম, একপয়সার পান কিনিলাম, আমি একটা খাইলাম, তাহাকে একটা দিলাম।" (!)— ইহার ভিতর যদি কিছু কবিত্ব থাকে, ত তাহা নিতান্তই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, তাহার ভিতর আমাদের ন্যায় সমতলবাসী নির্জ্জীব প্রাণীদের প্রবেশ করা দুরূহ!

আমাদিগকে দেখিয়া তাহাদের গান বন্ধ হইয়া গেল, তাহারা সহাস্য

কৌতূহলের সহিত আমাদের অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মাপ্লুত ম্লান মুখ ও সঘন কষ্টশ্বাসে স্ফুরিত নাসিকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটু বিশ্রাম করিবার জন্য আমরা নিতান্তই লালায়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া আমাদিগকে বরং একটু অধিক বেগে চলিতে হইল!

ফলে দশপা গিয়াই হোঃ—শব্দে আমরা বসিয়া পড়িলাম! হায়রে বাঙ্গালীর দুর্ব্বল প্রাণ! আমাদের পাহাড়ী বয়টি দশবর্ষীয় বালকমাত্র, সে কেমন অনায়াসে টপাটপ্ উঠিয়া আসিতে লাগিল! আমাদের দশা দেখিয়া একটু হাসিয়া সেও বসিয়া পড়িল। তাহার সহিত আমরা বড় কথা কহিতাম না, কেন না, কেহ কাহারো কথা বড় একটা বুঝিতাম না। আমার বন্ধুবর বেশ পাহাড়ী কথা শিখিয়াছেন, কিন্তু দুদিনে আমি আর কি শিখিব। Boyটির সহিত আভাসে ইঙ্গিতে যতটুকু কথা হইত, ঐ পর্য্যন্ত।

যাহা হউক, টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া কোন ক্রমে অবশেষে শৃঙ্গের উপর গিয়া ঠেলিয়া উঠিলাম। উঃ, এতক্ষণে কি মুক্তি! দারুণ পরিশ্রমের পর সেই উচ্চচূড়ার সুশীতল ধীর সমীরণে কি আনন্দ, কি ক্লান্তিহরণ! চারিদিকে—যতদূর দৃষ্টিচলে, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ,—দূরে, বহুদূরে বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত, তরঙ্গে তরঙ্গে সজ্জিত। ঘনকৃষ্ণ গম্ভীর অন্ধকারাবৃত উপত্যকার পার্শ্বদিয়া সগৌরবে আকাশমার্গে সমুত্থিত। আর আমরা সর্ব্বোচ্চ শিখরে কয়েক-হস্ত-মাত্র-পরিমিত একটু সমতল স্থানে কয়টি প্রাণী অনন্তের পানে চাহিয়া বিহ্বল প্রাণে অনন্ত সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলাম! সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, পশ্চিমাকাশের গায়ে গিরিশৃঙ্গের শীর্ষদেশ লোহিত মেঘের লোহিত আভায় উদ্ভাসিত; চরাচর গভীর নিস্তব্ধ, গাঢ় স্বপ্নময়। দূরে, বহুদূরে পরিষ্কার শুভ্র চির তুহিনাবৃত সমুচ্চ গিরিশ্রেণী আকাশে অলস বিক্ষিপ্ত ধূসর মেঘের মধ্যে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। আহা, কি দেখিলাম, কি সুন্দর, কি গৌরবান্বিত, কি প্রশান্ত, কি মহিমামণ্ডিত,—অকূল নিস্তব্ধতার মহাসাগরের মধ্যে ঐ সকল অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হিমানীমণ্ডিত-শীরে অনন্তকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া নাজানি বিধাতার কি নিগূঢ় উদ্দেশ্যই সফল করিতেছে! মানুষের অগম্য, জন প্রাণীহীন, তরুলতাগুল্ম তথায় জন্মিতে পারেনা, শুধু কঠিন, শীতল, শ্বেততুষারে চির-সমাচ্ছন্ন, —শব্দ নাই, প্রাণ নাই, জীবন-সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাত নাই,—সে রাজ্য অচিন্ত্য, রুদ্ধ, স্তব্ধ, শান্ত, বিধাতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অচল, অটল।

স্তম্ভিত চিত্তে, বিমোহিত প্রাণে, রুদ্ধশ্বাসে প্রকৃতির সেই সুমহান সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমরা আত্মহারা হইলাম। কিন্তু সে সুখ আমাদের ভাগ্যে অধিকক্ষণ ঘটিলনা, দেখিতে দেখিতে ঘনকুজ্ঝটিকা আসিয়া প্রকৃতির বক্ষে যেন চাপিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে অতি শীতল দক্ষিণ বাতাস আসিয়া তাহা দূর দূরান্তে বহন করিয়া লইয়া গেল, নিমিষ মধ্যে সব অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্ধকার নহে, অথচ কিছুই দেখা যায়না,—সহসা চক্ষের উপর প্রকৃতি যেন এক গাঢ়শুভ্র যবনিকা ফেলিয়া দিল, আর কিছুই দেখিতে দিলনা। যাহা দেখিলাম, সকলি স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অগত্যা আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। শৃঙ্গটির শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ৬০০০ ফীট উচ্চে জলাশয়! বিধাতার লীলা বড়ই বিচিত্র। বার মাস ইহা জলে পরিপূর্ণ থাকে, শুনিলাম।

কালিম্পং অপেক্ষা ঝাণ্ডিডাঁড়ার শীত অনেক বেশী। তাহার উপর কুজ্ঝটিকার শীতল জলকণায় আমাদের গাত্রাবরণ ভিজিয়া গিয়া এক্ষণে অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অতি সন্তর্পণে অশ্বচালনা করিতে লাগিলাম। কুজ্ঝটিকায় বায়ুমণ্ডল এমনি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তিন চারি হস্ত পরিমিত স্থানের অধিক কোন দিকে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাণটি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কেননা, পথ অতি সঙ্কীর্ণ, যদি কোন ক্রমে একবার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সেই উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত গভীর উপত্যকা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমরা বাসায় ফিরিলাম। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আহারাদি করিলাম, শয়ন করিলাম, কিন্তু বৈকালে যে অনন্ত সুন্দর পার্ব্বত্য প্রকৃতির চিত্রখানি দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহার জলন্তস্মৃতি সুধু থাকিয়া থাকিয়া সারাটি হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে নিদ্রা আসিল।

ভাদ্র মাস, এ সময়ে বঙ্গদেশে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। কিন্তু কালিম্পংএ এ সময়ে পূর্ণ বসন্ত বিরাজমান। মাঘের অতিশেষ মুহূর্ত্তে যেমন বসন্তের প্রথম দক্ষিণাবাতাসটি মৃদুশীতলতা বহন করিয়া আকুল হিল্লোলে হিমক্লিষ্ট দেহখানি স্পর্শ করিয়া যৌবনের নবীন উৎসাহে পূর্ণ করিয়া দেয়, এদেশে প্রায় সারাটি বৎসর ঠিক্ তেমনি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইহাকে চিরবসন্তের দেশ

বলা যাইতে পারে। কেবল বসন্ত ও শীত এই দুই ঋতুতে একটু শীতাধিক্য লক্ষিত হয় মাত্র। অপর্য্যাপ্ত স্বাস্থ্য দেহের শিরায় শিরায় অণুতে অণুতে বল ও উৎসাহের সঞ্চার করে, অপরিমেয় সুখে চিত্তকুসুম ও হৃদয় বিকসিত হইয়া উঠে। এ দেশের পার্ব্বত্যজাতি বলিষ্ঠদেহ, রক্তাভা বিশিষ্ট গৌরবর্ণ, সুন্দর, দোষের মধ্যে চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতে থাকে। রমণীর সকল সৌন্দর্য্য ঐ ক্ষুদ্র চক্ষুতেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশাল আয়ত চক্ষু যে নাই এমন নহে ; যাহাদের আছে, তাহারা বাস্তবিকই পরমাসুন্দরী।

দুদিনের প্রবাসে ইহাদের রীতি নীতি কিছুই আয়ত্ত করিতে পারি নাই ; বিশেষতঃ প্রকৃতির অপরিমিত সৌন্দর্য্যে আমরা এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে, সে দিকে লক্ষ্যও করি নাই। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যখন দেখিতাম, স্পন্দহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘস্তূপ পর্ব্বতগাত্রে এলায়িত দেহে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যোদয়ের সাড়া পাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া ঊর্দ্ধে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনি আত্মহারা হইতাম। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে শৃঙ্গশীর্ষগুলি মেঘাচ্ছন্ন থাকিত, বেলা এক প্রহর হইতে না হইতেই সে মেঘ কাটিয়া যাইত, পরিষ্কার নীলবর্ণ শৃঙ্গশ্রেণী আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিত; আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ ক্ষীণ রশ্মিগুলি পর্ব্বতের অতি শেষ শীর্ষদেশে পতিত হইয়া ঝিক্ ঝিক্ করিত, আর দুষ্ট কুজ্ঝটিকা দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে সৌন্দর্য্যটুকু সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া সমগ্র প্রকৃতি তরল অন্ধকারে ডুবাইয়া দিত, সারাদিন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ভ্রমণ করিয়া আমরা গৃহকোণে গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির এই সদা পরিবর্ত্তনশীল নব নব দৃশ্য দেখিতাম এবং দেখিতে দেখিতে সুধু স্বপ্নে, মোহে, সুখে অভিভূত হইতাম !

এমন সুন্দর দেশ ছাড়িয়া কি আসা যায় ! কিন্তু তবু আসিতে হইল। দুরন্ত কর্ম্মের কঠোর তাড়নায় সে স্বপ্নের দেশ ছাড়িয়া আসিতে হইল। আসিবার পূর্ব্বদিন প্রাতে মনে হইল, দক্ষিণের সে উচ্চ শৃঙ্গটি আমাদের দেখা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। এইবার শেষ দেখাটা দেখিয়া আসি।

সে শৃঙ্গটির নাম "দুরবীণ ডাঁড়া"। ইহার উচ্চতা ৫০০০ ফীট হইবে। ইহার দক্ষিণে আর পাহাড় নাই। দুই একটি ক্ষুদ্র পিণ্ড আছে, তাহা ঘনবনাচ্ছাদিত, হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি। দুরবীণ সহযোগে ইহার শীর্ষ হইতে অনেকদূর

পর্য্যন্ত নিম্নতর ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের সঙ্গে দুরবীণ ছিলনা বটে, কিন্তু তবুও আমরা সাদা চোখে মন্দ দেখি নাই।

কালিম্পং হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২মাইল হইবে। কিন্তু "ঝাণ্ডীডাঁড়ার" মত ইহার চড়াই তেমন মারাত্মক নহে। আমরা কতকটা সহজে ইহার উপরে উঠিলাম। কিন্তু তবুও পথে দুই তিনবার বসিতে হইয়াছিল। ইহার শীর্ষ হইতে ত্রিস্রোতা একটি বঙ্কিম স্থূল মলিন রজতরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বহুদূরে, ত্রিস্রোতার উপকূলে রিয়াং পল্লীটিও বেশ দেখা যায়; কুটীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, যেন চিত্রে আঁকা।

পরদিবস বৈকালে আমরা কালিম্পং পরিত্যাগ করিলাম। আমাদের জিনিষপত্র, অশ্ব প্রভৃতি কুলিরা পূর্ব্বেই তিস্তাব্রীজে লইয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতেই যাত্রা করিব স্থির ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইল না। তীস্তাব্রীজ পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইব, এইরূপ বন্দোবস্ত। আমারা সঙ্কীর্ণ চোরবাটা, (অর্থাৎ গুপ্ত পথ) ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। উঃ, সে কি ভীষণ কষ্টময়, ক্রমাগত উপর হইতে নীচে হড়্ হড়্ করিয়া নামিয়া যাইতে হয়, কেহ যেন অনবরত পশ্চাৎ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রয়োগ করিতে থাকে, সাধ্য কি যে একদণ্ড দাঁড়াইয়া একটু বিশ্রাম করি! পা দুখানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; তাহার উপর যত নীচে যাই, ততই অধিক গ্রীষ্ম বোধ হয়। যাহা হউক কোন ক্রমে গাছের গুড়ি ধরিয়া ধরিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে সন্ধ্যার সময়ে আমরা তীস্তা ব্রীজে পঁহুছিলাম। পথে একটি ঘোড়া পাওয়া গিয়াছিল তাই রক্ষা, নহিলে আমাকে ত আর সে দিন তীস্তাব্রীজে পঁহুছিতে হইত না, পথে, ঘোর অরণ্যের মধ্যেই রাত্রি যাপন করিতে হইত।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সেই রাত্রেই আমরা অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম। ভৃত্য লণ্ঠন ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বামে ত্রিস্রোতার গর্ভে মৃত্যুস্রোত গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে,, দক্ষিণে গহনবন মাথায় করিয়া পর্ব্বতশ্রেণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পথ সঙ্কীর্ণ, আমরা সেই ভয়ানক অন্ধকার রাত্রে, সেই ভয়াবহ স্থানে অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে যাত্রা করিলাম। না গিয়াও উপায় ছিলনা, বন্ধুবরের হস্তে সরকারী কাজ, শ্বেতচর্ম্ম প্রভুর কড়া হুকুম। প্রাতে কালীঝোরায় পঁহুছিতেই হইবে, তা প্রাণ থাক্ আর যাক্।

যাহা হউক রাত্রি এগারটার সময় আমরা সেই দোলায়মান রিয়াং সাঁকোটি সন্দিগ্ধচিত্তে পার হইয়া জগদীশ্বরের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে রিয়াং

পঁহুছিলাম। সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিয়া পরদিবস প্রত্যুষে পুনরায় দ্রুত-বেগে অশ্বচালনা করিয়া বেলা প্রায় ৮টার সময়ে কালীঝোরার ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে, বন্ধুবরের সরকারী বাংলাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পর্ব্বতরাজ্যে আসিয়া অবধি প্রত্যহ গরম জলেই স্নান করিতাম। কিন্তু সেদিন দারুণ পরিশ্রমের পর যখন নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র ঝরণার নীচে বসিয়া তাহার সেই নির্ম্মল সুশীতল জলে অনেকক্ষণ স্নান করিয়া আসিলাম, তখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানিতে যে নূতন বল, নূতন স্ফূর্ত্তি ও অপরিমেয় সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, হায় জীবনে কি আর কখনো তেমন সুখ পাইব।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর বেলা প্রায় চারিটায় আমি অশ্বারোহণে কালীঝোরা পরিত্যাগ করিলাম। সহৃদয় আমার বন্ধুবর প্রায় পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন।

শীভোকে আসিয়া সেই পূর্ব্ব পরিচিত বিহার যাত্রী বাবুটির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনিও শিলিগুড়ি যাইতেছিলেন, বেশ হইল, সঙ্গী জুটিল। আমার বন্ধুবর পাঁচমাইল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমরা খুব দ্রুতবেগে চলিলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে ১৬ মাইল অতিক্রম করিয়া শিলিগুড়ি পঁহুছিলাম। হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ ও ত্রিস্রোতার গভীর গর্জ্জন বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

পরদিবস বেলা ১১ টার সময়ে শিয়ালদহে উপনীত হইলাম। পুনরায় জনস্রোতপ্লাবিত, শকটচক্রমুখরিত, ধূলিধূমতারাক্রান্ত কলিকাতার মাঝখানে যেন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য হইতে খসিয়া পড়িয়া আকুল হৃদয়ে সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। সম্পূর্ণ।

গোটাদুই কথা।

যাহারা বিদ্বেষবিষ উদ্গীরণ করিতে সদা তৎপর, রাজদণ্ড ব্যতীত তাহাদের শিক্ষা হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বে ভয়েই হ'ক, কিম্বা ভক্তিতেই হ'ক, কাহারও মুখে মুসলমানের কুৎসা শুনা যাইত না। এখন সে ভয়ও গিয়াছে, অতএব তৎসঙ্গে মুসলমানের দানের বিষয়ও চিরতরে কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়াছে এবং উচ্চনাদে মুসলমানকে গালী দিবার যুগ আসিয়াছে। এই

স্থানে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ার কথা লিখিলাম বলিয়া যদি কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, আমরা সবিনয়ে তাঁহাকে ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। ধনশালী মুসলমান মাত্রেই যে বদান্য এবং উচ্চাশয় হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কোন উদাহরণের আবশ্যকই করেনা। তাঁহাদের সহৃদয়তা দেশ-প্রসিদ্ধ। এখনও দেশে যত মুসলমান জমিদার আছেন, অনুমান করি তাঁহাদের ষোলআনা সংখ্যাই হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে সমস্নেহে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হিন্দু প্রজা বিনয়ভাষী হইলে মুসলমান জমিদার তাহার অসঙ্গত প্রার্থনাও পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং সে অন্যায় করিলেও তাহাকে দণ্ড প্রদান করেন না, একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে মুসলমান নরপতি-গণের বর্ণ নির্বিশেষে অনুগ্রহ-বিতরণ একটা স্বাভাবিক গুণ ছিল। কোথাও কোন অত্যাচারী অথবা পক্ষপাতী মুসলমান জমিদার পরিদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তুলনায় তাহাদের সংখ্যা এতই অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসেনা। অতএব দুএকজন মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে সমস্ত মুসলমানজাতিকে এবং তাহাদের গৌরবস্থানীয়গণকে গালী দেওয়া ভদ্রতা সঙ্গত কি না তাহাই একবার বুঝিয়া দেখা উচিত। যাঁহাদিগকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের ধ্যানাতীত রাজভক্তি প্রদান করিতেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে আক্রমণ করা বিবেকবানের কার্য্য নহে। স্বীকার করি, হিন্দুদ্বেষী মুসলমান জমিদার এই বাঙ্গালা দেশেই থাকিতে পারেন কিন্তু সেইরূপ হিন্দু জমিদারও নাই কি? তাই বলিয়া কি জ্ঞানী মুসলমান সমস্ত হিন্দুজাতিকে মুসলমান-দ্বেষী ভাবিবেন? অধুনাই এই দ্বেষ-বিদ্বেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। দীর্ঘ-কালব্যাপী সংশ্রবে মুসলমানের সহিত হিন্দুর যে ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল, এখনও পরস্পরের ব্যবহারে অনেকে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন। এখনও পল্লীগ্রামে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের সদ্ভাব দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে মাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। সহরেই এই মধুর ভাবের অভাব ঘটিয়াছে! সহরের লোক সভ্য; 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তাহারা পাঁচরকমের পাঁচখানা বই পড়িতেছে। এসব গ্রন্থের অন্য গুণ থাক বা না থাক মুসলমানের বিরুদ্ধে অনেক অসত্য কথায় তাহাদের প্রতি পৃষ্ঠা কলঙ্কিত। তাই হিন্দুর মনে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। গ্রাম্য হিন্দুগণ মুসলমানের ধর্ম্মাচার, ধর্ম্মভবন, পীরস্থান-

ও সজ্জনগণের প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইয়া থাকে, নাগরিক বাবু ও স্কুলের ছাত্রের পক্ষে তাহা ধারণাতীত। বিগত শতাব্দীর প্রত্যক্ষ প্রমাণে ও ইতিহাস পাঠে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে ভাবিতে হয় যে, এই উভয় জাতির সেই স্নেহোত্থ ভ্রাতৃত্ববন্ধন কোন্ যাদুমন্ত্র প্রভাবে ছিন্ন হইয়া গেল এবং পরস্পরের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ-বহ্নি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই বিষভাবের অনেকগুলি কারণ প্রদর্শিত হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ অস্মদেশীয় এক শ্রেণীর গ্রন্থকার। প্রথমেই দেখা যায়, মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে এখনকার মত, তখন গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সুপ্রচার ছিল না। তখন স্বদেশীয় লেখক ও সাধকগণ যে সকল অমূল্যগ্রন্থ এবং গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকই এখন দুষ্প্রাপ্য। কেবল ইহাই নহে, শাসন পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলও তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং রাজভাষার পরিবর্ত্তনে মুসলমানের ইতিহাসের সহিত, মুসলমানের শিক্ষা, জ্ঞান, ব্যবহার, সমস্তই আমাদের সামাজিক জ্ঞানের অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হইল। তৎপর নূতন বিজেতা কর্ত্তৃক নববর্ণে চিত্রিত ভ্রমপূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং মুসলমানযুগের মূল্যবান খাঁটি ইতিহাসগুলি যেন চিরদিনের জন্য সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে বড়ই ব্যথিত অন্তরে প্রস্থান করিল। প্রথমে যে সকল ভ্রমপূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই এখনও সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে। পরে ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বহু গবেষণার ফলে যে সব ঐতিহাসিক পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সন্দেহ।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত মুসলমান-শাসনবৃত্তান্ত অজ্ঞাত থাকিবার পর ভ্রমপূর্ণ ইতিহাসের প্রকাশে হিন্দুসমাজের দারুণ বিদ্বেষভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই বিদ্বেষবশে বিকৃত ইতিহাসকেও পরাভূত করিয়া কল্পনাপ্রসূত কলঙ্ককথায় মুসলমানজাতির চরিত্র চিত্রিত হইয়া গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সুপ্রচার হইয়া পড়িল। হিন্দুর মনে মুসলমানদ্বেষের ইহাই কারণ। ইহার প্রমাণ এই যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে বর্ণিত যে সমুদয় পুঁথিগত অমূলক অপবাদের সহিত শিক্ষিত সমাজ পরিচিত, অশিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রভাব এখনও পরিব্যাপ্ত হয় নাই।

বিদ্বেষমূলক ইতিহাস-বিরুদ্ধ কাহিনীর প্রতি গ্রন্থকার ও প্রবন্ধ লেখক-গণের হৃদয় এতই আকৃষ্ট যে, সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিহাস সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কারের সুদিন সমাগত দেখিয়াও তাঁহারা অবাধে অভ্যস্ত কুটিলপথে প্রধাবিত হইতে বিরত নহেন। ইহার ফল যে কিরূপ অনিষ্টজনক তাহা আমাদের শিক্ষিত নামধারী লেখকগণ যে কেন বুঝিয়াও বুঝেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

প্রথমে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এদেশের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে যে সকল দেশীয় লেখক গ্রন্থাদিতে মুসলমানের চিত্র বিকৃত অথবা অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের পথ আছে। কিন্তু এখনও,—এই অভ্রান্ত ইতিহাস আবিষ্কারেব সুদিনেও—যাঁহারা উক্তমত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশী স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র কিনা সন্দেহের বিষয়।

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে মধুধারার সহিত এমন এক বিষ-ধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে কতিপয় বিষগ্রাহী শিষ্য মুসলমানদ্বেষে অন্ধ হইয়া নির্ভয়ে ইতিহাসের সোনার অঙ্গে পদাঘাত করিতেছে। গুরু ইহার এক পথও রাখিয়া গিয়াছেন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সে পথের ডাকনাম। মুসলমান-সমাজ ও তাহাদের পূর্ব্বগত নৃপতি সমাজকে বৃথা অভিযোগে আক্রমণ করিয়া স্বেচ্ছামত কটূক্তি করাই এ পথের উদ্দেশ্য। গুরুদেব কেবলমাত্র উপন্যাস রচনা করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, শিষ্যসমাজের উপন্যাস ত আছেই আছে, তা'ছাড়া তাঁহারা 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক আবিষ্কার', 'ঐতিহা-সিক চিত্রোদ্ধার' প্রভৃতি লালিত্যপূর্ণ নাম দিয়া কল্পিত উপন্যাসে মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন।* ভারতের স্বভাবিক গুণে মুসলমান-যুগের ইতিহাস চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সেই সকল অমূল্যরত্নের উদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে। এসময়, সুফলপ্রসূ তরুর অঙ্কুরকালে, ঐ সকল লেখক-গণের বিদ্বেষ বহ্নি, বিবেক-বারিতে সুশীতল হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দিতা সমাজে প্রকৃত ইতিহাস পরিব্যাপ্ত হওয়ার বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ। মধুর রসপূর্ণ উপন্যাস এবং বিবিধ রসাত্মক পত্রিকারই এখন

* শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈ'ত্রেয় বি, এল, ও নিখিলনাথ রায় বি, এল, নিরপেক্ষ ভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিয়া যে উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা মুসলমানসমাজের চিরধন্যবাদের পাত্র। নং সং।

অধিক প্রসার ও প্রতিপত্তি ; কিন্তু নিরস খাটি ইতিহাসের প্রতি বাঙ্গালী পাঠক বড় একটা নজর করেন না। লেখকনামধারী কুলকুঠারগণ যে ইতিহাসকে বিকৃতমূর্ত্তিতে জনসমাজে প্রচার করেন তাহা সাধারণ পাঠক একবার ভাবেনও না। কাজেই ঐ সকল উপন্যাসে যে সব ঐতিহাসিক কথা প্রকাশিত হয়, তাহাই তাঁহাদিগের নিকট অভ্রান্ত ইতিহাসরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই সকল লেখকের কর্ম্মফলে সামাজিক অবস্থা দাঁড়াইতেছে যে, হিন্দুসমাজ, মুসলমানের অপকীর্ত্তি, মুসলমানের কুরীতি, মুসলমানের লাঞ্ছনা অতি অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক হইলেও, সত্যাসত্য বিচার রহিত হইয়া, সাগ্রহে তাহা পাঠ করেন এবং আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে তাহাই বন্ধুবান্ধবকে উপহার প্রদান করেন। ইহাতে কোমলমতি বালক ও রমণী এবং অনভিজ্ঞ ও গোঁড়া হিন্দু-গণের হর্ষোৎপাদন হয় বটে, কিন্তু মুসলমানের হৃদয়ে যে কি বিষের ছুরি বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কেহ ভাবেন কি ? এবং সেই আঘাতের ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা কেহ দেখেন কি ? মুসলমানদ্বেষীগণ বলিতে পারেন, "হইলইবা ; মুসলমানের যাহা সাধ্য থাকে করুকনা। আমরা মুসলমানকে কটূক্তি করিয়া পুস্তক লিখিব ; তাহারা আমাদের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া যদি কিছু করিতে পারে, করুক।" এই ধারণা যে নিতান্ত বালকোচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে হিন্দুজাতির স্বদেশভক্তি বা ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

মুসলমানের রচিত উপন্যাস হিন্দুর উপন্যাসের মত বিকিত হইবেনা সত্য, কিন্তু তথাপিও ইহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাহারা ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টানের ধর্ম্মপ্রচারের মত হিন্দুর কলঙ্ক-গাথা মুসলমানের ঘরে ঘরে বিতরণ করিতে পারে। হিন্দু, মুসলমান সমাজকে ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, আর মুসলমান তাহার প্রতিশোধ লইতে অর্থের অপব্যয় করিতে পারে না ? কিন্তু এক দেশে, এক গ্রামে বাস করিয়া পরস্পরে এই বিষভাব পোষণ করা কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ?

মুসলমান সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণহৃদয়, তাহারা অশিক্ষিত এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। এখন বাঙ্গলার প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসীই মুসলমান। অধুনা মুসল-মান সমাজে বঙ্গভাষার আলোচনা বিশেষ পরিদৃষ্ট হইতেছে। মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ কতিপয় সুলেখকের গ্রন্থ এখন মুসলমানের ঘরে ঘরে বিরাজিত। তাঁহারা যদি অসূয়াশূন্য পথ অবলম্বন না করিয়া প্রতিশোধ লইতে 'ঐতিহাসিক

উপন্যাস' রচনা করিতেন, তবে কি হিন্দুর কলঙ্ককাহিনী মুসলমানের মুখে মুখে বিচরণ করিত না? প্রতিপক্ষ প্রতিশোধ প্রদানে সক্ষম হইয়াও যে নির্ব্বাক রহিয়াছে, ইহা দেখিয়াও যদি আমরা হৃদয়ে হিংসার ভাব পোষণ করি, তবে তাহা হইতে নীচতার বিষয় আর কি হইতে পারে? যে সকল কলুষিতমনা প্রবন্ধপ্রণেতাগণ ইতিহাসের অমর্য্যাদা করিয়া থাকেন, উপদেশবাক্য তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। মুসলমানগণ ভদ্রভাবে বহুদিন হইতে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছিলেন; শেষে প্রহার ব্যতীত পশুর শিক্ষা নাই ভাবিয়া প্রতিশোধ লইতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। হিন্দু, মিথ্যা বর্ণনায় মুসলমানকে হীন করিতে চাহে, মুসলমান, ইতিহাস মন্থন করিয়া সত্য কথায় হিন্দুর কলঙ্ককাহিনী ঘোষণা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। কোনও মুসলমান সুকবি, ঐতিহাসিককে নির্ব্বাক রাখিয়া, 'দেবলা' কাব্যে হিন্দুর যে কলঙ্ক ললিত-মধুর কবিতায় প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কি মুসলমানের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে না? সেই কাব্য কি মুসলমানগণ হিন্দু বন্ধুকে উপঢৌকন দিয়া হিন্দুর মুখ অবনত করিতেছে না? হিন্দুর পত্রিকাতেই ত প্রকাশিত হইয়াছিল. 'দেবলা' কাব্যের কবি যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, মুসলমান কেন অনেক হিন্দু কবির পক্ষেও তাহা গৌরব-জনক। এই কাব্য কি মুসলমানসমাজে আদৃত হয় নাই? তাই বলিতেছি, পুস্তক প্রণয়নের প্রতিযোগীতায় মুসলমান যে পশ্চাতে পড়িবে, ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা। এ অবস্থায় মুসলমানকে শিষ্টাচারে বশীভূত করা কি সুযুক্তির পরি-চায়ক নহে?

সে দিন ক্লাসিক থিয়েটারে 'শিবাজীর' অভিনয়ের সমালোচনা পড়িয়া কোনও প্রতিভাবান মুসলমান কবি উগ্রআঁখিতে কহিলেন, 'হিন্দু মিথ্যার আশ্রয় লইয়া মুসলমানকে কুভাবে চিত্রিত করিতেছে; সত্য কথায় ইহার শতাধিক কলঙ্কে হিন্দুর মুখ অবনত করা যায়না কি? সেই নাটক কলিকাতার পার্শী থিয়েটারে অভিনীত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিতে পারে না কি? কেন ভাই, এরূপ অভদ্রোচিত বিবাদের আবশ্যক কি? বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস এতবার সমালোচিত হইয়া তদন্তর্গত ঐতিহাসিক বিষয় সকল মিথ্যা প্রমাণিত হইল, তবু আবার সেই ভাবের নাটকের আবির্ভাব হয় কেন? তবে কি হিন্দুগণ জাতীয় অপরিজ্ঞাত কলঙ্ক সকল মুসলমান কর্ত্তৃক প্রকাশিত করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক? যদি তাহাই হয়, তবে বেশ জানিবেন, বিলম্বে কর্ণপাত না করিলে মুসলমানের হাতে হিন্দুকে বিশেষ শিক্ষা পাইতে হইবে। আমরা এতদিন

ভাবিতাম, হিন্দু একবার দম্ভ করে যাহা করিয়াছে, 'ভবিষ্যতে তাহার পুনরভিনয় করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা কিছু নয়; মুসলমানকে পদে পদে অপদস্থ করাই হিন্দুর কার্য্য। এ দেশের হিতার্থে আমরা এতদিন জাতীয় স্বার্থকে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন বুঝি আর সে বাঁধ টিকে না!'

নিরপেক্ষ পাঠক! বুঝিবেন কি, কতিপয় হিন্দুলেখক কর্তৃক সমাজবিশেষের মনে কি বিষম বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া হিন্দুসমাজের অদম্য আশার অভ্যুত্থানের পথ সহজ ও সরল করিয়া দিতেছে! এই সঙ্কট সময়ে হিন্দুলেখকগণ ভাবী অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা না করিলে, যাহা ঘটিবে তাহার কেবলমাত্র ক্ষীণ আভাস উপরে প্রদান করিলাম। কংগ্রেসের উপদেশে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব সামাজিক ও দেশের মঙ্গল বলিয়া বুঝিয়াছি। অধঃপতিত দেশের লক্ষণানুসারে দেখিতে পাইতেছি যে সমাজনেতাগণ মুখে যাহার পক্ষপাতী, কার্য্যে তাহার বিপরীত।

অনেক সময়ে অনেক মাসিক পত্রে এমন সব বিষয় ইতিহাসের আবরণে প্রকাশিত হয় যে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সত্য পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী ব্যক্তিগণই আবার সেই সব পত্রের সম্পাদক ও লেখক। তাঁহারা কেমন করিয়া যে ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করেন, বুঝিতে পারি না। ইহারই নাম কি স্বদেশপ্রীতি? সহৃদয় লোক বলিবেন কি এরূপে স্বদেশের সেবা সাধন করা যায়? যতদিন পর্যন্ত আমরা সত্যের আদর করিতে না শিখিব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ভারতে ঐক্যভাবের আশা দুরাশা মাত্র। আমরা মুসলমানদের যে অনল জ্বালিয়া দিয়াছি এবং যেরূপ ভাবে এখনও তাহাতে প্রচুর ইন্ধন সংযোগ করিতেছি, তাহার ফলে ভারতের সকল শান্তিসুখ অচিরে বিদূরিত হইবে।

আমার স্বজাতীয় ভ্রাতাগণ কি সেকথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন? তাঁহারা কি মুসলমানদিগকে ভ্রাতা বলিয়া সম্মান প্রদান করিয়া স্নেহপাশে আবদ্ধ করিবেন? শুনিতে পাই, হিন্দুজাতির উত্থানের সময় আসিয়াছে। কিন্তু মুসলমানের ন্যায় এক প্রবল সম্প্রদায়কে সর্ব্বদা বিদ্বেষাচরণে নিযুক্ত রাখিয়া সে কার্য্য সাধন হইবে কি? ভরসা করি, হিন্দুসমাজের মহাত্মাবর্গ হিন্দু-মুসলমানের শুভ সম্মিলনের একটা উদার উপায় বাহির করিবেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ।

নিরীহ বাঙ্গালী।

আমরা দুর্ব্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙ্গালী কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা—এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্ত্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার Drawing room এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা! (Drawing room suit) যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা!!* অতএব আমরা মূর্ত্তিমান্ কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল—অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্য দ্রব্যগুলি—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁটাল—রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্য সামগ্রী ত্রিগুণাত্মক—সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

---

* "নায়িকা" বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ অনেকে বাঙ্গালী পুরুষকে "বেচারী" বলে। উর্দ্দু ভাষায় পুরুষকে "বেচারা" ও স্ত্রীলোককে "বেচারী" বলে। যদি আমরা "বেচারী" হইতে পারি, তবে "পদ্মিনী", "নায়িকা" ও "পুরুষিকা" হইলে দোষ কি?

আমাদের পরিচ্ছদ যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীমত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে Ventilationএর কোন বাধা বিঘ্ন হয় না। আমরা সময় সময় সভ্য ভব্য অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্দ্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কুসুমাঙ্গীগণ অনুকরণে ইংরাজ ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (পেটিকোট জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী বলিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী লতিকা তাই অতি সূক্ষ্ম ৭ গজ "হাওয়ার সাড়ী" পরেন। বাঙ্গালীর সকল বস্ত্রই সুন্দর, স্বাস্থ্য ও সুখদায়ক।

বাঙ্গালীর গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্ধবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জ্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে আবশ্যকীয় জিনিষ নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার যৌবনবর্দ্ধক ঔষধ এবং রাঙ্গা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটী বোতাম ইত্যাদি বিস্তর মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটী সোনা রূপা বা হীরা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন্ জিনিষটার নকল না হয়?

যদি কেহ একটু নূতন ধরণের নাম জাহির করিবার মানসে "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা অনুকরণে "ঘনকেশী" তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ "কৃষ্ণকেশী" তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা "শুভ্রকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশরঞ্জন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উন্মাদনা" পাওয়া যায়। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে পারে, সবই আছে। আমরা খাদ্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায় পাশ বিক্রয়। এই পাশ বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাশের মূল্য কত জান?—

"অনেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম, এ, পাশ অমূল্যবস্তু ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া সুলাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্য্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি Agriculture করা অপেক্ষা Brain culture করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M. R. A. C. পাশ করা সহজ। আইনচর্চ্চা করা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া Famine Report পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি ?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। যথা—

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B. SC. ও D. SC. পাশ করা সহজ।

(৩) অল্প বিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভজন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের দুঃখ শোকে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (গুহ্যগতে !) Kalydore

milk of rose ও Vinolia powder মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট অপমান লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ। ইত্যাদি।

তারপর আমরা বুদ্ধিমান্ আছি—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে সহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিবাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা, তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসী দাও!!

আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশী। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশী। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশী বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন কুলা," "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটীজুতা"—কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা—"অতি ভগ্নীলাবণ্য," "মাংসমজ্জ নয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ-প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।

মিসেস্ আর, এস, হোসেন।

"বিমলা" ও হিন্দুসমাজ।

শুনিতে পাই, গত আশ্বিন ও কার্ত্তিকের যুগ্ম-সংখ্যা নবনূরে প্রকাশিত "বিমলা" শিরোনামাঙ্কিত ক্ষুদ্র গল্পটি হিন্দু সমাজের প্রাণে আঘাত দিয়াছে।

প্রমাণ স্বরূপ ৪ঠা অগ্রহায়ণের "মিহির ও সুধাকরে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঐ পত্রে দীনেশ বাবু বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। "বিমলা" গল্পটির কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিয়া কৌশলে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"এই ভাবে পরস্পরের জানানার প্রতি অবমাননার ভাবে অগ্রসর হওয়া কখনই অনুমোদনীয় বলিয়া বোধ হয় না।" দীনেশ বাবু অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে এ ক্ষেত্রে হিন্দুগণই প্রথম দোষী; কিন্তু তাঁহার তর্ক হইতেছে যে, "পরস্পরের ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে না যাইয়া যাঁহারা শিথিল করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না।" অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ "বিমলা" গল্পের ন্যায় হিন্দুর প্রতি অবমাননার ভাব কল্পনা করিলে, হিন্দু ও মুসলমানে ঐক্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে, সুতরাং মুসলমানেরাই সেজন্য দোষী হইবেন। হিন্দুগণ যে এরূপ কল্পনা দ্বারা চিরদিন মুসলমানের অবমাননা করিয়া আসিয়াছেন, এবং এখনো করিতেছেন, দীনেশ বাবু হিন্দুকে সেজন্য দোষী বলিয়া স্বীকার করিয়াও, তাহা হিন্দু-মুসলমানে ঐক্যের বন্ধন শিথিল করিতে পারে, একথা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার মতে শুধু মুসলমানেরা ঐরূপ কল্পনা করিলেই ঐক্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। তর্ক খুব যুক্তি যুক্ত বটে!

আমরা এই প্রবন্ধে একটু খোলাসা ভাবে বিচার করিয়া দেখিব যে, "বিমলা"-জাতীয় কল্পনা দ্বারা কে কাহার অধিক অবমাননা করিতেছেন, এবং এতদ্বারা পরস্পরের ঐক্যের বন্ধন শিথিল হইলে কে তাহার জন্য অধিক দায়ী।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান যখন এত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, এবং আজ পর্য্যন্ত যখন হিন্দু মুসলমানে খুড়ো ভাইপো, মামা ভাগ্নে, মাসী বোন্‌পো, ভাই বোন্ প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তখন হিন্দু-মুসলমান বালক বালিকার মধ্যে ভালবাসা বাসি, ও ক্রমে যৌবনে তাহার প্রেমে পরিণতি কখনই বিচিত্র নহে। এক্ষণে আদর্শের কোন রূপ ব্যতিক্রম না করিয়া যদি হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রণয়চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। দীনেশ বাবু বলেন, হিন্দু সমাজের কুক্ষির ভিতরই যখন দুইটি বিভিন্ন জাতীয় নর নারীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয়-কল্পনা অসহনীয়; তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ কল্পনা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। কিন্তু

জহুরের এমন আত্মসংযম দ্বারা পরিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেম,—হইল কিনা বিমলার প্রতি অবমাননা। কেননা, বিমলা হইল "সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা", আর জহুর হইল মুসলমান যুবক। আচ্ছা, বেশ।

পাঠক দেখিবেন, "সম্ভ্রান্ত" শব্দটি কেমন সুকৌশলে বসিয়াছে। দীনেশ বাবুর অলক্ষিতেই বোধ হয় তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়া শব্দটি মুসলমান যুবককে বঞ্চিত করিয়া হিন্দুমহিলার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে! ইহা মুসলমানের প্রতি হিন্দুর গভীর অবজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত। মুসলমান সম্বন্ধে সামান্য সম্মান প্রদর্শনও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। "সম্ভ্রান্ত" শব্দটি বিশেষ করিয়া এস্থলে ব্যবহার করিলে, সেই হিন্দুমহিলাটি "অসম্ভ্রান্ত", পাঠকের মনে এরূপ কোন ভাবের উদয় হইত কি?—অথবা মুসলমান যুবকেরও ঐরূপ একটা সম্ভ্রমসূচক বিশেষণ ব্যবহার করা কি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে? মুসলমান বলিয়া কি যুবকটি দীনেশ বাবুর এত অবজ্ঞার পাত্র? এরূপ লেখনীশিথিলতা কি ঘোর সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচায়ক নহে?

রিজিয়ার অভিনয় দীনেশ বাবুর হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রদান করিয়াছিল, সাফাই স্বরূপ তিনি সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা দুষ্টবুদ্ধি, আমাদের মনে হয় যে, "বিমলা" পাঠ করিয়া তিনি সে আঘাতের যতখানি গুরুত্ব অনুভব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, বাস্তবিক অভিনয় দর্শন করিয়া তিনি ততখানি করেন নাই। কারণ, তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ লেখনী ধারণ করিতেন। "বিমলা" গল্পটি প্রকাশ হওয়ার জন্য বসিয়া থাকিতেন না। আমাদের আরো মনে হয়, পরস্পরের জাতির প্রতি অবমাননার ভাবে অগ্রসর হওয়া যে অনুমোদনীয় হইতে পারে না, এই দার্শনিক তত্ত্বটি দীনেশ বাবু পূর্ব্বে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। "বিমলা" গল্প হইতেই তিনি এতটুকু মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। [বিমলা লেখককে ধন্যবাদ যে তিনি অন্ততঃ একজন হিন্দুর মনেও এ শিক্ষাটুকু প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইয়াছেন] নহিলে, এ জ্ঞান যদি তাঁহার পূর্ব্বে থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এ বিষয়ে লিখিবার অনেক গুরুতর বিষয় ছিল।

দীনেশ বাবু বলিতেছেন,—"বর্ত্তমান কালের কোন উপন্যাসে এরূপ কল্পনায় সমাজদ্রোহী ব্যথিতা হইবেন।" সমাজদ্রোহী অর্থে এস্থলে হিন্দুসমাজদ্রোহী, কেননা, মুসলমানসমাজদ্রোহী ব্যথিত হইলেন কি মরিয়া গেলেন, সে দিকে

সম্রাট আওরঙ্গজেব।

আওরঙ্গজেব কেন বৃদ্ধ পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ...ন এবং বিদ্রোহী হইলেন আমাদের এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। ...ক সংসারের সহিত আওরঙ্গজেবের বিন্দুমাত্রও সংস্রব ছিল না। তবুও যে তিনি বিদ্রোহী হইয়া সম্রাট হইতে প্রয়াসী হইলেন ইহা একটি ...ম গুরুতর বিষয়। শৈশবেই ভ্রাতাত্রয়কে তিনি ভালমতে চিনিয়া ...ছিলেন এবং ইঁহারা সম্রাট হইলে যে মুসলমানদের এবং মুসলমান ধর্ম্মের- ...প কুঠারাঘাত অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা ...ইয়াছে দারা নামমাত্র মুসলমান ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমত হিন্দু ও খ্রীষ্টান ...র মিশ্রণোৎপন্ন এক অত্যদ্ভুত খিচুড়ী ছিল। তিনি সম্রাট হইলে যে ...দের অত্যাচারের মাহেন্দ্রসুযোগ উপস্থিত হইত ইহাতে সন্দেহ কি? বস্তুতঃ ...যে একজন সম্রাটের উপযুক্ত লোক ছিলেন না ইহা জগদ্বিখ্যাত ...হাসিক Bernier স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শুজা ও মুরাদ হিন্দুর হাতে ...পুতুল ছিলেন। [illegible] মদ, উপপত্নী এবং মানসিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদিও ...সম্পূর্ণরূপে সিংহাসনের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অধিকন্তু ...ইঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। যখন বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু ঘোষিত ...আওরঙ্গজেব মহাসমস্যায় পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন যদি সেই ...তান ... করিয়া থাকেন তবে ইঁহাদের একজন নিশ্চয়ই সম্রাট ...হবেই ভারতে মহা অনর্থ ঘটিয়া উঠিবে। বিচার একেবারে লোপ ... হিন্দুরা তাঁহাদের মনোমত দুর্ব্বল সম্রাট পাইয়া রাজ্যমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ...হইবেন। সম্রাটেরাও নামমাত্র 'সম্রাট' হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া ...ন। হিন্দুরাই তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত কাণে দড়ি দিয়া চালাইবেন। ...হানের সময়েই আলমগীর হিন্দুদের অত্যাচার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া-

কথিত আছে যে, একদা চারি ভ্রাতা গুরুর (ওস্তাদ) নিকট পড়া ...নিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন ওস্তাদ কাঁদিতেছেন। কেহই কারণ ...জ্ঞাসা হইতে সাহসী হইলেন না। আওরঙ্গজেব ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা ...করিলেন "কাঁদিতেছেন কেন?" ওস্তাদ প্রথমে ইতস্ততঃ করিলেন; অনেক-

ভর্ৎসনা পরায়ণ। এ চিত্র কত নির্মল, কত সুন্দর, কত স্বা
ইহাতেও যদি হিন্দুর সমাজপতী বাধিত হয়েন, বা মুসলমানের পক্ষ
উদ্ধার পাওয়া হইল বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে মুসলমানের হ
সমাজপতির দেশ ছাড়িয়া পলায়ন ও সাহিত্যক্ষেত্র হইতে মুসলমা
অবসর গ্রহণ অনিবার্য।

তাই বলিতেছিলাম, "বিমলা" গল্পে হিন্দুর আপত্তির কোন কা
পারে না। বরং হিন্দুর লিখিত অসংখ্য গল্পে আমাদের আপত্তির এ
রহিয়াছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি আমরা সব
করিয়া হিন্দুর সহিত মিলনাশায় একযোগে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই
একই মায়ের সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এত সহ্য করিয়াও
কারণে আমরা ভর্ৎসনা শুনিব? আমরাই বিরোধ উৎপাদকরূপে গ
হইব? হায়রে বিচার! A Daniel has come to judgment in

যাহা হউক, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। পরিশেষে
বক্তব্য এই যে, সমাজপতির ব্যথা প্রথম অনুভব করিয়া দীনেশ বাবু
ও সুধাকরে" যে নীতি প্রচার করিয়াছেন তাঁহাকে স্বয়ং সেই নীতি
হইয়া চলিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। মুসলমান সমাজপতি
আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের—অবমাননা ও দুঃখের কথা,—ঘোর দুর্দশা
লক্ষ্য করিয়া দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" দ্বিতীয়
অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব
যদি তাহাতে দেখি যে মুসলমানের প্রতি সুবিচার করা হইয়া
যদি হিন্দুগণ মুসলমানের আদর্শ খর্ব করিয়া ফেলিয়া সমাজে মুসলমানের
না দেন, তাহা হইলে বুঝিব, United India র সুখস্বপ্ন সফল নাই
অধিক বিলম্ব নাই। *

ইসমো

* পৌষের নবনূরে প্রকাশিত "মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান" প্রবন্ধ পড়িয়া
এই প্রবন্ধটি হস্তগত হইয়াছিল। সঃ সঃ।

ঘার চিকিৎসিত হইবার পর তিনি আওরঙ্গজেবকে বলিলেন ; "তোমাকে আমার দুঃখ বলিয়া কোন ফল হইবে না। আমি যাহাদের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছি তাহাদের বিচার এ রাজ্যে নাই।—বিনা কারণে একজন রাজপুত সৈনিক আমাকে অপমানিত করিয়াছে।" শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা আলমগীর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। ওস্তাদ আবার বলিতে লাগিলেন "কেবল আমি কেন ? অত্যাচারী বিধর্ম্মী হিন্দুদের হাতে প্রত্যহ শত শত ধার্ম্মিক মুসলমান অপমানিত হইতেছেন। পাছে মুসলমানেরা তাহাদের বিরুদ্ধে সম্রাট-সমীপে অভিযোগ আনয়ন করেন এই ভয়ে সেই অত্যাচারীরা আবার মুসলমানদিগকে তোমার পিতার দরবারে আসিতে দেয় না। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া অনেকে ফল পান না।" শুনিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে আওরঙ্গজেবের হৃদয় কাঁদিল। তিনি বলিলেন—"যাহারা সম্রাটের চক্ষের উপর, আমাদের চক্ষের উপর, এমন কি রাজধানীতে থাকিয়া, আমাদের গুরুর প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে পারে, না জানি দূরদেশীয় মুসলমানদিগকে তাহারা কতই লাঞ্ছনা দিয়া থাকে।—আমি পিতার নিকট বলিয়া দুর্দান্ত সৈনিককে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করাইব।" অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়কে ইহার প্রতিবিধান কল্পে মনোযোগ করিতে প্রার্থনা করিলেন। কেহই স্বীকৃত হইলেন না। অধিকন্তু প্রত্যেকেই সৈনিকের পক্ষ হইয়া আওরঙ্গজেবকে 'অনর্থক' গণ্ডগোল হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখনই তিনি তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইলেন। তাঁহারা সিংহাসনারোহণ করিলে যে ভারতীয় মুসলমানগণ অপার দুঃখ-সমুদ্রে ভাসিবেন ইহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। অতঃপর তিনি সৈনিকের বিরুদ্ধে পিতার নিকট অভিযোগ করিলেন। শাহ্জাহান প্রথমতঃ তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতে চাহিলেন না। পরে আওরঙ্গজেবের প্রতি যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি সৈনিককে ডাকাইলেন এবং সামান্য পরিমাণে তাহার অর্থদণ্ড করিলেন। আওরঙ্গজেব কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, সমস্তই দেখিলেন। গুরুর কথায় আর মাত্রও সন্দেহ রহিলনা। রাজ্যের অবস্থা দেখিবার জন্য তিনি একদা ছদ্মবেশে বাহির হইলেন। দেখিলেন কত স্থানে কত রাজপুতের হস্তে গরীব মুসলমানদের নিগ্রহ হইতেছে ; কত স্থানে অত্যাচারী রাজপুত কর্তৃক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ায় কত [illegible] সপরিবারে রোদন করিতেছেন। নরপিশাচদের এরূপ ঘৃণিত [illegible] হৃদয় কাঁদিল। তিনি ঈশ্বরের নিকট উপযুক্ত সময়

আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী হওয়ার দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ ধর্ম। সুচতুর আকবরের Matrimonial alliance দ্বারা চালিত হইয়া প্রায় অনেক মুসলমানই হিন্দু-বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব এ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিধর্মী কাফেরের সহিত মিলিত হওয়া তিনি অতিশয় ঘৃণাজনক এবং ধর্মবিরুদ্ধ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন "এরূপ প্রথা প্রবল থাকিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে একটিও মুসলমান থাকিবেনা—মুসলমান ধর্ম একেবারে লোপ পাইবে;—সকলই হিন্দু হইয়া যাইবে।" আলমগীর কি প্রকার বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার কথাগুলি হইতেই স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। যদি হিন্দুদের সহিত আমাদের বিবাহ-বন্ধন-প্রথা চলিতে থাকিত তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ফেলিতাম। তাঁহারা কিন্তু আমাদের ওগুলি নিতেন না। আমরাই হিন্দু হইতাম, তাঁহারা মুসলমান হইতেন না। ইদানিংও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল স্থানে হিন্দুর সংখ্যা অধিক তথাকার মুসলমানেরা প্রায় অর্দ্ধহিন্দু। তাঁহাদের অনেকেরই চাল চলন, চলাফেরা প্রায় হিন্দুদের মত। আর যদি বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা হিন্দুদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং যাওয়া আসা হইত তাহা হইলে যে ভারতে ইসলামের কি দুর্দশা ঘটিত বলা যায় না। দারা, শুজা, মুরাদ ইঁহাদের ধর্মাধর্ম কিছুই জ্ঞান ছিল না। তাঁহারা কেবল হিন্দুর হাতের ক্রীড়া পুতুল ছিলেন এবং বুদ্ধিমান আকবরের Matrimonial alliance এর প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। আওরঙ্গজেব দেখিলেন ইঁহারা সম্রাট হইলে ভারতের ইসলাম ধর্ম অতল বারিধি-গর্ভে ডুবিয়া যাইবে। হিন্দু মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিবে।

এখন দেখা যায়, আওরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভচেষ্টা মাত্র দুইটি উদ্দেশ্যে—মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অত্যাচর নিবারণ, এবং ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্ম্মের স্থায়ীত্ব সংরক্ষণ। বস্তুতঃ সাংসারিক কোন কার্য্যেই আলমগীরের আকাঙ্খা ছিলনা। তিনি একজন সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। "সংসার-রূপ তুলাদণ্ডে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সুখ, শান্তি কিম্বা সিংহাসন কিছুই তিনি ধর্ম্মাপেক্ষা ভারী বোধ করিতেন না।"—S. Lanepoole. তিনি শুধু ধর্ম্মের জন্যই প্রাণ দিতে পারিতেন। মুসলমান ভ্রাতাদিগের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অপরিসীম স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল। তিনি মুসলমানের দুঃখ দেখিতে পারিতেন না। ইঁহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে একজনও যদি স্বাধীনচেতা ধর্ম্মবিশ্বাসী

এবং সৎস্বভাববিশিষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এসব গণ্ডগোলে পদক্ষেপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টই বলিতেন—"ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং সম্মানী লোক হইব ভাবিয়া আমি যুদ্ধ করি নাই। কাফেরের করাল কবল হইতে মুসলমানধর্ম্ম এবং মুসলমানকে রক্ষা করাই আমার যুদ্ধ করার একমাত্র কারণ।"

সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ শুজাই প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দারা পিতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন প্রকাশ করিয়াই তিনি নিজকে সম্রাট ঘোষণা করিলেন। শাহ্‌জাহান দেখিলেন এই সময়ে চুপ করিয়া থাকিলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে এবং বিশেষতঃ তাঁহার নিজেরও যে ভাল হইবে এরূপ নহে। সুতরাং তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া সংবাদ দিলেন। শুজা কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।

এদিকে মুরাদও সুরাট অবরোধ করিলেন এবং বণিকদের নিকট হইতে ছয়লক্ষ টাকা আদায় করিয়া আহ্‌মদাবাদে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিলেন।

আওরঙ্গজেব চুপ করিয়া রহিয়াছিলেন। দারা তবুও বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজা জয়সিংহের সহিত তাঁহার পুত্র সুলেমানকে শুজার বিরুদ্ধে এবং মারোয়ারের যশোবন্ত সিংহের সহিত নসিম খাঁকে মুরাদ এবং আলমগীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দারার সৈন্যগণ বারানসীর নিকটে শুজাকে পরাস্ত করিল। শুজা অনেক যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং বহুমূল্য জিনিষপত্র ফেলিয়া পলায়ন করিলেন।

আওরঙ্গজেব এখন তাঁহার মত ঠিক করিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি রাজধানী উদ্দেশ্যে বোরহানপুর ত্যাগ করেন। পথে নর্ম্মদা নদের নিকটে মুরাদ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। যখন তাঁহারা উজ্জয়িণীর অন্তর্গত ধর্ম্মপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন তখন শাহ্‌জাহান এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন যে তিনি বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু রাজপুত্রগণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। উক্ত ঘোষণায় সুচতুর দারাকর্ত্তৃক বৃদ্ধ সম্রাটের নাম জাল করা হইয়াছে বলিয়া বাস্তবিকই তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। তাঁহারা উত্তর দিলেন যে যদি বাস্তবিকই তাঁহাদের পিতা বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া আসিবেন। ("বাস্তবিক তাঁহাদের এ প্রস্তাব প্রকৃত ছিল। ইহাতে কোন প্রবঞ্চনা ছিল না।") আওরঙ্গজেব যশোবন্তকে এই মর্ম্মে লিখিলেন যে "আমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা নাই।

শুধু মাগো—পূজিতে তোমায়।
কত ভাবে কত জ্ঞানে,
বাঁধি সে আরতি-গানে
চাহিতেছি বিশ্ব-মাঝে
মাতাতে সবায় ;—
শুধু মাগো—পূজিতে তোমায়।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অনুরোধ।

হাসি মুখে তুমি চেয়োনা লো বালা
বেসোনা আমারে ভাল
আমি এ হৃদয় পারিবনা দিতে
নিভেছে ইহার আলো।
এ হৃদয় সখি ভীষণ সাহারা
তুমি গো কনকলতা,
রাখি যদি বুকে দহিবে ও দেহ,
রাখিব বা তোরে কোথা।
আমি প্রিয়তমে তুষার শীতল,
তুমি সে সুরযমুখী,
করিতে চাহিনা ও কোমল হৃদি
আমার দুঃখেতে দুঃখী।
আমি সে কঠোর নিদাঘ দিবস,
রজনীগন্ধা তুমি,
তুমি সোহাগিনী। মধুর নির্ঝর,
আমি ভীম মরুভূমি।
আমি ধরণীর ঝটিকা প্রবল,
তুমি সুখী প্রজাপতি
তুমি সুহাসিনী, সমীর কুমারী
আমি দীন হীন অতি ;
দুঃখ তপনের প্রখর কিরণ
সহি মোর দিন গেল,
তুমি সখি এই দেখিছ প্রথম
উষার কনক আলো।
তোমারে ললনা। উপহার দিতে
কিছুই আমার নাই
ভাঙ্গা শুধু এই হৃদিখানা আছে
দে... দিবগো তাই।
বুক ভরা শুধু আছে দুঃখ রাশি,
আছে আঁখি ভরা জল
ভয় হয় পাছে আসাইয়া ফেলে
ও কনক শতদল
তাই বলি বালা হেসো নাগো আর
বেসনা আমায়
আমি এ হৃদয় পারিবনা দিতে
নিভেছে ইহার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লি...

সম্মিলন।

আমি নিতি নিতি
তোমা চা...
ডাকিব, খুঁজিব কাঁদিব কখন,
তবু দীপ্র ধরা দিও
আমি নিদাঘে পুড়িব
তখন আ...
বর্ষায় ভাসিব
মেঘের ...
শরতে শুকাব শীতের কুয়াসে
হারাইব আর গভীর নিরাশে,
তখন সাজিয়ো তুমি মধুমাস
উজল কিরণ সহ ফুল বাস।
নিতি দেখা তুমি দি...
সারা সন্ধ্যাবেলা হোথা
ফুটিবে তা...
চাহিয়া থাকিব
পাগল মা...
পেচক ডাকিবে গভীর রজনী—
কাঁদিব খুঁজিব আকুল আহ্বানি
দেখনি কেবল হাসেয়ে পূর্ব্বাশা ;
দেখা দিও হয়ে প্রীতিময়ী উষা।
দণ্ডে দণ্ডে দেখা এ...
মিত্য পথ পানে আমি
চাহিব ...
গণিব দিবস
দণ্ডে ...
শতেক প্রণয় আলেখ্য দিবসে
আঁকিব, মুছিব ... আবেগে
তখনি আসিও
হয়ে প্রিয়তম
...

আর ত পারি না কিন্তু; হা মিত্র। কি বলি,
কি সম্বোধি, তোমা। এত সদয়িছ কেন
এ দীন লেখকে আজ? এই মহীতলে
কত হতভাগ্য আর কত দুরদৃষ্ট—
না লভিছে শান্তিসুখ জুড়াইতে জ্বালা
দগ্ধ হৃদয়ের। তবে বিশ্রামদায়িনে।
কেমনে না গমনিছ তাহাদের পাশে,
আগমনি হেথা মোর আবদ্ধিক কাজ?"

না, পাঠক মহাশয়; আজ আর না। নিদ্রাকে কত সাধনিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও না। তা না হইলে বলিতে পারিতাম যে, এই গ্রন্থখানি Pedantry র একটা চূড়া। গ্রন্থকারের কতকটা শক্তি আছে কিন্তু তিনি তাহার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও সংযম অভ্যাস করিলে কালে তিনি দশের একজন হইতে পারিতেন।

হজরত মহাম্মদ—শ্রীমোজাম্মেল হক-প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। পয়গম্বর সাহেবের জন্মকাহিনী, বাল্য-লীলা, মাহাত্ম্য-কথা, প্রেরিতত্ব-প্রাপ্তি ও ইসলাম বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান-রচিত একাধিক গ্রন্থ ছিল না। আজ দ্বিতীয় হইল, আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী নূতনে পুরাতনে মিশ্রিত। কবি কেবল সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়। চেষ্টা করি রচনার আরো উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতেন। ইতিহাসের মত কেবল ঘটনা দিলেই জীবনী হয় না। যে মহাপুরুষের পবিত্র জীবন-কাহিনী ইহাতে বর্ণিত গ্রন্থপাঠে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যের একটা নিখুঁৎ ছবি পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় না। হজরতের জীবনের কোন কোন ঘটনায় সমাবেশ করিয়া দিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতিপন্ন করা যাইতে পারিত। বিষয়টা যেরূপ কঠিন, তাহাতে কবির এই না ধরিলেও চলে। এসকল ত্রুটী সত্ত্বেও গ্রন্থখানি যে মোটের উপর সুন্দর হ মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়া ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে এখানে কয়েকটা কথা বলিব। দেখিতেছি, নবী মুসলমান লেখকই ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি উদাসীন। কবি মোজাম্মেল একজন প্রবীন লেখক; অথচ তাঁহার লেখাতেও বহুল ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষি জ্ঞানীবর, মনোপ্রাণ, নিঃশেষিত, সকাতরে, পুণ্যপথ, অহোরহ, শান্তশীল, অনোয়াসে, সকরুণ, প্রবুদ্ধিত, মহান ঘটনা, তিরষ্কিত, মনোক্ষোভে, মনো মনোল্লাস, তপোক্লিষ্ট প্রভৃতি ব্যাকরণ-দুষ্ট পদের প্রয়োগে দীনা বঙ্গভাষার করিতে গ্রন্থকারের একটুও দয়া হইল না?

(১) অনায়াসে তরিবে ভব ভক্ত যেই নর। ১ পৃঃ।
(২) করুণ কাতরে কত দুঃখ আপনার
করিলেন বর্ণন। ২৩পৃ।
(৩) ধর্ম্মের শাসন তাঁরা শিরসে ধরিয়া। ৩৬ পৃঃ।
(৪) ইহ পারত্রিক পথ প্রশস্ত লাগিয়া। ঐ।
(৫) ধাবন কুর্দ্দন দক্ষ হইলা অনাসে। ৯২ পৃঃ।
(৬) কুমার তারিলা শুন আত্মার ধাতার। ৯৪ পৃঃ

প্রভৃতি চরণগুলিতে ব্যাকরণ-দুষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রথম থাকিলেও উহা কি 'অনায়াসে তরিবেক ভব ভক্তনর' এরূপ লিখি

বসন্ত।

মোর রুদ্ধ-দুয়ার সহসা খুলিয়া
হৃদয়ে পশিল কে গো!
ধীরে স্নিগ্ধ ছুঁইয়ে সুপ্ত-পরাণ
পরশি' জাগাল কে গো!—
অই শত সুতানে গাহিল প্রীতি কে গো!

নব উল্লাস-ভরে সুখহিল্লোলে
মাতিল শিথিল প্রাণ,—
আর উঠিল বাজিয়া হৃদিকন্দরে
আবেশ-অবশ তান!—
ওগো লহরে লহরে নব আনন্দ-তান!

শত মধু-ঝঙ্কারে উঠিল গাহি
শত বিহঙ্গ আজি—
মোর প্রাণের মাঝারে স্তব্ধ বীণাটি
সহসা উঠিল বাজি,—
ওগো বনে ও প্রাণে জাগিল প্রাণ আজি!

শত পুষ্পিতলতা-বেষ্টিত তরু
নবকিসলয়ে সাজি,
নব সুরভি উষার শুভ্র শিশিরে
তনুখানি এল মাজি'!—
ওগো নবযৌবনে ধরণী আকুলা আজি!

অই বায়ু যায় চলি ফুলফুলের
যৌবন-বাস চুমিয়া,
আহা চঞ্চল চোরে অঞ্চলে ফুল
পারে না রাখিতে বাঁধিয়া—
ওরে, নিয়ে আয় কেউ যৌবন-চোরে ধরিয়া!

ওগো লতায় পাতায়, বন-বনান্তে
নব বসন্ত আসিয়া
মোর এ চির বিরহ ব্যাকুল হৃদয়
আকুল করিল হাসিয়া !—
ওগো অন্তর মাঝে নব বসন্ত আসিয়া !

মোর চির অশান্ত নব-বসন্ত
ফুল সুগন্ধ বহিয়া,
অই গেল গো গেল গো চলিয়া !—
এস, গাহি আনন্দে বন্দনা-গীতি
বন্ধন-হীনে বাঁধিয়া !—
তোরা রাখ্ ধ'রে ওরে প্রীতির ডোরে বাঁধিয়া !

ইমদাদুল হক্।

আরবীয় দর্শনালোচনা।

(৪)

"সেইরূপ, হে শাহান্‌শাহ্, আমি যদিও জানি যে আমাদের শত্রুগণ জয় লাভ করিলে আমার মৃত্যু নিশ্চয়, তথাপি আমি আশা করি যে, আমার ষড়যন্ত্র যদি সফল হয়, তাহা হইলে আমার বাদশাহ্, তাঁহার অনুচরবৃন্দ ও প্রজাকুলসহ রক্ষা পাইবেন, এবং আমার মৃত্যু হইলেও শত্রুগণ সমূলে বিনষ্ট হইবে। অধিকন্তু, আমার বিবেচনায় সেই ভুবুরিগণের প্রাণরক্ষাকারী যুবকটি আমা অপেক্ষাও অধিক উদারচিত্ত। কেননা সে যুবক মাত্র, তাহার বাঁচিবার আশা ছিল, আর আমি রগ্ন বৃদ্ধ, জীবনে আমার আর সাধ নাই। এতদ্ভিন্ন আমি জানি যে আমি বাদশাহের জন্য প্রাণ দিলে বাদশাহ্ আমার অনাথ পরিবারের যথেষ্ট উপকার করিবেন, কিন্তু সেই ভুবুরিগণের নিকট হইতে যুবকের তেমন আশা করিবার কিছুই ছিল না। আমাদের উভয়েরই

মৃত্যুর পর এ কীর্ত্তি জগতে গীত হইবে, কিন্তু সেই যুবকটি প্রাণ দিয়া যতগুলি লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, আমি তদপেক্ষা বহুতর লোকের জীবন রক্ষা করিলাম।"

পারস্যরাজ ফিরোজ সসৈন্যে রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইলে আল্-খায়শোয়ান সেই বৃদ্ধ জ্ঞানীপুরুষের হস্তপদ কাটিয়া এবং চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে সেইস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন। ফিরোজের অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে আপনার এমন দশা করিল?" তিনি কহিলেন,—"আমি আল্-খায়শোয়ানের একজন মন্ত্রী। বাদশাহ্ যখন পারস্য-রাজ ফিরোজের সহিত যুদ্ধ করা সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ফিরোজের সহিত সন্ধিস্থাপন, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিতে আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিলাম। তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া আমার এই শাস্তি বিধান করিয়াছেন।" এই সংবাদ ফিরোজের নিকট নীত হইলে তিনি সেই বৃদ্ধ জ্ঞানীপুরুষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তিনি আসিলে পুনরায় উপরোক্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। ফিরোজ সমস্তই বিশ্বাস করিলেন, এবং কহিলেন, "আপনি উপযুক্ত পরামর্শই প্রদান করিয়াছিলেন।"

অতঃপর সেই বৃদ্ধ জ্ঞানীপুরুষ কহিলেন,—"হে বাদশাহ্, আপনার অনুগ্রহ আমার প্রতি প্রসারিত হউক। আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন, নহিলে সেই বন্য পশুরা দেখিতে পাইলেই আমার প্রাণ বিনাশ করিবে। আমি আপনাদিগকে সহজ অথচ অতি গুপ্ত পথ প্রদর্শন করিয়া দিব।" ফিরোজ ইহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলেন, এবং এক ভয়াবহ মরুপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। অনুচরেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আর কতদূর?" জ্ঞানীপুরুষ উত্তর করিলেন, "এই আর অল্প দূর আছে।" সে দিন গেল, রাত্রি প্রভাত হইল, আবার প্রশ্ন হইল, "আর কতদূর?" জ্ঞানী-পুরুষ কহিলেন,—"যখন আমার চক্ষু ছিল, তখন এই পথে আসিয়াছি। এখন আমার দশা দেখ; পথ চিনিতে পারি না। তোমরা নিজে দেখিয়া লও।" খাদ্য সামগ্রী ফুরাইল। সৈন্য সামন্ত অনেক বিনষ্ট হইল। ফিরোজ অতি কষ্টে সামান্য দুই চারি জন অনুচরসহ প্রাণ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

আল্-খায়শোয়ান অতঃপর ফিরোজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন, এবং সৈন্য মণ্ডলী লইয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। সেই জ্ঞানীপুরুষের

পুত্রেরা রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন, সৈনিকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার সেই অতুল কীর্ত্তির কথা চিরস্মরণীয় রহিয়া গেল।

ধর্ম্ম প্রতিপালনে এবং জাতিকে সংস্থাপনে পরস্পরের সাহায্য করা বিষয়ে সকলগুণান্বিত উদারমতি লোকসমূহের বিশ্বাস ঠিক পুরাতন গল্পটির অনুরূপ; কেননা তাঁহারা অবগত আছেন যে, এই নশ্বর দেহ উৎসর্গ করার উপরই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল নির্ভর করে। যখন দেহাদিও বিনষ্ট হইবার জন্য তাঁহাদের আত্মা সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত, কেননা তাঁহারা সেই বৃদ্ধ জ্ঞানীপুরুষ এবং যুবাপুরুষের ন্যায় আশা করেন — তাঁহাদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ধর্ম্মের উন্নতি, ও সমাজের কল্যাণ-সাধন, এবং ঈশ্বরের প্রীতিলাভ করিবার জন্য যাঁহারা দেহ বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাদের আত্মা বিনষ্ট-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করিবে, অপ্সরগণের শরীর ভিতর প্রবেশ করিবে, সেই পবিত্র পরমাত্মার সহিত বাস করিবে, এবং অনন্ত আকাশে সুখ স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে, সসম্মানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। ঈশ্বর কহিয়াছেন, "সত্যের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে তোমরা মৃত বলিয়া কখনই মনে করিবে না; বরং তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রভুর সহিত জীবিত বাস করিতেছেন, এবং ঈশ্বরের বদান্যতা উপভোগ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন।"—ইত্যাদি (কোরাণ, তৃতীয় অধ্যায়।)

ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে ওহোদ ও বদরযুদ্ধে যাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের নশ্বর দেহ পচিয়া গলিয়া ধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা অবিনশ্বর, কেননা তাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণে দেহ নষ্ট করিয়াছেন।

আমাদের প্রেরিত পুরুষ যখন পবিত্র মক্কাভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে প্রস্থান করিলেন, তখন তিনি বিশ্বাসী শিষ্যমণ্ডলীকে দেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অনুগামী হইতে আদেশ প্রচার করিলেন। তদনুসারে কয়েক-জন দেশান্তর গমনের জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্তু আর সকলে নানা বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল। কেহ শিশু সন্তানসন্ততির কথা, কেহ বৃদ্ধ মাতাপিতা ভাইবন্ধু অথবা সুন্দরী স্ত্রীর কথা, কেহবা গৃহের কথা, কেহ সঞ্চিত ধন অথবা ব্যবসা-হানির কথা ভাবিয়া মনে দ্বিধা করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর আমাদের প্রেরিত পুরুষের প্রতি কোরাণের এই বচনটি প্রেরণ করিলেন,—"বল, যে যদি তোমাদের পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাইবন্ধু, স্ত্রীপরিবারে, অথবা

তোমাদের সঞ্চিত ধন, ব্যবসাবাণিজ্য, ঘরদুয়ার প্রভৃতি ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রেরিত সন্দেশবহ ও ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম, এ সকল অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তাহা হইলে যাবৎ ঈশ্বর তোমাদিগের প্রতি তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান না করেন তাবৎ অপেক্ষা কর,—কেন না, অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করেন না।" (কোরাণ, তৃতীয় অধ্যায়)। প্রেরিত পুরুষ ঈশ্বরের এই প্রত্যাদেশ যখন মক্কাবাসিগণের নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমন করিল। কেবল দুর্ব্বল বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিগণ পথের দীর্ঘতা ও খাদ্যদ্রব্যের অভাব হেতু আসিতে পারিল না, তাহারা অপূর্ণ আশা লইয়া স্বদেশেই বাস করিতে লাগিল।

এদিকে মক্কাবাসী বিধর্ম্মীগণ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, প্রহার করিয়া, হত্যা করিয়া—নানা রূপে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। অগত্যা তাহারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, এবং প্রেরিত পুরুষের নিকট পত্র লিখিয়া আপনাদের দুর্দ্দশা নিবেদন করিল। এই সময়ে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের প্রতি এই প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিলেন,—"কেন তোমরা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতেছ না, কেন তোমরা সেই দুর্ব্বল প্রপীড়িত নরনারী এবং বালক বালিকার উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করিতেছ না, যাহারা বলিতেছে, 'হে পরমেশ্বর, এই অত্যাচারী রাক্ষস পরিপূর্ণ নগর হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর, আমাদিগের মধ্যে একজন রক্ষাকর্ত্তা প্রেরণ কর আমাদিগকে একজন আশ্রয়দাতা দাও'!" [কোরাণ, ৪র্থ অধ্যায়]

এতদনুসারে প্রেরিত পুরুষ মক্কানগরীর বিধর্ম্মীগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বদর্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যখন দুই দল নিকটবর্ত্তী হইয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল, তখন আন্সার, অর্থাৎ সাহায্যকারীগণ অগ্রসর হইলেন দেখিয়া বিধর্ম্মীরা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমাদের সঙ্গীগণকে আমাদিগের মধ্যে প্রেরণ কর।" প্রেরিত পুরুষ কহিলেন,—"হে হাসেম-পুত্রগণ, তোমাদের প্রেরিত পুরুষের সাহায্য করা তোমাদের এখন অবশ্যকর্ত্তব্য।" তদনুসারে প্রেরিত পুরুষের খুল্লতাত হামজা, আলি এবং আবু ওবায়দা প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া বিধর্ম্মীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রেরিত পুরুষের পক্ষে প্রায় ৭০ জন মোহাজেরীণ, অর্থাৎ "দেশান্তরিত" ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই হয় পুত্র, না হয় পিতা অথবা ভ্রাতা, কেহ না কেহ বিধর্ম্মীদিগের

মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা স্বীয় অথবা প্রিয়পরিজনের মৃত্যুভয়-বিরহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কেন না তাঁহারা জানিতেন যে, এইরূপ কার্য্যের উপরই তাঁহাদের ধর্ম্মের ও বিশ্বাসী ভ্রাতৃমণ্ডলীর কল্যাণ নির্ভর করে, এবং ইহাই প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবহন, ও ঈশ্বরের সন্তুষ্টিসাধন।

এইরূপে ওহদযুদ্ধে যখন বিশ্বাসী শিষ্যমণ্ডলী পরাভূত হইয়া গেলেন, এবং প্রেরিত পুরুষ মুষ্টিমেয় অনুচরমাত্র সহ অবশিষ্ট রহিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "আজ যে আমাকে সাহায্য করিবে, এবং আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ-পাত করিবে, স্বর্গদ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত।" তৎক্ষণাৎ তিনজন আন্‌সার অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিধর্ম্মী শত্রুর তীরের মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রেরিত পুরুষের দেহ রক্ষা করিতে ক্রমে তিনজনই পতিত হইলেন। তাঁহারা আপন প্রাণ আপনার হস্তে বলিদান করিলেন, কেননা তাঁহারা জানিতেন যে প্রেরিত পুরুষের জীবনের উপর ধর্ম্মের ও সমাজের মঙ্গল সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে; এবং প্রেরিত পুরুষ যে মরণের ভয়ে অথবা জীবনের সাধে তাঁহাদিগকে প্রাণ দিতে বলিয়াছিলেন, এমত নহে, তখন ধর্ম্মের অত্যন্ত শৈশবাবস্থা, এবং ইস্‌লামের পবিত্র বিধানসমূহ তখনো সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয় নাই বলিয়াই। "আজ তোমার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল, এবং আজ তোমার প্রতি আমার বদান্যতা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইল—" ঈশ্বরের এই প্রত্যাদেশ যখন অবতীর্ণ হইল, তখনই প্রেরিতপুরুষ কহিলেন, "আমি আমার মৃত্যুর আহ্বান শ্রবণ করিয়াছি।" শিষ্যেরা কহিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ, আমাদের বড় সাধ যে আপনি আপনার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে শেষ দিবস পর্য্যন্ত বাস করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন,—যাহাতে তাহারা আপনার সঙ্গলাভে উন্নতিলাভ করিতে পারে।" প্রেরিতপুরুষ কহিলেন,—"আমরা সকলেই ঈশ্বরের এবং তাঁহাতেই আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। ঈশ্বর তাঁহার বন্ধুবর্গকে পৃথিবীতে অমরত্ব প্রদান করেন নাই।" অতঃপর তিনি কহিলেন, "আমি প্রেরিত-ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর নিকট প্রত্যাগমন করিতে উৎসুক হইয়া আছি।"

ইহার পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, সত্বরই মৃত্যুর দ্বার দিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবগত হও যে প্রেরিত পুরুষেরা, তাঁহাদিগের বংশাবলী, শিষ্য ও অনুচরবৃন্দ, জ্ঞানী ও দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী, সকলেই আত্মা উৎকর্ষিত হইলে দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁহারা দেহকে আত্মার কারাগার স্বরূপ বিবেচনা করেন। আত্মা যতদিন উৎকর্ষ লাভ না করে, ততদিন সে দেহকে যত্ন করে, ভালবাসে, কিন্তু একবার উন্নত ও মার্জ্জিত হইলেই দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের দার্শনিক ব্রাহ্মণেরা মৃতদেহ যেরূপ দাহ করেন, তাহাতে এই তত্ত্ব সম্যক্ সমর্থন করে। * তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ডিম্বের সহিত পক্ষিশাবকের অথবা ভ্রূণাচ্ছাদন চর্ম্মের সহিত ভ্রূণের যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মারও সেই সম্বন্ধ। ধাত্রী-প্রকৃতির যত্নে যখন পক্ষিশাবক ডিম্বের ভিতর অথবা ভ্রূণ চর্ম্মের ভিতর পূর্ণ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখন শাবকটি বা বালকটি নিরাপদ হইলেই, সে ডিম্ব ভাঙ্গিলে বা চর্ম্ম ছিন্ন হইলে প্রকৃতি আর গ্রাহ্য মাত্রও করে না। আত্মা ও দেহের সম্বন্ধও সেইরূপ। দেহের জন্য আত্মা সতর্ক থাকে, দেহকে যত্ন করে ও ভালবাসে, যতদিন সে বুঝিতে না পারে যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র একটি অস্তিত্ব তাহার নিশ্চয়ই আছে, এবং এই দেহ-নিহিত অস্তিত্ব অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠতর, চিরস্থায়ী, অধিকতর আনন্দময়, এবং সুন্দর।

যখন কোন একটি স্বতন্ত্র আত্মা পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার সূক্ষ্ম অবয়ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, সে যখন বিস্মৃতির গভীর নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করে, এবং বুঝিতে পারে যে এই বাহ্যজগতে সে ক্ষণিক নির্ব্বাসিতমাত্র হইয়া রহিয়াছে, ও এই বাহ্য বস্তু-সাগরের মধ্যে, এই ভৌতিক-কষের গহনবনের অভ্যন্তরে পথহারা হইয়া, জড়সাংসারিকের দাসত্বে নিয়োজিত হইয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুপ্রবাহের চাক্‌চিক্যে প্রতারিত হইয়া সে প্রকৃতির নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যখন ইহার সত্বের যাথার্থ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং সেই সত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, যখন সে তাহার আধ্যাত্মিকতা বাহ্যবস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে ধারণা করিয়া তাহার স্বর্গ বৈচিত্র্য এবং প্রতিভার উল্লাস উপভোগ করে, আর সেই মহান সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব মহিমা, নির্ম্মল আলোক, সেই অতুলনীয় অপার সুখ এবং আনন্দ প্রত্যক্ষ

---

* আরবীয় দার্শনিকেরা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে কি চক্ষে দেখিতেন, ইহা তাহার একটি দৃঢ় প্রমাণ। সং সং।

করিতে সক্ষম হয়, তখন ঈশ্বরের তুষ্টিবিধান, ধর্ম্মের কল্যাণ এবং সমাজের হিতসাধনার্থ তাহার পক্ষে এই নশ্বরদেহ বিনষ্ট করিয়া প্রস্থান করা অত্যন্ত সহজ বলিয়া বিবেচিত হয়।

হজরত মূসা, ঈসা প্রভৃতির ন্যায় সকল প্রেরিত পুরুষই আত্মার অমরত্বে এবং মৃত্যুর পর আত্মার সুখকর অবস্থায় বিশ্বাসস্থাপন করিতেন।

হজরত মূসা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে প্রজাগণ, বৎসতরকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়া সত্য সত্যই তোমরা আপনাপন আত্মার অপকার করিয়াছ। অতএব তোমরা সকলে তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে ধাবমান হও, এবং আপনাদিগকে সংহার কর। কেননা, সৃষ্টিকর্ত্তার চক্ষে ইহা তোমাদের শ্রেয়স্কর কার্য্য।" [কোরাণ, ২য় অধ্যায়]—অর্থাৎ তরবারি দ্বারা তোমাদের দেহ বিনষ্ট কর, কেননা তরবারি আত্মার কিছুই করিতে পারে না। হজরত মূসা যখন পর্ব্বত-প্রবাসে ছিলেন, তখন প্রজারা বৎসতর পূজা করিয়া বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহারা সত্যপথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। যখন হজরত মূসা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, যাহারা তাঁহার শ্রুতিসমূহ দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাই কেবল বৎসতর পূজা করে নাই, আর যাহারা পূর্ব্বের অজ্ঞানতাময় ভ্রান্ত শ্রুতির বশবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহারাই বৎসতর পূজা দ্বারা আত্মার অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তখন তিনি ভাবিলেন যে যদি শেষোক্তেরা বাঁচিয়া থাকে; তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহারা তাঁহার ধর্ম্মের শ্রুতির এবং বিধানাবলীর নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অনর্থপাত করিতে পারে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে ইহাদিগকে ইস্রায়েলের বংশধরদিগের বাসস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত; এবং ঈশ্বরও তাঁহার এই অভিমত সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন, কেননা ইহাতে সাধারণের সমূহ উপকার হইবে। তদনুসারে হজরত মূসা তাহাদিগকে কহিলেন—"তোমাদের যদি ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যাহাদিগের প্রতি তোমরা অত্যাচার করিয়াছ, তাহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রতিদান অর্পণ কর; তোমাদের দানপত্র লিখিয়া ফেল, শবাচ্ছাদন বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্তুত হও, এবং প্রার্থনামন্দিরে গমন করিয়া ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা কর, এবং তাঁহার ক্ষমা কিম্বা দণ্ডের জন্য প্রার্থনা কর।" অতঃপর যাহারা বিশ্বাস

করিত যে দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মার পক্ষেই মঙ্গল, তাহারা আগ্রহ সহকারে এবং যাহারা এই সকল শাস্তির কথা গ্রাহ্য করিত না, তাহারা অনিচ্ছার সহিত এই আদেশ প্রতিপালন করিল। তখন যাহারা বৎসতর পূজার পাপ হইতে বিমুক্ত ছিল, হজরত মুসা তাহাদিগকে উন্মুক্ত তরবারি লইয়া নির্দ্দয়চিত্তে সেই বৎসতর-পূজাপাপনিমগ্ন ব্যক্তিগণকে হত্যা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন *। তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই আদেশ পালন করিল, কেন না তাহারা অবগত ছিল যে এইরূপ আজ্ঞাধীনতার উপর তাহাদের আত্মার কল্যাণ নির্ভর করে। তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই ভ্রাতা পুত্র অথবা আত্মীয় বন্ধু কেহ না কেহ সেই নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালনে তাহারা নিরস্ত হয় নাই, কেন না, তাহারা জ্ঞাত ছিল যে, এইরূপ দেহের বিনাশেই তাহাদের আত্মার কল্যাণ, ধর্ম্মের মঙ্গল, অবশিষ্ট ভ্রাতাগণের উপকার, হজরত মুসার আজ্ঞাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের সন্তুষ্টিসাধন।

আবদুল্লা আল্-মামুন সোহ্রাওয়ার্দী।

ধর্ম্ম এবং শিক্ষা। †

ধর্ম্ম এবং শিক্ষা, এই দুইটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আজ শুভ মুহূর্ত্তে আমরা সমবেত হইয়াছি। বহুদিন হইল, আমাদের সমাজ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং অধুনা এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার নূতন উন্নতির পথে তুলিয়া দিতে হইলে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এক্ষণে একমাত্র ধর্ম্ম ও শিক্ষা এতদুভয়ের সুযোগ্য সম্মিলনেই সেই অসাধারণ শক্তির উৎপত্তি হইতে পারে; এবং সেই ধর্ম্ম ও শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধনে আজ যখন আমরা সচেষ্ট হইয়াছি, তখন ভবিষ্যৎ শুভ বলিয়া সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

শিক্ষা আমরা কাহাকে বলি? যাহা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, তাহাই

---

* বাইবেল, এক্সোডাস্, ৩২, ২৮। মুসা লেবি অর্থাৎ যাজকবংশীয় ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং সেই দিবস ৩০০০ লোক নিহত হয়।

† বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে দৌলতপুর (খুলনা) ছাত্রসমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

শিক্ষা। আবার জ্ঞান কাহাকে কহে? যাহা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার, সৎ ও অসতের প্রভেদ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাই ত জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্ম, এই দুইটি শব্দের মধ্যে অর্থের কোনই বিভিন্নতা নাই। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের কি উপকার সাধিত হয়? ইহার একমাত্র উত্তর, সমাজ-বন্ধন। মানুষ সামাজিক প্রাণী, সকলে একত্র হইয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক। প্রশ্ন হইতে পারে, তা মিলিয়া মিশিয়া থাকিলেই ত হয়, তাহার জন্য আবার ধর্ম্মের একটা কড়া বাধাবাধি কেন?—মানুষের ভিতরে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে, একটি সুপ্রবৃত্তি, অপরটি কুপ্রবৃত্তি। এই সুপ্রবৃত্তিই মানুষকে সামাজিক প্রাণী করিয়া তুলে, মিলিয়া মিশিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবার জন্য সচেষ্ট করে; কিন্তু কুপ্রবৃত্তিগুলি আসিয়া ছলনা করে, বিঘ্ন জন্মায়, সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে। তাই কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া সুপ্রবৃত্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্যই ধর্ম্মের এত বাঁধাবাঁধি। ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, কুপ্রবৃত্তি দমন করা; গৌণ উদ্দেশ্য, সুপ্রবৃত্তির স্ফুর্ত্তি বিধান করিয়া মানুষকে সুখী করা।

এক্ষণে এই কুপ্রবৃত্তি হইতে সুপ্রবৃত্তির প্রভেদটুকু আয়ত্ত করিয়া লইয়া, কোন্‌টিকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, কোন্‌টিকে দমন করিতে হইবে, সেইটি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলাই হইল ধর্ম্মকর্ম্ম করা; আর বুঝিতে না পারিয়া বিপরীতাচরণ করাই হইল অধর্ম্ম করা। কিন্তু এই ভালমন্দ বিচার-টুকু করিবার জন্য একটু শক্তি আবশ্যক; সকলে ত পারে না, যে পারে, সেই ধার্ম্মিক। সেই শক্তিটুকু লাভ করিতে হইলে জ্ঞান চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞান অর্থে সৎ ও অসতের বিভিন্নতা উপলব্ধি করা। সুতরাং জ্ঞানই হইতেছে ধর্ম্ম। জ্ঞানলাভ না করিলে ধর্ম্মলাভ করা যায় না। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে শিক্ষার আবশ্যক, সুতরাং ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন।

জ্ঞানের মহিমাকীর্ত্তন করিতে যাইয়া আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়াছিলেন, "তোমরা জ্ঞান অর্জ্জন কর, কেননা জ্ঞানী ব্যক্তিগণই বাস্তবিক পুণ্যবান। যাহারা জ্ঞানের কথা আলোচনা করে, তাহারা জগৎপিতারই গুণকীর্ত্তন করে, এবং যাহারা জ্ঞান অনুসন্ধান করে, তাহারা তাঁহাকেই লাভ করে। জ্ঞান আমাদের স্বর্গপথে প্রদীপের, মরুশ্মশানে বন্ধুর, নির্জ্জনে প্রিয় সহচরের, এবং নির্ব্বাসনে পরম সুহৃদের কার্য্য করে। ইহা সুখ শান্তির পথপ্রদর্শক, দুঃখ দারিদ্রের অবলম্বন, বন্ধু সমাজের অলঙ্কার, এবং শত্রুগণের

মধ্যে রক্ষা-কবচ। জ্ঞানী-ব্যক্তি জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, পরাক্রান্ত সম্রাটগণের বন্ধুত্ব লাভ করেন, এবং পরকালে অনন্ত শান্তির অধিকারী হয়েন।" হজরত শিষ্যবর্গকে জ্ঞানানুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে গমন করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া কহিতেন,—"স্বদেশের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ স্বদেশ-প্রেমিকের শোণিত অপেক্ষা পণ্ডিতের ব্যবহার্য্য মসী অধিকতর পবিত্র।"

ইস্লামের উজ্জ্বলতম প্রদীপ বীর-কেশরী মহাপুরুষ আলী (রাজিঃ) উপদেশ দিয়াছেন—"জ্ঞানান্বেষণে গৃহত্যাগী মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকে লাভ করিবার পথেই ভ্রমণ করেন। যাঁহারা জ্ঞানের জন্য দেশ ভ্রমণ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি একদণ্ড বসিয়া একাগ্রচিত্তে সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা করেন, তাহা হইলে ৭০ বৎসরের উপাসনা অপেক্ষাও তাঁহার অধিক পুণ্য সঞ্চিত হয়। সহস্র রাত্রি একাদিক্রমে দণ্ডায়মান থাকিয়া শুধু উপাসনা করা অপেক্ষাও মুহূর্ত্তকাল বিজ্ঞান ও তত্ত্বকথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা সমধিক শ্রেয়স্কর।"

কোরাণের মূলমন্ত্রই "জ্ঞান"। সুতরাং জ্ঞানই ধর্ম্ম। যে সময়ে মুসলমান-সমাজ এই জ্ঞানের আদর করিতে শিখিয়াছিল, তখনই তাহারা উন্নত ছিল। আজ আমাদের সমাজে আর সে আদর নাই, তাই আজ আমরা গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। এই পতিত মুসলমানেরাই ত এক সময়ে পৃথিবীর শিক্ষাগুরু বলিয়া পূজিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কখন? যখন জ্ঞানই ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের প্রচার ধর্ম্মের প্রচার বলিয়া পরিগণিত ছিল।

মুসলমানজাতির অতীত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিলে, আমাদের আধুনিক অবস্থা কত শোচনীয়, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। সেকালে জ্ঞানালোচনাই মুসলমানগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ছিল। হজরতের মৃত্যুর দুইশত বৎসরের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, এমন কি সুদূর ইউরোপের স্পেন প্রদেশ পর্য্যন্ত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কর্দ্দোভা, গ্রানাডা, কায়রো, আলেকজেন্দ্রিয়া, বোগদাদ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী মহা-নগরীতে যে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা কি করিয়া এহেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করিল! এক কর্দ্দোভা নগরেই ৭০টি সাধারণ লাইব্রেরি ছিল—আর বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন লাইব্রেরীতে বিশলক্ষ পুস্তক ছিল—আজ যে ইউরোপ, আমেরিকা এতবড় উন্নত হইয়াছে—আছে ক ত,

তাহাদের কোন মহানগরীতে এমন বড় বড় এতগুলি লাইব্রেরী আছে? আর মুসলমানদের ছিল, কোনও কালে ছিল, আজ প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ছিল!

স্ত্রীলোকেরা তখন চতুর্দ্দেষ্টিত প্রাচীরের মধ্যে অর্গলবদ্ধা থাকিতেন না। রীতিমত উচ্চশিক্ষাদ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া তাঁহারা যশঃস্বিনী হইতেন, সুতরাং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিতা হইতেন। এখন আমরা নারীজাতিকে গৃহকোণে লুকাইয়া রাখি, বহুমূল্য মণিকাঞ্চনের ন্যায় সাবধানে, অথবা ভঙ্গুর কাচদ্রব্যের ন্যায় যত্নে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখি; শিক্ষা দিই না, অজ্ঞান করিয়া রাখি, কোন ক্রমে মেফ্‌তাহুল জেন্নাত খানা পড়াইয়া, ধর্ম্মের বাহ্যিক নিয়ম কানুনগুলি সাড়ম্বরে ঘড়ির কলের ন্যায় পালন করিয়া যাইতে অভ্যস্ত করিয়া দিই, এবং মনে করি, ইহাই যথেষ্ট, স্ত্রীলোকের পক্ষে আর অধিক আবশ্যক কি? কিন্তু তাহাতে কি মানসিক স্ফূর্ত্তি জন্মিতে পারে? হৃদয় কি বিকসিত হইতে পারে? ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কি তাহারা বাস্তবিক ধার্ম্মিক হইতে পারে? কখনই নহে। না বুঝিয়া সুঝিয়া কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম পালন করিতে করিতে মন ক্রমে কঠিন হইয়া উঠে, হৃদয়বৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়; অবশেষে তাহারা না করিতে পারে, এমন কর্ম্মই থাকে না।

যখন মুসলমানদিগের মধ্যে নারীজাতির জন্য স্বতন্ত্র কলেজ ছিল, যখন স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত একযোগে জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, যখন মুসলমান-রাজ্যে স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-ঐতিহাসিক, স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী-দার্শনিক, স্ত্রী-বক্তৃ, এমন-কি স্ত্রী-চিকিৎসক পর্য্যন্ত দলে দলে বিরাজ করিতেন, যখন বিদুষী মহিলারা বিদ্বান পুরুষবর্গের সহিত স্বাধীনভাবে জ্ঞান আলোচনা করিবার জন্য সাধারণ জ্ঞানকেন্দ্রে সমবেত হইতেন, সহস্র সহস্র নরনারীর সমক্ষে উন্মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেন,—তখনই মুসলমানসমাজ বাস্তবিক উন্নত ছিল, তখনই মুসল-মানেরা পৃথিবীর শিক্ষাগুরু বলিয়া পূজিত হইতেন, তখনই মুসলমানেরা পৃথি-বীর কিয়দংশ শস্ত্রবলে এবং কিয়দংশ শাস্ত্রবলে জয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা ত আর আপনাপন অজ্ঞতাবশতঃ পুত্রকন্যাগণকে কুশিক্ষা দিয়া কুসংস্কারে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা লাভের মাথায় বজ্রাঘাত করিতেন না। তখন ত আর মাতৃগণ নয়নের মণি পুত্রটিকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ বিদেশে প্রেরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, তখন ত আর মাতৃগণ-

বাল্যকাল হইতে জুজুর ভয় দেখাইয়া সন্তানগণের চিত্ত দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেন না। তখন ত আর মাতৃগণ ভূপতিত ক্রন্দনশীল শিশুকে উঠাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভূমিতে সশব্দে পদাঘাত করিয়া, শিশুর চিত্তে ভয়ঙ্কর প্রতি-হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন না। তখনকার মাতৃগণ শিক্ষিতা ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, ধার্ম্মিক ছিলেন, কিরূপে সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, কিরূপে প্রথম হইতেই তাহাদের কুপ্রবৃত্তিগুলি দমন করিয়া সদ্বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিবিধান করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সম্যক্ অবগত ছিলেন; তাই তাঁহা-দের সন্তানেরা মানুষ হইতে পারিত; আমাদের এখনকার অজ্ঞানতামসাচ্ছন্না মাতৃগণের সন্তান সন্ততির ন্যায় পশু হইয়া যাইত না।

সে একদিন ছিল। কি শস্ত্রবলে, কি শাস্ত্রবলে, কি বিজ্ঞানবলে, কি ধর্ম্ম-বলে, মুসলমানজাতি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। সমস্ত জগত সে সুসভ্য, উন্নত, গৌরবান্বিত, তীব্র জ্যোতির্বিভূষিত মহাজাতির সম্মুখে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ে আভূতল অবনত হইত। আজ যে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানজাতির অমিত প্রভাবে আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই, তখন সে ইউরোপের অবস্থা কি ছিল? পৈশাচিক বর্ব্বরতা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে সে জাতি তখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। ধর্ম্মের নামে তাহারা না করিত, এমন দুষ্কর্ম্মই ছিল না। জীবন্ত মানুষকে ধরিয়া জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা ত তাহাদের নিত্যক্রিয়া ছিল। স্বাধীন চিন্তা এবং দর্শন বিজ্ঞান আদি শাস্ত্রচর্চ্চা ত ভয়ঙ্কর অপরাধের মধ্যেই পরিগণিত ছিল এবং কেহ তাহা করিলে বিধিমত দণ্ডিত হইত। বিজ্ঞা-নের অভিনব সত্যের আবিষ্কার করিয়া মহাত্মা গ্যালিলিও এবং কোপর্নিকাস ত পিশাচোচিত নির্দ্দয়তার সহিত নিহত হইয়াছিলেন, স্বনামধন্য পোপ গ্রিগরী দি-গ্রেট যাবতীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকে স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত না করিয়া ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সেই জাতি, সেই ইউ-রোপীয় খ্রীষ্টান বর্ব্বর জাতি আজ এহেন আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিল কি করিয়া? কে তাহাদিগকে সভ্যতা ও উন্নতির সরল গৌরবান্বিত পথ প্রদর্শন করিল? ইস্লাম। ইস্লামেরই পবিত্র আলোকে তাহাদের চিত্ত সর্ব্ব প্রথম আলো-কিত হইয়াছিল। যে নূতন জ্ঞানের প্রভাতসূর্য্য স্পেনের মুসলমান বিদ্যাচল-শিখরে প্রথম উদিত হইয়াছিল, সেই জ্ঞানসূর্য্যই ত আজ ইউরোপের মধ্যাহ্না-কাশে বিরাজ করিয়া তীব্র নির্ম্মল শুভ্রজ্যোতিতে পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম আজ প্রায় দুই সহস্র বর্ষ হইল পৃথিবীতে প্রচারিত হই-

য়াছে ; কিন্তু সভ্যতা ও উন্নতির পথ ত খ্রীষ্টানেরা দেখিতে পাইয়াছে সে দিন। সে ত আজ ৪০০ বৎসরও হয় নাই। এতদিন তাহারা কি করিতেছিল? অসভ্যতা ও বর্বরতার ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে পতিত হইয়া পরম নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। ইস্‌লাম যদি তাহাদিগকে সে সময়ে উদ্ধার না করিত, তাহা হইলে, খ্রীষ্টধর্ম এতদিন যে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, অন্ততঃ তাহারা আফ্রিকার নরখাদক অসভ্য জাতিতে পরিণত হইয়া পৃথিবী কলঙ্কিত করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুদীর্ঘ সহস্রাধিকবর্ষ ধরিয়া ত তাহারা খ্রীষ্টধর্ম ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কি তাহারা বিন্দুমাত্রও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? কখনই নহে ; বরং তাহারা দিন দিন অবনতির পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। আর যখন ইস্‌লাম তাহার অপরিমেয় অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া স্পেনে উপস্থিত হইল তখন তাহারা দলে দলে দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, এবং মোস্‌লেম জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্ন সঞ্চয় করিয়া, নূতন বিদ্যালাভ করিয়া, নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে, দুই তিন শতাব্দী মধ্যে তাহারা সভ্যজাতিরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। আধুনিক সভ্য খ্রীষ্টানজাতি ইস্‌লামেরই শিষ্য ধরিতে গেলে পরোক্ষে তাহারা ইস্‌লামেরই শক্তি দ্বারা সর্ব্বথা অনুপ্রাণিত। মধ্যযুগে মুসলমানেরা ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, জ্ঞান-প্রচার দ্বারা শিষ্যমণ্ডলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কেননা তাঁহারা তখন বুঝিয়া-ছিলেন, জ্ঞানপ্রচারে আর ইস্‌লাম প্রচারে কোন প্রভেদ নাই। ইস্‌লাম প্রচারের উদ্দেশ্য জ্ঞানপ্রচার দ্বারা মানবসমাজে সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধির উপায় বিধান করা। এই বাক্যের সারবত্তা যখন মোস্‌লেমগণের উপলব্ধ হইল, তখন ধর্ম্মপ্রচার শিথিল হইয়া পড়িল ; জ্ঞানপ্রচার প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। প্রথম যুগে ধর্ম্মপ্রচার প্রবলবেগে চলিয়াছিল। হজরতের মৃত্যুর শতবর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে ইউরোপের দূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত ইস্‌লামের মহাপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। কিন্তু তখন জ্ঞানের উৎকর্ষ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যোগী হইয়া তখন ইস্‌লামের সনাতন সত্য প্রচার দ্বারা শিষ্য সংগ্রহ করিতে হইত। আর সেরূপ উদ্যোগী হইয়া ইস্‌লামধর্ম্মপ্রচার করিতে হয় এখন, মুসলমানের এই শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন, ধর্ম্মহীন সমাজের মধ্যেই ; নহিলে, ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে শিষ্য সংগ্রহ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভিন্ন ধর্ম্মের বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে মোহিত হইয়া আধুনিক পণ্ডিত মুসলমানের

ধর্ম্মত্যাগ করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। জ্ঞানের প্রভাব এমনি প্রবল ছিল যে তখন উদ্যোগী হইয়া প্রচার করিবার আর কোন আবশ্যকই ছিল না। ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য জ্ঞান প্রচার দ্বারা সর্ব্বথা সিদ্ধ হইত। এবং সেই উপায়ে সমগ্র ইউরোপ তখন ইস্‌লামের পবিত্র জ্ঞানশক্তি দ্বারা পরাভূত ও দীক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। তাই আজ ইউরোপের এত গৌরব। শুধু খ্রীষ্টধর্ম্মে কি এতখানি করিয়া উঠিতে পারিত? কখনই নহে। যদি পারিত, তাহা হইলে প্রথম দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দী মধ্যে নিশ্চয়ই করিয়া ফেলিত। ইস্‌লামের ত আর অন্য পথপ্রদর্শক আবশ্যক হয় নাই। যেমন প্রচার, অমনি উন্নতি। খ্রীষ্টানেরা ইস্‌লামের শক্তিই আয়ত্ত করিয়া আজ গৌরবান্বিত। আমরা যে আজ মুসলমান বলিয়া এত বড়াই করি, আজ যে ইস্‌লাম লইয়া আমাদের এত অহঙ্কার, এত বক্‌বক্‌রণ, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের আর তাহা সাজে না। আজ যাহারা পৃথিবীর মধ্যে উন্নত জাতি, আজ যাহারা বিস্তার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীজয় করিয়া ফেলিয়াছে, আজ আমরাই জ্ঞান লাভের জন্য যাহাদের শরণাপন্ন হইতেছি—তাহারাই বাস্তবিক ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারাই ইস্‌লামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহারাই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। আর আমরা, মুখে মাত্র মুসলমান বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়া, বাহিরে দুই চারিটি মোটামুটি গোঁড়া মুসলমানের সামাজিক আচার মাত্র অতি সাবধানে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াই নিশ্চন্ত মনে আমাদের কর্ম্মহীন ইতর-জীবন যাপন করিয়া যাইতেছি। আমরা মুসলমান নহি, আমরা ইস্‌লামের ঘোরকলঙ্ক। আমরা ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী নহি, আমরা অধর্ম্মাবলম্বী। আমাদিগকে মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়া আমরা মিথ্যা কহি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কেন এমন হইল? যাহাদের পিতামহ প্রপিতামহেরা এই ইস্‌লামেরই পবিত্র শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, তাহারা আজ কেন এহেন জঘন্য দশায় নিপতিত হইল? সেই ইস্‌লাম অদ্যাপি ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান, আমরাও অদ্যাপি ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিয়মিত রূপে পালন করিয়া যাইতেছি; তবে কেন আজ আমাদের অন্তর হইতে তাহার পবিত্র শক্তির প্রভাব তিরোহিত হইল? ইহার উত্তর, একমাত্র শিক্ষার অভাব। আবার

প্রশ্ন হইতে পারে, এ অভাব ত ছিল না, এ অভাব আসিল কোথা হতে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ঐতিহাসিকের শরণাপন্ন হইতে হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে মুসলমানজাতি যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছিল, তখন তাতার এবং খ্রীষ্টানজাতি উপর্যুপরি কয়েকবার তাহার অভ্রভেদী মস্তক ভীষণ রূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর নৃশংস হালাকু বোগদাদ "মগলী" ছারখার করিয়া, পণ্ডিত মণ্ডলীকে হত্যা করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ পরিপূর্ণ লাইব্রেরীগুলি ভস্মীভূত করিয়া মোস্লেম-সভ্যতা ও উন্নতির যেরূপ ভয়াবহ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জাতির অদৃষ্টে সেরূপ আর কখনো ঘটে নাই। সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা ধর্ম্মমদে উন্মত্ত ইউরোপীয় খৃষ্টানেরা বার বার ক্রুসেডচ্ছলে বিধাতার অভিশাপের ন্যায়, মহামারীর ন্যায়, মোস্লেমরাজ্যে পতিত হইয়া রাজ্য, ধর্ম্ম, সভ্যতা, বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতির সমূহ ক্ষতি ঘটাইয়াছিল। সর্ব্বশেষে স্পেনের অসভ্য বর্ব্বর গথ্ জাতির ভীষণ আক্রমণে বিলুপ্ত-বিভব মুসলমানজাতি যখন নিরবলম্বনে আফ্রিকার উপকূলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তখন স্পানিশ খ্রীষ্টানেরা মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, পুস্তকাগার ভস্মীভূত করিয়া, সভ্যতা ও উন্নতির চিহ্ন পর্য্যন্ত স্পেন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল।

উপর্য্যুপরি এতগুলি ভীষণ আঘাত মুসলমানজাতি সহ্য করিতে পারিল না। যখন রাক্ষসের কবলে পড়িয়া শাস্ত্রবল অপহৃত হইল, তখন সব গেল। ভগ্নহৃদয় মুসলমানেরা পরে আবার উন্নতি লাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করে নাই, এমন নহে; এবং একটু সফলতা লাভও করিয়াছিল; কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী। যে প্রাণ-প্রদায়িনী মহাশক্তি অবলম্বন করিয়া তাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল, সহসা অচিন্তাপূর্ব্ব অতি-প্রবল নিষ্ঠুর আঘাতে সে শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাই মুসলমানজাতি আর উঠিতে পারিল না। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত অস্তিম আলোক বিকীর্ণ করিয়া আজ প্রায় ২।৩ শত বর্ষ হইল, মুসলমানজাতি একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যখন আসিয়াছিল, তখন ত তাহার গৌরব-প্রদীপের তৈলটুকু নিঃশেষ হইয়া প্রায় শেষ বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। আর বিশেষতঃ ভারতে মুসলমানেরা শস্ত্রবল ও ধর্ম্মবল আনিয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্যাবল আনে নাই। যে জ্ঞানশক্তির প্রভাবে প্রতীচ্য-পৃথিবী আলোকিত হইয়াছিল,

সে শক্তি ভারতীয় মুসলমানের হৃদয়ে কখনো ছিল না, ছিল কেবল তাহাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের অক্ষয় জ্যোতির একটি ক্ষীণ রশ্মি মাত্র। তাহার প্রভাবে ৬০০ বৎসর তাহারা ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

ধরিতে গেলে ভারতের মুসলমানেরা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাখা সম্ভূত। ইস্লামের যাহা প্রাণ, সেই জ্ঞানচর্চ্চার অবারিত-স্রোত ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনো প্রবাহিত হয় নাই। যেটুকু হইয়াছে, তাহা নীরবে, ধীরে, অতিক্ষীণ প্রাণে। ইস্লামের প্রধান লীলাক্ষেত্র পশ্চিম এসিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং স্পেনে যেরূপ দুন্দুভিনির্ঘোষে জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল, যেরূপ প্রবলবেগে সভ্যতা ও উন্নতিস্রোত প্রবাহিত হইয়া বিদ্যারাজ্যে সম্পূর্ণ নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল ভারতে তেমন করে নাই। তাই ভারতীয় মুসলমানশক্তি অন্তরে অন্তরে হীনবল হইয়া অবশেষে আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কি ইউরোপে, কি আফ্রিকায়, কি পশ্চিম এসিয়ায় মুসলমান-শক্তি আপন মজ্জাগত দোষেই বিনষ্ট হইয়াছিল, এমন নহে। এবং বাহির হইতে আসুরিক শক্তি যদি তাহার উপর করাল আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় কখনো মুসলমানশক্তি বিনষ্ট হইত না, বিরুদ্ধবাদী খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকেরাও বাধ্য হইয়া একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে সকল স্থানে মোস্লেমশক্তির উচ্ছৃঙ্খল বিজাতীয় বর্ব্বর কাণ্ডজ্ঞানহীন অসুরপ্রকৃতি দস্যুদলের মহাপ্লাবনের তাড়নাতেই ভূমিস্যাৎ হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতা যে কোন্ মহদুদ্দেশ্য সাধনমানসে ইস্লামের উন্নত শিরে এতগুলি বজ্র কৌতুকভরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বুঝি মুসলমানেরা উন্নতির প্রবলতায় আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়াছিল, তাই তাহার এহেন কঠিন শাস্তি বিধান করিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানেরা আপনা আপনিই মজিয়াছে। যে জ্ঞান লইয়া আসিয়াছিল, তাহার দ্বারা ৬০০ বৎসর কাটাইয়া দিল, আর কতদিন তাহাতে চলিবে? উৎকর্ষের অভাবেই তাহারা ডুবিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে শিক্ষার অভাবে আজ আমরা এহেন দুর্দ্দশা-গ্রস্ত, সে অভাব পূর্ব্বে ছিল না। ভারতবর্ষে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত মুসলমানেরা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের আর উৎকর্ষ করিতে মনোযোগী হইল না, তাই ভারতবর্ষে কালক্রমে শিক্ষার ভয়ানক অভাব হইয়া পড়িল। আর অন্যত্র বিধাতার অভিশাপে, ঐশ্বর্য্য-গরিমায় আত্মহারা মোস্লেমগণের শান্তি-

স্বরূপ রাক্ষসেরা আসিয়া অতি নিষ্ঠুর উপায়ে সে অভাব ঘটাইয়া দিল। কিন্তু সে উপায় দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানরাশির যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কি আর পূরণ হইবে। সে সব থাকিলে যে আজ পৃথিবীর উন্নতিস্রোত বহুশতাব্দী অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিত।

যাহা হউক, যাহা গিয়াছে, তাহার জন্য শুধু অনুতাপে কোন ফল নাই। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য সেই অনুষ্ঠানে মনোযোগী হওয়া, যাহা দ্বারা সেই লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, মোসলেমগণ আজ যদিও অবনত, কিন্তু ইসলাম সগৌরবে অদ্যাপি আপন মহদাদর্শ লইয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। ইসলামের শক্তি এক্ষণে পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত জাতির অন্তরে অন্তরে রাজত্ব করিতেছে, আমরা ক্ষণিক অবসাদভরে তাহাকে অবহেলা করিয়াছিলাম, সেই অবসরে অন্যান্য জাতি তাহাকে লুফিয়া লইয়াছে। লউক, কিন্তু ইসলাম আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। আজ যদি আমরা আমাদের এই বহুশতাব্দীব্যাপী মোহনিদ্রা হইতে স্ফূর্ত্তির সহিত গাত্রোত্থান করিয়া অমিত বিক্রমে পুনরায় জ্ঞানচর্চ্চায় মনোযোগী হই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের ইসলাম আবার আমাদেরই হৃদয়ের মাঝখানে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার আমরা পৃথিবীর শিক্ষা-গুরুর সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ যাহারা আমাদিগকে পরিহাস করিতেছে, আমাদের ধর্ম্মের প্রতি বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়া মর্ম্মে ব্যথা দিতেছে, আজ শস্ত্রবলে এবং শাস্ত্রবলে যাহারা আমাদিগকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত করিতেছে, এক্ষণে দেখিতে পাইব, তাহারাই আবার আমাদিগের পদানত হইয়া আমাদিগকে পূজা করিতেছে। তাহা হইলে সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সেই সোনার দিন আবার ফিরিয়া আসিবে। হায়, বিধাতা কবে আমাদের এ সুখস্বপ্ন সফল করিবেন, কবে আমরা আবার জগতকে জ্ঞান শিখাইব, কবে আমরা আবার মানুষ হইব, কবে আমরা আবার সত্য সত্যই ইসলামধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সদম্ভে প্রচার করিতে পারিব।

সে শুভদিন খুবই নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, যদি আমরা আমাদের যথা সর্ব্বস্ব জ্ঞানের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিই। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানের জন্য ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একবার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইয়াছিল? লাভের মধ্যে ত দেখিতেছি আমাদেরই এই শোচনীয় অবনতি। কিন্তু না, তাহা নহে। মানুষ দিবসে

কাজ করে, আবার রাত্রে ঘুমায়। তেমনি প্রত্যেক বিষয়ের যেমন উত্তেজনা আছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি অবসাদ আছে। আমাদের আজিকার এই নিদ্রার যুগ, ইহাও পরোক্ষে আমাদের গৌরবের বিষয়, আমরা কাজ করিয়াছিলাম এক্ষণে বিশ্রাম করিতেছি। কত প্রাচীন জাতি যে এক একবার পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া তাহার পর আবার চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, আর উঠে নাই; বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চিহ্ন মাত্রও নাই। কোথায় গেল আজ সেই জগতের অতি প্রাচীন মিসর রাজ্য, যাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের কথা অদ্যাপি উপকথার রাজ্যে অসম্ভব ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিতেছে। কোথায় আজ সেই গ্রীসের দর্শনবিজ্ঞানের অতুলনীয়তা! কোথায় আজ রোমের সেই জগতজোড়া মহাসাম্রাজ্য! রোম আজ মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্তু সে রাজ্য সে আর কোথায় পাইবে? উহাদের যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নহে। কিন্তু ইস্‌লামের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, ইস্‌লামের গৌরব বিলুপ্ত হয় নাই, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে আজও সে রাজত্ব করিতেছে, মানব সমাজকে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে।—ইস্‌লামের যাহা ছিল, সব আছে—কেবল আমরা নাই। আমরাই শুধু আজ ইস্‌লাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। কেননা আমরা নিদ্রিত।

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের ও নিদ্রা চিরনিদ্রা নহে—ক্ষণিক অবসাদ মাত্র। আমরা যদি একবার জাগিয়া উঠি, বিশ্বব্যাপী ইস্‌লাম আবার আমাদেরই হইবে। জ্ঞানচর্চ্চা ক্ষণিক পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিশ্রাম করিতেছিলাম, কিন্তু যদি আমরা হৃদয়ের দিকে একবার লক্ষ্য করি, তাহা হইলে এখনো শুনিতে পাই, অতীতের সে অপূর্ব্ব জ্ঞানতন্ত্রী হৃদয়মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছে। আমাদের সব আছে, একবার উঠিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, কি করিতে হইবে। করিতে হইবে এখন শিক্ষালাভ, শিক্ষার চর্চ্চা, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার উন্নতি। একমাত্র শিক্ষার দ্বারা ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মবিস্তার ও ধর্ম্মের উন্নতি হইবে। কেবল তুমুল উল্লাসে সভা সমিতি করিয়া, বক্তৃতা দিয়া এবং বক্তৃতা শুনিয়া বেড়াইলে কোনই ফল দর্শিবে না। আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেককেই স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব শিক্ষার কল্যাণে উৎসর্গ করিতে হইবে।

আজকাল আমরা বলিয়া বেড়াই, আমাদের সমাজ দরিদ্র, সেই জন্য

আমাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার নাই, কেননা, আজকালকার শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিস্তর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। স্বীকার করি, আজকালকার বিদ্যাশিক্ষা বহুব্যয়সাধ্য। কিন্তু একথা কিছুতেই স্বীকার করিব না যে আমরা দরিদ্র। মুসলমানসমাজ যদি দরিদ্র হইত তবে গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প কাগজের ব্যবসা এতদিন কোন্ কালে উঠিয়া যাইত। হিন্দু উকিলমণ্ডলীকে আজ বড় বড় ইমারতে বাস করিয়া এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুড়ি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া বেড়াইতে হইত না। ইঁহাদের এত অর্থ আসিল কোথা হইতে? গবর্ণমেণ্ট যে বৎসর বৎসর কোটী কোটী মুদ্রার ষ্টাম্প বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছেন,সে টাকা কাহারা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়? সব এই "দরিদ্র" নামধারী মুসলমানসমাজ! মোকদ্দমা করিয়া অর্থনাশ, সর্ব্বস্বনাশ মুসলমান ছাড়া কয়জন হিন্দুতে করিয়া থাকে? মুসলমানেরা যে টাকা মামলা মোকদ্দমায় উড়াইয়া দিয়া নিজের আত্মীয়গণের সর্ব্বনাশ করে, সে টাকা কি শিক্ষার কল্যাণে উৎসর্গ করিতে পারে না? একদিন এই সম্মিলনীর আর এক অধিবেশনে দাঁড়াইয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলাম আজ আবার এস্থলে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। শুধু মোকদ্দমা করিয়া নহে, খাইয়া এবং পাঁচ জনকে খাওয়াইয়া যথা সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিতে মুসলমানেরা গৌরব অনুভব করে। অভুক্তকে অন্নদান নিতান্তই পুণ্যকর্ম্ম, একথা শতবার স্বীকার করি, কিন্তু সে কাহাকে? আরবদেশ মরুভূমি, খাদ্য দ্রব্য বড় অপ্রচুল, তাই যাহার আছে, সে দরিদ্র অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাওয়াইবে, হজরত এই বিধান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে খাইতে পায় না কয়জন? খাদ্যদ্রব্য এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের দেশে ছড়ান রহিয়াছে যে, একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারিলেই আহার্য্য মিলিয়া যায়। ভিক্ষুকদিগের অধিকাংশই ত দেখিতে পাই আমাদের অপেক্ষাও পরিপুষ্টদেহ, বেশ মোটা সোটা, জোয়ান। তাহারা খাটিয়া উপার্জ্জন করে না, তবুও ভিক্ষা করিয়া সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক উপায় করে। এ প্রবৃত্তিটা মুসলমানের নিজস্ব নহে! বঙ্গদেশের অকর্ম্মণ্য [illegible] ইঁহাদের শিক্ষাগুরু। মুসলমানশাস্ত্রমতে পরদ্বারে চাহিয়া খাইবা[illegible] মার নাই। সুদ খাওয়া অপেক্ষাও ত কার্য্যক্ষম লোকের [illegible] খাওয়া হারাম। অথচ আমাদের সমাজ আদর করিয়া ইহাদিগকে খাওয়ায়। ইহাতে যে কি পুণ্য হয়, তাহা সেই অন্তর্যামিই জানেন। আমাদের দেশে খাওয়ানটা অভুক্ত অক্ষম লোকের মধ্যে নিবিদ্ধ নহে।

খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানটাই পুণ্যকর্ম্মে পরিগণিত। কিন্তু এতগুলি টাকা অনর্থক ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ না করিয়া শিক্ষার কল্যাণে ব্যয় করিলে অধিক পুণ্যের ভাগী হওয়া যায় না কি ?

আবার, আমরা দেখিতে পাই, সম-বেতন ভোগী হিন্দু ও মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারীর মধ্যে খরচ বেশী মুসলমানের। তাহার কারণ খাওয়া এবং পরায় ধুমধাম। অধিক দূর যাইতে হইবে না। একজন হিন্দু মাসিক ৫০৲ টি মাত্র মুদ্রা আয়ের দ্বারা ৫ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে ১০০০৲ সহস্র টাকা জমাইয়া ফেলিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্তির পথ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বিগুণ আয় সত্বেও একজন মুসলমান ঐ সময়ের মধ্যে ২০০০৲ সহস্র টাকা যে দেনা করিয়া ফেলিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তথাপি আমারা বলি, আমরা গরীব, ছেলে পড়াইবার জন্য টাকা পাইব কোথায় ?

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিক্ষাবিস্তারের জন্য আমাদের অর্থের অভাব নাই, কেবল বুঝিয়া সুঝিয়া, সে অর্থ অন্যায়রূপে ব্যয় না করিয়া শিক্ষার কল্যাণে নিয়োজিত করিলেই হইল। অর্থব্যয়ের স্রোত একদিক হইতে ফিরাইয়া অন্যদিকে দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। শিক্ষার উন্নতির জন্য আমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না, সবই আছে, কেবল একটু চেষ্টা মাত্রের উপর সকলি নির্ভর করিতেছে। ইংরাজিতে একটি প্রচলিত কথা আছে—"Whre there is a will, there is a way," অর্থাৎ যেখনে ইচ্ছা আছে, সেখানে পথও আছে। পথ আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছাটুকু হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া তুলিলেই আমরা উন্নতির মুখ দেখিতে পাই।

শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক। আজকাল ইংরাজি শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যাঁহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজি শিক্ষার এবং এলমে-বেদীন বলিয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, তাঁহারা অজ্ঞান, তাঁহারা মূর্খ, তাঁহারা দয়ার পাত্র। মুসলমানেরা ত একদিন বিজ্ঞানবলে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিল, মুসলমান-জাতি বিজ্ঞানের অপর্য্যাপ্ত চর্চ্চা করিয়াছিল বলিয়াই ত এত উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল ! আজ আমরা বিজ্ঞান অবহেলা করিতেছি বলিয়াই এ অধঃপতনের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিতেছি না। যখন বিজ্ঞানই উন্নতির মূল ছিল, যখন কায়রোর বিশাল দার-উল্-হেক্মত অর্থাৎ

বিজ্ঞানক্ষেত্রে পৃথিবীর বিজ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত মণ্ডলীর তৃষ্ণা নিবারণ করিত, তখনই ত মুসলমানজাতি জগতের শিক্ষাগুরু বলিয়া পূজিত হইত। আজ যদি আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চা পুনরায় নূতন তেজে আরম্ভ না করি, তাহা হইলে কখনই আমরা আর উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব না। আমরা ইংরাজি শিক্ষা করিব যে শুধু চাকরী করিবার জন্য, তাহা নহে, জ্ঞানপ্রচারের জন্য, বিজ্ঞানে প্রবেশলাভ করিবার জন্য। যাঁহারা বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আরবী ভাষাদ্বারা জ্ঞানঅর্জ্জন এবং জ্ঞানপ্রচার করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরবদেশে গমন করিতে অনুরোধ করি। সকল দেশের ভাষা এক হইতে পারে না। আরবী ভাষার আলোচনা আমাদের অবশ্যই আবশ্যক কিন্তু তৎসহ এক্ষণে ইংরাজি না হইলে কখনই চলিবে না। ইস্‌লাম কখনো একমাত্র আরবী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ নহে; বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিলে ইস্‌লামের গৌরববৃদ্ধি ছাড়া কখনো খর্ব্ব হইবে না।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভাবিতে হইবে না। শিক্ষার যখন বিস্তার হইবে, তখন অর্থোপার্জ্জনের নানা পথ আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে।

আমার ক্ষুদ্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া আমি আপনাদের অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার মূলবক্তব্য এই যে শিক্ষা, অর্থাৎ জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম, এই দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। জ্ঞানের বিস্তারই হইতেছে ইস্‌লামের পূর্ণ সার্থকতা। এক্ষণে উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা, যেন শিক্ষার বিস্তার দ্বারা ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদনার্থ তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন শক্তি, মন, ও প্রাণ সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করেন, এবং সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় বিধাতার প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিগণিত হন।

ইম্‌দাদুল হক্।

পত্র।

শ্রীযুক্ত 'নবনূর' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

অগ্রহায়ণ মাসের 'নবনূরে' ভারতী পত্রিকায় পরেশ বাবুর লিখিত একটি প্রবন্ধের দীর্ঘ সমালোচনা পাঠ করিয়া ২' একটি কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আশা করি সেগুলি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন। সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন 'জীবন-যুদ্ধে মুসলমান এখন আর চেষ্টাহীন নহে।' 'আশা করা যায় মুসলমানও একদিন হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিবে।' আমরা এই আশায় সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতেছি। বিদ্যালয়ের হিন্দুছাত্রগণ মুসলমান-সমপাঠিদিগকে জঘন্য কথা বলিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে ঘৃণ্য ও পরিবর্জ্জনীয়, ইহাও স্বীকার করি। সতীর্থদিগের মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সদ্ভাব থাকা সঙ্গত। স্কুল কলেজে পড়িবার কালে মুসলমানছাত্রদিগের সহিত আমাদের ত বেশ প্রীতির ভাবই ছিল। * হিন্দুকর্ম্মচারিগণ যে মুসলমানজমিদারের সম্পত্তি কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এরূপ ২' একটি ঘটনা আমি জানি এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করি। তবে যে সকল জমিদারের সম্পত্তি এরূপে হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহাদের বিলাসলিপ্সা এবং বিষয়কার্য্যে অমনোযোগও তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। মুসলমানগণের বাঁদী-প্রথা, বহুবিবাহ, ও অতিরিক্ত তোষামোদ-প্রিয়তা †

---

* প্রীতির ভাব যে আমাদেরও ছিল না, এমত নহে, তবে তাহা দায়ে পড়িয়া। পত্রলেখক যেমন নিজের experience হইতে বলিতেছেন, আমরাও তেমনি নিজের নিজের experience হইতে বলিতে পারি যে, ক্লাসের মধ্যে "একশত্রুস্থমোহস্থি" গোছ দুই একটি মুসলমানছাত্রকে অসংখ্য হিন্দু-সতীর্থমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত চোরটি হইয়া থাকিতে হয়। কথায়, ভাবে, ভঙ্গিতে নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াও যেন তেন প্রকারেণ সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে হয়। এই আজ ৮।১০ দিন হইল স্থানীয় জিলাস্কুল হইতে কয়েকজন মুসলমানছাত্র আমার নিকট আসিয়া কথা প্রসঙ্গে তাহাদের উক্তরূপ অবস্থা বর্ণন করিতেছিল। মুসলমান-ছাত্রগণকে অনেকটা সহিয়া যাইতে হয়, বন্ধুগণের নাসাকুঞ্চন সত্ত্বেও পারতপক্ষে মুসলমানেরা হিন্দু-সতীর্থগণের সহিত অসদ্ভাব ঘটায় না। কিন্তু মন মরা হইয়া থাকে নিশ্চয়ই। নঃ সঃ।

† প্রথমতঃ, বাঁদী-প্রথা। কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়া লেখক বাঁদী-প্রথার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা বুঝা গেলনা। যদি নীতির দিক্ হইতে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে

প্রভৃতি দোষগুলি দূরীভূত হইলে হিন্দুদিগের নিকট সম্মান আদায় তাঁহাদের পক্ষে অনেক সহজ হইয়া আসিবে, এবং সেদিন সমগ্র ভারতের পক্ষেই নিতান্ত শুভদিন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সমালোচক মহাশয় বলেন, 'দুর্বল ছেলের প্রতি মায়ের একটু বাহ্যিক টান বেশী'। যদি গবর্ণমেন্টকে সমালোচক মহাশয় বাস্তবিক মাতৃস্থানীয় বিবেচনা করেন, তবে সেই মাতার মুসলমান-সন্তান-বৎসলতা বাহ্যিক হইতে পারেনা, আন্তরিক হওয়াই স্বাভাবিক। আসল কথা দু' একটি (ইংরাজের চক্ষে) তুচ্ছ চাকরী দিয়া মুসলমানগণকে বাধ্য রাখিবার প্রয়াসের মূলে যে নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহা যে মাতৃভাব প্রসূত নহে, মুসলমানগণও ইহা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই বোধ হয় স্বীয় পুরুষকারের উপর নির্ভর-চেষ্টা এখন তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু স্ত্রী-কুলের অবস্থা হইতে আমাদের বাঁদীগণের অবস্থা অনেক ভাল। মুসলমানের অন্তঃপুরে যে সকল বাঁদী থাকে, তাহারা প্রায়ই, হয় সেই বাটীর চাকরের, না হয় প্রতিবেশী প্রজার সহিত বিধিমত বিবাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুগণের স্ত্রী-কুল চরিত্রহীনা বিধবা, অর্থাৎ বেশ্যাশ্রেণীর এক সংস্করণ। অথচ বাঁদী বাঁদী করিয়া হিন্দুগণ আমাদিগকে তাড়না করিতেছেন। বাঁদীর কোন্ জিনিষটা খারাপ, তাহা যদি তাঁহারা খুলিয়া বলেন, তাহা হইলে যথাযথ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বহুবিবাহ। মুসলমানেরা বহুবিবাহের জন্য হিন্দুর নিকট অসম্মানার্হ, এ কথা এই প্রথম শুনিলাম। তবু এখনো কুলীনের "খাতা দেখিয়া শ্বশুরবাড়ী যাওয়া" সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় নাই। বস্তুতঃ ধর্মবিধানানুসারে বহুবিবাহ মুসলমানের সম্পূর্ণ অধর্মের কাজ। শিক্ষিত সম্প্রদায় বহুবিবাহের জন্য কখনো হিন্দুর নিকট অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না কেননা তাঁহারা সে দোষবর্জ্জিত। যাহারা অধর্মের কাজ করে, তাহারা হিন্দুর নিকট কেন, মুসলমানের নিকটও অশ্রদ্ধার পাত্র। হিন্দুগণ কি বহুবিবাহ একেবারেই করেন না?

তৃতীয়তঃ, তোষামোদপ্রিয়তা। এ দোষটির জন্যও মুসলমানের প্রতি কটাক্ষ করা লেখকের উচিত হয় নাই। হিন্দুর মধ্যে তোষামোদপ্রিয়তা যথেষ্ট আছে, একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। খেতাবপ্রার্থী হিন্দুগণ তাহার এক প্রমাণ। তবে শিক্ষার অপর্য্যাপ্ত বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং স্বাধীনচেতা লোকেরও অভাব নাই। মুসলমানের মধ্যে যতটুকু শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহাতেই স্বাধীনচেতা লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ, এই সকল কাল্পনিক দোষে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া হিন্দুগণ আমাদিগকে অশ্রদ্ধার পাত্র বলিতে চাহেন। কিন্তু যে সকল কুসংস্কার ও "খ্যাতির মাদারদ" ব্যবহারের জন্য তাঁহারা আমাদিগের অধিকতর অশ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত (অথচ তথাপি আমরা অশ্রদ্ধা করি

সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন 'আমরা ইহা একশোবার জোর করিয়া বলিতে পারি যে আত্মীয়বাৎসল্যরূপ অত্যায়টা হিন্দুরাজপুরুষগণই বেশী করিয়া থাকেন, পরেশ বাবু নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।' পরেশ বাবু ইহা স্বীকার করিলেও আমি বলিব এস্থলে তুলনার সুবিধা নাই। যদি মুসলমানরাজপুরুষগণ তুল্য ক্ষমতা ও সুবিধা পাইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র মুসলমান-বাৎসল্য প্রদর্শন না করিতেন, তবেই তুলনা চলিতে পারিত। কিন্তু তুল্য ক্ষমতা পাইলেও অনেক মুসলমানরাজপুরুষ তুল্য সুবিধা পান না, কারণ অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গ, কর্ম্মপ্রার্থিগণ, হয়ত সকলেই হিন্দু থাকে, সুতরাং তাঁহাদের স্বজাতিপ্রিয়তা বিকাশের অবসর থাকেনা। যেখানে তাদৃশ অবসর থাকে, তথায় যে তাঁহারা আত্মীয়বাৎসল্য দেখাইতে ত্রুটি করেন, আমার নিজের অভিজ্ঞতা তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। যে ঘটনাটি উল্লেখ করিলে পরেশ বাবুকে নিরুত্তর হইয়া থাকিতে হইত বলিয়া সমালোচক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিপরীত ঘটনা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উচ্চশিক্ষিত বিলাতপ্রত্যাগত জেলার মুসলমান জজ, এন্ট্রেন্স পাশ হিন্দু এপ্রেণ্টিস থাকিতে তাহাকে ডিঙ্গাইয়া তদপেক্ষা অল্পশিক্ষিত মুসলমান এপ্রেণ্টিসকে মোহরেরগিরিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, দেখিয়াছি।*

না), সে সকলের দিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। হিন্দুর ঘর মুসলমানকে ভাড়া না দেওয়া, (এই মাস ১ মাস হইল, আমরা একটি শিক্ষিত লোকের ঘরভাড়া লইতে গিয়া বিতাড়িত হইয়াছি। অথচ সেই ঘরের এক কামরার ভিতর মানুষ মরিয়াছিল বলিয়া সে ঘর কেহ ভাড়াই লইতেছে না; আমাদের ঐ মত কোন Prejudice নাই,—আর প্রতিবেশী ভাড়া লইতে আসিলে আমরা চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া "দিবনা" একথা কখনও মুখেও আনিতে পারি না) হিন্দু উকিলের তক্তপোষের উপর হুঁকা থাকিলে তাহাতে মুসলমান-মক্কেলকে বসিতে না দেওয়া, তা সে মুসলমান যতই কেন সম্ভ্রান্ত হউন না, (ইহার আর দৃষ্টান্ত দিতে হইবে না. পত্রপ্রেরক সম্ভবতঃ নিজেই ওকালতি করেন), ইত্যাদি, আবার পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া কন্যার পিতার রক্তশোষণ প্রভৃতি নানা কুসংস্কারে যে তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিতে চাহেন? হিন্দুগণ আমাদিগকে বলেন, তোমাদের এটা মন্দ ওটা মন্দ; কিন্তু তাঁহাদের যে মন্দগুলি আমাদের চক্ষে বিদ্ধ হয়, সেগুলি তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে প্রস্তুত আছেন কি? উভয় পক্ষের কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করা United Indiaর পক্ষে আবশ্যক নহে কি? নঃ সঃ।

* মুসলমান একটি কিছু করিলে তাহা ঢক্কা-নিনাদে বিঘোষিত হয়, আর হিন্দুর অনেক কথা চাপা থাকে। পত্রপ্রেরক ঐ একটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন, কিন্তু একটি জেলা-কোর্ট হইতে এক বৎসরের মধ্যে কতকগুলি উদাহরণ দেখাইয়া দিতে পারি। ৬০৲ টাকার

সমালোচক মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমার নিকট ইঁহার নাম ধাম জ্ঞাত হইতে পারিবেন। এপ্রেণ্টিসের লিষ্টে একজন মুসলমানেরও নাম না থাকার আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কারণ যোগ্যতম কর্ম্মপ্রার্থীগণ হইতেই এপ্রেণ্টিস নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাদৃশ মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থী না থাকিলে লিষ্টে তাহাদের নাম থাকিবে কি করিয়া? * যদি যোগ্যতর, এমন কি তুল্যরূপ যোগ্য মুসলমানপ্রার্থী থাকিতেও তাহার হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীকে কার্য্যে নিয়োগ করা হয়, তবেই তাহা স্বজাতি-বাৎসল্যের পরিচায়ক ও নিন্দনীয় হয়। যে হিন্দুরাজপুরুষ এরূপ করেন তাঁহার সহিত অনেক চিন্তাশীল সুশিক্ষিত হিন্দুরই সহানুভূতি নাই। সবরেজিষ্ট্রারী চাকরী যদি এখন মুসলমানগণের একচেটিয়া না থাকে, তাহার কারণও অতি সহজেই বোধগম্য—এখন রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কর্ত্তা হিন্দু। মুসলমানাধীনে ঐ বিভাগে মুসলমানদিগের প্রায় একচেটিয়া অধিকার দ্বারা কি মুসলমান-রাজপুরুষের স্বজাতিবাৎসল্য তীব্ররূপে সূচিত হইতেছে না? †

মুসলমান-কেরাণীকে ডিঙ্গাইয়া ৪০ টাকার হিন্দু-কেরাণী ৮০ টাকার হেডক্লার্ক গিরি পাইয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পেস্কারী হইতে কৌশলে তাড়িত হইয়া মুসলমানকে কেরাণীগিরি স্বীকার করিতে হইয়াছে। অধিক উদাহরণের কথা উত্থাপন করা অপ্রিয়কর। আর মুসলমানের দরখাস্ত অনেক স্থলে হিন্দু আমলাবর্গ কর্ত্তৃক গাপ্ হওয়ার কথা তুলিয়াই কাজ নাই। সঃ সঃ।

* কিন্তু স্থানীয় লোকেরা রটায় যে মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থিগণ অযোগ্য ছিল না। বা হিন্দু কর্ম্মপ্রার্থিগণ মাত্রেই মুসলমান প্রার্থিমাত্র হইতেই যোগ্যতর ছিলেন তাহা নহে। খুব যোগ্যপ্রার্থী মুসলমানও ছিল। তবে কথা এই যে তাহারা যখন চাকুরী পায় নাই, তখন ত বাহিরের লোকের কাছে অযোগ্য বিবেচিত হইবেই। সমালোচনায় লেখা হইয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা এত প্রশস্ত নহে যে তিন বৎসরের মধ্যে একজনও যোগ্য কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত হইতে পারে নাই; তথাপি পত্রলেখক আবার এ কথার উত্থাপন করিলেন কেন? (ফলতঃ উভয় পক্ষ হইতে এইরূপ উত্তোতর্ক জুড়িয়া দিলে আসল প্রশ্নের মীমাংসা কখনই হইবে না।) সঃ সঃ।

† মুসলমান-কর্ত্তার বেলায় সবরেজিষ্ট্রারী চাকরী যে মুসলমানের একচেটিয়া ছিল, একথা বলাও ভুল, বুঝাও ভুল। একচেটিয়া ছিল যখন উর্দ্দু পারসীর আমল ছিল, তখন। হিন্দুরা তখন উর্দ্দু পারসী ছাড়িয়া ইংরাজি ধরিয়া ইংরেজের সৃষ্ট চাকরীগুলি একচেটিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন, মুসলমানগণের জন্য থাকিল সবরেজিষ্ট্রারী, ও দুই একটি মুন্সেফী। রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে ইংরাজি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া অবধি সবরেজিষ্ট্রারী হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে সমান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তবে কিছুদিন মুসলমান বেশী ছিল, কেননা পূর্ব্ব হইতে তাহারা চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে মুসলমান-কর্ত্তার আমলে একরূপ হিন্দুরই একচেটিয়া ছিল। সে সময়ে কয়জন মুসলমান

হিন্দুদিগের আত্মীয় বন্ধন মুসলমান অপেক্ষা দৃঢ়তর বটে, কিন্তু মুসলমানগণের ধর্ম্ম ও জাতিবন্ধন হিন্দুদিগের অপেক্ষা দৃঢ়তর, সুতরাং উভয়পক্ষেরই একদেশদর্শিতার সম্ভাবনা আছে। উভয়কেই যত্ন পূর্ব্বক তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। নতুবা বাস্তবিকই 'United Indiaর সুখস্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই রহিয়া যাইবে।'*

বস্তুতঃ মুসলমানগণের ধর্ম্মান্ধতা হিন্দুগণ অপেক্ষা অধিক,—হিন্দুধর্ম্ম Proselytising নহে, এবং চিরকালই উদার। হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারধর্ম্মমতই প্রচলিত আছে, বহুদেববাদ, একেশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ সমুদায়ই উহার বিশাল ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে। এই কারণে মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে মুসলমানগণের সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভারতীয় একতার বিঘ্ন সম্পাদন করিবে, ইহা আমারও বিশ্বাস।†

ও কয়জন হিন্দু চাকরী পাইয়াছে, একবার হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং "মুসলমান রাজপুরুষের স্বজাতিবাৎসল্য" এদিক হইতে 'তীব্ররূপে সূচিত হইতেছে না।" সঃ সঃ।

* আমরাও কার্য্যতঃ তাহাই চাই। উভয়কে যত্নপূর্ব্বক একদেশদর্শিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, একথা কিছুকাল হইতে শুধু শুনিয়াই আসিতেছি। কিন্তু হিন্দুগণ যে মুসলমানের মুখ চাহিয়া আপনার স্বার্থ কার্য্যক্ষেত্রে এ যাবত কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন এপর্য্যন্ত আমরা দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া আছি। পূর্ব্বেও যা ছিল এখনও তাই আছে। হিন্দুগণ আমাদের অপেক্ষা ধনে, বিদ্যায়, পদমর্য্যাদায়, সর্ব্ববিষয়ে বড়, তাঁহাদিগেরই উচিত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা। তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ যেরূপ করিতে দেখিবে, পশ্চাদ্বর্ত্তী মুসলমানেরাও তাহাই করিবে, শুধু কথায় ভুলিবে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যখন দেখিব, হিন্দুগণ একদেশদর্শিতা বর্জ্জন করিয়া, স্বীয় উন্নতির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তখন আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিব। উভয় পক্ষ একসঙ্গে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না। যে অগ্রগামী তাহাকেই স্বার্থত্যাগ করিয়া পথ দেখাইতে হয়; নহিলে যে দুর্ব্বল, তাহার মনে বিশ্বাস হইবে কেমন করিয়া? সঃ সঃ।

† মুসলমানধর্ম্ম Proselytising বলিয়া অনুদার, এবং হিন্দুধর্ম্ম তাহা নহে বলিয়াই যে উদার, একথা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং মুসলমানধর্ম্ম Proselytising বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মাপেক্ষা অধিক উদার। মুসলমানধর্ম্মের উদারতাই তাহার অপরিমিত প্রসারের একমাত্র কারণ। হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের সংস্রব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিতে চাহে, সুতরাং তাহার উদারতা কোথায়? বহুদেববাদ, একেশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্মমত থাকুক না কেন, মোটের উপর তাহা একই গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত, অন্য ধর্ম্মের বাতাস তাহার সহ্য হয় না, অতি

মানবের যুক্তি অতিপ্রাকৃত ধর্ম্মের শৃঙ্খলমুক্ত না হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি অসম্ভব, Renaissanceএর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ইউরোপের ইতিহাসই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্পেনীয় মূরগণের অসাম্প্রদায়িকতা এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকারই তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রণী করিয়াছিল।* তাঁহাদের সেই মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া না চলিলে মুসলমানসমাজ উন্নতির পথে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এবিষয় বক্তব্য অনেক আছে, কিন্তু অবসরাভাবে অদ্য এখানেই ক্ষান্ত হইতে হইল।

৫ই পৌষ বর্দ্ধমান

১১ ১০। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

পুনশ্চ। পরেশ বাবুর ভাষা অবজ্ঞার ভাবপূর্ণ বলিয়া সমালোচক মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে 'নবনূর' পত্রিকার সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের 'নবনূরের' ২৯০ পৃষ্ঠাখানি সমালোচক

সন্তর্পণে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয়। কিন্তু মুসলমানধর্ম্মে তেমন কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নাই। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কিরূপ উদারতার প্রসার হইতে পারে, তাহা পুরাকালের বিখ্যাত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুসলমানের সঙ্কীর্ণতা কখনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। মুসলমানের আদর্শের ভিতর এমন কোন সঙ্কীর্ণতা নাই, যাহা হিন্দুগণের ভয়ের কারণ হইতে পারে। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ যেমন একজন মুসলমান সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে (আমাদেরই জনৈক বন্ধু) প্রবেশানুমতি প্রদানে বিমুখ হইয়াছিল, কোন মুসলমান-কলেজ দ্বারা কোন দিন এরূপ কঠোর সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। নঃ সঃ।

* বাস্তবপক্ষে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির খাতিরে মুসলমানজাতিকে অতিপ্রাকৃত ধর্ম্মের শৃঙ্খল-মুক্ত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় নাই। মুসলমানধর্ম্ম স্বতঃই অতি প্রাকৃতত্ব-দোষ বিমুক্ত তাহা না হইলে ধর্ম্মপ্রচারের অব্যবহিত পরেই মুসলমানগণ এরূপ অসাধারণ উন্নতি করিতে সক্ষম হইত না। খ্রীষ্টানগণ ঐ দোষেই প্রথম দেড় সহস্রাধিক বর্ষ অন্ধকূপে নিমজ্জিত ছিল। ইস্‌লামের Free Thinking এবং Rationalism এর প্রভাবেই ইউরোপের সে অন্ধকার যুগের অবসান হইয়াছিল। অসাম্প্রদায়িকতা এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার যে শুধু মূরগণের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, তাহা নহে, তাহা সমগ্র মুসলমানজাতিরই মূলধন। আজ মুসলমানজাতি সেই মূলধন হারাইয়াই পতিত হইয়াছে, তাই সেই মূলধন পুনরায় লাভ করিবার জন্য মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন, আর্য্যমিসন ইনষ্টিটিউসন প্রভৃতি

মহাশয়কে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তিনি দেখিবেন 'হিন্দুভায়া'দের প্রতি যে ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংযমের নিতান্তই অভাব। বস্তুতঃ এবিষয়েও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই দোষী, সুতরাং উভয়কেই সতর্ক হইতে হইবে। অপ্রিয় সত্যকথাও সংযত ভাষায় বলা যায় না কি?*

যমন শুধু হিন্দুরই, মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ, মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সেরূপ হইবে না, তাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপনার সামগ্রী হইবে। এরূপ অবস্থায় বিশ্ব-বদ্যালয়ের পূর্ব্বে "মুসলমান" কথাটিতে (প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের "মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়" নামকরণ হইবেই তাহার এমন কোন নিয়ম নাই। "আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়"ও হইতে পারে।) যদি হিন্দুগণ আপত্তি করেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার হিসাবে কলিকাতার হিন্দুস্কুলের নামেও আমরা তদপেক্ষা অধিক আপত্তি করিতে পারি না কি? নঃ সঃ।

* অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের জন্য উভয়েই দোষী, একথা আমরাও স্বীকার করি। কন্তু হিন্দুগণই ইহার পথপ্রদর্শক। শুধু তাহাই নহে, অবজ্ঞার তীব্রত্ব তাঁহাদের অনেক বেশী। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে যেরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, এবং এখনো করিতেছেন, তাহার উত্তরচ্ছলে মুসলমানেরা সেইরূপ অবজ্ঞার ভাষা প্রয়োগের জন্য চেষ্ট হয়,—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। হিন্দুগণের এক্ষণে উচিত, অবজ্ঞার ভাষা প্রয়োগ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হইয়া পথপ্রদর্শন করা, তাহা হইলে মুসলমানেরা পূর্ব্বের বেদনা ভুলিয়া যাইবে। নহিলে হিন্দুগণ যদি অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতে থাকেন, তাহা হইলে মুসলমানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়িবে, সুতরাং মুসলমানদিগের নিকট হইতে পূর্ণসংযত ভাষা আদায় করা হিন্দুদিগের নিতান্ত দুলুম হইয়া পড়িবে। মুসলমানদিগের এতটুকু অবজ্ঞা তাঁহারা সহিতে পারেন না, সুতরাং আশা করা যায় যে, যখন তাঁহারা তলাইয়া দেখিবেন যে হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমানের প্রতি কি গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তখন মুসলমানের এ অবজ্ঞার ভাষায় তাঁহাদের গভীর মর্ম্মকাতরতার অভিব্যক্তি তীব্ররূপে অনুভব করিয়া তাঁহারাই পূর্ণসংযমের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিবেন।

পরিশেষে ভরসা করি যে, আমাদের এই টীকাগুলি পত্র প্রেরকের এবং সাধারণতঃ হিন্দু-সমাজের উদার এবং গভীর আলোচনার বিষয় হইবে। নঃ সঃ।

বাসিফুল।

"পিসিমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল,"
এত বলি আসি ছুটি   হাতে দিল ফুল দু'টি,
চেয়ে দেখি আনিয়াছে দু'টি বাসিফুল।

"পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ ফুল!"
সকালে কাননে গিয়ে   বাসিফুল কুড়াইয়ে
"পিসিমারে" দিতে এসে হাসিয়ে আকুল।

"পিসিমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল।"
শুনে সে বচন সুধা   দূরে গেল তৃষ্ণা ক্ষুধা,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হয়ে গেল ভুল।

মরি! সে স্বর্গের শিশু মরতে অতুল!—
তাহারে স্মরিয়া তাই   আপনা ভুলিয়া যাই—
কোন্ বিধি গড়েছিল সে ননী-পুতুল?

কি দিয়ে কে গড়েছিল সে প্রেম-মুকুল?—
ইন্দ্রধনু-বর্ণ দিয়ে,   চন্দ্রিকালাবণ্য দিয়ে,
পারিজাতগন্ধ দিয়ে মাণিক অতুল!

ললিত রাগিণী নহে তার সমতুল,—
নহে সুধাস্বাদ সম,   নহে ধন রত্ন সম,—
সেত নহে বসোরার গোলাপ মুকুল।

তুলনার উপযুক্ত নহে—সে অতুল।
তার সেই উপহার,—   কি দিব তুলনা তার?
কোটী কোহেনুর নহে তার সমতুল।

প্রেমের সে উপহার জগতে অতুল,—
কোথা পাব সে আদর?   কোথা সেই স্নেহস্বর,
হৃদয় জুড়ান সেই সোহাগ অমূল?

স্নেহের শিশির মাখা সেই বাসিফুল!।
অমিয়া ঢালিয়া বুকে   কে আর সহাস্য মুখে
কহিবে "পিসিমা! ধর আনিয়াছি ফুল।"

"পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ ফুল।"—
সেই কথা পুনরায়   শুনিতে পরাণ চায়,—
কোথা সে বালক মোর প্রেমের পাগল?

ভূতলে চামেলী যূঁই নহে অপ্রতুল,—
আছে কত পুষ্পলতা—শুধু নাই সেই কথা,—
"পিসিমা! তোমারে দিতে আনিয়াছি ফুল।"

সেই কথা শুনিতে এ পরাণ ব্যাকুল,—
বাজে কি স্বরগ পুরে   গন্ধর্ব্বের বীণাস্বরে,
"পিসিমা!" তোমারি তরে এনেছি এ ফুল"?

কি দিলে আবার পাব স্নেহের পুতুল?
কোন্ যজ্ঞ তপস্যায়   বাঁচিয়ে সে পুনরায়
হাসিয়ে আমারে দিবে দু'টি বাসিফুল?

সে স্নেহ আদর কেন জগতে দুর্মূল?
রত্ন-প্রসবিনী ধরা   বিবিধ রতনে ভরা,
তথাপি মিলেনা হেথা দু'টি বাসিফুল।!

বিধি "সর্ব্বশক্তিমান" নিতান্ত এ ভুল!—
নতুবা শকতি তাঁর   নাই কেন পুনর্ব্বার
ফিরাইয়া দিতে মোর সে প্রেম পুতুল?

বিধি "সর্ব্বশক্তিমান" ইহা নহে ভুল,—
নতুবা আর কে পারে   সমাহিত করিবারে
অমন স্বরগ-শিশু বিশ্বে যে অতুল?

পাবনা প্রাণের ধন—পাবনা সে ফুল!
আর শুনিবে না প্রাণ   সে ললিত কণ্ঠতান—
প্রেমের পীযূষভরা রাগিণী মঞ্জুল!

শুধু স্মৃতি-কুঞ্জে ফুটে আছে "বাসিফুল,"
সে মুখের স্মৃতিসুখ   ভরিয়ে রয়েছে বুক,—
অঙ্কিত সে চিরতরে হইবেনা ভুল।

মিসেস্ আর, এস, হোসেন।

রাজর্ষি দাউদ।

প্রেরিত পুরুষ রাজর্ষি দাউদ কেনান দেশের অন্তর্গত বয়তলহম নগরে, সুবিখ্যাত ইস্রায়েল-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যিশয়, তিনি কৃষিজীবী ছিলেন; তাঁহার অষ্ট পুত্রের মধ্যে দাউদ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। দাউদ শৈশবকালেই তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত পশু চারণে নিযুক্ত হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেন।

মহাত্মা দাউদের জন্ম-সময়ে ইসরায়েল-বংশের অত্যন্ত হীনাবস্থা ছিল। তাঁহারা জালুত নামীয় পেলেষ্টেনীর এক নৃশংস নৃপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে ছিলেন। ঈশ্বর প্রদত্ত মুসার "সাক্ষ্যসিন্দুক", যাহা তাঁহাদের সমস্ত সুখ ও সৌভাগ্যের কারণ ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছিল। ফলতঃ তখন তাঁহাদের কষ্টের আর সীমা ছিল না।

নৃপতি জালুতের অত্যাচার একান্ত অসহ্য হইলে, ইস্রায়েল-বংশীয় অশীতি সহস্র লোক, আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে দলপতি করিয়া, তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; তন্মধ্যে দাউদ ও তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতৃবৃন্দও ছিলেন। পথিমধ্যে দারুণ ঐশ্বরিক পরীক্ষায়, সেই অশীতি সহস্র যোদ্ধার মধ্যে, তিনশত তের জন মাত্র মহাবিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মহাত্মা দাউদ স্বগণসহ সেই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যুদ্ধস্থলে ইস্রায়েল-দলপতি তালুতের ঘোষণানুসারে বীরবর দাউদ, দুর্দ্দান্ত নরপতি জালুতকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, অর্দ্ধেক রাজ্য ও স্বীয় দলপতির কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃষক-পুত্র দাউদ, ঈশ্বর কৃপায় ও স্বীয় অসাধারণ বাহুবলে, রাজ্য ও রাজকন্যা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু এ সুখৈশ্বর্য্য অধিক কাল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। অচিরে রাজ্যমধ্যে তাঁহার অতুল প্রভুত্ব ও সম্মান দেখিয়া, নব নির্ব্বাচিত ভূপতি তালুতের মনে মহা চিন্তা ও ঈর্ষার উদয় হইল। অবশেষে প্রবল দুর্ব্বুদ্ধির তাড়নায় তিনি আপনার জামাতা মহচ্চরিত্র দাউদকে বিনষ্ট করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে মনস্থ করিলেন। এদিকে এই সংবাদ

পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়া মহামতি দাউদ এক জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করেন এবং তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও স্থানের মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হইয়া, শত শত ধ্যান-পরায়ণ ঋষি সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। মহাত্মা দাউদ এরূপে সর্ব্বত্যাগী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইলেও, তালুতের ভয়-বিহ্বল-ক্রূরদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে পারিলেন না। সহসা একদিন রাত্রি-যোগে তালুতের প্রেরিত সৈন্য আসিয়া মন্দিরনিবাসী সমুদায় তপস্বীকে বিনষ্ট করিয়া গেল। বিধাতার মঙ্গল হস্ত তাঁহার প্রিয়পুত্র দাউদকে রক্ষা করিল; সেদিন দাউদ কার্য্যগতিকে মন্দিরে ছিলেন না, সুতরাং তালুতের মনস্কাম পূর্ণ হইল না। তালুত যখন দেখিলেন, তিনি যাঁহাকে হত্যা করিতে যাইয়া এতগুলি নির্দ্দোষ সাধুবৃন্দকে নিহত করিলেন, অথচ তিনি এখনও জীবিত; তখন তাঁহার মনে প্রবল অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি দাউদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। দাউদ বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি ধর্ম্মাত্মা মহর্ষিবৃন্দকে অনর্থক হত্যা করিয়া মহা পাপগ্রস্ত হইয়াছ, এ ঘোরতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে তোমার সহিত মিলিত হইতে পারিব না।"—এই ঘটনার অল্পকাল পরেই তালুত কোনও যুদ্ধে নিহত হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দাউদ তালুতের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন সেই সূত্রে তালুতের মৃত্যুতে তিনি শূন্য সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে আপন অধিকার বিস্তার করিলেন।

রাজ্যলাভান্তে নানারূপ ঘটনা-বিপর্য্যয়ে চল্লিশ বৎসর গত হইলে পর, নৃপতি দাউদ 'প্রেরিতত্ব' লাভ করেন। ঈশ্বর দাউদকে বলিয়াছিলেন;—"হে দাউদ, আমি ধরাতলে তোমাকে রাজা করিলাম, তুমি ন্যায়ানুসারে প্রকৃতি-পুঞ্জের সুবিচার করিতে থাক, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, তাহা করিলে আমার রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইবে।" (কোরাণ শরিফ।) প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদকে ঈশ্বর বলিয়াছেনঃ—"আমার দাস মহা বলশালী দাউদকে স্মরণ কর, সে একান্তই আমার অনুগত ছিল।" আবার অন্যত্র "আমি তাহাকে রাজৈশ্বর্য্য দান করিয়াছি এবং সুবিচার ও শাসন প্রণালী ও বিজ্ঞান-কৌশল শিক্ষা দিয়াছি।" (কোরাণ শরিফ।)

পুণ্যাত্মা রাজর্ষি দাউদ ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া "জবুর" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয়কন্দরে যে সকল অমূল্য ঈশ্বরবাণী

প্রতিধ্বনিত হইত, এই গ্রন্থে তাহাই বিশেষভাবে প্রকটিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ কেবল ভজন-সঙ্গীত, ঈশ্বরবন্দনা, আরাধনা ও প্রার্থনা এবং ঈশ্বর-ভয়-পরাক্রম ও মহিমা বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। 'জবুর' শব্দের অর্থই 'ধর্ম্ম-পুস্তিকা'। ইহা মুসাদেবের 'তওরতের' পরবর্ত্তী গ্রন্থ।

প্রেরিত পুরুষ দাউদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল। তিনি যখন আপন কমনীয় কণ্ঠে স্বর সংযোগ করিয়া ঈশ্বর-মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তখন অরণ্যের পশুপক্ষীও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া; নিঃশব্দে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া থাকিত। এমনকি তাঁহার সুমধুর স্বরে পাষাণও দ্রবীভূত হইত; যাবতীয় জড়পদার্থও তাঁহার সহিত ঈশ্বরের মহিমাগানে যোগদান করিত।

রাজর্ষি দাউদ ঈশ্বরাদেশে নিজ হস্তে বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিতেন এবং তাহার বিক্রয়-লব্ধ ধনে আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজস্ব হইতে কণামাত্রও আপনার বা পরিজনবর্গের জন্য ব্যয় করিতেন না। এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেই অলৌকিক শক্তিবলে লৌহ দ্রব হইয়া যাইত; তিনি তদ্বারা অগ্নিসংযোগ ব্যতিরেকেই স্বল্পায়াসে বর্ম্ম প্রস্তুত করিতেন। তিনিই নাকি সর্ব্বপ্রথম লৌহ-বর্ম্ম-নির্ম্মাতা।

নৃপতি-প্রবর মহাত্মা দাউদের পূর্ণ একশত জন ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠাপত্নী বৎশেবার পাণি-পীড়ন উপলক্ষে তিনি যে দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মহচ্চরিত্র লোকের কিছুতেই উপযুক্ত হয় নাই। তদ্বিবরণ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানুষ জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ-মালায় বিভূষিত হইয়া, জীবনের যতই উচ্চসোপানে আরোহণ করুন না কেন, হৃদয়ের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় তথা হইতে তাঁহাদের মুহূর্ত্তে পদ-স্খলন অসম্ভব ব্যাপার নহে। সে বৃত্তান্তটি এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, রাজর্ষি দাউদ, কতিপয় বৎসর পরম সুখে রাজ্য-শাসন করিলে পর, কোন অশুভক্ষণে, "আমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ" এই অহ-ঙ্কারের ভাব আসিয়া তাঁহার পতনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। তাঁহার রাজ-প্রাসাদের অদূরে উড়িয়া নামক এক ব্যক্তির বাগানবাটী ছিল। একদিন দাউদ আপনার ছাদের উপর বসিয়া একটি সুন্দর বিহঙ্গম দেখিতেছিলেন, হঠাৎ পাখীটা উড়িয়া পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের কোন তরুশাখায় যাইয়া বসিল। সেই সঙ্গে নৃপতি দাউদের দৃষ্টিও সেই দিকে প্রধাবিত হইল। দৈবক্রমে সে সময়ে উদ্যানস্থ ক্ষুদ্র সরোবরে উড়িয়ার পরমাসুন্দরী তরুণী ভার্য্যা বৎশেবা

বিবস্ত্র অবস্থায় স্নান করিতেছিলেন। দাউদের দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইল। তাঁহার চক্ষু ও মন সেই ভুবনমোহিনীর অতুল সৌন্দর্য্যে ঝলসিয়া গেল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই দূতমুখে সুন্দরীর পরিচয় পাইয়া, তিনি যুদ্ধ ব্যপদেশে তাহার স্বামী উড়িয়াকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন এবং কালক্রমে সেই যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হইলে, পরম হৃষ্টচিত্তে তিনি বৎশেবার পাণি-পীড়ন করিয়া আপন হৃদয়তৃষ্ণা মিটাইলেন। এইরূপে তাঁহার একশত পত্নী-সংখ্যাও পূর্ণ হইল।

এবম্বিধ অন্যায় আচরণ দ্বারা বৎশেবাকে লাভ করিয়া রাজর্ষি দাউদের শোচনীয়রূপে পতন হইল বটে, কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বর কখনও আপন প্রিয় সন্তানকে দূরে ফেলিয়া রাখেন না। এই ঘটনার পর কিয়দ্দিবস গত হইলে, একদা স্বর্গীয় দূত আসিয়া দাউদের এ পাপ-চিত্র তাঁহার সম্মুখে প্রকটিত করিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইল; মর্ম্মভেদী আত্ম-গ্লানিতে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবলই ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কঠোর মর্ম্ম-স্পৃক অনুতাপানলে চত্বারিংশৎ দিবস দগ্ধ হইলে, পরমেশ্বরের আশ্বাসবাণী হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল; তিনি উড়িয়ার কবরস্থান অনুসন্ধান করিয়া তথায় যাত্রা করিলেন, এবং কবরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, অশ্রুপ্লাবিত বদনে, তাহার আত্মার নিকট উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

দয়াময়ের অতুল দয়ায় মহাত্মা দাউদ নিদারুণ অন্তর্দাহ ও পাপ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় সুবিচারক নরপতি অতি অল্পই পৃথিবীর অঙ্ক পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার বিচার-নৈপুণ্য সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উল্লিখিত হইল না।

রাজর্ষি দাউদ ঊনবিংশতি পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। সকলেই তদীয় রাজ্যাভিলাষী ছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে বৎশেবার গর্ভোৎপন্ন সন্তান সোলেমান জ্ঞান ও ধর্ম্মে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করায় তিনিই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়েন। প্রবাদ আছে যে, সোলেমান পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সকলের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ দাউদ অনেকগুলি সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল পবিত্র ভাব রাজি বেশ পরিস্ফুট হয়। তিনি

সর্ব্বসমেত চল্লিশ বৎসর ছয় মাস কাল রাজত্ব করিয়া ছিলেন। হিব্রোণ নামক স্থানে সাত বৎসর ছয় মাস এবং সুপ্রসিদ্ধ জেরুজিলেম নগরে তেত্রিশ বৎসর তাঁহার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনিই জেরুজিলেম নগরের সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন; পরে সোলেমান কর্ত্তৃক মন্দিরের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

রাজর্ষি দাউদের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অনেক সময় যুদ্ধ বিগ্রহেই ব্যয়িত হইয়াছিল। সে সকল কাহিনীর সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ যুদ্ধ বিগ্রহের দুরাধর্ষ শোণিতাভিনয় বর্ত্তমান সময়ের শান্তিপ্রিয় বঙ্গীয় পাঠকের বড় তৃপ্তিকর হইবে, মনে হয় না।

মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ১০১৫ দশ শত পনের বৎসর পূর্ব্বে রাজর্ষি দাউদ মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে সোলেমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মুসাদেবের বিধিব্যবস্থানুসারে জীবন যাপন ও রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন।

প্রেরিত পুরুষ রাজর্ষি দাউদের পবিত্র জীবনচরিত অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। তিনি অতুল রাজ্যসম্পদের মধ্যে থাকিয়াও যেরূপ ঋষির ন্যায় নির্লিপ্তভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহা জগতে একান্ত দুর্লভ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শকুন্তলা।

মলয়ের মৃদুশ্বাসে বিকশিত কুসুমের প্রায়
সেদিন ফুটিলে তুমি ঋষিদের তপোবনচ্ছায়,
প্রথম প্রেমের রাজ্যে প্রবেশিলে পাগলিনী-পারা,
সলজ্জ-শঙ্কিত-পদে একেবারে হয়ে আত্মহারা,
বল্কল-বসনা শ্লথ, আকুল-কুন্তলা
ওগো শকুন্তলা!

করতল-লগ্ন-শীর্ষ, নিমীলিত যুগল নয়ান,
যুগল তারকা যথা গোধূলির মেঘেতে শয়ান,
তুমি কি দেখিতেছিলে প্রণয়ের প্রথম স্বপন—
দুষ্মন্তের সুখ-স্পর্শ, প্রীতির নূতন সম্ভাষণ ?
বেতসে বিসিনী-শয্যা নিতান্ত নিরালা,
ওগো শকুন্তলা ?

তুমি কি ভাবিতেছিলে, প্রাসাদের স্বর্ণ-সিংহাসন
কোন শুভক্ষণে তব পরশিবে রাজীব চরণ ?
মহিষীর দিব্যবেশে বরবপু হবে আবরিত
পুষ্পিত-ব্রততী-সম আপনার গৌরবে নমিত,
ভুলেছিলে কণ্বাশ্রম একান্ত বিহ্বলা
ওগো শকুন্তলা ?

বাহিরে যে মেঘমন্দ্রে বিদারিত করি নভস্তল
উঠিল প্রলয়ধ্বনি অতিতীক্ষ্ণ, অব্যর্থ, অটল,—
"অতিথিরে অবহেলি ভাব যারে একাগ্র মানসে,
সে তোমারে পাশরিবে মিলনের প্রথম দিবসে,
ভুলিবে সে তব দত্ত গুপ্ত বরমালা,
অয়ি শকুন্তলা !"

তুমি কি শোননি হায় অভিশাপ—দারুণ দুর্ভাষা
মাহঙ্কারে উচ্চারিল ক্রোধোন্মত্ত তপস্বী দুর্বাসা ?
ভীম-কান্ত মূর্ত্তি দুই বাহিরে ও অন্তর মাঝারে
তোমারে যে ডুবাইল বিরহের অকূলপাথারে,
তুমি কি বোঝনি তাহা মোহমুগ্ধ বালা
ওগো শকুন্তলা ?

শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়।

লুসাই হিল।

শিলচর ও মণিপুরের দক্ষিণ সীমা হইতে আরাকানের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমা হইতে ব্রহ্ম প্রদেশের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ আমরা মানচিত্রের মধ্যে দেখিতে পাই ইহারই নাম লুসাই হিল। এই স্থানের অধিবাসীবৃন্দই "লুসাই" নামে কথিত হয়। চারি বৎসর পূর্ব্বে লুসাই হিল আসামস্থ কাছাড় জেলার একটি মহকুমা ছিল, বর্ত্তমানে অত্রস্থ চিফ কমিশনারের অধিনে একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হইয়াছে। শিলচর হইতে ১৩১ মাইল দক্ষিণে সাড়ে তিন হাজার ফিট উচ্চ একটি পর্ব্বত-চূড়াতে আইজাল নামে এক রমণীয় নগর স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই লুসাই হিল জেলার সদর ষ্টেসন। নগরটি স্বভাবের রমণীয় শোভায় পরিপূর্ণ। জলবায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। সকল ঋতুতেই শীতানুভব হয়। এখান হইতে শিলচর পর্য্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ নদী প্রবাহিত আছে। অত্রস্থ আমদানী রপ্তানী এই নদী দ্বারাই হইয়া থাকে। এখানে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাদাম চাল, ডাল, ঘৃত, মনোহারী দ্রব্য, করোগেটেড্ আয়রণ প্রভৃতি আমদানী হয়, আর কাঠ, বাঁশ, বেত, মোম প্রভৃতি দ্রব্য ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। নৌকাযোগে কিম্বা হাঁটিয়া উভয় প্রকারেই শিলচর হইতে নয় দশ দিনে এখানে পঁহুছিতে পারা যায়। কিন্তু উভয় পথই বড় বড় পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ, এবং হিংস্রজন্তুপূর্ণ। শিলচরের সহিতই এই স্থানের আমদানী, রপ্তানী ও যাতায়াত প্রভৃতির সম্পর্ক। আইজাল হইতে ১০৭ মাইল দক্ষিণে এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ১০০ মাইল পূর্ব্বে লুসাই হিলের অধীনে এক মহকুমা আছে। সে মহকুমার নাম লুংলে। শিলচরের সহিত সদরের যেরূপ সম্পর্ক লুংলের সহিত চট্টগ্রামের সেইরূপ সম্পর্ক। আইজাল হইতে ব্রহ্মপ্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ১৩৬ মাইল দীর্ঘ একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া বা হাঁটিয়া উভয় প্রকারেই বহুলোক এখান হইতে ব্রহ্মপ্রদেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। এখান হইতে ১৫ দিনে তথায় যাইতে পারা যায়।*

আইজাল জেলার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ১০ জন ইংরেজ অফিসার এখানে অবস্থান করিতেছেন। অফিসে কাজ করেন অথবা ব্যবসায়ী এরূপ প্রায়

---

* লুসাই হিলে বিয়াশী হাজার লোকের বসতি, তন্মধ্যে দু হাজার ভিন্ন প্রদেশীয়। গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় ২৪ হাজার টাকা কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ মাসিক ৩৫ হাজার।

শতাধিক বাঙ্গালীও এখানে আছেন তন্মধ্যে অধিকাংশ বিক্রমপুর ও শ্রীহট্ট নিবাসী। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া নিরাপদ সত্বেও এক হাজার গুর্খা সিপাই এখানে অবস্থান করিতেছে।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শিলচর প্রভৃতি সমীপবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে লুসাইগণের পুনঃ পুনঃ উপদ্রব উৎপীড়ন নিবারণ জন্যই গবর্ণমেণ্ট এই অতি দরিদ্র বর্ব্বর প্রদেশে স্বীয় শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লুসাইগণ উক্ত প্রদেশ সমূহ হইতে কতকগুলি শিশু সন্তান ধরিয়া আনিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪।৫টি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আজিও জীবিত আছে। ইহারাও এদেশীয় রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে কোথায় বাড়ী ছিল, কোন্ জাতি, কিছুই বলিতে পারে না। লুসাইদের মধ্যে ক্ষৌর-কার্য্যের পদ্ধতি নাই, স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির শিরে দীর্ঘ কেশকলাপ বর্ত্তমান, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকদের কেশই অধিক দীর্ঘ এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট ও চিক্কণ। শুনিয়াছি, শুকরের তৈল ব্যবহারই ইহার কারণ। স্থানটি শীতপ্রধান বলিয়া অধিবাসীবৃন্দ মাত্রেই সুশ্রী ও গৌরবর্ণ। পুরুষগণ স্কন্ধ প্রদেশ হইতে আজানুলম্বিত এক খণ্ড প্রশস্ত কাপড় জড়াইয়া লজ্জা ও শীত নিবারণ করিয়া থাকে। আর স্ত্রীলোকগণ কটিদেশে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাপড় জড়াইয়া তদুপরি একটি পিরাণ পরিয়া থাকে। ইহাদের পরিধেয় কাপড় মাত্রই স্থানীয় স্ত্রীলোকগণ বুনন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাদের গাত্রাবরণ মাত্রই নিতান্ত অপরিষ্কার। আইজালের নিকটবর্ত্তী ও শিক্ষিত লুসাইগণ প্রায়ই কোট প্যাণ্টালুন পরিয়া থাকে। ইহারা ক্রমশঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে। বিলাতি জিনিষের স্রোতও ইহাদের ভিতরে সতেজে প্রবেশ করিতেছে।

জাগতীয় জন্তু মাত্রই ইহাদের আহার্য্য। জীবিত বা মৃতে আপত্তি নাই। পর্ব্বোপলক্ষে ইহারা একটি জীবিত কুকুরের মুখ দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক জঘন্য ক্রিয়া বিশেষ অবলম্বনে কতকগুলি চাউল উদরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উক্ত কুকুরটিকে অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ খণ্ড খণ্ডরূপে কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান সুখাদ্য। ইংরেজের অনুগ্রহে একটি লুসাই এফ, এ পাশ করিয়া কলিকাতায় বি, এ, অধ্যয়ন করিতেছে। অফিসে একটি কেরাণী ও ১৫।১৬ জন চাপরাশী আছে, এতদ্ব্যতীত আরও ১০।১৫ জন ইংরেজি লিখিতে পড়িতে পারে। লুসাই জাতি যদিও অসভ্য বর্ব্বর কিন্তু নিতান্ত ধূর্ত্ত। অসভ্য জাতির মধ্যে এরূপ ধূর্ত্ত জাতি জগতে বিরল। আপনার স্বার্থ সংরক্ষণার্থে

তাহারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ইহারা বন্দুক ও বারুদ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা সম্যক্ অবগত ছিল। ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ।

লুসাইগণ খুঁটির উপর অর্দ্ধগোলাকৃতি ছাপর বিশিষ্ট একটি মাত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকলত্রাদিসহ একত্রে বসবাস করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহে গভর্ণমেণ্ট এক টাকা হিসাবে কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আজ কাল অনেকে কুলি মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে সত্য কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় শুধু চাকুরীর উপর ইহারা জীবিকার নির্ভর করে না। কৃষিকার্য্যই ইহাদের জীবিকার প্রধান উপায়। ধান, ভুট্টা, তরমুজ, ফুট, ইহাদের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের কোনরূপ কর নাই, যে যত আবাদ করিয়া লইতে পারে।

ইহারা সন্তানের শৈশব অবস্থায় প্রসূতির মৃত্যু হইলে মৃত প্রসূতিসহ জীবিত শিশুকে সমাধিস্থ করিয়া থাকে। ইংরেজ কর্ত্তৃক ক্রমে এই নিয়ম রহিত হইতেছে। একদিন অত্রস্থ কোনও অফিসের একজন বাঙ্গালী বাবু উপরোক্ত লুসাই কেরাণীকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা কেন এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক? প্রত্যুত্তরে লুসাই বলিল বাবু! আমরা সম্পূর্ণ অসভ্য বর্ব্বর জাতি, আমাদের দ্বারা এরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে কিন্তু আপনারা সুসভ্য হইয়াও ইহা হইতে হৃদয়-বিদারক অনেক অযথা পৈশাচিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

পুতুল পূজা করে বলিয়া লুসাইগণ হিন্দুদিগকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। লুসাইগণ বলে জগতে অপর কোনও সভ্য জাতির মধ্যে ত পুতুলকে পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিবার বিধান নাই। আমরা যে অসভ্য বর্ব্বরজাতি আমরাও ত পুতুল পূজার পক্ষপাতী নহি।

আহ্মদ আলী দেওয়ান।

আলি পাশা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরাজিত, নিগৃহীত এবং মাতা-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দৃঢ়মতি আলি দিগন্তরে স্বীয় ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই স্থির করিয়া তিনি নিগ্রপণ্টের দিকে অভিযান করিলেন। এ প্রদেশের অনেকে তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং অনেক প্রধান প্রধান

ব্যক্তির সহিত তাঁহার পত্রাদি আদান প্রদান চলিল। ফলে অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে ধূলা-মুঠা ধরিলে সোনা হইয়া থাকে, সহসা বিপুলবিত্ত আয়ত্তে আইসে, একথা অপ্রকৃত নহে। আলি বিপন্ন অবস্থায় ইহার একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি একটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভেলোরা নামক স্থানের অনতিদূরে একটি ধ্বংসাবশিষ্ট উপাসনামন্দিরের নিকট স্বীয় সৈন্যগণের শিবির সন্নিবেশ করেন। নির্জ্জনে নিবিষ্টমনে আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য একদিন আলি উক্ত জঙ্গলময় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইস্থানে ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্তিকা-গর্ভ-প্রোথিত প্রভূত অর্থ তাঁহার হস্তগত হয়। উক্ত ধনভাণ্ডার প্রাপ্তি বিষয়ে তিনি নিজমুখে এইরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—"আমি জন প্রাণীহীন ভগ্নমন্দির মধ্যে বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া কিরূপে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব, কিরূপে অবস্থার উন্নতি সাধন করিব, এই বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম এবং ক্রম্যমান প্রবল শত্রুবর্গের সহিত আপন দুর্ব্বল অবস্থার তুলনা করিতেছিলাম। এই সময়ে, লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে আমি আপনার হস্তস্থিত যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছিলাম। সহসা যষ্ট্যগ্র কোন একটি কঠিন বস্তুতে লাগিয়া বাধা প্রাপ্ত হইল এবং উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতে শব্দ উত্থিত হওয়ায় আমার মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। আমি স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দেখিবার জন্য সঙ্কল্প করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই যষ্টির দ্বারাই মৃত্তিকা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কি অননুভবনীয় অপূর্ব্ব ব্যাপার! খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখি, স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ পাত্র প্রোথিত রহিয়াছে। দেখিয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে অভাবের জন্য এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহার নিদারুণ নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম; হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই দৈবপ্রাপ্ত ধনরাশির দ্বারা আমি যে, সমূহ কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইব, তাহা ভাবিয়া আমার উৎসাহ নবজীবন প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এই ধন এখানে কি প্রকারে আসিল? বুঝিলাম, কোন অন্তর্জাতিক ভীষণ বিদ্রোহের সময়ে কেহ ইহা ভূগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" যাহা হউক, আলি অতঃপর এই অর্থে দুই সহস্র লোকের বেতন দিয়া এবং অপর বহু অনুচর সংগ্রহ করিয়া লইয়া জয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক কম্পিত ও শঙ্কিত করিয়া টিপলেনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আলি আপনার বাল্যকালের লীলানিকেতন টেপলেনীতে আসিলেন। তাঁহার ধন-ভাণ্ডার দৈবানুগ্রহে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু অর্জ্জিত অর্থ শান্তির সহিত উপভোগ করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। তিনি দুরাকাঙ্ক্ষার অঙ্কুশ-তাড়নে উত্তেজিত হইয়া অধিকতর বিক্রমের সহিত প্রশস্ত ক্ষেত্রে কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। তদনুসারে সমুদয় গিরি-সঙ্কট স্বকীয় অনুচরবর্গের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা পথিকগণের সর্ব্বস্ব হরণ, সরাই ও অরক্ষিত নগর সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া আলির ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল। আলির অত্যাচার ও দস্যুতা ঈদৃশ ভীষণত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল যে, পরিশেষে তাহা মহামান্য তুরস্কাধিপতির মন্ত্রী-সমাজের কর্ণে গিয়া পঁহুছিল। অবশেষে গিরি-বর্ত্ম সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মহামতি খুর্দ্দ পাশার উপর আলির অত্যাচার নিবারণের আদেশ প্রদত্ত হইল। তিনি রাজাদেশ পাইবামাত্র একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আলি তাহাদের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া বেরাটে প্রেরিত হইলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে এবার আলির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—তিনি এবং তাঁহার ধৃত অনুচরগণ রাজাজ্ঞানুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ফলতঃ আলিকে উক্তবিধ দণ্ডের কথা জ্ঞাপন করাও হইল। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ঘটিল। আলির যৌবনকাল ও শারীরিক সৌন্দর্য্য, আলির সাহস ও কার্য্যদক্ষতা, আলির রাজনীতিপূর্ণ বাক্যালাপ ও শিষ্টাচার প্রভৃতি দর্শনে খুর্দ্দ পাশা একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি আলিকে দণ্ডের পরিবর্ত্তে দয়াপরবশ হইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং স্বীয় সহযোগী করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

পাশা আলিকে আপনার প্রাসাদে কয়েক বৎসরের জন্য রাখিয়া দিলেন এবং বিবিধ প্রকারে অনুগৃহীত করিলেন। তিনি আলিকে নিষ্ঠুর ব্যবসায় পরিত্যাগ করাইবার জন্য বহুল প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উজীরের সেই চেষ্টায় আলির কার্য্য প্রসরক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইল—তিনি পথিক লুণ্ঠনকারী সামান্য দস্যু হইতে দেশ ও প্রদেশ আক্রমণকারীতে পরিণত হইলেন। উজীর, নিকটবর্ত্তী সর্দ্দারদিগের সহিত যুদ্ধে আলির অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি আলির জননীয় ব্যবহার ও বিনয় বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া আলিকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এই সূত্র হইতেই বেরাটের উজীরের সহিত আলির গাঢ় সম্বন্ধ ঘটে। (ক্রমশঃ।)

কবিতা-গুচ্ছ।

চিরযুগ বন্দিতা।

অয়ি শ্যামাঙ্গিনী   চিরস্নেহশীলা
    চিরযুগ বন্দিতা জননী!
শিরে শান্তোজ্জ্বল   প্রদীপ্ত গরিমা
মাণিক্য চঞ্চল   জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
    থাকিয়া থাকিয়া রটে মহিমা কাহিনী।
  বক্ষে কুলু কুলু   রজত তরল
  বিগলিত সুধা   শুভ্র পুণ্য গাথা
    গাহিয়া গাহিয়া বহে শীতল তটিনী।
  বিপিন বিতানে   লবঙ্গ লতিকা
  গোলাপ মল্লিকা   কেতকী যূথিকা
  গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্প-বিথীকাস্নিগ্ধ যামিনী।
  শ্যাম কুঞ্জ-চ্ছায়ে   মধুপ ঝঙ্কারে
  পত্রের মর্ম্মর   সঙ্গীত নির্ঝর
    বাজে কল কল স্বরে অযুত রাগিণী।
অয়ি ভাগ্যবতী   বিলাস বিবশা
    কেন আর রহ সুপ্তিলীনা
রাতুল তনিমা   কনক প্রদীপ্ত
কলারাগরাশি   আজি কেন মসী
  অঙ্গে অঙ্গে মাখা; বিলুপ্ত বিভব-দীনা।
  কোথা অলঙ্কার   হীরাহেম মণি
  মতি ঝল ঝল   কিরীট কুণ্ডল,
    যুগ যুগ ধরি মাতঃ সুপ্তিলীনা।
  ঝর ঝর আঁখি,   সুধাহীন স্তন্য,
ধরা বিলুণ্ঠিতা,   পদ বিদলিতা,
    আজ চতুর্দ্দিকে দৈন্য অয়ি অঙ্গহীন।
  মরণিত মাতঃ   জীবনে মরণ
  ছল ছল ছল   সদা অশ্রুজল
    শুধু রেখেছে জীবন পরের করুণা
আমি শুচিস্মিতা আর কেন রহ সুপ্তিলীনা।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাল ও প্রেম।

(১)

এই যে দেখিনু,—তুঙ্গগিরি-চূড়া সম
সুদৃঢ়, হঠাৎ চূর্ণ হ'ল ধূলিসার,
কালের কঠোর স্পর্শে চূর্ণ সেথা আর
অতীতের স্বর্ণস্তম্ভ পূর্ণ অহঙ্কার।
এই ত দেখিনু পুনঃ,—সুধার্ত্ত সাগর
চুম্বিছে উত্তালনৃত্যে সৈকত বেলায়,
গ্রাসিয়া মেদিনী দ্রুত হয় অগ্রসর
সঞ্চয় করিছে ক্ষয় ক্ষয়েতে সঞ্চয়।
  আমি ত দেখিছি নিত্য অনিত্যের লীলা—
ব্যাকুল মীমাংসাহীন, বিচারবিহীন,
শঙ্কিত হৃদয় ভীত চিন্তিত কেবল,
আমারে হইতে হ'বে বিরহে মিলন!
হিয়ারে বুঝা'তে নারী, সহি মৃত্যুব্যথা,
স্মরি স্নেহহীনা সন্ধ্যা,—ভাবি নির্ম্মমতা।

(২)

যখন দেখিনু হায়! দুর্নিবার কাল
নাশিছে দুর্জ্জয় সিন্ধু, হিমাদ্রি অটল,
কি হ'য়ে সহিবে আহা! সৌন্দর্য্য কোমল
জ্যোৎস্না, কুসুমের বুকে নিবাস যাহার?
কি ক'রে সহিবে বল অশনি-নির্ঘাত,
ফুলের পরশে যেই ফুল পায় ব্যথা?
সুদৃঢ় প্রস্তর পুরী কালের কবলে
পলকে চূর্ণিত, হায়! ফুলের কি কথা?
  কি চিন্তা যাতনাপূর্ণ, হায় রে সময়
কালের অমূল্য সৃষ্টি কালে হ'বে লয়!
তবু অনিত্যের ক্ষুদ্র পরিধি যেথায়
উদিত আনন্দ ঊর্ম্মি সৌন্দর্য্য ঊষায়।
অনিত্যের সৃষ্টি স্বপ্ন,—লীলা অনিত্যের
সৃজিবে প্রমোদ-স্বর্গ অমর প্রেমের।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

কি দিব তোমায়।

হৃদয়ে আকাঙ্খা—দিব—কি দিব তোমায়?
    বিজন নদীর ধারে
    বসি' সাঁঝা অন্ধকারে
কতদিন ভাবিয়াছি কি দিব তোমায়?
স্নেহের একটি চিহ্ন কি দিব তোমায়

মধুর জ্যোছনা রাতে,
একাকী বসিয়া ছাদে,
ভাবিয়াছি মনে মনে কি দিব তোমায় ।
কি দিব তোমায় আমি খুঁজে নাহি পাই ;
খুঁজিয়াছি কত স্থানে,
মরমের মাঝ খানে,
মনের মতন কিছু—কোথাও না পাই ।
মধুর পূর্ণিমা রাতে চাহিয়াছি মনে
আকাশের চাঁদখানি
ধরে তোমা দেই আনি,
স্নেহের অক্ষয় চিহ্ন জীবনে মরণে ।
বরষার মেঘ-ম্লান আকাশের গায়
চঞ্চল বিজলী হেরি'
চাহিয়াছি সেই ধরি'—
বিদ্যুতের মালা গেঁথে পরাই গলায় ।
তারা-ভরা নিশীথের অন্ধকার কোলে,
চাহিয়াছি তারারাশি
সমুজ্জ্বল থাকি থাকি,
যতনে রচিয়া হার দিতে তব গলে ।
শিশির-মুকুতা-কণা নবদূর্বাশিরে
যদি না তরল হ'ত
রবি-করে না শুকা'ত
যতনে তুলিয়া কণ্ঠে রাখিতাম ধীরে ।
উষার রক্তিম ঠোঁটে যেই হাসি ফুটে,
নিমেষে কুড়া'য়ে ওরে
বাঁধিয়া স্নেহের ডোরে,
সাধ, সেই গলে দিতে যেন নাহি টুটে ।
শারদ জোছনা সাথে রাখি ফুল-হাস,
"স্নেহ" কথা লিখে তা'তে,
সেই "স্নেহে" হার গেঁথে
তু'লে দিতে তব করে—কত অভিলাষ
এ শুধু আশার স্বপ্ন—সব মিছা মিছি,—
ও সব হ'বার নয়,
ও কিছু দিবার নয়,
দিব তবে বন-ফুলে—মালা একগাছি ।
বিজনেও ফুটে ফুল, সৌরভ বিলায়,
ওতেও সৌন্দর্য্য রয়
কোমল মাধুরীময়,
তুমি মোর ফুল-হার দিবেনা গলায় ?
এই ধর, সেও মোর বন ফুল হার;—
অরণ্যে ফুলের হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
এর বেশী কিবা দিব—কি আছে আমার ।

আজিজর রহমান ।

—:০:—

কলঙ্ক ও মৃত্যু ।

কলঙ্ক আসি দাঁড়াল সমুখে
বলিল 'মোরে কি চাও' ?
সুখ রাশি লয়ে ও সরম টুকু
আমার চরণে দাও ।

যুবতী বলিল না ।
তুমি দূরে যাও সরি ।
সুরভি না যেতে যুথবধু সেও
ভূমেতে পড়ে যে ঝরি ?

মৃত্যু আসিয়া দাঁড়াল সমুখে
বলিল 'আমারে চাও' ?
শুভ-সিন্দুর কপালেতে পরো
মোরে প্রাণটুকু দাও ।

যুবতী বলিল এস ।
এই সে মিনতি তবে,
এসেছিল এক সাধ্বী বিধবা
বলে যেন হেথা ভবে ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ।

—:০:—

মমতাজ মহল।

(প্রেমের সমাধি)

ধবল মর্ম্মরে গড়া সমাধি ভিতরে
কে তুমি শুইয়া দেবী অনন্ত নিদ্রায়?
তুমি কি স্বর্গের সুধা?— বঙ্কিম অধরে
আজিও ফুটিয়া হাসি স্বর্ণ আভায়?
সম্রাট-মহিষী তাজ প্রেমের পুতলি,
তুমি মা আদর্শ সতী পবিত্র জীবন,
তোমার তুলনা তুমি; শত শ্রদ্ধা তুলি
আসিছে দেবতা জ্ঞানে করিতে অর্চ্চন।
ধন্য তব নারীত্ব—জীবন যৌবন,
প্রেমের সমাধি তাজ—দেব পুরস্কার;
পতিপত্নী দোঁহে মিলি করিলে সাধন
নিষ্পাপী প্রেম তার সুষমা আধার।
কারারুদ্ধ বাদশাহ্ হেরিয়া তোমায়
চলি গেল সুখাসনে ত্রিদিব ছায়ায়।।

শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

মাসিক সাহিত্য।

ভারতী,—অগ্রহায়ণ। 'জাপানী বীর' একটি কবিতা। বর্ণিত বিষয়টি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বর্ণনা প্রাণহীন। 'ঔপন্যাসিক বিবাহ' বেশ হাসির। লেখকের কল্পনার যথেষ্ট বাহাদুরী আছে। 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' গবেষণামূলক প্রবন্ধ; পড়িলে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। 'উদয়াদিত্য' গত ৬ষ্ঠা আশ্বিন বঙ্গের বালকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "উদয়াদিত্য পুষ্পাঞ্জলি" উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত' হইয়াছিল। 'অ্যাবট্‌স্ ফার্ড' সুখপাঠ্য রচনা। "নির্ঝর" একটি ক্ষুদ্র কবিতা, বৈচিত্র্যবিহীন নহে। 'বেদে পৃথিবীর গতি' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী নানা আলোচনা দ্বারা ধারণা করিয়াছেন যে, 'পৃথিবীর গতি বহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণের বিশেষরূপে বিদিত ছিল।' 'সুজাতা' একটি বৌদ্ধগাথা, মন্দ নহে। 'নারায়ণী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া মনে হয়, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শেষরক্ষা করিতে পারিবেন। সর্ব্বশেষ মৌলভী ইমদাদুল হক্-লিখিত 'আল্‌হাম্‌রা' প্রবন্ধ। লেখকের ভাষা স্বাভাবিক আবেগপূর্ণ না হইলে রচনাটি আরও সুখপাঠ্য হইত। "আল্‌হাম্‌রা" বা "লোহিত প্রাসাদ" স্পেনীয় মুরগণের এক অতুলকীর্ত্তি। আজ স্পেনে আর মুরজাতির চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু আল্‌হাম্‌রা এখনও অতীতের নিদর্শনরূপে বিদ্যমান। পতিত মুসলমানের অধম অকর্ম্মা যিনি প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন, তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না। যখন মনে হয়, প্রাচ্যের তাজমহল, প্রতীচ্যের আল্‌হাম্‌রা উভয়ই মুসলমান নির্ম্মিত, তখন স্বতঃই নিজেদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উপর ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

প্রদীপ,—কার্ত্তিক। "হায়দর আলি ও ইংরাজ-সমরে লেফ্‌টেনাণ্ট মেল্‌ভিলের পত্র", Bowring কৃত "Life of Haider Ali" অবলম্বনে লিখিত একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। "বৈদিক যুগে আর্য্য-সভ্যতা" তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। এই স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যেই লেখক বৈদিকযুগে আর্য্য-সভ্যতার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। "মণ্ডলী" উপন্যাস চলিতেছে। "শিবরহস্য"— উক্ত নামধেয় একখানি প্রাচীন পুঁথির পরিচয়। "শিবরহস্যের" পরিচয়-প্রদাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। প্রাচীন পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিবার অধিকার কাহারও নাই। যাহাকে লেখক বর্ণাশুদ্ধি বলিতে চান, তাহা কখনই বর্ণাশুদ্ধি নহে, তাহাই তৎসময় প্রচলিত ঠিক বর্ণবিন্যাস। যে ইংরেজী-সাহিত্যের আদর্শে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট, সেই ইংরেজী সাহিত্যের আদি যুগের কবিগণ যে ভাবে বহুশব্দের বর্ণবিন্যাস করিয়া গিয়াছেন তৎপ্রতি ও বর্ত্তমান বর্ণবিন্যাসের প্রতি কি কখনও লেখকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে? তাহা যদি হইত, তবে লেখক কখনই

এরূপ অযৌক্তিক কথা বলিতেন না। বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচিত হইবার জন্য এই সমুদয় প্রাচীন পুঁথি যথাবৎ প্রকাশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। 'শিবরহস্য'-সংগ্রাহক সাহংকারে বলিয়াছেন, আমি যদিও একজন পরিষৎ-সংস্রবি ব্যক্তি, তবুও কর্ত্তব্যানুরোধে এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।' হয়ত অন্য কোনও 'উপরিষৎ-সংস্রবি ব্যক্তি' এরূপ সাহঙ্কার-উক্তি করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন। 'ঢুণ্ডার' সুখপাঠ্য নহে। 'সৌরজগত' সরল ভাষায় লিখিত জনসাধারণের আলোচ্য একটি সুন্দর বৈজ্ঞানিক রচনা। 'ভারতীয় জাতীয়জীবনের উপর মুসলমান-রাজত্বের ফলাফল' পত্রিকায় লিখিত যুগোৎপত্তি ও যুগস্থিতির বিবরণের ন্যায় চিন্তাকর্ষক। 'কবি শিবচন্দ্র' বিক্রমপুর, কাঁঠাদিয়া গ্রামনিবাসী জনৈক প্রাচীন কবির বিবরণ। 'সংবাদের মুখ' আসর জমাইতে পারে নাই। বর্ত্তমান 'প্রদীপ' পুরাতন 'প্রদীপের' গৌরবের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গ্রন্থ সমালোচনা।

অর্ঘ্য—নূতন কাব্যগ্রন্থ। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী-প্রণীত ও কলিকাতা 'বিশ্বকোষ' প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আমাদের জন্মভূমি চট্টগ্রাম চিরদিনই সরস্বতীর প্রিয় ক্রীড়া-ক্ষেত্র। কালে কালে এদেশে কত কবি-কোকিল আবির্ভূত হইয়া সুমধুর কুহুতানে জগত মাতাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার সম্যক্ ইয়ত্তা করা যায় না। যে পুরাতন কুহুস্বরে সুর মিলাইয়া আমাদের 'নবীনচন্দ্র' একদিন যে স্বরলহরী তুলিয়াছিলেন, তাহার ঝঙ্কার শেষ হইতে না হইতেই আবার তদীয় স্বরানুকারী পারস্কৃৎকুল বীণাহস্তে বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখিলে কোন্ স্বদেশ ভক্তেরই হৃদয় আনন্দে না নাচিয়া উঠে? একবার আমরা যাহা হারাই, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আর ফিরিয়া পাই না। আমাদের মাতৃভূমির নব্য-কবিকগণের জন্য মঙ্গলময় বিধাতা কি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, জানি না। তাই আমাদের শশাঙ্ক, সতীশ, জীবেন্দ্র ও শশাঙ্কগণের জীবননাটকের অভিনয় কিরূপ হইবে, দেখিবার জন্য আমরা অদূর ভবিষ্যতে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি। অবশ্যই বিধাতা আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি চারি অঞ্জলিতে সমাপ্ত। এই অঞ্জলি চতুষ্টয়ে যথাক্রমে ৩৮, ১০, ১১ ও ৫টি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম অঞ্জলিতে রমণী-প্রেম, ২য় অঞ্জলিতে স্বদেশ-প্রেম, তৃতীয় অঞ্জলিতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি-প্রেম সম্বন্ধে এবং শেষ অঞ্জলিতে উক্ত তিন প্রকারেরই কবিতা আছে। রমণী-প্রেমে আবার অনুরাগ, মিলন, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সকল ভাবেরই সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়।

'অর্ঘ্য' পাঠ করিয়া আমরা অসঙ্কোচ বলিতে পারি, বিপিন বাবুর এতদিনের নীরব সাধনা সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছে। তিনি যে সাহিত্য-সেবা করিতেন, এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও আমরা তাহা এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারি নাই। বিপিন বাবুকে ব্যবহারাজীবের নীরস কঠিন বিষয়াদির চর্চা করিয়াই দিনরাত কাটাইতে হয়। এরূপ অবস্থাতেও যে

কাহারো হৃদয় সাহিত্যের বিমল আলোকে আলোকিত থাকিতে পারে এমন বিশ্বাস বাস্তবিক পূর্ব্বে আমাদের ছিল না। আজ সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বিপিন বাবু কতকটা হঠাৎ কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহাকে উপহাস করিতে হইবে, ইহা কোন্ কথা? 'নূতন' গ্রহণে প্রথমে জগতের কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে সত্য, কিন্তু এই 'নূতন'ই কি 'পুরাতনে' পরিণত হইয়া একদিন সকলের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে না? আমাদের আশা আছে, পরিচয় ঘনীভূত হইলে বিপিন বাবু সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন।

হঠাৎ কবি হইলেও, সুখের বিষয়, বিপিন বাবু 'কষ্ট-কবি' নহেন। তাঁহার অনেক কবিতাই হৃদয়-উৎস হইতে স্বতঃ বিনিঃসৃত হইয়াছে, বোধ হয়। তবে নূতন কবির পক্ষে যে দোষ নিতান্ত অপরিহার্য্য, 'অর্ঘ্যে' তাহার আদৌ অসদ্ভাব আছে, সে কথা আমরা বলিতেছি না। অধুনা কবিতারাজ্যে জটিলতার প্রভাব যেন খুব বেশী বলিয়াই বোধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহা অতি জটিল ও একরূপ অর্থশূন্য, তাহাই সমধিক সুন্দর বলিয়া অধুনা সমালোচিত হয়। 'অর্ঘ্যের' সে রকম রচনাকে আমরা সুন্দর বলিতে প্রস্তুত নহি। বিপিন বাবুর সহজ সরল রচনা আমাদের নিকট অতি মধুর লাগিয়াছে। তাঁহার ছন্দে মনোহারিতা ও নবীনত্ব আছে। ভাব-সম্পদেও তিনি দীন নহেন। 'অর্ঘ্য'-পাঠে প্রতীতি হয়, বঙ্গভাষায় তাঁহার সুন্দর অধিকার আছে। তবে নবোদ্যম বলিয়া অনেক স্থানে কাঁচা হাতের চিহ্ন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উদার-হৃদয় বিপিন বাবু কতকগুলি প্রাচীন শব্দের এমন সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাঠকের চক্ষে তদ্রূপ শব্দগুলি কিছু নূতন,—কিছু বাধ বাধ ঠেকিবে, সন্দেহ নাই। বিদেশীয় আচার ব্যবহারের মত বিদেশীয় হাবভাব আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কৃত্রিমতা-দুষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বিপিন বাবু এই দুর্দ্দিনে আমাদের 'ঘরাও' শব্দরাজির ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাস্তবিক ভালই করিয়াছেন। আরো সুখের কথা, বিপিন বাবু 'যবনের' মুখ-চর্ব্বণ করেন নাই।

বিপিন বাবুর ভাবুকতা প্রশংসনীয়। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রই অন্তর্মুখিনী। সামান্য দৃষ্টিতে যাহা অসুন্দর দেখায়, কবিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে তাহাকেই সৌন্দর্য্যাধার বলিয়া বুঝেন। সমানুভূতি-শক্তি নিতান্ত প্রবল না হইলে কেহ কবি হইতে পারে না। সুখের বিষয়, বিপিন বাবু এ গুণে দরিদ্র নহেন। সাধনা করিলে, কালে তিনি অনেক উন্নতি করিতে পারিবেন।

স্বদেশপ্রেমিক বিপিন বাবু যেকয়েকটি সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'আত্ম-পরিচয়' বাঙ্গালীর ঘরের একটা সুন্দর-ছবি। এই অংশে তিনি বাঙ্গালীর উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের মত উদ্দীপনাশক্তি লইয়া আমাদের দেশে অল্প কবিই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। বিপিন বাবুও কয়েক স্থানে নিদ্রিত বঙ্গসমাজকে এই বলিয়া উদ্দীপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন:—

"কিসের ভাবনা কিসের বিষাদ
কিসের যাতনা ধরণীতলে।

তোমাদের মত কত শুষ্ক তরু,
মঞ্জরী মুকুলে শোভিছে ফলে।
পশ্চাদনুশোচনা দুর্ব্বল হৃদয়ে,
অতীতে ভাবিয়া কি হবে কার?
কলঙ্কের চিহ্ন শূন্য কেহ নহে,
বেশী কম হোক্ ভাগ্যে সবার।
কি ক্ষতি মরেও মরিবার শেষ?
—না মরিলে কেবা অমর হয়?
—ক্ষুধায় দহিছ? তৃষ্ণায় জ্বলিছ?
—উপবাস বিনে ব্রত কি হয়?
যদি না উঠিবে কেন ডাকে পাখী
এখনও প্রভাতে মধুর স্বরে,
যদি না দেখিবে কেন রবিশশী
দিন দিন উঠে আলোক ভরে?
*　*　*　*
কুরীতি কুপ্রথা প্রাণের জড়তা
তাড়াও সবলে সকলে মিলি।
সত্যের অর্চনা সামর্থ্যের ধ্যান
কর শক্তি যাবে চরণে ঠেলি।"

বিপিন বাবুর এ উপদেশ কখনো কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা, ভবিতব্যতাই জানে। "অর্ঘ্যের" অনেকগুলি কবিতা আমাদের নিকট বেশ লাগিয়াছে। চতুর্থ অঞ্জলিটিই গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। এ অংশের চিত্রগুলি উজ্জ্বল বর্ণরাগে রঞ্জিত। বিপিন বাবু পিতামাতার তথা এই হতভাগ্য মাতৃভূমির সুযোগ্য সন্তান। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ-জীবি করিয়া সাহিত্য-সেবায় নিরত রাখুন।

এইক্ষণে ইহার কয়েকটি দোষের উল্লেখ করিব। ইহার মুদ্রাঙ্কণ ও কাগজ অতি সুন্দর। কবিতাগুলির নাম শীর্ষদেশে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা হওয়ায় তাহা সহজে চক্ষে ঠেকে না। কয়েকস্থলে বর্ণাশুদ্ধিও ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল বাঙ্গালা ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্য। পূর্ণমাসী, অরাজকময়, অগ্রণীর, ইন্দ্রময় ধরা, জীবনী সঞ্চার, ইত্যাদি পদের ব্যবহার ব্যাকরণ সম্মত নহে। 'আঁধিয়ায়' কি 'আঁধারে' অর্থে প্রযুক্ত? 'উদয় হওয়া' অর্থে 'উলা' ক্রিয়ার প্রয়োগ চট্টগ্রামে থাকিলেও, সর্ব্বত্র নাই। 'বাটিয়া ছানিয়া' দেওয়া কেমন? 'বেয়ানা বেসাৎ' কি 'বেগানা বেসাৎ'? চট্টগ্রামের অপভ্রষ্ট ভাষার ব্যবহার করিতে গেলে আমরা সাহিত্য-সমাজ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র পাইব বলিয়াই, আশঙ্কা হয়। কি গরজে পড়িয়া বিপিন বাবু এমন করিলেন? আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, সকল ভ্রম প্রদর্শন করা চলে না। নবীন লেখকদের গ্রন্থে এরকম ভ্রমপ্রমাদ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সুখের বিষয়, এই গ্রন্থে সে রকম প্রমাদ বেশী নাই। কোন কোন কবিতার অর্থ স্পষ্ট উপলব্ধ হয় না, অনেক কবিতায় কষ্ট-কল্পনার চিহ্ন

আছে। 'অঞ্জলি' বিশেষ হ'তে কোন কোন কবিতা বাদ দিলেই বেশ ভাল হইত, বোধ হয়। যাহা হউক, এসকল সামান্য দোষ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিবেন, আশা করি। সাহিত্যরাজ্যে আমরা বিপিন বাবুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

মানসিংহ—ঐতিহাসিক চিত্র। শেখ ফজলল করিম প্রণীত ও 'প্রচারক' পত্র হইতে পুনঃ মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন নাই। মানসিংহের জীবনী সংগ্রহে লেখকের চেষ্টার ত্রুটী না হইলেও, তাঁহার রচনাপদ্ধতি সর্ব্বত্র চরিতাখ্যায়কদিগের অনুসৃত মার্গানুযায়িনী হয় নাই। সত্য নিষ্ঠা যে ঐতিহাসিকের পরম আশ্রয়, লেখক তাহা বিস্মৃত হইয়া অনেক স্থানেই কবি-জনোচিত কল্পনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও অনেক স্থানে জটিল ও ইতিহাসের অনুপযুক্ত বোধ হইল। প্রবন্ধটি পুনঃ প্রচারিত হইল, অথচ নানা স্থানেই ভাষাদোষ রহিয়া গেল। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। ভাষাদোষ-পরিহারের প্রতি আমাদের সকল মুসলমান লেখকই কিছু উদাসীন। ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। ভাষাকে জটিল করিতে যাইয়াই তাঁহারা এরূপ ভ্রম করিয়া ফেলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষার জটিলতাতে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি হয় না। 'তৃণাবৃত অসির মত সুতীক্ষ্ণ আগ্রহ', 'মিহির তাড়িত শিশির কণা' প্রভৃতি লম্বা চৌড়া পদে বিদ্যাভিমান প্রকাশিত হয় মাত্র, প্রকৃত বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার 'সম্মানীয়', 'নিশ্চুপ', 'দুরিকরণ', 'নিস্বার্থময়', 'অনাবশ্যকীয়' এবং 'আয়ত্তাধীন' প্রভৃতির প্রয়োগে মুসলমান-লেখকের হস্তে বঙ্গ-ভারতীর দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে বাস্তবিক বড় আঘাত লাগে। এমন ভ্রম আরো কয়েকটী না আছে এমন নহে; সকলগুলির উল্লেখের স্থান কোথায়? মোটের উপর, গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই। ইতিহাসাদির অনুশীলনে আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ নিতান্ত উদাসীন বা পশ্চাৎপদ। আশা করি, অতঃপর মুসলমান লেখকগণ ইতিহাস-চর্চ্চার সহিত ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে কদাচ ভুলিবেন না।

এখানে আর একটি কথা বলা চাই। লেখক মহাশয় 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"মানসিংহ মুসলমান-ভক্ত ছিলেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা বা ঈর্ষাবশে তাঁহার জীবনী সঙ্কলনে সঙ্কুচিত।" এই কথাগুলি না বলিলে তাঁহার গ্রন্থরচনায় কি কোন বাধা ছিল? সাহিত্য-রাজ্যে হিন্দুগণের দোষ অনেক থাকিলেও গুণও যে অনেক আছে, লেখক কি তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন? ধান ভানিতে শিবের গীতে কি দরকার? সাহিত্য জগতে অকারণ দ্বেষাদ্বেষির অবতারণা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। এবিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত সংখ্যা নবনূরের ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৯ম পংক্তিতে এইরূপ হইবে,—'বিধাতার কৃপাবলে, অনায়াসে অরাতিদলে' স্থলে লেখক 'অনায়াসে অরিদলে' লেখেন নাই কেন, কে বলিবে?

আরবীয় দর্শনালোচনা

৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

(সারাংশ)

পবিত্র খৃষ্টানেরা যে আত্মার অমরত্বের এবং পরলোকে আত্মার শান্তিময় অবস্থিতির বিষয় বিশ্বাস করিতেন, তাহা হজরত ঈসার ক্রিয়াকলাপ * এবং শিষ্যবর্গের প্রতি উপদেশ হইতে সম্যক্ প্রমাণিত হয়। তাঁহার শিষ্যেরা ধর্ম্ম-প্রচারার্থে নানারূপ কষ্ট সহ্য করিতেন, এমন কি সত্যের কল্যাণে জীবন পর্য্যন্ত পাত করিতেন। ধর্ম্মযাজক, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, এবং পরিব্রাজকগণের কার্য্য-কলাপও আত্মার অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ। তাঁহারা পৃথিবীর সুখসচ্ছন্দতার জন্য বিন্দুমাত্রও লালায়িত বা সচেষ্ট নহেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

হজরত ইবরাহিম এবং হজরত ইউসফ যে আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন তাহার প্রমাণ এই যে, মৃত্যুর পর "পুণ্যাত্মাদিগের সহিত সহবাস" লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আমাদিগের প্রেরিত পুরুষের বংশধরগণও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন। কারবালার ভীষণ প্রান্তরে ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা দেহপাত করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিঃশব্দে অবিচলিতচিত্তে ধৈর্য্যসহকারে দারুণ গ্রীষ্মতাপ, মর্ম্মান্তিক পিপাসা, তীক্ষ্ণ তরবারি এবং বর্শার প্রচণ্ড আঘাত, সমস্তই সহ্য করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদিগের আত্মা সেই কর্দ্দমময় নশ্বর বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এবং দার্শনিকেরা সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা অবিনশ্বর।

---

* বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঈসার ক্রুসে মৃত্যু সম্বন্ধে গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকই অনুসরণ করিয়াছেন। কোরাণের মতে, "তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুসেও বিদ্ধ করে নাই। তাঁহাদিগের অনুরূপ এক ব্যক্তিকে তাঁহার পরিবর্ত্তে উপস্থিত করা হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহাকে তাহারা হত্যা করে নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে আপনাতে উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন।" কোরাণ, ৪র্থ অধ্যায়।

পরম পণ্ডিত সক্রেটিস সত্যের জন্য পরমানন্দে বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং শিষ্য-বর্গকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি আত্মার অমরত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্লেটো বলিয়াছিলেন, "যদি এমন একটি পরকাল না থাকিত, যেখানে আমরা মঙ্গলের আশা করিতে পারি, তাহা হইলে ইহলোক দুর্বৃত্তেরই স্থান হইত।" "আমরা একদিন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দানবদিগের প্রতিবেশী রূপে এইস্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া আছি। আমাদের প্রথম পিতা আদমের পাপে আমরা গৃহতাড়িত।"

তর্কশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক আরিষ্টটলের গ্রন্থসমূহ, তাঁহার মৃত্যুকালীন বক্তৃতা, দর্শনশাস্ত্রাধ্যয়নের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি মৃত পরিজনের জন্য শোক-বিহ্বল মনুষ্যের বিষয় গভীররূপে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আত্মার অমরত্বের বিষয়ে আর একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। মানুষ মৃতব্যক্তির দেহের জন্য শোক করে না, কেননা সে দেহ ত তাহাদের সম্মুখেই বর্ত্তমান থাকে, এবং ইচ্ছা করিলে সে দেহকে ঔষধাদিযোগে বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারে। যদি বল, মৃতদেহ হইতে চলন, স্পন্দন ইত্যাদি শক্তি তিরোহিত হয় বলিয়াই মানুষ শোক করে, তাহা হইলে যখন তাহারা নিদ্রা যায়, তখন শোক করে না কেন? কারণ, নিদ্রিত ব্যক্তি অন্যান্য জীবন-চিহ্ন-রহিত হইলেও শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হয় না। সুতরাং সে জীবিত আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। অতএব হে ভ্রাতঃ, স্নেহ, প্রেম, বন্ধুত্ব ইত্যাদি যে কোন হৃদয়-বৃত্তির কথা বল না কেন, সকলই সেই নির্ম্মল আত্মার, এবং দেহ হইতে যখন সেই আত্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, তখন স্পন্দন, চলন, বলন, শ্রবণ, সকল শক্তিই তিরোহিত হয়, এবং পরিজনেরা সেই আত্মার অভাবেই শোক পরিতাপে অভিভূত হয়।

যাহারা প্রতিজ্ঞা পালন, ক্ষমা প্রার্থনা বা পরার্থে প্রার্থনা, অথবা প্রার্থনা পূরণের জন্য সাধু ব্যক্তি এবং প্রেরিত পুরুষদিগের সমাধিতীর্থ পরিদর্শন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আত্মার অমরত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ। দ্বীপের উপর একটি পর্ব্বত, তাহার উপর একটি নগর। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর, বায়ু সুখশীতল ও স্বাস্থ্যজনক, জল সুস্বাদু, এবং সমগ্র দেশ অসংখ্য সুমিষ্ট ফলশালী বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। অধিবাসিরা একজন মাত্র মনুষ্য হইতে উৎপন্ন, পরস্পর ভাই ভাই। সকলেই সুখী, স্নেহ মমতা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে বিজড়িত, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কবল হইতে নির্মুক্ত।

এখন একদিন এই সুখরাজ্যের একদল প্রজা নৌকায় চড়িয়া সমুদ্র যাত্রা করিল, এবং নৌকা মারা পড়িয়া তাহারা সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তরঙ্গের আঘাতে তাহারা অবশেষে আর একটি দ্বীপে নীত হইল। এই দ্বীপটি বন্ধুর পর্ব্বতসঙ্কুল, উচ্চ উচ্চ বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন, অন্ধকার, মলিন পঙ্কিল জলের গভীর উৎস, এবং ভয়ঙ্কর গহ্বরে পরিপূর্ণ। বন্যপশু এবং প্রধানতঃ বানরই ইহার অধিবাসী। ইহার নিকটস্থ অন্য একটি দ্বীপে একটি বিকটাকার পক্ষী বাস করিত, এবং সে প্রত্যহ এই দ্বীপের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময়ে কতকগুলি করিয়া বানর ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইত।

অতঃপর সেই নৌকামগ্ন মনুষ্যেরা এই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া আহারান্বেষণে ব্যাপৃত হইল। তাহারা ফলমূল আহার, ঝরণার জল পান, বৃক্ষবল্কল পরিধান এবং শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা বানরজাতির সহিত পরিচিত হইয়া উঠিল, কেননা, বানরেরাই অবয়বে মনুষ্যের খুব নিকটবর্ত্তী। অবশেষে তাহারা তাহাদিগের আদিম নিবাসের কথা ভুলিয়া গিয়া সেই দ্বীপেই গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল, এবং আপনাদিগকে সুখী বলিয়া মনে করিল। কিন্তু তাহারা যখন ভূমি, গৃহ প্রভৃতিতে আপনাপন স্বতন্ত্র অধিকার বুঝিয়া লইতে এবং প্রত্যেকেই অপরাপেক্ষা অধিক ফলমূল আহরণে ব্যাপৃত হইল, তখন হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির সূত্রপাত হইল, এবং বিবাদবিসম্বাদের বীজ রোপিত হইল।

অতঃপর একদিন তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে সে যেন আবার তাহার প্রাচীন আবাস ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, এবং তাহার স্বদেশীয়েরা বহুদিন নির্ব্বাসনের পর তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে। কিন্তু যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সেই বানরের রাজ্যেই

অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়া সে অত্যন্ত ম্রিয়মান ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িল, এবং বন্ধুগণের নিকট তাহার অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শুনিয়া সকলের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, গৃহের কথা, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিজন সকলের কথা মনে পড়িতে লাগিল, এবং সকলেই সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলে মিলিয়া একটি জাহাজ নির্ম্মাণের আয়োজন করিল। কিন্তু যখন সকলে একত্র হইয়া নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, তখন সেই বিকটাকার পক্ষীটি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে উড়াইয়া লইয়া গেল। উড়িতে উড়িতে সেই পক্ষী যখন দেখিতে পাইল যে এ তাহার আহার্য্য বানর নহে, তখন বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে ব্যক্তি পক্ষীর নখরচ্যুত হইয়া স্বদেশে স্বগৃহের ছাদের উপরই পতিত হইল। তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় আপন পরিজন-বেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল; এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল; এবং তাহার ইচ্ছা হইল যে সেই পক্ষীটি প্রত্যহ এমনি করিয়া এক এক জনকে সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপ হইতে আনিয়া এই দ্বীপে নিক্ষেপ করিয়া যায়। কিন্তু তাহার সঙ্গীগণ যখন তাহাকে সেই পক্ষী-কর্ত্তৃক নীত হইতে দেখিয়াছিল, সকলেই তাহার জন্য অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু সেই বীভৎস পক্ষী-কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহার পরিণাম যে কতদূর সুখকর হইয়াছিল, তাহা যদি সেই নির্ব্বাসিতেরা জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা শোক না করিয়া বরং আপনারা তেমনি করিয়া সেই পক্ষী-কর্ত্তৃক নীত হইবার জন্য সমুৎসুক হইত।

মৃত পরিজন সম্বন্ধে "শুদ্ধাচারী লাতৃমণ্ডলীর" বিশ্বাস ঠিক্ উপরোক্ত গল্পটির অনুরূপ হওয়া উচিত। কেননা, সেই বন্ধুর পর্ব্বতময় বন্যজন্তুসমাকুল দ্বীপই আমাদের এই পৃথিবী, বানরেরা পৃথিবীর অধিবাসী মনুষ্যজাতি, নৌকামগ্ন যাত্রী নাগরিকেরা পৃথিবীর জ্ঞানী সাধু ব্যক্তিগণ; সেই সুখময় দ্বীপটি পরকালের রাজ্য, সাধুগণের আদিম নিবাস; এবং সেই বিকটাকার ভয়ানক পক্ষীই মৃত্যু। সমাপ্ত।

আবদুল্লা আল্-মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী।

সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

আগেই বলিয়াছি, ঘটনা-হিসাবে এই কাব্যখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে লোররাজ ও চন্দ্রানী রাণীর এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাতন ও ময়নাবতী রাণীর প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। আকারে উভয় খণ্ডই প্রায় সদৃশ।

লোর 'গোহারী' দেশের রাজা; ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। চন্দ্রানী 'মোহরা' দেশের রাজ-কুমারী। জনৈক যোগীর হস্তে চন্দ্রানীর চিত্রপট দেখিয়া লোর তদীয় রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়েন। এখানেই চন্দ্রানীর প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ ও লালসার উদয়। রাজার অভিলাষ; সুতরাং অপূর্ণ থাকিবে কেন? তিনি স্বীয় রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া 'ভুখিল' চকোরের মত চন্দ্রানীর উদ্দেশে মোহরা-গমন করেন। তথায় অনেক দিনের অবস্থানের পর চন্দ্রানীর সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। কেবল মিলন নহে, চন্দ্রানীকে লইয়া তিনি একদিন গোপনে চম্পট দেন।

বামনের সঙ্গে পূর্ব্বে চন্দ্রানীর পরিণয় হইয়াছিল। কিন্তু সে বামন পুরুষত্বহীন ছিল বলিয়া চন্দ্রানী বরাবরই তদীয় অধিনতাপাশ ছিন্ন করিতে অভিলাষী ছিলেন। সুতরাং সুযোগ পাইয়া তিনি লোরের সঙ্গে চম্পট দিতে কুণ্ঠিতা হয়েন নাই।

বামন ইহা জানিতে পারিয়া লোরের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্ট দৈবগুণে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লোরের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। পরে মোহরা-রাজ লোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রানীকে সানন্দে তদীয় করে সমর্পণ করেন। *

---

* হিন্দুশাস্ত্রে নিম্নোক্ত কারণ বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদের পত্যন্তর গ্রহণের বিধান আছে, যথা:—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥' (মনুসংহিতা।)

পাঠকগণের স্মরণ আছে, দৌলত কাজী 'গোহারী' ভাষার কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য রচনা করেন। সুতরাং হিন্দুনারীর পত্যন্তর ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। কাজী সাহেব ঋষির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বলিয়া আমাদের হিন্দুভ্রাতৃগণ তাঁহার উপর খড়্গ-হস্ত হইবেন না ত? তিনি হিন্দুর অনুরাগী ভিন্ন বিদ্বেষী ছিলেন না, তাঁহার কাব্যপাঠক একথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখনকার মত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সেকালে এত হিংসা বিদ্বেষ ছিল না, ইহাও এখানে স্মর্ত্তব্য বটে।

লোর স্বরাজ্য-গমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শ্বশুর-রাজ্য 'মোহরায়' অবস্থিতি করিতে থাকেন। পাঠক জানেন, ওদিকে ময়নাবতী স্বরাজ্যে আছেন। ছাতন নামক কোন বণিকপুত্র প্রোষিত-ভর্তৃকা ময়না রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসমাগমাশে 'রত্না' মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা অছিলায় রাণীর শৈশব-ধাত্রীর পদলাভ করে। মালিনী সময় সময় লোরের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে রাণীকে কখনো বা হতাশাস করিতেছে, কখনো বা পত্যন্তর, চাই কি, রাজধানীস্থিত ছাতন কুমারকে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতেছে। এরূপ নানা কৌশল-জালেও যখন মালিনী রাণীকে আবদ্ধ করিতে পারিল না, তখন অগত্যা সে ষড়ঋতুর বর্ণনা জুড়িয়া দিল। প্রথমেই আষাঢ় মাস *। দৌলত কাজী পরবর্ত্তী বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত লিখিয়া অমরধামে গমন করেন। তৎপর আলাওলের লেখা। তিনি লোরচন্দ্রাণী ও ময়নাবতীর মিলন-সংঘটন করিয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। কাব্যের মূল ঘটনা সংক্ষেপে এইরূপ হইলেও ইহাতে নানা প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা আছে; তৎসমস্তের উল্লেখ এখানে তত আবশ্যক নহে।

আলাওলের শক্তিমত্তা ও গুণাগুণ সর্ব্বজন-বিদিত; তৎসম্বন্ধে মাদৃশ ক্ষুদ্র লোকের কিছু বলিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থ-রচনায়ও তাঁহার লোক-প্রখ্যাত কবিত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণই আছে। কাব্যের আদ্যন্ত দৌলত কাজীর রচিত হইলে উহার উপসংহার কিরূপ দাঁড়াইত, জানি না; কিন্তু আলাওল সাহেব এই হিন্দু-কাব্যখানিতে মুসলমান-ভাব মিশ্রিত করিয়াই 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়াছেন। রজ্জু-সাহায্যে জল-মধ্য দিয়া পাতালে প্রবেশ, তথা হইতে পক্ষী-পৃষ্ঠারোহণ পূর্ব্বক পুনঃ পৃথিবীতে প্রত্যাগমন ও পক্ষীর পালক-ধারণ করতঃ বৃদ্ধ-রূপ গ্রহণ প্রভৃতি অবাস্তব ঘটনারাজির কথা পাঠ করিতে করিতে যেন কোন আরব্য বা পারস্য উপন্যাস পাঠ করিতেছি বলিয়াই মনে হয়। ফলতঃ কাব্যের উপসংহার ভাগ দেখিয়া ইহাকে হিন্দু-কাব্য বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। আলাওলের মত মহাকবি যে কেন এরূপ বিসদৃশ কাজ করিলেন, বলা কঠিন। ইচ্ছা করিলে তিনি

---

* আসরফ খাঁর নামের আদ্যক্ষর লইয়া কাজী সাহেব এই 'বারমাস্যা' রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ভক্তির সুন্দর নিদর্শন বটে।

হিন্দুভাব বজায় রাখিয়াও ইহা পরিসমাপ্ত করিতে পারিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?*

দৌলত কাজীও আলাওলের মত হিন্দুশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সমালোচ্য গ্রন্থে দৌলত কাজী শুদ্ধ সংস্কৃতে কয়েকটি গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে রচনা অতি কোমল ও মধুর। বঙ্গভাষায় যে তাঁহার অধিকার অসাধারণ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। 'ব্রজবুলী'তে তাঁহার অধিকার আরো বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক দৌলত কাজী ও আলাওল সর্ব্বথা মুসলমানসমাজে অতুলনীয়। অধিকন্তু, তাঁহারা যে বঙ্গীয়সাহিত্যদরবারে হিন্দু-কবিগণের সহিত একাসনে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, আশা করি, সে বিষয়ে কেহ ভিন্নমত হইবেন না।

দৌলত কাজী আলাওল সাহেবের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের লোক; সুতরাং তাঁহাদের ভাষার মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে, ইহা বিচিত্র নহে। আমাদের মতে মুসলমানদের এই দুই মহাকবি প্রায় সমতুল। দৌলত কাজী বিদ্যাবুদ্ধিতে বা কবিত্বে আলাওল সাহেব অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বলিয়া বোধ হয় না। আলাওল নিজেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আলাওলের মত কবি তদপেক্ষা কোন কম ক্ষমতাশালী কবির অসমাপ্ত কাব্যের সমাপ্তি-বিধান করিতে কদাপি যাইত না, ইহা ত সহজেই বলা যায়। ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট সুকবি বলিয়া মান্য হইবার যদি কোন কবি মুসলমানদের থাকে, তবে সেই কবি দৌলত কাজী ও আলাওল সাহেবই। ইঁহারা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। বহুভাগ্যেই কোন সমাজে এমন লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থখানি পরম মনোজ্ঞ। ইহার আদ্যন্ত বিবিধ সুন্দর ছন্দ-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, সুললিত পদ-লালিত্যে অমৃতায়মান, ভাবও কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে একান্ত তৃপ্তি-প্রদ। পূর্ব্বে যে দীর্ঘ ঋতু বর্ণনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে বঙ্গভাষায় অতুলনীয়। ময়নাবতী ও মালিনীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে গভীর পাণ্ডিত্য, অনুপম কবিত্ব ও ছন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ও পদলালিত্য

---

* দৌলত কাজীর অনুসৃত 'গোহারী' ভাষার গ্রন্থাবলম্বনে আলাওল সাহেব এই উপসংহার বিধান করিয়াছেন কিনা, বলা দুষ্কর। ইহার জন্য ঠিক আলাওল দায়ী কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকিলেও, উক্ত মূলগ্রন্থের অসদ্ভাবহেতু সত্য নির্ণয়ের সুবিধা না থাকায়, তৎকৃত কর্ম্মের জন্য আলাওলকেই দায়ী করিতে হয় বটে।

দর্শনে মুগ্ধ না হইবেন, এমন নীরস লোকই নাই। এই গ্রন্থ কাব্যামোদী ও ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট সমান আদর পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিম্নে উক্ত কবির রচনার কিছু কিছু নমুনা প্রদান করিলাম।*

মালিনীর বিনয়।

পয়ার।

জাগিল ভাদ্র মাস গহন গম্ভীর।
চৌদিগে বরিষে নির্ভর ঘন নীর॥
গর্জ্জএ প্রচণ্ড মেহ (মেঘ) মণ্ডলী নিপুণ।
পাতাল শয্যাতে নাগ হৈলা কম্পমান॥
ঘোরতর রজনী দীঘল ভয়ঙ্কর।
দাদুরীর কল্লোলে জাগএ বিষধর॥
পঞ্চশরে পৃথিবী সকল হৈল বশ।
সুরতি সম্ভোগ ভেজে কাহার মানস॥
দিনে ২ জীবন যৌবন যায় তোর।
অথনেহ হিততত্ত্ব শুনহ যে মোর॥

ময়নার উত্তর।

রাগ ধানশী॥

জাগহ সুসম্পদ সুখকে বিপদ
দুঃখ সম জান মোর ভাব।
দিবসি মোর নিশি একাকিনী জাগো বসি
হরি বিনে সতত উত্তাপ।
মালিনী, আমি বড় দুঃখী অপরাধী।
যে দুঃখ মোহর পরে, পড়োক সতিনী শিরে
চন্দ্রানী হইল মোর বাদী।
মলয়জ অঞ্জন পরিমল চন্দন
বিষ সম তনু বিনে মোর।

* এখানে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদ আছে, সন্দেহ নাই। একাধিক পুঁথির সাহায্য ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যের বিশুদ্ধ পাঠ কোন মতেই দেওয়া যায় না। 'লোর চন্দ্রানীর' অনেকগুলি প্রাচীন প্রতিলিপি আমাদের নিকট সংগৃহীত থাকিলেও এখানে পাঠান্তরাদি প্রদান করিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

মহারাজ-নন্দিনী যে চান্দ গোহারিণী
নৈল যেও মোহর সিন্দুর॥
নটবর বেশরস রঙ্গ উল্লাস হাস
কাহাতে কহিমু কি না লাগি।
যৌবন সময়ে ধরি বিদেশে রহিল ছাড়ি
হাস বড় বিরহে বিরাগী॥
চকোর চকিত জনি রজনী দম্পতী বিনি
একাকিনী জাগ প্রেমত্রাসে।
লোর বিনে লোর ধোর নয়ানে বরিখে মোর
তনু দহে মদন হুতাশে॥
অবিরত হরি-রতি জপয়তি কলাবতী
আন মানসে নহি ভায়।
শ্রীআসরফ খান শুনহ সতীর গুণ
কাজী দৌলতে রস গাএ॥ (দৌলত কাজী।)

মালিনীর বিনয়।

রাগ—মল্লার।

তরণি প্রচণ্ড ধরণী খণ্ড খণ্ড
তরকি রহো জল বিন্দে।
বাহির দিনকর বিরহ অন্তর।
নিদাঘ সময় কঠিনে॥ ধু।
শুন ধনি জ্যৈষ্ঠ ষট ঋতু একরে।
রসিক রস রতি মানএ রস অতি
বঞ্চিত সুখ আতিরে॥
মধু ধমকত চপল চমকত
গগনে খণ্ড খণ্ড গর্জ্জেউ।
ডাউক দাদুর কুহকে গিরি ঘর
সময় পাহুক বাজউ॥
জখন ঘন ওর উদয় হিমকর
শীতল নিরমল বাতিআ।

আঞ্জন রঞ্জন নয়ান খঞ্জন
বিরদ শারদ ভাতিআ॥

* * *

তোহো সুনাগরী সুরূপে আগরি
অতুল সম্পদ ধরাই।
সুখ নিবারণ আপন বন্ধন
কেন লই সরির পৈরাই॥ (?)
বৃথা এ যৌবন না কর আপন
মিলাও নাগর ভলো রে।
গুনিক সম্পদ রহুক নিরাপদ
শ্রীযুত ছোলেমান রে॥

ময়নার উত্তর।

যমক ছন্দ।

মালিনীর বচন শুনিআ ময়না রাণী।
বিরস বদন হৈআ কহে কষ্ট বাণী॥
স্বামীর বিচ্ছেদে মোর অসন্তোষ চিত্ত।
সংসারের যত সুখ হৈল বিপরীত॥
মোহর ঘরেত মোর আসিবেক যবে।
এক খাতে ঘট খাত্রু সুখ হৈব তবে॥
ভিন্ন জন সনে সুখ পাপ অপ্রতিষ্ঠা।
চন্দন তেজিআ মক্ষী যেন খাএ বিষ্ঠা॥
কিবা নিশি কিবা দিশি সমীর বাদর।
সর্ব্ব মতে দহএ আমার কলেবর॥
কাল কাকোদর যেন ঝাঞ্জানির শ্বাস।
লহ লহ জিহ্বাএ যামিনী পরকাশ॥
সঘন গর্জ্জনে করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন॥
ডাউক দাহুরী রবে হিআ জলে দুখে।
গরল বরিখে কর্ণে শিখিনী কুহকে॥

বাত বৃষ্টি হইলে শীতল হএ তনু।
মোহর শরীরে জলে বাড়ব কৃশানু॥
কোকিল ভ্রমর নাদে কর্ণে ফুটে শাল।
বিচটির পত্র যেন লাগে পুষ্প মাল॥
চন্দ্রগেম চন্দনে অন্তর ধিক জলে।
'পনি' * পরে পঙ্ক যেন লিপএ কুলালে॥
কণ্টক ফুটএ অঙ্গে কোমল শয্যাত।
পিয়া বিনে মোর গৃহে লাগএ উৎপাত॥
পুষ্পের সৌরভে নাসার শ্বাস বন্দি হএ।
স্বামী বিনে হিত সব অহিত করএ॥
হিত শত্রু হইলে জীবন কিসে আর।
তাহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার॥
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ-পতি।
সিংহ শৃগালের কোথা একত্রে বসতি॥ (আলাওল।)

স্থানে স্থানে কথার বাঁধুনি দেখিয়া অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির কথা মনে হয়। মুসলমানের লেখনীও এতটা মধুবর্ষণ করিতে পারে, দেখিলে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় জন্মে। এই কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখুন :—

(১) দারুণ ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণ বিরহিতে
ছোহএ মনে মদন॥

(২) ধাই বড় পাপিনী পাপ শুনায়সি
ধরম করাওসি বাম।
পানক উপঘাত ধাই মোর চিন্তসি
জাতি কুল করহ নির্ণাম॥

(৩) রে ময়না পরব দেওয়ালি।
উক্তিয়রাতি (?) খেলএ মঙ্গল
ছত্রিশ জাতি ব্রাহ্মণী ক্ষেত্রিনী বিবিধ ভাতি পাতি পাতি।

---

* পনি—কুম্ভকারের 'পোয়ানি'।

রমণী মণ্ডল বাসে মদন মদে অতি রতি বিলাসে।
পীড়তি ময়নাবতী বিরহ-হুতাশে নিয়তি দোষে।

(৪) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ।
কামপুর মোর হৈল শূন॥
কি মোর জীবন রে।
জীবন নহে মোর জঞ্জাল-জাল,
ধাক্কি হৈল মোর প্রাণের কাল।

(৫) নব চূত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলি কুল কল কল কূজিতি
শোভিত ললিত নিকুঞ্জে॥
কেতকী চম্পক কদম্ব মরবক
বকুল সকুল (?) লবঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মানিনী মন বিভঙ্গে॥ (দৌলত কাজী।)

(৬) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বরিখে নাদর বিথ তরঙ্গ।
মলয়া সমীর অনল তুল।
কঠিন কণ্টক মালতী ফুল। (আলাওল।)

উপরে এতক্ষণে যাহা বলা হইল, এই কাব্যের স্বরূপ ও উপাদেয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়, বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় ক্ষীণশক্তি সমালোচকের দ্বারা, ইহার উপযুক্ত ও প্রকৃত সমালোচনা আদৌ অসম্ভব। আমাদের মাননীয় দীনেশ বাবুর দক্ষহস্তে পতিত হইলে, এই গ্রন্থখানিও তাঁহার অমরকীর্ত্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র একপ্রান্তে' একটু স্থানাধিকার করিতে পারিত। মুসলমানসমাজের পরম হিতৈষী ও গুণগ্রাহী দীনেশবাবু তাঁহার অমূল্য গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে আমাদের এই কবিকেও একটু স্থানদান করিয়া এই অধঃপতিত সমাজকে আরো উপকৃত ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন না কি? সহৃদয় দীনেশবাবু আমাদের এ আবদার রক্ষণে কদাচ বিমুখ হইবেন না, আশা করি।

আলাওলের রচনায় 'আনন্দ বর্ষার' একটা প্রস্তাব এই কাব্যে আছে।

ঠিক সেই উপাখ্যান সম্বন্ধেই আমরা 'শশিচন্দ্রের পুঁথি' নামক একখানা প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার রচয়িতা রামজী (?) দাস। উক্ত উভয় স্থানেই উপাখ্যানাংশ এক; তবে তদ্বর্ণিত নায়ক নায়িকাগণের নামধাম সম্বন্ধে যাহাই কিছু বৈসাদৃশ্য আছে মাত্র। রামজী দাসের বা তদ্রচিত গ্রন্থ-রচনার কাল নির্ণিত হয় নাই। সেকালের কবিগণ প্রায়ই কোন না কোন সংস্কৃত বা অপর ভাষার গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কাব্যাদি লিখিতেন। বোধ হইতেছে, উক্ত উপাখ্যানটিও আলাওল বা রামজী দাস কাহারো স্বকীয়-কল্পনা-প্রসূত নহে। তাঁহারা উভয়েই অপর কোন মহাজনের অধমর্ণ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভাষায় উহার আদি প্রবর্ত্তক কে, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য বটে। যে পর্য্যন্ত এই দুই পুঁথি লোকলোচনের গোচরীভূত না হইবে, সে পর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ের মীমাংসা হওয়ার নহে। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই উভয় পুঁথির তুলনায় সমালোচনা করিয়া এই বিষয় নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

কয়েক বৎসর হইল, এই পরম উপাদেয় সমালোচ্য কাব্যখানি জনৈক অশিক্ষিত মুসলমান-কর্ত্তৃক অতি জঘন্য ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের গৌরবের স্থল আলাওলাদির দুর্দ্দশা দেখিলে হৃদয়ে দারুণ আত্মগ্লানির উদয় হয়। আমাদের সমাজের বড়লোকেরাত রঙ তামাসায়, নাচগানে, উপাধিলোভে ও গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্তোষ-বিধানে বৎসর বৎসর অজস্র অর্থরাশির সদ্ব্যবহারে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। সুতরাং বঙ্গের কৃতীসন্তান, মুসলমানসমাজের মুখোজ্জ্বলকারী হতভাগ্য আলাওলাদির প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত না করিলেও যখন তাঁহাদের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ থাকিবে না, তখন কি গরজে পড়িয়া তাঁহারা আবার অতটা 'পেরেসানি' ভোগ করিতে যাইবেন? হায় দুর্ভাগ্য কবিগণ! কোন্ পাপে না জানি তোমরা এ অধঃপতিত সমাজে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে! আমাদের এ পোড়ামুখে আবার কলঙ্ক কালিমা লেপনের জন্যই কি তোমরা মর্ত্তধামচ্ছলে এখানে আসিয়াছিলে? তোমাদের স্বজাতীয় এত লোক থাকিতেও আজ পরজাতীয় ও পরধর্ম্মী লোকেরা তোমাদের কীর্ত্তিদেহের সৎকার করিতে উদ্যোগী, ইহা দেখাই কি তোমাদের অভিপ্রেত ছিল? কিন্তু এ অরণ্যে রোদনে ফল নাই! অস্থানে পতিত হইলে রত্নের যে এমন দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে?

আবদুল করিম।

আলি পাশা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

এই সময় হইতে অদ্ধশতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আলির কার্য্য-গতি অবাধ উন্নতিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল। তিনি এতাদৃশ সম্মানের স্বর্ণসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন যে, সেরূপ ঘটিবে বলিয়া কখনো স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। তিনি প্রথমতঃ কতিপয় বিবাদরত সর্দারদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আলির প্রতাপ, সাহস ও কার্য্যদক্ষতা সর্ব্বত্র বিঘোষিত ছিল, এজন্য তৎসাহায্য আগ্রহের সহিত গৃহীত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে তিনিও যথোচিতরূপে পুরস্কৃত হইতে লাগিলেন। এই উপায়ে বহু ক্ষমতাশালী বন্ধু এবং দেশবিদেশ অপরাপর সুবিধা তিনি প্রাপ্ত হইলেন। চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ডেলভিনোর পাশা কেপলানের পরম রূপলাবণ্যবতী সুশীলা-দুহিতা, আমেনার পাণিগ্রহণ করায় আলির প্রভাব অধিকতর-বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

এই কেপলান পাশার কিঞ্চিৎ পরিচয় এস্থলে দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি এক-জন ভীষণ প্রকৃতির অত্যাচারী লোক ছিলেন। এই হেতু তিনি "ব্যাঘ্র" এই উপনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্যাঘ্র যেরূপ হিংস্র ও খলচরিত্র হয়, কেপলানও প্রায় তদনুরূপ ছিলেন। তিনি মহামান্য তুরস্ক-সুলতানের শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন বলিয়া বরাবরই সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে সেই সঙ্কল্প অসম সাহসিক জামাতা আলির সাহায্যে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সাহসে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল; নব নব আশায় মুগ্ধ হইয়া আকাশ কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন। জামাতার সহিত তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেও বাকি রহিল না। আলি সেই কার্য্যের অনুমোদন করিয়া আগ্রহা-তিশয্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি বিষকুম্ভ পয়োমুখ, তাঁহার অন্তর বাহির এক প্রকৃতির নহে। কেপলান প্রভুদ্রোহী—অতি ভয়ানক লোক। কিন্তু আলি তদপেক্ষাও ক্রূরকর্ম্মা। তাঁহার আত্মপর জ্ঞান নাই। তিনি স্বার্থের জন্য কোন্ কর্ম্ম না করিতে পারেন? আলি শ্বশুরকে অমোচনীয় অপরাধে বিজড়িত করিয়া স্বয়ং লাভবান হইবেন, তদ্বিষয়িনী চিন্তাই হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কেপলানের অভিপ্রায়ানুকূল একটি ঘটনাও সমুপস্থিত হইল।

গ্রীকেরা স্বাধীনতা লাভার্থ বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে স্বার্থান্বেষী রুষিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। তজ্জন্য সেনাপতি অর্লফের কর্তৃত্বাধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হইলে আলবেনিয়া, মণ্টিনিগ্রো, কিমারিয়ৎ প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ঈদৃশ আকস্মিক বিদ্রোহ দর্শনে ভীত হইয়া তুরস্ক-মন্ত্রীসভা সমুদয় মুসলমানসমাজকে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে কেপলান পাশা, খুর্দ্দ পাশার সহিত সম্মিলিত হইয়া বিদ্রোহী কিমারিয়ৎ ও সুলিয়ৎ সম্প্রদায়কে বশীভূত করনার্থ আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক জামাতার কুপরামর্শের বশীভূত হইয়া সেই আদেশ অমান্য করিলেন, তাঁহার দুরভিসন্ধির দুর্ভেদ্য অবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ কেপলানও বিদ্রোহী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি স্পষ্টতঃ বিদ্রোহীদিগের সাহায্য করেন নাই। তবে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে মহামান্য সুলতানের সৈন্যগণকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অল্পদিনেই বিদ্রোহ-বহ্নি সর্ব্বত্র নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু দুরাচার সুলিয়ৎগণ দুর্ভেদ্য দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপে অবস্থান করিল। এই আংশিক অকৃতকার্য্যতা যে কেপলানের রাজাদেশ অমান্যের ফল, তাহা অনেকেই ধারণা করিয়া লইলেন।

পাঠক! এক্ষণে একবার স্মরণ করুন, ইতিপূর্ব্বে আলি নীচতার সহিত যে কার্য্য ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা অবিলম্বে ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। সুলিয়ৎ সম্প্রদায়ের দমনের বিফলতা কেপলানের অবহেলা বা বিশ্বাসঘাতকতার উপর আরোপিত হইল। তিনি স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারসভায় আহূত হইলেন। কিন্তু কি অমানুষিক পৈশাচিক ব্যবহার! আলি স্বীয় স্বার্থসাধন জন্য নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি শ্বশুরের প্রতিকূলে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আত্মীয় বৎসলতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। তিনি এই জঘন্য কার্য্য তুরস্কপতির কর্ম্মচারিগণের নিকট গুপ্ত পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের ধন সম্পত্তি এবং পদ-প্রভুত্ব পাইবার আশা করিয়াই আলি এতাদৃশ নীচতার চরম সীমায় সমুপস্থিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাছে শিকার বিস্তৃত বাগুরা ছিন্ন করিয়া ফেলে, তজ্জন্য তিনি ভ্রান্তমতি কেপলানকে বিচারসভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উপদেশ দিলেন। তাহাতেও কেপলান ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া নৃশংস আলি স্বীয় সহধর্ম্মিণী আমেনাকে কাকুতি মিনতি

সহকারে তাঁহার প্রস্থান ঘটাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সরলা আমেলা কিছুই জানে না, পিতাকে বিচার সভায় যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। তিনিও পাগলোপমা দুহিতার কথায় অন্যমত করিলেন না, যথারীতি অনুচর-গণসহ সরল মনে প্রস্থান করিলেন। তথায় দণ্ডাজ্ঞা ইতিপূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সুতরাং কেপলান পঁহুছিবা মাত্র শিরশ্ছেদন-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

এদিকে দুর্ভাগ্য বশতঃ, আলির কোন শারীরিক শাস্তি হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহার জন্য এতদূর কলুষিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। লাভের মধ্যে তাঁহার দুর্নামের কলঙ্ক ও লজ্জা উপার্জ্জন হইল মাত্র। আলি শ্বশুরের পদ বা ধনসম্পত্তি কিছুই পাইলেন না। তুরস্কাধিপতি আর্জিরো ক্যাষ্ট্রোর শাসনকর্ত্তা আলি নামধেয় অপর এক ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিলেন। এই ব্যক্তি সুলতানের নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

আলির আশালতা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। তিনি লজ্জা ক্ষোভ ও অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন; কখন বা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দন্তে দন্ত-ঘর্ষণ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ইহার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করিতে ক্ষান্ত রহিলেন না। অবশেষে সুযোগ ক্রমে এক অঘটন ঘটনার উপক্রম হইল। নব প্রতিষ্ঠিত আর্জিরো ক্যাষ্ট্রোর শাসনকর্ত্তা আলি তখনও অবিবাহিত ছিলেন। খামকো স্বীয় দুহিতা সাই-নিৎজার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সাইনিৎজা তখন যুবতী, শ্রীসম্পন্না এবং মনোরমা ছিলেন। নব পাশা তাঁহার সৌন্দর্য্যের লহরী-লীলায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। অতি সমারোহের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সাইনিৎজা প্রফুল্ল বদনে স্বামী-গৃহে নীতা হইলেন। এই বিবাহ বন্ধন দ্বারা উভয় পরিবার চিরদিন অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইল, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু কার্য্যে কতদূর দাঁড়ায়, তাহা পাঠকগণ অতঃপর দেখিতে পাইবেন। সাইনিৎজার গুণবান স্বামী নব প্রণয়িনীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। শ্যালক আলিকেও ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতে লাগিলেন না। কিন্তু আলির আন্তরিক ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ক্রূর বিষধর কি আত্মপর জ্ঞান করে? আবশ্যক হইলে সে আপন সন্তানকেও গ্রাস করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই আপনার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যে ব্যক্তির অঙ্কশায়িনী

হইয়াছে, তিনি তাঁহার ধ্বংসসাধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিলেন। সে ক্রোধানল তাঁহার অন্তরে প্রবল প্রভায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এক্ষণে কি উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবেন, সেই কৌশল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলেন না, অধীর হইয়া তাঁর ভগ্নীর নিকট ভগিনীপতিকে বিনাশ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কহিলেন, "ভগিনী! তোমার স্বামীর কার্য্যকলাপে আমার অন্তর অতীব অনুতপ্ত হইয়াছে, বোধ করি, তুমিও তাহার ব্যবহারে আশানুরূপ সুখিনী হইতে পার নাই। অতএব সেই নির্ম্মম পশুকে বিষপ্রদানে নিপাত কর—আমাদের উভয়ের মনস্তাপ বিদূরিত হউক; অতঃপর তোমার কিছুরই অভাব হইবে না।" কি নিদারুণ কথা! কি পৈশাচিক প্রস্তাব!! সাইনিৎজা শ্রবণ মাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল-মুখ-কমল বিশুষ্ক হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদার্দ্র হইল। কহিলেন "ভাই! এ তোমার কি নিদারুণ প্রস্তাব! ছি ছি ভ্রমেও ওকথা আর মুখে আনিও না। অভাগিনীর অপরাধ ক্ষমা করিও।" বলিয়া মুখ অবনত করিলেন। আলির প্রস্তাব উপেক্ষিত হইল—শিকার জালে পতিত হইল না, দেখিয়া ধূর্ত্ত অমনি অন্তরের ভাব চাপিয়া রাখিয়া ধীর গম্ভীরে কহিলেন "ভগিনী! আমি কি ক্ষিপ্ত! কেবল রহস্য করিবার জন্যই ওকথা বলিয়াছি, জানিবে। কে কোথায় আত্ম-বলিদান দিয়া থাকে ভগিনী! ভ্রাতায় কি স্নেহময়ী ভগিনীর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে? কখনই না, জীবন থাকিতে—না, অতএব শান্ত হও, মনে কিছু করিও না।" এই বলিয়া বিবিধ প্রকারে ভগিনীপতির গুণ-গরিমা ও সম্মান-সৌভাগ্যের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এবং সাইনিৎজার অন্তরে এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন যে, তিনি বাস্তবিকই বুঝিলেন, স্বামীর নিধন-সাধন জন্য ভ্রাতা এ কথা প্রকাশ করেন নাই, ইহা রহস্যই বটে। এই বিশ্বাস ও ভ্রাতৃবাৎসল্য বশতই সাইনিৎজা সেই ঘৃণিত পাপ-প্রসঙ্গ অন্তর হইতে চির-বিদায় দিয়াছিলেন—কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। হায়, সরলে সাইনিৎজে! যদি তাহা ঘুণাক্ষরেও ব্যক্ত করিতে, তবে পরিণামে তোমার প্রিয়তম স্বামী নিরপরাধ পাশার অপমৃত্যু সংঘটিত হইত না।

আলি আবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পাশার সোলেমান নামে একটি ভ্রাতা ছিল। আলি তাহাকে আশাতিরিক্ত প্রলোভনে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। কহিলেন "এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, তিনি ষোড়শী

রূপসী সাইনিংক্ষা ও পাশার [illegible] তাহাকে প্রদান করিবেন, কেবল [illegible] পালনের অনুমতি লইলেন। [illegible] সোলেমানের সম্মত হইল। তখন উভয়ে [illegible] হইল। হায়রে কামিনী-কাঞ্চন! তোমাদের অপরিসীম প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া [illegible] ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। [illegible] ভগিনীর হৃদয়ে [illegible] ভগিনীকে সমর্পণ করিতে [illegible]। হায়, তোমাদের মহিমা বর্ণনাতীত!

সঙ্কল্পিত ভীষণ কার্য্যে [illegible] সাহায্য লাভ করিল এবং তাহারা দুইটি মাত্র প্রাণী ঐ নিভৃত কারা মধ্যে থাকায় উভয়ের অভীষ্ট সিদ্ধ বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রত্যহ রাজবাটী পরিদর্শন করা তাহাদের উভয়েরই অভ্যাস ছিল। এবং বিশ্বাস ঘাতকতার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ যে তাহাদের চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া দিবে, উভয়ের এমন কোন সঙ্গীও ছিলনা। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে পাশার প্রাসাদে গমনাগমন করিতে লাগিল। একদা ঘাতকদ্বয় পাশার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। সরলহৃদয় পাশা তাহাদের আশা পূর্ণ করিলেন। পাশা উভয়ের সম্মুখীন হইবামাত্র নৃশংস সোলেমান স্বীয় হস্তে স্থিত পিস্তল পাশার বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল। প্রবলবেগে গুলির আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা এই ভীষণ শব্দ গৃহ শব্দায়মান করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। অমনি পতিসোহাগিনী সাইনিংক্ষা আলুথালু বেশে দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রাণাধিক স্বামী রক্তাক্ত কলেবরে উভয় ঘাতকের মধ্যে ধরাশায়িত রহিয়াছেন। তিনি আর্ত্তনাদ সহকারে সাহায্য প্রার্থনা আশায় চীৎকার করিতে উদ্যত হইলে, নিদয় আলি কহিলেন, "চুপ কর, নতুবা তোমাকেও ঈদৃশ অবস্থা ভোগ করিতে হইবে।" অবলা-বালা নীরব হইলেন, তখন আলি সাইনিংক্ষাকে তাঁহার গাত্রাচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিবার সঙ্কেত করিলে সোলেমান তাহাই করিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা সাইনিংক্ষা সোলেমানের স্ত্রীরূপে গৃহীত হইলেন, আলি ইহাই ব্যক্ত করিলেন। ফলতঃ এই ভয়াবহ কাণ্ড অধিকতর দৃঢ় ও নির্দ্দোষ করণার্থ নিহত স্বামীর উষ্ণ শব-পার্শ্বেই সাইনিংক্ষার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিছুদিনের মধ্যে সোলেমানের সংসর্গে সাইনিংক্ষা সর্ব্ব শোক বিস্মৃত হইলেন। হায় সংসার! কি বিচিত্র! মানবের অন্তর কি পরিবর্ত্তনশীল!!

(ক্রমশঃ)।

আওরঙ্গজেব কি সত্যই দোষী ?

ভারত-সম্রাট আওরঙ্গজেব ইতিহাস-পৃষ্ঠায় দারুণ কলঙ্কিত। ইতিহাস পাঠ করিলে আওরঙ্গজেবকে মানব বলিতে ইচ্ছা হয়না। বোধ হয় আওরঙ্গজেব মানব-শরীরে রাক্ষস বা পিশাচ। কিন্তু সত্যই কি তাই ? কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গ পর্য্যন্ত ভারতের একমাত্র অধিশ্বর, একমাত্র শাসন-দণ্ড-পরিচালক—ধর্ম্মের, ন্যায়ের একমাত্র প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ আওরঙ্গজেব সত্যই কি এত কলঙ্কী ? সে বিষয় আজ আমরা একটু আলোচনা করিব।

মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু-লেখকগণকেই ইহার জন্য দায়ী করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়না। কারণ তৎকালিক হিন্দু ইতিহাস-প্রণেতা নহে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ইতিহাস তৎকালে সঙ্কলিতও হয় নাই, বহুবর্ষ পরে ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ কর্ত্তৃক উহা লিখিত হয়। তখন তাঁহাদের সাধারণ লোককে মোগল-রাজত্বের প্রতি অশ্রদ্ধাবান করা বিশেষ আবশ্যক। তাহা না করিলে ইংরেজদের উপর জন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় না।

তাৎকালিক ইংরেজগণ স্বার্থের জন্য যে, ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের পুস্তকাবলীতে পূর্ব্বতন ইংরাজগণের চরিত্র সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত। তবে আমরা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য যে, হিন্দুগণ সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্দোষ নহেন। ইতিহাস-সঙ্কলয়িতাগণের সহায়তা যে তাহারা করেন নাই, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না। যে উদারতা গুণে হিন্দুগণ একদিন বিধর্ম্মী বুদ্ধকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সে উদারতা তাঁহারা অনেক দিন পূর্ব্বে হারাইয়াছিলেন। তাহারা তৎকালে বিস হারাইয়া কুলোপানা চক্র বজায় রাখিতে ক্রটি করেন নাই।

মারীচ বলিয়াছেন "রামেই মারুক আর রাবণেই মারুক আমি ত মরিয়া আছি।" যে কারণেই হউক আওরঙ্গজেব ত কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন।

অবশ্য আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বা দেবচরিত্র বলিতে চাহি না। মানবের ভ্রান্তি পদে পদে। আওরঙ্গজেবও মানব। তবে আজ যে সকল লেখক-গণের কৃপায় তাঁহার গুণটিও দোষে পরিণত হইয়াছে তাহা ক্ষালন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আওরঙ্গজেবের দোষগুলি উল্লেখ করিয়া তৎসমুদয়ের সমালোচনা করা যাইতেছে।

১ম। পিতা ও ভ্রাতার প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিয়া তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

২য়। তিনি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না।

৩য়। হিন্দুজাতির প্রতি তিনি ঘোরতর অত্যাচারী ছিলেন।

১ম। পিতার প্রতি অস্ত্রধারণ মোগল-রাজগণের এক প্রকার নিত্য-ব্রত। এই নৃশংস কার্য্যে ইতিহাসের অকলঙ্ক জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহানও লিপ্ত। কিন্তু যত দোষ আওরঙ্গজেবের বেলায়! এইখানেই যত মহাভারত অশুদ্ধ। তিনি বাল্যে যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন যৌবনে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। আবার তিনিও পুত্রের নিকট সেই ব্যবহার লাভ করেন। তদীয় পুত্র আকবর রাজপুত-বীর রাজসিংহের সহিত মিলিত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তবে আকবর, জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গজেব কৌশলী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাই তাঁহারা সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শাহ্জাহান ততদূর ছিলেন না* তাই তিনি পুত্রকে সিংহাসন দিতে বাধ্য হয়েন।

২য়। সন্তানের প্রতি পিতার পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ তিনি রাজা। তাঁহার একবিন্দু পক্ষপাতে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। এই অবস্থায় সেই পিতা অপরিণামদর্শী পরের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলী স্বরূপ দারাকে সিংহাসন দিবার জন্য তাঁহাকে কৌশলক্রমে সুদূর দাক্ষিণাত্যে নির্ব্বাসিত করিলেন। আবার 'বাঘ মারিতে শত্রু পাঠাইয়া এই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ বিজয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে

---

* যেসময় আওরঙ্গজেব বিদ্রোহী হয়েন প্রকৃত পক্ষে সে সময় দারাই সম্রাট। আওরঙ্গজেব ঠিক পিতার প্রতি বিদ্রোহী হয়েন নাই। সত্য কথা বলিতে হইলে তিনি কপটাচারী দারার বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থিত হয়েন।

আদেশ করিলেন।* যে সময় আরঙ্গজেব মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত, সেই সময়েই সম্রাট নিজের অসুস্থতার ভান করিয়া দারাকে সিংহাসন দানে কৃতসঙ্কল্প। জগতের মধ্যে প্রধান পূজার পাত্র শ্রেষ্ঠ হিতকারী পিতা যাহার প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে পারেন; সে ব্যক্তি কি কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে ? এই অবিশ্বাস জনিত দোষের মূলতঃ দায়ী কি তাঁহার পিতাই নহেন ? অথবা দারা ও শাহজাহানের হিন্দুমুসলমান মন্ত্রীবর্গ নহেন ?

৩য়। যে সময়ে কৌশলক্রমে দারা সিংহাসন অধিকার করেন তখন হিন্দুগণই তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। রাজপুত বীর যশোবন্ত সিংহ দারার সেনাপতি হইয়া উজ্জয়িনীর নিকটে আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করেন।

ইহাতেও যে তিনি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছেন তাহা নহে। তিনি রাজত্বের প্রথম ১০ বৎসর কাহারও প্রতি অত্যাচার বা উৎপীড়ন করেন নাই। কিন্তু সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। এদিকে রাজপুত, ওদিকে মহারাষ্ট্রগণ মুসলমানের প্রতি কঠোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা ধর্মান্ধ হইয়া মসজিদ ভাঙ্গিতে, মোল্লাদের কাটিতে, মুসলমানের গৃহ-দাহ করিতে, প্রবৃত্ত হইল। ইহার উপরে আগ্রার নিকটবর্ত্তী সৎনামী নামক এক হিন্দু সম্প্রদায় ১৬৭৬ অব্দে ঘোরতর বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এদিকে চট্টগ্রামে ও আরাকানে পর্ত্তুগীজেরা হিন্দুগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া লুণ্ঠনবৃত্তি আরম্ভ করে। যশোবন্ত-সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় সম্রাটের মাতুল ও সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ পুনা-দুর্গে শিবজী কর্ত্তৃক আহত হয়েন। এই সমুদয় দেখিলে শুনিলে কাহার ধৈর্য্য থাকে ? যার থাকে সে মানুষ নহে— হয় দেবতা নয় অক্ষম পশু। আওরঙ্গজেব দেবতা নহেন্ রক্ত মাংস সম্পন্ন মানব। অক্ষমও নহেন এক সময়ে তিনি দিল্লীর ও বাঙ্গালার। সমুদয় সৈন্য

---

* কান্দাহার অঞ্চলে দুর্দ্দান্ত উজবেগজাতিকে দমন করিবার জন্যও আওরঙ্গজেব প্রেরিত হন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যতে মঙ্গলই হইয়াছিল। স্বীয় বলবীর্য্য ও অদম্য পরাক্রম প্রকাশের অবসর পাইয়া তিনি সৈন্যগণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। উজবেগদিগের সহিত যুদ্ধকালে যখন সান্ধ্য উপাসনার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন দারুণ অস্ত্রঝঞ্ঝনা, মৃত্যু-বিভীষিকাময়ী অগ্নিক্রীড়ার মধ্যে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিষ্কম্প হৃদয়ে উপাসনার্থ আওরঙ্গজেবকে অটল পর্ব্বতের মত দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া সৈন্যেরা চিনিয়াছিল যে; তিনি কি ধাতুর লোক ছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যতে যশোরাশি সেই ক্ষণেই সূচিত হইয়াছিল। সঃ সঃ।

† যে সময় দারা সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে উদ্যত হয়েন তৎকালে শুজা বঙ্গদেশে

ও সেনাপতিগণকে পরাভূত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সহ্য করিবেন কেন? ১৬৭৭ অব্দে জিজিয়া কর * প্রবর্ত্তিত করিলেন। ক্রমে হিন্দুদিগের অত্যাচারের মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তিনিও তাহার প্রতিশোধার্থ ততই অত্যাচারী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাৎকালিক হিন্দু ক্ষুদ্র সামন্ত চক্রের অন্তর্গত, সুতরাং তাঁহাদের অত্যাচার ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইল না। আর সম্রাট দিল্লীশ্বরের অত্যাচার কাহিনী কোথাও অবাস্তু রূপে কোথাও বা তাহার উপরে আর একটু রং ফলাইয়া ইতিহাসে উঠিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে যে কারণেই হউক না মোগল সাম্রাজ্য অন্তঃসার শূন্য হইয়া উঠিল সুতরাং সে দোষটি তাঁহার স্কন্ধে চাপাইবারও বিশেষ সুবিধা দাঁড়াইল।।

তিনি যে কেবল হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারী ছিলেন তাহা নহে। যে কেহ তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভু-শক্তির প্রতি অপব্যবহার করিয়াছে তাহারাই তাঁহার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্য। এই উভয় রাজ্য দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। এই রাজ্যদ্বয়ের অধিপতিগণ হিন্দু নহেন, মুসলমান। এই উভয় রাজ্য তাঁহা-দ্বারা যে নিপীড়িত হইয়াছিল ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

ভ্রাতৃবর্গের প্রতি তিনি যে অত্যাচার ও অপব্যবহার করিয়াছিলেন তাহারও অনেক কারণ আছে। ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। হুমায়ুন কামরাণের প্রতি যে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার নিকট এ সমুদয় অকিঞ্চিৎকর বলা যাইতে পারে। †

শাসন কর্ত্তৃরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সুজা প্রথমে বারাণসীর নিকট দারার পুত্র সোলেমান ও মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। পরে ১৬৫৯ অব্দে আওরঙ্গজেব স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী কাজোয়া নামক স্থানে সুজাকে সম্পূর্ণরূপ পরাজিত করেন।

* পূর্ব্বকালে মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের নিকট হইতে জন প্রতি একটা নির্দ্দিষ্টহারে শুল্কগ্রহণ করিতেন উহাকে জিজিয়া কর বলে। আকবর শাহ্‌ এই শুল্ক পরধর্ম্মদ্বেষমূলক বিবেচনা করিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

† মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণের বীর্য্যহীনতা। আওরঙ্গজেবের পর যদি তাঁহার ন্যায় বিক্রমশালী সম্রাট আর দুই একজন দিল্লীর সিংহাসনে স্থান পাইতেন, তাহা হইলে ভারতেতিহাসের শেষাংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়িত। সঃ সঃ।

‡ বিশেষতঃ মধ্যএসিয়ার তাতারজাতির মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট

হিন্দুকুলতিলক বাপ্পারাও নিজের আশ্রয় দাতা মাতুলকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহা অপেক্ষাও কি আওরঙ্গজেব কলঙ্কিত? তবে বাপ্পারাওকে লোকে হিন্দু-সূর্য্য বলে কেন? আওরঙ্গজেবই বা নরপিশাচ কেন, এ কথার কি উত্তর আছে?

মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোক সুসীম ও বীতশোক নামক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের প্রাণসংহার করিয়া মগধের রাজাসন প্রাপ্ত করেন। তিনিই এক সময়ে প্রজাপীড়ন দোষে মন্ত্রী রাধা গুপ্তের পরামর্শ ক্রমে পিতা কর্ত্তৃক তক্ষশিলার যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দৈব তাঁহার অনুকূল হইয়াছিল। তাই তিনি ধর্ম্মাশোক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পাঠক! "দেবতার বেলায় লীলাখেলা পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।"

বাদশাহ্ আকবর মানসিংহের বিনাশের জন্য বিষ মিশ্রিত দন্তমঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরিশেষে ভ্রম বশতঃ উহা ব্যবহার করিয়া নিজেই ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন।* পাঠক! তিনি কিন্তু সাধারণ-চক্ষে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।"

দিল্লীর সম্রাটগণের মধ্যে সকলেই সুরাপায়ী ছিলেন। আওরঙ্গজেব কিন্তু সুরা স্পর্শও করিতেন না। আকবর ও শাহ্জাহান ঘোরতর বিলাসী ছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদের রমণীমণ্ডল মধ্যেই অতিবাহিত হইত। কিন্তু আওরঙ্গজেব কখনও এ সকল বিষয়ে লিপ্ত হয়েন নাই। তাঁহার আরো মহৎ গুণ ছিল যে তিনি জীবনে কখনও শ্রম বিমুখ ছিলেন না। পরের উপর নির্ভর করিয়া নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সকল বিষয় পরিদর্শন না

বিধান ছিল না, এই জন্য মোগলসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা এই সকল বিশৃঙ্খলতা দেখিতে পাই। সাধারণতঃ পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালীই রাজা হইতেন। আওরঙ্গজেব যদি উদ্যোগী হইয়া সিংহাসনাধিকার না করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ যে সন্দেহের বা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিতেন না, একথা দারার আনুপূর্ব্বিক ব্যবহারের কথা চিন্তা করিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না। আওরঙ্গজেব যাহা করিয়াছিলেন, অন্য কেহ সম্রাট হইলে তাঁহারও সেই দশা করিতেন। এখন আওরঙ্গজেব মরিবেন, না রাজা হইবেন? নঃ সঃ।

* টড্ সাহেবের রাজস্থান দ্রষ্টব্য। (লেখক) কিন্তু এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। টড্ সাহেবের এ অভিমত অন্য ঐতিহাসিকেরা গ্রাহ্য করেন নাই। 'At an Elephant fight, there was a scene of jealous disputing in his presence ; the weary king gave way to ungovernable fury, as he too often

করিয়া কোনও কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। পাঠক! এহেন আওরঙ্গজেব যদি মহা কলঙ্কিত, তবে বলিতে পারিনা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া কোন্ ব্যক্তি অকলঙ্ক?

যাহা হউক আওরঙ্গজেবের বিশেষ দুর্ভাগ্য স্বীকার করিতে হইবে। তা না হইলে যে কর্ম্মবীর ভারতের জন্যই বৃদ্ধবয়সে চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া ক্লান্ত-দেহে শ্রান্তমনে মরিয়া গেলেন, তাঁহার ভাগ্যে কিনা কতকগুলি কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই জুটিল না? তাঁহার দুর্ভাগ্য না হইলে তাঁহার সন্তানগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া সোনার সিংহাসনকে একেবারে ভষ্ম করিয়া দিবে কেন? যদি দিল্লী সাম্রাজ্য আর কিছুদিন অক্ষুণ্ণভাবে চলিত (আওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রতাপান্বিত কর্ম্মবীর সম্রাট আর দুইএক জন জন্মগ্রহণ করিলে চলিতেও পারিত) তাহা হইলে কি এমন করিয়া বিদেশীয় ও বিজাতীয় করে তদীয় চরিত্র-চিত্রণভার সমর্পিত হয়? না সোনার মোগলসাম্রাজ্য এমন করিয়া ছারেখারে যায়?

পাঠক! আমরা এ সকল পর্য্যালোচনা করি, আর মনে মনে মর্ম্মাহত হই। আর ভাবিতে থাকি যে,—

"পর হাতে দিয়া ধনরত্ন সুখে
পর লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"*

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

---

did in this stricken period of his decay, and he was led away sick unto death." Stanely Lane-Pooleএর Mediaeral India গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে (২৮৮ পৃঃ)। H. G. keene তাঁহার "A sketch of the History of Hindustan." গ্রন্থেও ঐরূপ লিখিয়াছেন, (১৫৮ পৃঃ) স্থানাভাবে আমরা অন্যান্য ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। নঃ সঃ।

* এই নিরপেক্ষ আওরঙ্গজেব-চরিত্রোদ্ধার চেষ্টার জন্য স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এ সকল কার্য্যে প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি স্মৃতিভূষণ মহাশয় ভবিষ্যতে অধিকতর উৎসাহের সহিত ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিবেন। নঃ সঃ।

আয় আয়! *

আয় আয় ভাইটি আমার, কেন মিছে করিস্ রোদন ?
আমি কি ভুলিতে পারি তোরে, তুই কিরে ভুলিবার ধন ?
এক রক্তে জনম দোহার, এক মাতৃ-ক্ষীরে পুষ্ট দেহ ;
খেলা ধুলা এক তরুতলে, এক বনে জীর্ণ পর্ণ গেহ ;
এক সূত্রে বাঁধা উভয়ের সুখ দুঃখ, বিপদ বিভব ;
"শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক" এক আত্মা ভিন্ন অবয়ব।
তাই বলি এই যে রে আমি, কেন মিছে করিস্ রোদন ?
তোরে ফেলি' যাইব কোথায়, তুই আমি ভিন্ন কি কখন ?
শৈশবের সেই সুখস্মৃতি এখনও জাগিছে অন্তরে,
সুখ শান্তি, পর্য্যাপ্তি পূর্ণতা ছিল যবে হায়! প্রতি ঘরে ;
নাহি ছিল দীনতা ক্ষীণতা, চিন্তা, শ্রান্তি, দারুণ অভাব ;
হা হুতাশ, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র লাভালাভ।
হ'তে পারি অবোধ, অজ্ঞান, কিন্তু ভাই! ছিনু বড় সুখে ;
ঘুমাইয়ে পড়েছিনু মোরা তাই একে অপরের বুকে।
ভেবেছিনু এ সুখ-শয়নে কেটে যাবে সারাটি জীবন,
শুধু পুণ্য, প্রীতি, পবিত্রতা পূর্ণ করি রহিবে ভুবন।
কিন্তু হায়! জীবনযুদ্ধের নিদারুণ, ভীম করাঘাত
রূঢ়ভাবে দিল আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গি অকস্মাৎ।
একে তুই শিশু সুকুমার, তায় জননীর প্রিয়ধন ;
বুঝিলি না কিসের সে ধ্বনি, চাহি পুনঃ মুদিলি নয়ন।
ঘুমে ছিলি, বেশ ছিলি, ভাই! জানিস্‌নি তাই এতকাল
সংসার যে পরিণত এবে রণক্ষেত্রে—বিকট, বিশাল।

* "নবনূরের" শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মোহারত আলী খান সাহেবের লিখিত 'নিবেদনে'র প্রতি-নিবেদন।

কত যুদ্ধ করি, কত শ্রমে খুলেছি যে কত রুদ্ধ-দ্বার,
কত পথ করেছি সুগম কণ্টকাদি করিয়ে উদ্ধার।
আয় আয়! আয় ভাই এবে, আয় এবে অনন্তপ্রেমে ;
ভুলি নাই, ফেলি নাই তোরে ; শিশু, তাই ভাবিস্ তা ভ্রমে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস।

ত্রিকূটেশ্বর।

দেবগৃহ বা দেওঘর হইতে এক ভাদ্রপূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে এবং অদূরস্থ বৈদ্যনাথ দেবের মন্দিরোত্থিত যাত্রীগণের উল্লাস-ব্যঞ্জক 'বম্ বম্ হর হর শিবশম্ভু' ধ্বনি শুনিতে শুনিতে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আমরা কয়েকজন বন্ধু বীরবেশে সুসজ্জিত হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বত শিখরস্থ 'ত্রিকূট' বা 'ত্রিকূটেশ্বর' নামক মহাদেব দর্শনার্থ ত্রিকূট পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ত্রিকূট পর্ব্বত দেবগৃহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমরা যখন রওয়ানা হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় ১০টা হইবে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই জন কোলাহল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। নগর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

আমরা ধীরে ধীরে এক হরিৎলতাপল্লবসমাচ্ছন্ন নীরব ও নির্জ্জন অরণ্যানীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রকৃতির সেই গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ভাব বর্ণনাতীত। আমরা কথা কহিতেছি, চারিদিকে তাহাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন দিকে শব্দ নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে নৈশ-বায়ু হিল্লোল-সঞ্চালিত শ্যামল বৃক্ষপত্রাবলী হইতে অতি মধুর সর্ সর্ শব্দ হইতেছিল। সে মৃদু পবন-স্পর্শে নানা জাতীয় বন্য কুসুমলতা ধীরে ধীরে দুলিতেছিল। কোথাও বা শুভ্র জ্যোৎস্নালোক-পুলকিতা রজতনলিনা ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী শিলা হইতে শিলান্তরে লুটিয়া ছুটিয়া পড়িয়া, চন্দ্ররশ্মি-প্রতিফলিত বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন তট-প্রান্তের এবং চন্দ্রতারা-পরিবেষ্টিত অনন্ত নীলাম্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্য-ছায়া বুকে করিয়া একখানি স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায় ঝর্ ঝর্ রবে অবিরাম গতিতে সে বিশাল

অরণ্যানীর ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অতি ধীরে নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিয়া যাইতেছিল।

ক্রমে আমরা শালবন-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া এক বিশাল মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। পথের চারিদিকে কেবল বহুদূর বিস্তৃত মাঠ,আর দূরে দূরে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত দু'একখানি নিদ্রিত সাঁওতাল-পল্লী। দূরে,—কৌমুদী-স্নাত নীলমেঘের মত ত্রিকূট পর্ব্বত বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং আমাদিগকে অক্লান্তগমনে প্রলুব্ধ করিতেছিল। কল্পনায় সে গিরিশিখরে কতই না অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিব বলিয়া মনে করিতেছিলাম।

অতি প্রত্যূষে আমরা আসিয়া ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। তখন সবে মাত্র পূর্ব্বদিকে হঠাৎ রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে। নানা জাতীয় বন-বিহঙ্গমগণ মধুর প্রভাতী-গান আরম্ভ করিয়াছে। মৃদুবায়ুবিকম্পনে মর্ম্মরিত তরুকুলের আনন্দ-ব্যঞ্জক আহ্বান-গীতি শুনিতে শুনিতে আমরা ক্লান্ত দেহে পর্ব্বত-পাদদেশস্থ এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণ শিলাপরি উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের স্নিগ্ধতার এবং প্রফুল্লতার সহিত আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া লতাপাতার মধ্য দিয়া বনজঙ্গল অতিক্রম করিতে করিতে রেখার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ পথে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলাম, কণ্টকাঘাতে প্রতিপদে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছিল।

বিহগকলকাকলী-মুখরিত, গীতি-উচ্ছ্বসিত, শ্যামল বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন গিরি-শিখরে যেন এক মায়াবিনীর মায়াজাল বিস্তৃত রহিয়াছে,ইচ্ছা হয় না আর ঘরে ফিরি, মনে হয় যদি এমনি করিয়া—এমনি শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম পুরুষের ধ্যানে কাটাইয়া দিতে পারিতাম, না জানি কতই সুখের হইত।

ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ—দীপ্তিমান সূর্য্য, চরণতলে শ্যামলা ধরণী, কুলু-নাদিনী স্রোতস্বিনী ও আঁকা বাঁকা গ্রাম্যপথ। হায়! কেন আমরা ভাই ভাই মিলিয়া রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষী করিয়া কাটাই, কেন ঝগড়া বিবাদ করি? প্রকৃতির মত এমনি মুক্ত, এমনি উদার কি আমরা হইতে পারি না?

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিতে ফেলিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া 'ত্রিকূটেশ্বর' মহাদেবের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।

পর্ব্বতোপরি শত শত অপরিচিত বৃক্ষশাখা ও সহকার-তরু-পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধ শ্যামলছায়া সম্পন্ন স্থানটি আমাদিগকে স্বর্গসুখ আনিয়া দিয়াছিল।

একখণ্ড প্রস্তরকে লোকে মহাদেব বলিয়া পূজা করে। এস্থানটি অতিশয় নির্জ্জন। নিকটে মানুষের আবাস নাই,যে দুই একখানি সাঁওতালপল্লী আছে তাহাও অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। শুনিতে পাইলাম একজন পুরোহিত নাকি নিকটস্থ কোনও গ্রাম হইতে প্রত্যহ আসিয়া পূজা করিয়া যান,—সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, আমরা কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই নাকি এই 'চিত্রকূট' শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহাদেবের মস্তকোপরি ঝর্ ঝর্ করিয়া আসিয়া এক নির্ঝরিণীর জল পড়িতেছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। আমাদের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল,অঁজল পুরিয়া সে পূতধারা পান করিয়া এই পাপ-কলুষিত,সংসার-তাপ-জর্জ্জরিত প্রাণ প্রফুল্ল ও পবিত্র হইল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় গেল? সে পবিত্র নির্ঝর ধারাই কি স্বর্গীয় মন্দাকিনী-ধারা? যে ধারা পান করিলে লোকের শোক, দুঃখ থাকে না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে না, হিংসা, দ্বেষ থাকে না, যাহাতে হৃদয়ে আসিয়া মহানুভবতা বিরাজ করে? যদি তাহাই না হইবে তবে কেন এই লোকের অগম্য কঠিন পর্ব্বতশিরে অরণ্যানীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে?

আমরা সকলে ভক্তি-বিকম্পিত কণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া গাহিলাম,—

"খোলরে প্রকৃতি! আজি খোলরে তব দুয়ার,
লুকায়ে রেখোনা আর প্রাণসখারে আমার।"

আমরা পর্ব্বতগাত্রে ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলাম, তন্দ্রা আসিল। যখন জাগরিত হইলাম তখন রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিয়াছে, অপরাহ্ন হইয়াছে, নির্ঝরের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালিত করিয়া—গিরি-শিখর হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলাম। ভানু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমাকাশ লোহিতরাগ-রঞ্জিত। উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে অস্তগত সূর্য্যের আরক্তিম-কান্তি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

পক্ষীগণের মুখে শ্যামসন্ধ্যার শুভ বন্দনাগীতি শুনিতে শুনিতে বৈদ্য-নাথাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। ক্রমে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল,

আকাশে তারা, চন্দ্র ফুটিয়া উঠিল। পশ্চাতে বৃক্ষরাজি পরিশোভিত, লতাপল্লব সমাচ্ছন্ন ত্রিকুট পর্ব্বত অদৃশ্য হইতে লাগিল। হায়! এমনি করিয়াই এক-দিন আমাদের সুখ-শৈশব সুমধুর স্বপ্ন বুকে করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে,—এ জীবনে সে আর ফিরিবে না,—আর তাহাকে পাইব না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গোরস্থান।

বিজন বিপিন জনশূন্য স্থান,
দূর ব্যাপি মাঠ রয়েছে পড়িয়া,
অতি রুক্ষ ভাব রুক্ষতায় পূর্ণ
হেরিলে পরাণ উঠে শিহরিয়া।
মৃত্তিকার স্তূপ, স্থানে স্থানে তার
বন্ধুর করেছে ভূমি সমতল;
নাহি দূর্ব্বাদল এ বিজন স্থানে
রুক্ষ মূর্ত্তি ধরি রয়েছে সকল।
সারি সারি গোর গণনা রহিত
ভূমিশায্য বক্ষে করিয়া ধারণ,
সতত এস্থান নিস্তব্ধ হইয়া
অনন্ত নিদ্রায় করিছে শয়ন।
প্রকাণ্ড বিটপী ধরি ভীমকায়
দীর্ঘ শাখাগুলি করিছে বিস্তার;
পেচক নিচয়, তাহার কোটরে,
ক্ষণে ক্ষণে করে বিকট চীৎকার।
দাঁড়কাক-কুল, বসি বৃক্ষ ডালে,
অবিরত ডাকে গম্ভীর স্বরে।
স্থানে স্থানে ঝোপে ঝিঁঝিঁ পোকা গুলি,
সদা শর্ব্বরীর আহ্বান করে।
অদূরে পুকুরে ভেকের আবাস,
অনন্ত আমোদে ডাকে নিরন্তর;
কখন শৃগাল ত্যজি নিজ স্থান
ঘুরিয়া বেড়ায় মাঠের উপর।
মানবের স্বর শুনা নাহি যায়,
নিরজন সদা এ ভীম গহন;
যতদূর দেখ মেলিয়া নয়ন
দৃষ্টিপথে পড়ে গোর অগণন।

কত সাধু জন পূত মনঃ কায়,
নিরমল জ্ঞানে আলোকিত মন;
পণ্ডিত প্রবর সর্ব্ব পূজনীয়
যাঁহাদের জ্ঞানে উজ্জ্বল ভুবন;
নির্ভীক যুবক পরিশ্রম প্রিয়,
জীবনের লক্ষ্য হিতের সাধন;
দয়াবান্ লোক চিরব্রত যাঁর
অবনী মণ্ডলে দারিদ্র্য-মোচন;
জনম হইতে জগতে যাহারা
পালিত সর্ব্বদা সৌভাগ্য সুহাসে
বিলাসী পুরুষ পরিপাটি-প্রিয়,
আসক্ত নিয়ত চারু সব বেশে;
ধনাঢ্য বণিক বাণিজ্যে নিপুণ
ধনরাশি যার সঞ্চিত ধরায়;
সকলে হেতায়, চিরদিন তরে,
মহা ঘোর ঘুমে সতত ঘুমায়।
ধনী ও নির্ধন সুজন, দুর্জ্জন,
ত্যজিয়া এথানে অরি মিত্র-জ্ঞান,
সমভাবে তারা মৃত্তিকা শয্যায়
পাশাপাশি আজি সকলে শয়ান॥
গিয়েছে গরব হৃদয় বাসনা,
মনের উচ্চতা, মান, অভিমান,
হিংসা ক্রোধ লোভ, অসূয়া বিদ্বেষ,
জনমের তরে হয়েছে নির্ব্বাণ।
মহাকাল চক্র নিয়ত ঘুরিছে
থামেনা কখন দেখিতে পশ্চাতে
মরমে কাহার অসহ্য যাতনা
কাহারা আনন্দে রয়েছে জগতে,

কাহার পরাণ নিরাশে কাটিয়া
শতধা হইয়া ধরায় পড়িল ;
প্রেম প্রীতি হার কাহার গলায়,
বিচ্ছেদ অনলে শুকাইয়া গেল ;
কা'র আঁখি বারি নয়নের কোণে
বিন্দু দেখা দিয়া শুকালো নয়নে ;
আশার মুকুল কাহার হৃদয়ে
আধ ফুট রহিয়া মিশিল পরাণে ;
কা'র হৃদিতল নিঠুর চরণে
দলিয়া সময় বিকৃত করিল ;
কা'র হৃদিধন সবলে কাড়িয়া
অপরের করে তুলিয়া সে দিল।
কুট কালস্রোত অজস্র প্রবাহে
বহিছে সতত অনন্ত সাগরে,
অসংখ্য পরাণী নিতি যায় ভেসে
অদৃশ্য হইয়া সময় পাথারে।
জীবন কান্তার কুটিল ভীষণ
পূর্ণ সদা শোক দুঃখে অগণন,
নাহিক বিশ্রাম একটু কান্তারে,
ধাইছে সতত যত পান্থগণ।
পড়িয়া মায়ায় দুদিনের তরে
ভাবে মনে যা'রা শান্তি নিকেতন ;
অস্থির তাহারা, অশান্তি তাড়নে,
শমন মূরতি করিয়া স্মরণ।
নির্দ্দয় শমন সতত ঘুরিছে,
কালাকাল জ্ঞান নাহিক তাহার ;
কোমল শৈশব, কৈশর যৌবন,
অথবা বার্দ্ধক্যে করেনা বিচার।
ওই তরুমূলে ক্ষুদ্র যে কবর,
স্তন্যপায়ী শিশু সেথায় ঘুমায়,
তাহার জননী হৃদয়ের মণি
হারাইয়া গৃহে উন্মাদিনী প্রায়।
তার পাশে ঐ যে মৃত্তিকার ঢিপি,
তথায় তরুণ যুবক শয়ান ;
পরাণের আশা তার না মিটিতে
জীবন-প্রদীপ হয়েছে নির্ব্বাণ।
বৃদ্ধ পিতা তার জীবন সম্বল
হারাইয়া শোকে বিহ্বল ধরায় ;
পুত্র শোকানল সহিতে না পারি,
পরিশেষে হেথা আসিয়া জুড়ায়।
ওই যে বিটপী, গুটিকত ফুল
যাহার শাখায় রয়েছে ফুটিয়া,
তাহার তলায় কুলের কামিনী
একাকিনী আজি রয়েছে পড়িয়া।
আত্মীয় স্বজন, কুলবধূ আনি
যতনে দিতনা যাহারে বাহিরে,
বউমা বলিয়া প্রতিবাসী জন
ডাকিত যাহারে কতই আদরে,
সেই কুলবালা একাকিনী আজি
নিরজন মাঠে নিয়ত ঘুমায় ;
স্বজনের স্থানে কাননের পাখী
'বউ কথা কও' বলিয়া জাগায়।
রূপের মাধুরি, অঙ্গের বিলাস,
রমণী সুলভ লাজ মানভয়,
গাঢ় মাতৃস্নেহ, আদর যতন
চির অবসান হয়েছে হেথায়।
ওই যে মণ্ডপ সরোবর পাশে,
বনফুলরাশি ফুটেছে যথায়,
প্রণয়িনী এক প্রেম হুতাশনে
জীবন-আহুতি দিয়েছে তথায়।
প্রণয়ী তাহার প্রেমের পুত্তলী
হারায়ে ধরায় শোকে জর জর,
জীবনে মরণ এখন তাহার,
মৃত্যুর কামনা করে নিরন্তর।
হৃদিপটে আঁকা প্রেমের সে ছবি
নয়নের পথে ঘুরিয়া বেড়ায়,
মরম বেদনে হৃদয় গলিয়া
নয়নের কোণে আসি দেখা দেয়।
শোকের আবেগে কখন হেথায়
সমাধির পাশে আসিয়া দাঁড়ায়,
হেরে ওই স্থান তাপিত পরাণ
নয়ন ধারায় জুড়াইতে চায়।
বনফুল লতা কতই যতনে,
রোপিয়াছে এক সমাধির পাশে,
ফুটিয়া সন্ধ্যায় কুসুম ঝরিয়া
পড়ে গোরপরি সাঁঝের বাতাসে।
কখন পাপিয়া যদি বসি ডালে
পিউ পিউ রবে ডাকে এইস্থানে,
শুনিয়া অমনি প্রণয়-কাহিনী
পাখীস্বর শর বিঁধে তার প্রাণে।
পরাণের আশা ফুরাইয়া গেছে,
'পিয়ার' পিয়াস মিটেছে ধরায়,
একের জীবন অন্যের মরণ,
হাতে হাতে বাঁধা রয়েছে হেথায়।

যে সমাধি স্থান এ কি ভাব তোর।
কাব্য তায় পূর্ণ—গাঢ় শান্তিময়।
শিহরে পরাণ হেরিলে মূরতি,
কিন্তু শান্তি পায় তাপিত হৃদয়।
মধ্য এইস্থান পবিত্রতা খনি
শুদ্ধ হয় মন নয়নে হেরিলে,
মলিন কামনা, হৃদয় হইতে,
দূরে যায় চলি হেথায় আসিলে।

গাঢ় শান্তি ভাব নিয়ত বিরাজে,
আত্মার উদ্বেগ প্রশমিত হয়;
সংসার বিরাগ ক্ষণকাল তরে
উচ্চ ভাবে মন ফিরাইয়া দেয়।
গভীর ভকতি উথলে হৃদয়ে,
চিরদিন করে বিশুদ্ধ পরাণ
তাঁ'র প্রতি যিনি বিশ্ব-রচয়িতা
যাঁহার আদেশে জীবন মরণ।

ওয়াহেদ হোসেন।

মধ্যএসিয়ার জ্ঞানসাম্রাজ্য।

গত পৌষ মাসের বঙ্গদর্শনে "শ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধ শ্রমণগণের অশ্রান্ত অধ্যবসায়ে এই জ্ঞানসাম্রাজ্য (মধ্যএসিয়ায়) সংস্থাপিত হইয়াছিল; কালে তাহা মুসলমানধর্ম্মের প্রবলপ্রতাপে চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও, মরুনিহিত বৌদ্ধ বিহারাদি অদ্যাপি সে অতীত কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছে।"

মধ্যএসিয়ায় বৌদ্ধগণ জ্ঞানসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কালে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল, একথাও ঠিক্। কিন্তু কে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিল, এ প্রশ্ন যখন মনে উদয় হইয়াছিল, তখন প্রথম চিন্তার উত্তেজনায় মুসলমানকেই দোষী সাব্যস্ত করা, অক্ষয় বাবুর ন্যায় ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সঙ্গতও বটে। কেন না, ইতিহাস যাহাই বলুক না কেন, মুসলমান না হইলে যে ধ্বংসক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, এ কথা হিন্দুমুসলমান-মিলন-প্রত্যাশী বঙ্গীয় হিন্দুভ্রাতৃবৃন্দের ধ্রুব বিশ্বাস, সুতরাং ইহাই সত্য ইতিহাস, এবং বঙ্গদর্শনের ন্যায় সর্ব্বজনাদৃত মাসিক পত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বথা উপযুক্ত।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে গেলে ইতিহাস আলোচনার আবশ্যক; উহা কল্পনার কর্ম্ম নহে। গিবনের প্রসিদ্ধ ইতিহাসখানির প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে আর অক্ষয় বাবু কখনই এমন কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না।

যখন সাহস করিয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আমরা বুঝিলাম যে, অক্ষয় বাবু ইতিহাস না পড়িয়াই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি অশেষ প্রশংসার্হ। আবার মুসলমানের স্কন্ধে যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক সত্য কিনা, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রবন্ধটি পাঠ করিবার সময়ে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় এ কথা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যকই বোধ করিলেন না। সম্পাদকের কঠোর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি মুসলমানের কলঙ্কঘোষণা করিবার বেলায় বন্ধুপ্রীতির খাতিরে নিতান্তই শিথিল হইয়া পড়ে দেখিতেছি।

পৃথিবীর কোন জ্ঞানসাম্রাজ্য যে মুসলমানধর্ম্মের প্রতাপে কখনো চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল, এ কথা কোন ইতিহাস-নামধেয় পুস্তকে লেখে না। বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানেই মুসলমানধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছে, সেইখানেই হয় অতীত জ্ঞানসাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত, না হয় নূতন জ্ঞানসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অযথা আক্রোশবশতঃ কল্পনাপ্রবণ উষ্ণ-মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া মুসলমানের ইতিহাসে যাঁহারা অম্লানবদনে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার স্পর্দ্ধা করেন, যে জাতি তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক-আখ্যা প্রদান করিতে পারে, কঠোর রাজদণ্ড ব্যতীত সে জাতির চরিত্র গঠনের আর কোন সদুপায় দেখিতে পাই না।

দিগ্বিজয়ের প্রথম মত্ততার বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমানেরা মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিজিতের উপর যে যৎকিঞ্চিৎ অত্যাচার করিয়াছিল, এ কথা সত্য; এবং স্বাভাবিকও বটে। আবার বিজিতের উপর অন্যান্য জাতীয় বিজেতারা মুসলমানজাতি অপেক্ষা যে কতগুণ অধিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা গণনা করা ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষমতাবহির্ভূত। মুসলমানেরা যে অত্যাচার করে নাই, এমন নহে; কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন্ জাতি আছে, যাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে যে মুসলমান অপেক্ষা অধিক অত্যাচার বিজিতের উপর তাহারা করে নাই? আবার জ্ঞানসাম্রাজ্য ধ্বংস করা দূরে থাকুক, মুসলমানজাতি পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর, আর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত যে সুদূর বিস্তৃত অসাধারণ জ্ঞানসাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস মন্থন করিয়া তাহার তুলনা আবিষ্কার করিতে পারেন, তেমন ঐতিহাসিক মহাপণ্ডিত অদ্যাপি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন নাই।

৭১০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে সমগ্র মধ্যএসিয়া মুসলমান-শাসনাধীনে আসিয়াছিল। তখন প্রথম দুই চারিটি মন্দিরাদি ধ্বংস হওয়া ভিন্ন অন্য কোন অত্যাচার

সংঘটিত হয় নাই। মুসলমান-শাসনের সময়ে ভারতবর্ষের ন্যায়ই মধ্য-এসিয়ার মসজিদ এবং মন্দির পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। প্রায় ৫০০ বৎসর কাল মুসলমানেরা এই প্রদেশে রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকাল মধ্যে বহুতর রাষ্ট্রবিপ্লব সত্ত্বেও মধ্যএসিয়া প্রদেশে সাহিত্য-বিজ্ঞান শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি অপরিমিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এমন কি, যিনি ত্রিকোণ-মিতির সিকাণ্ট ও ট্যানজেণ্টের আবিষ্কার করিয়া গণিতিক্ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, সেই মহাপণ্ডিত আবুল ওয়াফা ৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যএসিয়ার বুজয়ান নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এ ক্ষুদ্র প্রতিবাদে আর অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

মধ্যএসিয়াস্থিত মুসলমান-জ্ঞানসাম্রাজ্য যে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানেরই প্রতিষ্ঠিত এমত নহে। প্রাচীন বৌদ্ধ-জ্ঞানসাম্রাজ্য তাহার ভিত্তি। কিন্তু সেই সামান্য ভিত্তির উপর মুসলমানেরা যে গগণচুম্বী বিস্তীর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সূক্ষ্ম গণিতের বিধানানুসারে সে ভিত্তির অস্তিত্বই লোপ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমানেরা যে প্রাচীন বৌদ্ধ-জ্ঞানসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, একথা শুধু এই অর্থেই বলা যাইতে পারে।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, মধ্যএসিয়ার যাহা কিছু সভ্যতা, উন্নতি, জ্ঞান-চর্চ্চা, সমস্তই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্দ্দান্ত চঙ্গেজ খাঁর বিশ্ববিধ্বংসী শক্তি প্রভাবে বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। কে না জানে যে, যে বোখারা ও সমরকন্দের অচিন্ত্যনীয় ঐশ্বর্য্য ও সুখসমৃদ্ধির মধুর-করুণ স্বপ্ন-কাহিনী পারস্য-কবিগণের ললিতকণ্ঠে অদ্যাপি ঝঙ্কৃত হইতেছে, সেই সমরকন্দ ও বোখারার পরীরাজ্য রক্তাক্তধর্ম্মী চঙ্গেজেরই পদতলে লুণ্ঠিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যে ব্যক্তি সামান্য একটু ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর উন্মুক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করিয়াছে, সেও জানে যে অসুরপরাক্রম চঙ্গেজ খাঁই সমগ্র মধ্য-এসিয়া ছারখার করিয়া মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ যে মরুনিহিত প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসস্তূপ সমূহ ভূগর্ভমধ্যে আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা চঙ্গেজেরই বিপুলবিক্রমের নিদর্শন, মুসলমানজাতির চূর্ণীকরণ-কুশলতার প্রমাণ নহে, একথা অক্ষয় বাবুর ন্যায় একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক পণ্ডিতকে আমাদিগের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির বুঝাইয়া বলা আবশ্যক হইল, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

কথা প্রসঙ্গে অক্ষয় বাবু নির্বিঘ্নে, অবলীলাক্রমে মুসলমানধর্মটার এক ভয়ানক কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া গেলেন,—যে কলঙ্ক নিতান্ত অমূলক, যাহা সাক্ষাৎ ইতিহাসের একটি নিদারুণ বিকৃতি। লিখিবার পূর্ব্বে অক্ষয় বাবুর ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া জানা উচিত ছিল যে, জ্ঞানসাম্রাজ্য কখনো মুসলমান-জাতির হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পারে না। বরং যে বর্ব্বরজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ মধ্যএসিয়ার জ্ঞানসাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই উত্তর কালে যেমনি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল, অমনি সেই লুপ্তসাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার কার্য্যে কায়মনঃপ্রাণে ব্যাপৃত হইল। এমনি ইস্‌লামের পবিত্র প্রভাব। কিন্তু উদ্ধার-কার্য্যে তাহারা সম্পূর্ণ সফলতালাভে সক্ষম না হইলেও তৈমুর-মহিষী বিবী খানম্-প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি তদানীন্তন জ্ঞানসাম্রাজ্যের অশেষ উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

না জানিয়া শুনিয়া একটা গুরুতর বিষয়ে যদৃচ্ছা অভিমত প্রকাশ করিয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচয় প্রদান করা অক্ষয় বাবুর ন্যায় বিশিষ্ট লেখকের পক্ষে কি লজ্জার বিষয় নহে? আমাদের দেশে যেরূপ ইতিহাস আলোচনার ছড়াছড়ি, তাহাতে যে কেহ যা তা একটা গালগল্প লিখিলেও তাহা সত্য ইতিহাস বলিয়া সাধারণ পাঠকের ধারণা হইয়া যায়। তাহার উপর অক্ষয় বাবুর ন্যায় লেখকেরা যদি যাহা মনে আসে তাহাই লিখিয়া অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, আর তাহা বঙ্গদর্শনের ন্যায় পত্রের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য-জগতের নিতান্তই দুর্দ্দিন আসিয়াছে বলিতে হইবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দিন আসিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার ত বিপরীতই দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুলেখকগণের লেখনী মুসলমান সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই যেন অধিক শিথিলতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা কখনই মঙ্গলের লক্ষণ নহে। কি কাব্যে কি উপন্যাসে, কি রঙ্গমঞ্চে, কি ইতিহাসে, কোন বিষয়েই ত আমরা মুসলমানের প্রতি হিন্দুর সুবিবেচনার পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি না। অকারণ মুসলমানকে টানিয়া আনিয়া কৌশলে গালি দেওয়ার অভ্যাস প্রায় সকলেরই ত দেখিতে পাই। অথচ মুখে সকলেই মুসলমানের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু মুখের কথায় ভুলিবার দিন আর মুসলমানের নাই। হিন্দুগণ পরোক্ষে মুসলমানের প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ আরম্ভ করিয়াছেন,

তাহাতে মুসলমানেরা আর অধিক দিন নীরবে তাহা সহ্য করিবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলমানের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; যদিও অস্ত্র-সঞ্চালনের দিন আপাততঃ অতীত হইয়াছে, তথাপি মুসলমানের মস্তিষ্ক নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। হিন্দুগণ যদি এখনো মুসলমানের প্রতি এহেন দুর্ব্যবহার হইতে বিরত না হয়েন, তাহা হইলে যেদিন মুসলমানেরা ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ তুলিয়া হিন্দু-প্রদত্ত বিশেষণ পরম্পরার চরম সার্থকতা সম্পাদন করিবে, নিশ্চয়ই বলিতে পারি সেদিন খুবই নিকটবর্ত্তী।

নিবেদন

গত কয়েক মাস নবনূরের সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে, বঙ্গীয় মুসলমান লেখকগণের মধ্যে অনেকেই কবিতা-রচনা দ্বারা অযথা শক্তি-ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রায়শঃই তাঁহাদের রচিত কবিতা প্রকাশযোগ্য হয় না। তাঁহারা যদি একটু দয়া করিয়া ভাল বিষয় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করেন, আমরা ভরসা করি, তাঁহারা কখনও ব্যর্থমনোরথ হইবেন না, বরং উত্তরোত্তর যশস্বী হইতে থাকিবেন। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইবে যে কল্পনার সেবা হইতে বাস্তবের রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনই এখন আমাদের পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়। যাঁহাদের কবিত্বশক্তি জাতীয় আদর্শকে উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম, তাঁহারা যে এ ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যস্থল নন্, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই বঙ্গদেশে মুসলমান লেখকের আলোচনার জন্য বহু বিষয় রহিয়াছে, কেবল একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি ও চর্চ্চার অভাবে তাহা লোক-লোচনের অগোচর হইয়া আছে। তৃতীয় শ্রেণীর কবি হইয়া যে যশঃলাভ সম্ভবপর, তাহা হইতে বহু পরিমাণে অধিক যশঃ সেই সমুদয় বিষয়ের সতর্ক আলোচনায় লাভ করা যাইতে পারে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সেবকদের সূক্ষ্মদৃষ্টি কি সে দিকে পতিত হইবেনা?

আশা করি, মুসলমানসাহিত্যসেবীগণ আমাদের কথায় রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে স্বীয় শক্তি সমাজের উপকারজনক সেবায় ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবেন।

নবনূর সম্পাদক।

কবিতা-গুচ্ছ ।

শশধর ।

কি ভাবিছ শশধর ! বসি নীলাসনে,
কি রেখেছ শশধর ! হৃদয়ে গোপনে ?
লুকা'তে পারনি তাহা প্রভূত যতনে আহা !
দেখা যায় কাল ছায়া ও চাঁদবদনে ।
কি ভাবিছ শশধর ! বসি যোগাসনে ?

পুষিছ হৃদয়ে তুমি প্রেমের অনল ?
পুড়িয়ে হয়েছে কাল তাই হৃদিতল !
(না বুঝে অবোধ নরে কত অনুমান করে)
অথবা অমিয়া ভ্রমে ভীষণ গরল
হৃদয়ে পূরিয়া,—মুখে হাসিছ কেবল !
নীরবে দগধ হও,— নীরবে যাতনা সও,
নীরবে নীহার রূপে ঝরে আঁখিজল ।
পুষিছ হৃদয়ে শশি, প্রেমেরি অনল ?

দু'টি সান্ত্বনার কথা তোমারে যে বলে
নাই কি এমন কেহ বিশ্ব ভূমণ্ডলে ?
এত তারা আছে, কেহ তোমারে করেনা স্নেহ ?
তাই তুমি শশধর ! বসিয়া বিরলে,
নিশীথে জুড়াও প্রাণ ভিজি আঁখিজলে ।
এ নিঠুর চরাচর শুনেনা কাতর স্বর,—
ঢালেনা করুণাবারি যবে প্রাণ জ্বলে ।
দু'টি সান্ত্বনার কথা কেহ নাহি বলে ।

কি দেখিছ, শশধর ?—আমার হৃদয় ?—
তোমারি কলঙ্ক সম অন্ধকার ময় !
শুধু পাপ, তাপ, ভয়, শোকে পূর্ণ এ হৃদয়,
এ নহে উজ্জ্বল শুভ্র সরলতাময় ।
কি দেখিবে, শশধর,—এ পোড়া হৃদয় ?

এ নহে কোমল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুনির্মল,—
এ হৃদয়ে স্তরে স্তরে তীব্র হলাহল ।
নৈরাশ্য বেদনা শত, কালানলশিখা কত,
কি করে দেখাব শশি ! তোমা সে সকল ?
এ নহে পবিত্র রম্য স্বচ্ছ সুনির্মল ।

তোমার কলঙ্ক শশি ! মুছিবে কেমনে,
যাবেনা কলঙ্ক তব কোন শুভক্ষণে ?
ও কলঙ্ক হৃদি পরে রবে যুগ যুগান্তরে—
তাই বুঝি তুমি সদা বসি যোগাসনে ?
আঁধার কালিমা রেখা মুছিবে কেমনে ?

মিসেস্ আর, এস, হোসেন ।

—:০:—

যাচনা ।

অখ্যাত, অজ্ঞাত, ম্লান নিভৃতে পড়িয়া আছি
দৃষ্টি শুধু কুজ্ঝটিকাময়,
চক্ষে সদা ঘুমঘোর, বক্ষভরা দুঃখ ত্রাস
এ আমার বিষাদ আলয় !
তোমাদের আলো দিয়া প্রদীপ জ্বালায়ে দিও,
অধরে আঁকিয়া দিও হাসি ;
তোমাদের সাথে সাথে ফুলটি গাঁথিয়া দিও,
সহোদর স্বজন স্বদেশি !
তোমাদের স্নেহ এনে হৃদয়ে রাখিয়া যেও,
মুছে দিও সজল নয়ন ;
তোমাদের মাঝমাঝে আমারে বেড়িয়া দিও,
এ আমার শুধু আকিঞ্চন !
তোমাদের হাসি হেরি ভুলে যাই, আশা পাই,
আপনি ঝরবি অশ্রু আপনার গান গাই ।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় ।

—:০:—

দূরেই ত ভাল ।

দূরে ভাল বাঁশরীর প্রাণ-কাড়া স্বর,
দূরে ভাল সুধাংশুর মূরতি মধুর
কোকিলের "কুহু" ধ্বনি
দূরেই ত বেশ শুনি,
দূরেই ত ভাল লাগে বিজলীর খেলা,
দূরেই ত ভাল সাজে কুসুমের মেলা ।
ললিত সঙ্গীত-তান
দূরেই জুড়ায় প্রাণ,
ভ্রমরের 'গুণ' 'গুণ' দূরেই ত বেশ,
দূরে বুঝি প্রণয়ের মাধুরী-অশেষ ।

ফুটে ফুল প্রেমকুঞ্জে চিরগন্ধময়,
চির নব, চিরোজ্জ্বল—দূরেই ত রয় ।

বুক ভরা সুধারাশি,
চিরদিন হাসি-হাসি,
জোঁয়না মিলন-মসি বিমল পরাণ,
দূরেই ত ভাল প্রেম, প্রেম-অভিজ্ঞান।
বিচ্ছেদ-জলদ-মাঝে
আশার দামিনী খেলে,
ক্ষণিক বিকাশ, মরি, কত মুগ্ধকর
দূরেই ত ভাল প্রেম, দূরেই সুন্দর।

প্রাণের পিপাসা, প্রেম, বেদনা, তাহার
বুঝিতে বুঝা'তে দূরে যত পারা যায়,
নিকটে তত কি পারে
তত কি বদনে সরে,—
নিকট চাহিনা তার, দূর অভিলাষী,
দেখিব দেখাব প্রাণ প্রেমের পিপাসী।
আশাভরা প্রেমরাশি লাজের পীড়নে
ফুটেও ফুটেনা যদি মধুর মিলনে,
ও মিলন সুধাপান
চাহেনা ত এ পরাণ,
নিকট চাহিনা তার—দূরে যেন থাকি,
দেখিব দেখাব দূরে হৃদি-ছবি আঁকি।

দূরেই ত ভাল প্রেম—দূরেই সুন্দর,
গগনের বহুদূরে হাসে শশধর,
অযুত যোজন-প্রান্তে,
সরসীর বুক-বৃন্তে,
বিকশে কমলদল ঘন অনুরাগে,
মরমে পিপাসা প্রেম উদ্দীপনা জাগে,
দূরে দূরে হাসা-হাসি,
প্রাণময় মিশামিশি,
দূরে দূরে কামনায় প্রেম-বিনিময়।
চিরনব অফুরন্ত, অটুট, অক্ষয়।

বনের আড়ালে দূরে চাঁদের মাধুরী
যে হেরেছে, সে বলেছে—"কি সুন্দর মরি"।
বুঝেছে প্রেমিক হিয়া
দূরত্বের মাঝ দিয়া
প্রেমের বিমল ভাতি, মাধুরী মোহন,
জীবনের পাতে পাতে বসন্ত-স্বপন,
নিত্য নব অনুরাগে
যৌবন লহরী জাগে—
দূরেই ত ভাল প্রেম, দূরেই ত বেশ,
দূরে বুঝি প্রণয়ের মাধুরী অশেষ।

আজিজর রহমান।

কল্পনা।

এ ঘোর নিশীথে কে তুমি আসিলে,
এ ঘোর নিশীথে কে তুমি ত কিলে,
তুমি কি আমার প্রাণের মণি।
তুমি কি আমার স্বপনের মায়া,
তুমি কি আমার সৌন্দর্য্যের ছায়া,
তুমি কি আমার প্রেমের খনি।

বারেক তোমার মুখ পানে চে'য়ে,
বারেক তোমার সুধা গান গে'য়ে,
পলকে হই যে আপন হারা।
অশনে বসনে শয়নে স্বপনে,
তব মুখ-জ্যোতিঃ পড়ে সদা মনে,
তব প্রেম-স্মৃতি অমৃত-ধারা।

তব সনে যবে নিকুঞ্জ কাননে,
তব সনে যবে নিথর গগনে,
তব সনে যবে তটিনী-কূলে।
কি সুখ তখন চাঁদের কিরণে,
কি সুখ তখন কোকিল-কূজনে,
কি সুখ তখন সুরভি ফুলে।

তব সনে যবে সমর প্রাঙ্গনে,
তব সনে যবে দীপ্ত হুতাশনে,
তব সনে যবে মরণ-পথে।
কি সুখ তখন অশ্বের ঝমনে,
কি সুখ তখন কামান গর্জ্জনে,
কি সুখ তখন শোণিত-স্রোতে।

তুমি শৈশবের খেলার সঙ্গিনী,
তুমি যৌবনের জীবন তোষিণী,
বার্দ্ধক্যের তুমি জপের মালা।
তুমি যদি থাক প্রাণের নিকটে,
তুমি যদি থাক হৃদয়ের পটে,
না থাকে আমার যাতনা জ্বালা।

তুমি সমীরের সুরভি নিশ্বাসে,
তুমি বিরহীর আকুল উচ্ছ্বাসে,
তুমি প্রেমিকের চুম্বন-সুখে।
জীবন-সাগরে তুমি ধ্রুবতারা,
সংসার মরুতে অমৃতের ধারা,
কবির সমাধি তোমারি বুকে।

কায়কোবাদ।

হজরত মহাম্মদ গ্রন্থ
ও
নবনূরের সমালোচনা।

বিগত মাঘ মাসের নবনূরে হজরত মহাম্মদ গ্রন্থের সমালোচনা দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম। আনন্দিত হইবার কারণ—আজকাল অনেক সমালোচক পুস্তক পড়িয়া সমালোচনা করেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যা হয় একটা মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাদের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু নবনূরের সমালোচক সাহেব সে প্রকৃতির সমালোচক নহেন, তিনি পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, ইহা আমাদের সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। সুতরাং তাঁহার এই মহৎ গুণ দর্শনে কে না আনন্দিত হইয়া থাকিতে পারেন? পক্ষান্তরে বিস্মিত হইলাম কেন? তাহার কারণ—তাঁহার ন্যায় একজন বিজ্ঞ সমালোচক সমালোচন-প্রসঙ্গে যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ সুসঙ্গত ও সমীচীন নহে। তবে যে, পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে না বা নাই, তাহা কে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে? মুনিদিগেরও মতিভ্রম ঘটে। যে (কার্য্য) করে, তাহারই দোষ জন্মিতে পারে, যে চলে, তাহারই পদস্খলনের সম্ভাবনা। "সর্ব্বতস্তিমির মগ্যন্তি দীপো নাশ্রমূল তিমিরং বিনিহন্তি।" সুতরাং হজরত মহাম্মদ গ্রন্থে, গ্রন্থকার বিপন্ন থাকায় প্রুফ দেখা ভালরূপ না হওয়াতে বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণ ঘটিত দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু সে দোষ বঙ্গের কয়জন গ্রন্থকার এড়াইতে পারেন? কবিবর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের গ্রন্থেও ঈদৃশ দোষ পরিলক্ষিত হয়। তাই বলিয়া কি তাঁহারা দীনা বঙ্গভাষার হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিয়া গিয়াছেন! না, তাহা নহে। সে গুলি দোষ নহে। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দোষ বলা যায় বটে, কিন্তু বঙ্গভাষায় সেইরূপ পদের প্রয়োগ প্রচলিত আছে বলিয়াই বরাবর ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রথমেই শ্রদ্ধেয় সমালোচক সাহেবকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি;—তিনি এই সমালোচন-প্রসঙ্গে নবনূরের একটি মাত্র পাতা ব্যয় করিয়াছেন। এই একটি পাতেই "অারো" উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতেন, এই সকল "এটী" স্থান ধরিলেও চলে, এসকল "ক্রটী" "সত্বেও", নবীন "প্রবীন" * সকল লেখক, কবি মোজাম্মেল হক্ একজন "প্রবীন" লেখক প্রভৃতি বাক্য মধ্যে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ-প্রয়োগে তিনিও কি দীনা বঙ্গভাষার হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন?

সমালোচক সাহেব লিখিয়াছেন, "ইতিহাসের মত কেবল ঘটনার তালিকা দিলেই জীবনী হয় না।" জীবনী ত যথাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস বা ঘটনা-সমষ্টি; ইহাই আমরা জানি। সেই ঘটনা নিচয় বা ইতিহাস লিখিলে জীবনী হয় না ত কিসে হইয়া থাকে? তবে কি যাল তাজে লিবের গানের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুই একটা অযথা গল্পের সমাবেশ করিয়া দিলেই জীবনী হয়? না জীবনীর "অনুপমত্বাদি" প্রতিপাদন করিতে হয়? হজরত মহাম্মদের ধাত্রী-গৃহে অবস্থান, বক্ষোবিদারণ, সুরিয়া গমন প্রভৃতি প্রস্তাবে যে অনুপমত্ব আছে, তাহা অলৌকিক, অপূর্ব্ব, অনুপম ও রমণীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহাতে কাহার না হৃদয় চমকিত, জবীভূত ও অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে? ফলতঃ তাহাতে হজরতের "চরিত্র-মাহাত্ম্যের" "নিখুঁত ছবি" যাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না,

* সমালোচক সাহেব-লিখিত প্রবীণে "ণ" এবং সত্ত্বে "ত্ত্ব" ছিল কিন্তু প্রুফ দেখার দোষে তাহা "ন" ও "ত্ব" হইয়া গিয়াছে। নঃ সঃ।

তাঁহার হৃদয় যে কীদৃশ উপাদানে গঠিত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বাক্য-বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। সমালোচক সাহেব, হজরত মহাম্মদ গ্রন্থে ব্যবহৃত যে সকল পদ ও শব্দ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গভাষার হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছে বলিয়া তীব্র উক্তি করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ পদ বা শব্দই যে সুসঙ্গত ও বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত, তাহাই প্রতিপন্ন করণার্থ বঙ্গের প্রথিত নামা সাহিত্য-সেবীদিগের গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

নিঃশেষিত—"ভাবী-বিদ্রোহের বীজ নিঃশেষিত করিয়া মহারাজ অশোক উদ্যান বিহারে গমন করিলেন।" সন্দর্ভহার,—প্রণেতা শ্রীপতি কবিরত্ন ও প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ।

সকাতরে—"সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে," "সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি তপোধন।" সুরধুনী কাব্য,—প্রণেতা রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর। কবিবর মধুসূদন দত্ত "সচকিতে" "সশঙ্কিতে" প্রভৃতি পদেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। দীনবন্ধুর ত যেখানেই গেল। এমত স্থলে হজরত মহাম্মদ গ্রন্থে লেখাতেই কি মহা অপরাধ হইল ?

আয়েক—"ঢেকে দেই ভবে কথা আয়েক কথার আলাপনে" সব্যভারতে "আমার পীরিতি" প্রবন্ধে কুঙ্কুম-কস্তুরী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস। বায়েক, শতেক, তিনেক প্রভৃতি শব্দের ন্যায় আয়েক শব্দ সিদ্ধ হইবে না, তাহার কারণ কি ?

সকরুণ—করুণার সহিত বর্তমান যাহা, তাহাই সকরুণ। কে কে এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, দেখুন—"প্রতি গৃহপথে, সকরুণ মৃদুস্বর" বৃত্রসংহার—হেম বাবু। "আক্ষেপিছে রামচন্দ্র শুন সকরুণে" মেঘনাদবধ কাব্য। "রাজা সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনিং শুশ্রাব।" সংস্কৃত পরিচয়ম্, প্রণেতা নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন। "নির্মম হৃদয়ে সকরুণ", অমিতাভ কাব্য—নবীন বাবু। "বলিলেন সকরুণ বচন নিচয়" সুরধুনী কাব্য,—দীনবন্ধু মিত্র। "গান সকরুণ স্বরে সারদামঙ্গল", সারদামঙ্গল কাব্য—কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। "সকরুণ স্বরে বাজে রাখা-লের বেণু।" রবীন্দ্র বাবু।

মহান্—এই শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয়বিধ শব্দেরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। উদাহরণ যথা—"কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার, কি এক মহান্ মূর্ত্তি, কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি, মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার।" সারদামঙ্গল কাব্যে বিঃ লাঃ চক্রবর্ত্তী। "মিশেছে মহান্ শির মহান্ অনন্ত সনে।" অমিতাভ কাব্য। "হৃদয়ের বৃত্তি সদা উদার মহান্।" প্রিয়প্রসঙ্গ সচরিত্রী। "মহান্ ঈশ্বরে সব সাধকের মতি।" পদ্যপাঠ। "মহান্ চরিত, চমৎকার ভাব" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "এই সুমহান্ শব্দ উত্থিত হইল" আর্য্য-শিক্ষা—পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে। "অতি মনোহর তাঁর আশ্রম মহান্।" রামায়ণ, রাজকৃষ্ণ রায়।

হিয়ানিধি—"তুষিব এখানে মোর সন্তাপিত হিয়া", পদ্যপ্রকাশ। "কিন্তু প্রলয়ের শূন্যে দিয়া,বাঁধা যবে থাকে দুই হিয়া।" মিত্রবিলাপ। "দুরু দুরু করে মির জাফরের হিয়া," পলাশির যুদ্ধ কাব্য। "কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে ?" মেঘনাদবধ কাব্য। হিয়া শব্দের বহুল প্রচলন আছে, তবে "হিয়া-নিধি" অসঙ্গত কিসে ?

শান্তশীল—সুশীল, শান্তরশ্মি ব্যাকরণ-সঙ্গত শব্দ। শান্তশীলও তাহাই। শান্ত অর্থাৎ নম্র শীল অর্থাৎ প্রকৃতি যার, সে শান্তশীল, ব্যাকরণ-দুষ্ট কেন, সমালোচক সাহেবই বলিতে পারেন।

মনোলোভ—মনস্ (মনঃ) তমস (তমঃ) শব্দ কেহ কেহ অকারান্ত (মন) করিয়া ব্যবহার করেন। তজ্জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু মিত্রবিলাপে "মতান্ধ আমি না দেখি যে ঘোর", হেম বাবু বৃত্রসংহারে "তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন" এবং ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া প্রমথ বাবু "বিকম্পিত মনোতন্ত্রী নিমগন প্রায়" লিখিয়াছেন। তদনুসারে কবি মোজাম্মেল হক্ সাহেবও "মনোলোভ", "তপোত্তর", "মনোচোর" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে দোষ কার, কে বলিবে ? আর পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে সন্তাত বিসর্গ স্থানে ও হয়। তবে মনোমাঝেই বা না হইবে কেন ?

অনায়ে—"অনায়ে তরিবে" লেখায় কি যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা সমালোচক সাহেবই বলিতে পারেন। কাব্যে এ শব্দের বহুল প্রচার আছে।

শিরস্—"সে যশঃ-কীরিট আজি বাঁধিব শিরসে, পরিব অতুল যশ, উজ্জ্বল করি শিরস" হেমচন্দ্র, "সকলের চেয়ে সড়েছ শিরসে,অসিত কুন্তল,খেলিল মন।" অবসর-সরোজিনী—কাব্য।

স্তন—"নিজ পুত্রে স্তনদানে করেনি খলতা" যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। "তরুতলে বসি সুতে করে স্তনদান" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

উপজে—"বজ্রপীড়ে উপজিল বিষম সঙ্কট" বৃত্রসংহার কাব্য। "তবু কি সুখের অম্ব সুখে উপজয়?" সুরধুনী কাব্য। "আহা কি বিমল সুখ উপজিল মনে।" পদ্যপাঠ ৷ এস্থলে উপজিল শব্দগুলির অর্থ কি? উপস্থিত হইল না উদিত হইল? কোন খবর রাখেন কি?

করিনি হইনি—করে নাই স্থলে করিনি, হয় নাই স্থলে হইনি, এটি স্থলে ইটি ইত্যাকার প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সুরধুনী কাব্যে "বাম দিকে যাব আমি করিনি বিচার, ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান" কবিতা দ্রষ্টব্য।

একতান চিতে—"একতান মনে শুনিতে রত, উপত্যাগ কথা মনের মত" মিত্রবিলাপ কাব্য। "কেবল অভাগা হ'য়ে একতান মন" বিষাদ সঙ্গীত। জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি উড়িয়া প্রয়োগ?

স্বচ্ছল—সময়ে সময়ে কবিরা বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার করেন। যেমন সুরধুনী কাব্যে "অরাজক রাজ্য মধ্যে ক্রমশঃ প্রবল", "কাকের নীরব হেতু ইহা কিছু নয়।" এবং বৃত্রসংহারে "তাহার নিকটে যাই সহায় যাচিতে?" এস্থলে অরাজকতা, নীরবতা ও সাহায্য স্থলে উহাদের বিশেষণ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় যদি দোষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "স্বচ্ছল" লেখাতেই বা দোষ হইবে কেন?

অচিরায়—অচিরায় ঠিক হউক বা না হউক, কাব্যে অব্যবহার্য্য নহে। "শৈলোপরি নিপতিত শিলাখণ্ড প্রায়, মধুর নিক্কণ তায় উঠে অচিরায়" কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ। "কি চাও বলদ। তুমি বল অচিরায়।" অবসর সরোজিনী কাব্য।

অরশিবে—ঠিক নহে কি জন্য? যখন অরূপিল, দগধ, বরষিয়া, সরজিল প্রভৃতি শব্দ বঙ্গের নবীন প্রবীণ সকল লেখকই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তখন গায়ের জোরে "অরশিবে" আদালতে চলে, সাহিত্যে নহে" বলিলে শোভা পায় কি? আর যখন জগৎ অনুকরণময়, তখন অনুকরণ করায় বিরূপতাটা যে কি তাহা কে বলিয়া দিবে?

ভেপান্তরে—এই শব্দটির অর্থ কি? সমালোচক সাহেবের বুদ্ধিতে তাহা প্রবেশ করে নাই। আমরা এ কথার উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, "কবিতা-কৌমুদীর" "কখন বা তেপান্তরে করিতে ভ্রমণ" কথার অর্থ কি?

তরে—মুসলমানী বাঙ্গালায় চলে, বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় চলে না, কে বলিল? বঙ্গবাসী কলেজের পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও কি ভারত সন্দর্ভে "উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় *Idiom* পদদলিত ও গৌরাম্বিত করিয়াছেন?

প্রিয় পাঠক! আর দেখাইব কত? ইচ্ছা করিলে এইরূপ আরও শত শত উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এই স্থলেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি বুঝেন, যে সমস্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইল, ভরসা করি, তাঁহারা তাহাতেই আমাদের এই প্রতিবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

মোহাম্মদ আজিজল হক্।